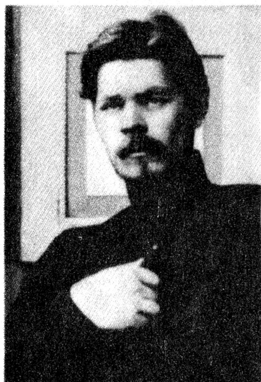

মাক্সিম গোর্কি
মা

বিশ্ব সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাসে আর দ্বিতীয় বই খুঁজে পাওয়া যাবে না যা গোর্কির এই বইটির মতো এত বিপুল পাঠক লাভ করেছে এবং এমন প্রবল ও অমোঘ প্রভাব ফেলেছে কোটি কোটির নিয়তিতে। ১৯০৫ সালে প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় লেখা হলেও বইটি আজো পর্যন্ত দুনিয়ার নানা দেশের পাঠকদের কাছে প্রিয়। ১২৭টি বিদেশী ভাষায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা জাতির ভাষায় তা ছাপা হয়েছে কোটি কোটি সংখ্যায়।



'মা' উপন্যাস সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, 'এটি দরকারী বই, বহু মজুর বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল অচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, এবার 'মা' পড়ে তাদের মহা উপকার হবে... খুবই যুগোপযোগী বই।'

বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন খ্যাতনামা গোর্কিবিদ, ভাষাতত্ত্বের ডক্টর, প্রফেসর বরিস বিয়ালিক।

'গোর্কিকে আমি ভালোবাসি প্রতিভাবান, ইউরোপেও সমাদৃত লেখক হিসাবেই শুধু নয়, বিচক্ষণ, উদার ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসাবেও।'

লেভ তলস্তয়

'গোর্কি রীতির যে প্রতিভা তার শুধু একটিই নাম আছে — সত্য।'

স্তেফান ৎস্ভাইগ

'নয়া সাহিত্যের পতাকায় আঁকা গোর্কির হৃদয় আর সে হৃদয়ের স্পন্দন বিশ্ব শান্তি।'

কৃষণ চন্দর

মাক্সিম গোর্কি · মা

ম্যাক্সিম গোর্কি
মা

উপন্যাস

পঞ্চম সংস্করণ



প্রগতি প্রকাশন · মস্কো
১৯৮১

অনুবাদ: পুষ্পময়ী বসু
অঙ্গসজ্জা: ভ. ইলিউশ্চেনকো

Максим Горький
МАТЬ
Повесть
На языке бенгали

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union



সোভিয়েতের ইউনিয়নে মুদ্রিত

Г $\frac{70302-800}{014(01)-81}$ без объявл. 4702010200

সূচী

মুখবন্ধ

পথের তাঁর শেষ নেই

১৮৯২ সালে 'মাক্সিম গোর্কি' বা 'তিক্তপ্রাণ মাক্সিম' এই ছদ্মনামে স্বাক্ষরিত রচনা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তার লেখক, নির্জনি নভ্গরদের কারুজীবী আলেক্সেই মাক্সিমভিচ পেশকভের বয়স ছিল চব্বিশ। কিন্তু এর মধ্যেই তাঁকে এত কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, এত কিছু সইতে হয়েছে এবং জীবন্ত অভিজ্ঞতা এতটা লাভ হয়েছে যে তাঁর পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক কোনো লেখকের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না। বাণীর রূপকার আর এমন একজনেরও নাম করা দুষ্কর যিনি এমন করে জীবনের নিম্নতম ধাপ থেকে বিশ্ব সংস্কৃতির শীর্ষে উঠতে পেরেছেন।

গোর্কির জীবনী এতই পরিচিত যে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়ে না। শুধু এইটুকু স্মরণ করা যাক যে তাঁর সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বের সর্বকোণে তাঁর নাম বিখ্যাত হয়ে ওঠার বছর কয়েক আগে ১৯ বছরের যে জোগাড়ে-টি তখন কাজানের একটি রুটি কারখানায় কাজ করত, সে কিন্তু আত্মহত্যা করে মরতে চেয়েছিল। কোন মর্মপীড়া তাকে এ পথে ঠেলেছিল? জেলের খুপরির মতো অন্ধকার গুমোট এক ভূগর্ভ কুঠরির গুরুভার পরিশ্রমে সে হতাশ হয়ে উঠেছিল কি, যা পরে গোর্কি রূপায়িত করেছেন তাঁর 'কনোভালভ', 'ছাব্বিশ জন আর একটি মেয়ে' ইত্যাদি গল্পে? না, এর অনেক আগে থেকেই এ তরুণ কাজ করেছে কুলি হিসাবে, ক্ষেতমজুর হিসাবে, গুণ-টানিয়ে হিসেবে—সাধ্যাতীত মেহনতের দৈনন্দিন কয়েদখাটুনি আর দারিদ্র্য তার ছেলেবেলা থেকেই জানা। এ পথে সে এগিয়েছিল অন্য কারণে। কিছু বই সে এর মধ্যে পড়ে ফেলতে পেরেছিল যাতে জানা গিয়েছিল মানুষ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম। এটা সে বিশ্বাস করেছিল এবং ভেবেছিল এ বিশ্বাসে সে অন্যকেও অনুপ্রাণিত করবে, করবে তাদের যারা তারই সঙ্গে খাটত ভূগর্ভের কারাগারে। কিন্তু কাজানে যখন ছাত্র আন্দোলন ফুঁসে উঠল (তাতে প্রধান ভূমিকা নেন গোর্কির ভবিষ্যৎ মহা সুহৃদ—তরুণ লেনিন) তখন এই সঙ্গীরাই তাকে বোঝায় ছাত্রদের পেটানো দরকার। সেটা যে কী ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ম এক আত্মিক যন্ত্রণায় মর্মাহত হয়ে তা বোঝাবার মতো ভাষাও তার জোটে নি। এই সময়েই হতাশ হয়ে ওঠে সে. কাজানকা নদীর উঁচু পাড়ে বেজে ওঠে গুলির শব্দ।

হৃৎপিণ্ডের সে লক্ষ্যে যদি গুলিটা পেঁছত, তাহলে আলেক্সেই পেশকভের কোনো কথাই আমরা জানতে পারতাম না, মাক্সিম গোর্কি লেখকও দেখা দিতেন না। সে দুর্যোগে কালের বহু তরুণের মতোই তার জীবনও ছিন্ন হয়ে যেত। যাই হোক, ফুসফুস বিদীর্ণ করে গুলি চলে যায় হৃৎপিণ্ডের ঠিক পাশ দিয়ে, তরুণ পেঁছয় হাসপাতালে। জ্ঞান ফিরলে সে রুটি কারখানার সেই একই সঙ্গীদের দেখে, যারা অমন ব্যথিত করেছিল তার মনকে। এবার কিন্তু তাদের মুখে সে দেখল উদ্বেগ, তার জন্যে সস্নেহ ভর্ৎসনা। সে বুঝল: লোকেরা খারাপ নয়, তমসায় তাদের দণ্ডিত করে রেখেছে যে পরিস্থিতি, সেইটেই খারাপ। তার মানে হতাশ হওয়া লজ্জার কথা, ঢেলে সাজা সম্ভব, ঢেলে সাজতে হবে জীবনকে। কিন্তু তার জন্যে আরো ভালো করে জানতে হবে জীবনকে, লোককে, নিজের দেশকে, এমন বাণী, এমন ভাবনা, এমন আদর্শ পেতে হবে যা লোককে দাঁড় করিয়ে দেবে সংগ্রামে।

সেই থেকে আর কোনো অগ্নিপরীক্ষাতেই গোর্কির সংকল্প টোটে নি। আর পরীক্ষা, ক্লেশভোগ, বিপদ তার পরেও কম দেখা দেয় নি — একটা জীবন নয়, একশ জীবনের পেয়ালা তাতে ভরে উঠতে পারে। ১৮৯১—১৮৯২ সালে রাশিয়ায় দেখা দিল এক মহা সর্বনাশ—আকাল, ঘর ছেড়ে, ভলগা তীর ও কেন্দ্রীয় রাশিয়া ছেড়ে লক্ষ লক্ষ চাষী বেরিয়ে পড়ে তাদের পুত্রপরিজন নিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে লোকে ধরে দক্ষিণের পথ। লেভ তলস্তয়, চেখভ, করোলেঙ্কো ও অন্যান্য রুশ লেখকেরা তখন দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্যে বহু পরিশ্রম করেছিলেন। গোর্কি তখন লেখক হয়ে ওঠেন নি, তখনও তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতদেরই একজন, তাদের সঙ্গেই পাড়ি দিয়েছেন ইউক্রেন, ক্রিমিয়া, ককেশাস। বহুবার তাঁকে পিটিয়ে আধমরা করা হয়েছে, 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তি হিসেবে পেঁছতে হয়েছে থানায় এবং সাধারণ ভাবে এত কিছুর মধ্যে দিয়ে গেছেন যে আদৌ টিকে রইলেন ভেবেই অবাক লাগে। কিন্তু এসব ক্লেশে তাঁর আর আগের মতো হতাশা জাগত না, বেড়ে উঠত প্রতিবাদের মনোভাব, কর্মশক্তির অসাধারণ একটা জোয়ার। এই সময়েই তিনি লেখক হন।

কয়েক বছর গোর্কির লেখা ছাপা হয় প্রধানত ভলগা তীরের মফস্বলী কাগজপত্রে, এবং নামকরা সাহিত্যিকদের মনোযোগ তৎক্ষণাৎ এই তাজা জ্বলজ্বলে প্রতিভার দিকে আকৃষ্ট হলেও যশ তাঁর বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করে নি। ১৮৯৮ সালে যখন প্রকাশিত হল তাঁর 'রেখাচিত্র ও কাহিনী' নামে

শীর্ণ একটি সংকলন, তখন তার বিপুল সাফল্যে গোর্কি সে সময়কার বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের এক পঙক্তিতে উঠে আসেন। এক বছর পর প্রকাশিত হয় গোর্কির উপন্যাস 'ফোমা গর্দেয়েভ', যা লেভ তলস্তয়ের একই সময় প্রকাশিত 'পুনরুজ্জীবন' উপন্যাসের মতোই সমান আগ্রহ সৃষ্টি করে। আর তার পরেই যখন বেরল গোর্কির উপন্যাস 'ত্রয়ী' এবং শুরু হল তাঁর নাট্যকর্ম (বিশেষ সাফল্য লাভ করে 'তলদেশে' নামক প্রতিভাদীপ্ত দার্শনিক নাটক) তখন তাঁর যশ দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে সমুদ্র পেরিয়ে হয়ে ওঠে সত্যসত্যই বিশ্বব্যাপী।

কিন্তু গোর্কির প্রথম সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় তাঁকে নিয়ে নানা কিংবদন্তী, এবং তাঁর যশোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ কিংবদন্তীও বাড়তে থাকে। বহু সমালোচক ঘোষণা করেন যে তরুণ লেখকের এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁর শিল্প প্রতিভার কারণে ততটা নয়, যতটা তাঁর অনন্যসাধারণ জীবনকাহিনী চাঞ্চল্যকরতায়। কথাটা ঠিক নয়: ৯০-এর দশকের শেষে তাঁর জীবনকাহিনী যে প্রকাশিত হতে থাকে সেটা আসলে তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতারই দৌলতে।

তাঁর আদি যে লেখাগুলোতে অতুলনীয় বাস্তব দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছিল অমন দুর্বিষহ এক জীবনযাপনের পক্ষে বিস্ময়কর এক মহামন্দ্র, 'নির্ভীকের বুদ্ধিহীনতার' বীরস্তুতি, তার মধ্যেই মহান শিল্পাবিষ্কারের সমস্ত পূর্বসর্ত সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনো সমাজতান্ত্রিক চেতনা গোর্কি পান নি, প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক নির্বন্ধ তাঁর জানা ছিল না। শ্রমিক শ্রেণীকে তখনো তিনি আঁকছিলেন কেবল শোষিত, দমিত, উৎপীড়িত হিসাবে, নিজেদের এবং সমস্ত মেহনতী মানুষদের দাসত্ব মোচনে সক্ষম এক পরাক্রান্ত শক্তি হিসাবে নয়। গোর্কির চেতনায় একটা আবর্তনের জন্যে দরকার ছিল কেবল একটা ঠেলার। সে ঠেলা তাঁকে দেয় দেশের প্রবল বিপ্লবী আন্দোলন, যাতে তিনি সাড়া দেন তাঁর উদ্দীপিত 'ঝোড়ো পাখির গানে'। ভ. ই. লেনিনের সঙ্গে তাঁর যে পথের মিল হয়, প্রথমে তাঁর রচনা ও ধারণার সঙ্গে পরিচয়, পরে তাঁর সুহৃদ, গুরু ও নেতা হিসাবে স্বয়ং লেনিনের সঙ্গে — এটাও কম তাৎপর্যের নয়।

লেনিনবাদে গোর্কি এসে পেঁছেন তাঁর নিজের ধরনে, মানবিকতার সমস্যায় গভীর আলোড়িত এক শিল্পী হিসাবে। ১৯০১ সালেই তাঁর 'কূপমণ্ডূক' নাটকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় পেঁছনো প্রলেতারীয় বিপ্লবী

নীল-এর মূর্তি এঁকেছিলেন। 'তলদেশে' নাটকে তিনি আরো ব্যাপকতা ও গভীরতায় হাজির করেন মানবতার সমস্যা, যেখানে প্রচারক লুকা'র সান্ত্বনা নীতি তিনি উদ্ঘাটিত করেন — যার সমস্ত দার্শনিকতাই হল 'যা বিশ্বাস করো তাই সত্যি'। জীবনকে মেনে নেওয়ার এই নিষ্ক্রিয় মানবতার বিরুদ্ধে গোর্কি হাজির করেছেন বিপ্লবী সংগ্রামের মানবতা, যা জীবনের সমস্ত সত্যকে আত্মস্থ করতে ডাক দেয় সে জীবন এবং মানুষকে বদলে দেবার জন্যে, বাহির থেকে এবং ভিতর থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যে। 'মানুষ — এই হল সত্য!', 'মানুষ — কী দৃপ্ত কথাটার ঝঙ্কার!', 'সবই মানুষের মধ্যে, মানুষের জন্যে' — 'তলদেশে' নাটকের উদ্দীপ্ত এ কথাগুলো আজো লক্ষ লক্ষ লোক পুনরাবৃত্তি করে চলেছে পৃথিবীর সমস্ত ভাষায়।

১৯০৬ সালে লেখা 'মা' উপন্যাসেও গোর্কি বিপ্লবী মানবতার সমস্যা তুলেছেন। একথা বললে অন্যায় হবে না যে বিশ্ব সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাসে প্রায় আর কোনো সাহিত্য কীর্তিই গোর্কির এ বইয়ের মতো এত বিপুল সংখ্যক পাঠক লাভ করে নি এবং কোটি কোটি মানুষের নিয়তিতে বিস্তার করে নি এমন প্রবল ও প্রত্যক্ষ প্রভাব।

বিশ শতকের গোড়ার দিকেই অর্থাৎ সাহিত্যে গোর্কির আবির্ভাবের পর দশ বছর না যেতেই তাঁর নাম গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ তাঁর পাশেই লেভ তলস্তয় ও আন্তন চেখভের মতো তাঁর স্বদেশীয় লেখকেরা তখনো জীবন্ত। তাহলেও নতুন যুগের সমস্ত মনোযোগ অর্পিত হল ঠিক গোর্কির ওপরেই। বলতে কি, তাঁর মতো একটা কোলাহল তুলতে ইব্‌সেন, বার্নার্ড শ' বা আনাতোল ফ্রাঁসের মতো সর্বজনস্বীকৃত সাহিত্যরথীরাও পারেন নি। গোর্কি বেরিয়ে এলেন নিচুতলা থেকে, সমাজের তলকুঠরি থেকে। এবার যেন তাঁর শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ করতে এগিয়ে এল নিয়তি। তাঁকে ধরা হল আক্ষরিক অর্থে নতুন যুগের বরপুত্র বলে। গোর্কির মধ্যেই নতুন যুগ তার আত্মপরিচয় নিতে চাইল।

নতুন বিশ শতকের নতুন সুরটা গোর্কি সঙ্গে সঙ্গেই ধরেছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সক্রিয় নায়ক হিসাবে, সর্বপ্রধান চরিত্র হিসাবে এসে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক মানুষ। আর মাক্সিম গোর্কি হয়ে দাঁড়ালেন এই নতুন যুগের নতুন নায়কের চারণ, তার জীবনীকার, সাহিত্যে তার প্রতিনিধি।

এবং 'মা' গ্রন্থেই নতুন যুগ-নায়কের পরিপূর্ণ শিল্পিত অভিব্যক্তি ও বিকাশ দেখা গেল।

অনেকেই জানেন যে উপন্যাসটির ভিত্তিতে আছে বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা — ১৯০২ সালের সরমভো শ্রমিকদের পয়লা মে'র মিছিল, এবং মিছিল ছত্রভঙ্গ করার পর যোগদানকারীদের বিচার। গোর্কি নিজেই পরে বলেছেন, 'নির্জনিতে থাকতেই সরমভো মিছিলের পর মজুরদের নিয়ে একটা বই লেখার ইচ্ছে হয়। সেই সময়ই মালমসলা জোগাড় করতে শুরু করি, নানা রকম নোট নিই।' গোর্কির উপন্যাস তাই হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের ঐতিহাসিক দলিল। তাহলেও যে ঘটনার ভিত্তিতে উপন্যাস তাকে লেখক অনেক ঘসামাজা করে একটা শিল্পরূপ দেন আর বইয়ের ভিত্তিস্থলের আদি নায়কেরা (সত্যিই তারা বাস্তবে ছিল: বইয়ের প্রধান নায়কদের চিত্রিত করা হয়েছে সরমভো শ্রমিক পিওত্‌র্‌ জালোমভ এবং তার মায়ের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে) ওস্তাদের কলমে লাভ করে নতুন জীবন, দেখা দেয় নতুন নায়ক ও নতুন পরিস্থিতি। এর পরিণামে দেখা দিল ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পূর্বাহ্নে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ও সংগ্রামের এক ব্যাপক ও সাধারণীকৃত ছবি।

লেখক যেন এ বইয়ের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন, রাশিয়ার বিপ্লবের পথ ছিল সুকঠিন ও জটিল, কিন্তু সেই ছিল একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ। সে পথ ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতের সে জনসংগ্রামের নেতা হিসাবে 'মা' উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত করল শ্রমিক শ্রেণীকে। এ উপন্যাস নিজেদের মহা আদর্শ রূপায়িত করতে নামা শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে। এ বই শ্রমিক শ্রেণীর জন্যেও। এতে তারা দেখল নিজেদের সমস্ত যোগ্যতা এবং তখনো অপ্রতুল রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত পরিপক্কতা। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে, সমগ্র রুশ জনগণের পক্ষে এ বই ছিল একান্ত অত্যাবশ্যক।

গোর্কির সঙ্গে এক আলাপে লেনিন 'মা' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এটি দরকারী বই, বহু মজুর বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল অচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, এবার 'মা' পড়ে তাদের মহা উপকার হবে... খুবই যুগোপযোগী বই।'

লেভ তলস্তয় একবার মন্তব্য করেছিলেন, শিল্পকীর্তির ঐক্য গড়ে ওঠে তার চরিত্রগুলির ঐক্যে নয়, পরিস্থিতির ঐক্যে নয়, লেখকের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্যে। 'মা' উপন্যাসে গোর্কির নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ

পেয়েছে তার প্রধান চরিত্র নিলভ্‌নার মূর্তিতে। এই চরিত্র, এই সাধারণ এক শ্রমিক মায়ের কাছেই বইটি তার নামের জন্যে ঋণী। বইয়ের শুরুতে শত শত অমনি আরো অনেক মা থেকে তার কোনোই তফাৎ ছিল না — সবাই তারা কলকারখানায় মাত্রাতিরিক্ত অমনি মেহনতে, মাতাল মারপিটে, নিজের সংসারেই একটা সদাশঙ্কিত অস্তিত্বে ক্লিষ্ট। কিন্তু তার ছেলে পাভেল ভ্লাসভ যখন কারখানা বস্তির এই অভ্যস্ত জীবন ধারা থেকে সরে গিয়ে হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিপ্লবী, তখন ছেলের পাশে তার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে তার মা নিলভনা। এ উপন্যাসে নিলভনার যে পথ, সেটা শ্রমিক জনের বিপ্লবে পেশছনোর পথ। আর নিলভনার সহৃদয় ন্যায়পর প্রাণ, তার বিবেক, কল্যাণ কী জিনিস, কী করে দিন কাটানো উচিত সে সম্পর্কে তার ধারণাই হয়ে উঠছে গোর্কির কাছে এ বইয়ের প্রধান নৈতিক মাপকাঠি। আর আমরা পাঠকেরা আমাদের চারিপাশের দুনিয়াটাকে দেখি এই মায়ের চোখ দিয়ে, ঘটনার মূল্যায়ন করি তারই মূল্যবোধ নিয়ে। পাভেল ভ্লাসভের কমরেডরাও নিলভনাকে ডাকে 'মা' বলে। গোর্কির বইয়ের একটা প্রধান, একটা মূল কথাই এখানে নিহিত। নিলভনার সঙ্গে সম্পর্কেই তার চারিপাশের বিপ্লবীরা, পাভেলের কমরেডরা অনুভব করে তাদের আত্মিক ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। পাভেলের ঘনিষ্ঠ কমরেড আন্দ্রেই নাখদ্‌কা বলে, 'আমরা সব এক মায়ের ছেলে — সেই মা হল এই এক দুর্নিবার ভাবনা, সারা দুনিয়ার শ্রমিক ভাই ভাই।' জীবনের গতিপথে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাধারণ আদর্শে যোগ দিয়েছে যে চাষী রীবিন, সেও বলে, 'সব মানুষকে এক প্রাণের মধ্যে ঢেলে দেওয়া — সত্যি এ যে কত বড় কাজ! যখন বুঝতে পারে, আমি যা চাইছি লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ তাই চাইছে, তখন হৃদয় কোমল হয়ে ওঠে।'

'মা' উপন্যাসে বলা হয়েছে বিপ্লবী সংগ্রামের কথা, কী ভাবে সে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়, তার হোমশুদ্ধি শিখায় লোকের ভেতরটা বদলে যায়, তার আত্মিক নবজন্ম ঘটে। মানুষের এই 'পুনরুজ্জীবনের' প্রশ্ন নিয়ে গভীর দার্শনিকতা ও তীব্র বিতর্ক দেখা গেছে। দস্তোয়েভস্কির যেখানে আশঙ্কা ছিল যে বিপ্লবী সংগ্রামে মানুষে মানুষে শত্রুতাবোধ তীব্র হয়ে উঠতে পারে, সেখানে উল্টে গোর্কি দেখালেন যে কেবল বিপ্লবী সংগ্রামেই মানুষ তার সমস্ত পাশবিকতা ও স্বার্থপরতা থেকে ভেতরটা শুদ্ধ করে নিতে পারে। লেভ তলস্তয় যেখানে মানুষের 'পুনরুজ্জীবন' দেখেছিলেন তার

আভ্যন্তরীণ আত্মউন্নয়নের পথে, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও কু'য়ের অপ্রতিরোধে, সেখানে 'মা'য়ের নায়িকা কেবল সংগ্রামের পথ নিয়েই এ ঘোষণার অধিকার পায়, 'আমার পুনরুজ্জীবিত আত্মাকে মারতে পারবে না ওরা!'

গোর্কির সৃষ্টির মধ্যে ছিল পরস্পর পরিপূরক দুটি প্রধান প্রসঙ্গ, যাতে উদ্ঘাটিত হয় তাঁর বিশ্ববোধের 'গহীনতম রহস্য', 'বাস্তবতার প্রতি তাঁর রসদৃষ্টি'। যে মানুষ তার নিজের ভাগ্য জড়িয়ে নেয় জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে, বাস্তবের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের সঙ্গে, তার পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গ এবং যারা জনগণের কাছ থেকে নিজের 'আমি'কে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়, লুকতে চায় ইতিহাসের উত্তাল প্রবাহ থেকে, তাদের আত্মপ্রতিশোধ স্বরূপ 'ব্যক্তিত্ব বিনাশের' প্রসঙ্গ। প্রথম প্রসঙ্গটার যদি শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ হয়ে থাকে 'মা' উপন্যাসে, তাহলে দ্বিতীয় প্রসঙ্গটা গোর্কির একগুচ্ছ লেখার মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে এসে তার ব্যাপকতম সামগ্রিকতা পেয়েছে তাঁর 'অন্তিম' রচনায়, চার খণ্ডের মহাকাব্য 'ক্লিম সামগিনের জীবন'এ।

সাধারণ ভাবে গোর্কির জীবনের শেষ পর্যায়টা তাঁর প্রতিভার এক অপূর্ব নবোৎসারে চিহ্নিত। 'ক্লিম সামগিনের জীবন' এবং অন্যান্য মহাকাব্যিক রচনা ছাড়াও তিনি লেখেন 'ইয়েগর বুলিচভ প্রমুখেরা', 'দস্তিগায়েভ প্রমুখেরা', 'ভাসা জেলেজ্নভা'র নবরূপ। শেষের দিকের অনেকটা জায়গা নেয় তাঁর প্রচার প্রবন্ধ, তাঁর বহুমুখী সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। আর এ সবের মধ্যেই ছাপ রয়ে গেছে লেখকের উত্তুঙ্গ পৌরুষের, তাঁর শেষ দিনগুলোর বীর্যের।

অনেকেই জানেন, ১৯২১ সালে লেনিনের পেড়াপীড়িতে গোর্কি চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যান। কবে একদিন গুলি খেয়েছিল তাঁর ফুসফুস, ক্ষয়রোগের হামলা তা এখন আর ঠেকাতে পারছিল না, গোর্কির প্রাণসংশয় হয়ে উঠল। বছরের পর বছর রোগ কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু স্বদেশ তাঁকে কেবলি টানছিল, বিরাট সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ শুরু হয়েছে সেখানে। ১৯২৮ সাল থেকে তিনি গ্রীষ্মের সময়টে সোভিয়েত ইউনিয়নে আসতেন, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা শুরু হতেই চলে যেতেন ইতালিতে, যেখানে তাঁর দেহযন্ত্র স্বস্তি পেত। তাহলেও ১৯৩৩ সালে রোগ আরো ঘন ঘন জানান দিতে থাকলেও গোর্কি বরাবর দেশেই থাকবেন ঠিক করেন। উনি জানতেন এতে তিনি আয়ু কমিয়ে আনছেন, কিন্তু আর যে

কিছু করার ছিল না: জার্মানিতে ক্ষমতা নিয়েছে ফ্যাশিস্টরা, বাতাসে নতুন বিশ্বযুদ্ধের গন্ধ, তার প্রধান আঘাতটা যে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই হবার কথা। গোর্কি হয়ে দাঁড়ালেন ফ্যাশিস্ট বিরোধীদের বাগ্মিমান মুখপাত্র, শান্তি সংগ্রামের বিশ্ব আন্দোলনের অন্যতম নেতা, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী কংগ্রেসের সংগঠক। করাল ব্যাধিতে আচ্ছন্ন গোর্কি তাঁর জ্ঞান হারাবার আগে শেষ যে কটি কথা বলেছিলেন, তা এই: '...যুদ্ধ হবে... তৈরি হওয়া দরকার...' মারা যান তিনি ঠিক তার লেখা গল্পেরই দাঙ্কোর মতো।

...১৯৬৮ সালের ২৮শে মার্চ গোর্কির জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর তিনি নেই, কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের অগ্রগতিতে তিনিই এখনো কেন্দ্রীয় আসনে, তাঁর শিল্পোদ্‌ঘাটনই আজও এ সাহিত্যকে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে।

বছরের পর বছর যায় আর নির্জনি নভ্‌গরদের কারিগর আলেক্সেই পেশকভ, প্রতিভাবান কথাশিল্পী মাক্সিম গোর্কিও হেঁটে চলেন রাশিয়ার রাস্তা দিয়ে, সারা বিশ্বের রাস্তা দিয়ে, নিজের অন্তঃকরণের তাপ দিয়ে উষ্ণ করে তোলেন লক্ষ লক্ষ মানবপ্রাণ।

পথের যে তাঁর শেষ নেই।

ভাষাবিদ্যার ডক্তর
প্রঃ বরিস বিয়ালিক

প্রথম খণ্ড

১

রোজ রোজই সেই এক — সেই ভোর না হতেই কারখানার বাঁশীটার কাঁপা কাঁপা বিশ্রী চীৎকার... কুলি-বস্তির ধোঁয়াটে তেলচিটে আকাশটা আঁত্‌কে ওঠে। ও তো ডাক নয় যেন সমন। পেশীগুলো চাঙা হয়ে ওঠার আগেই গুমোট ঝাপসা অন্ধকারে ঘুম ভেঙে যায়। ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে খুপরিগুলো থেকে অন্ধকার মুখে মানুষগুলো বেরিয়ে আসে ভয়-খাওয়া আরশোলার মতো। কন্‌কনে ঠাণ্ডা; শেষ রাতের আঁধার তখনও লেগে থাকে ভোরের গায়ে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটা দিয়ে চলে ওরা। কারখানার উঁচু উঁচু পাথুরে খুপ্‌রিগুলো ওদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার আত্মপ্রত্যয়ে। তাদের সার-বাঁধা চৌকো চৌকো তৈলাক্ত চোখের আলো পড়ে এঁদো রাস্তাটার ওপর। মানুষগুলোর পায়ের তলায় কাদা ছপ্‌ছপ্‌ করে। কর্কশ, মোটা, ঘুম জড়ান কণ্ঠের গালাগালি আর খিস্তির তোড়ে বাতাস বিদীর্ণ হয়। তাদের দিকে ভেসে আসে আরো নানা শব্দ — কারখানার যন্ত্র-দানবের গর্জন আর বাষ্পের ভস্‌ভসানি। কুলি-বস্তির ওপরে মাথা উঁচিয়ে থাকে বিরস কালো চিমনিগুলো, মোটা মোটা উঁচনো গদার মতো।

তারপর যখন সন্ধে হয়, পড়ন্ত সূর্যের ক্লান্ত ছায়া এলিয়ে পড়ে জানলায় জানলায়, পোড়া-কয়লার ছাইয়ের মতো করে কারখানাটা তার পাথুরে ভুঁড়ি থেকে মানুষগুলোকে উগ্‌রে ফেলে। আবার সেই নোংরা রাস্তা বেয়ে কালিঝুলি মাখা কালো কঠোর মুখের মিছিল; ক্ষুধার্ত ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো ঝিলিক দেয়। কলের তেল কালির গন্ধ বেরয় চট্‌চটে গা দিয়ে। কিন্তু এবেলা ওদের গলার স্বরে ফুর্তির, এমন কি আনন্দের সুর — আজকের মতো খাটুনি সারা। এখন ঘরে ফিরে, কিছু গিলে শরীরটা এলিয়ে দেওয়া।

ওদের দিনগুলোকে গিলে খায় কারখানাটা, আর দেহের শক্তি নিংড়ে নিংড়ে যতটা পারে শুষে নেয় যন্ত্র-দানব। একটা একটা করে দিন এমনি করে যায় — একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আর এক পৈঠে করে মানুষগুলোর পা এগোয় কবরের দিকে। কিন্তু তা হোক — এখনকার মতো তো দেহটা বিশ্রাম পাবে। সেই আশায়, আর ধোঁয়া-ভরা মদের আড্ডার কল্পনায় ওদের মন এখন রং-ধরা।

রবিবারদিন ঘুম ভাঙতে বেলা দশটা। বিয়ে-থাওয়া-করা সংসারী গেরস্ত গোছের যারা, তারা উঠে পোষাকী কাপড় পরে গির্জায় যেতে যেতে ধর্মে মতি নেই বলে গাল দিতে থাকে ছেলে-ছোকরাদের। উপাসনার পর বাড়ী ফিরে পিঠে-টিঠে খেয়ে আবার লম্বা ঘুম সেই সন্ধ্যে অবধি।

বছরের পর বছর হাড়ভাঙা খাটুনিতে দেহটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ওদের ক্ষিদে মরে যায়। মদ খেয়ে ভোঁতা ক্ষিদেটাকে শান দিতে যায়। কিন্তু কড়া ভদ্‌কার ঝাঁঝে পেটের নাড়ীগুলো চিড়্‌বিড়িয়ে ওঠে।

সন্ধ্যের সময় একটু বেড়াতে যায় অলস পায়ে। বেরবার সময় গালশ থাকলে ওটাই পরে বেরবে, হোক না রাস্তা খট্‌খটে শুকনো। আর ছাতা থাকলে বৃষ্টি না পড়লেও তা সঙ্গে নিয়ে বেরনো চাই।

কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে সেই একই কথা — কারখানা, যন্ত্র আর ফোরম্যান... কাজ ছাড়া ওদের কোনো কথা নেই, কোনো চিন্তা নেই। পান্‌সে, একঘেয়ে দিন। এরই মধ্যে কদাচিৎ এক-আধটা, অতি ক্ষীণ, ভীরু চিন্তার ফুল্‌কি ঝলক্‌ দিয়ে যায়। বাড়ী ফিরে ঝগড়া লাগে বৌ-এর সঙ্গে, ঠেঙায় তাকে, ঘুষি মারতে ছাড়ে না। চ্যাংড়ারা মদের আড্ডায় যায়, অথবা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী আড্ডা দেয়, — অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে অশ্লীল গান গায়, নাচে, গালাগালি দেয় আর কষে মদ খায়। খাটুনিতে অবসন্ন দেহটা সইতে পারে না, নেশা ধরে সহজেই, কি যেন একটা অজানা অস্থির ফরিয়াদ বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে সব কিছুর তলায়, বেরবার পথ চায়। তাই মনের জ্বালায় সামান্য কারণেই তারা খেয়ো-খেয়ি করে পাশব হিংস্রতায়, কথায় কথায় হাতাহাতি, রক্তারক্তি, হাত-পা-মাথা ভাঙা, কখনো কখনো খুনোখুনি পর্যন্ত।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটুকু ওদের বেলায় কি যেন এক বিদ্বেষে বিষিয়ে থাকে, যে কোনো মুহূর্তে ফেটে বেরিয়ে পড়ে। ও বিষ ঝেড়ে ফেলা যায় না; ওটা ওদের দেহের অনপনেয় ক্লান্তির মতোই। বাপ থেকে বেটায় সংক্রামিত হয় সে বিষ, কালো ছায়ার মতো একেবারে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করে। ওই বিষের জ্বালায়ই ওরা অযথা ক্রূর জঘন্য সব অপরাধ করে থাকে।

রবিবারগুলোয় ছোকরারা অনেক রাত্তিরে বাড়ী ফেরে ছেঁড়া কাপড়ে, সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা মাখা, কালশিটে-পড়া-চোখ, জখমী নাক; কখনও আবার বন্ধুদের ঠেঙ্গিয়ে এসে বিদ্বেষের সঙ্গে আস্ফালন করে, আর নয়তো

গঁতোনি খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসে, গোমড়া মুখে গজরায়; মাতাল, করুণ, অসহায়, ন্যক্কারজনক কতকগুলো মানুষ। কোন কোন দিন ছেলেরা বাড়ীই ফেরে না; পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ে থাকে রাস্তার ধারে বা বেড়ার আড়ালে, নয়তো আড্ডাখানার মেঝেতে। বাপ মা খুঁজে পেতে কুড়িয়ে আনে, যাচ্ছেতাই করে গালি-গালাজ করে, ভদকা-ঠাসা অসাড় গতরগুলোর উপর লাগায় ঠ্যাঙ্গানি। কম বেশি যত্নশীল যে-সব মা বাপেরা তারা ধরে নিয়ে বিছানায় ফেলে ওদের যাতে পরের দিন সাত সকালে কারখানার ক্রুদ্ধ বাঁশীটা যখন ভোরের আলো ঠেলে আঁধারের ঢেউয়ের মতো তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে আসে, তখন আবার ওদের তুলে দিতে পারে।

বড়োরা রাগ করে, ছেলেদের পেটায়ও বটে, কিন্তু ওদের মাতলামি আর মারামারিটা অস্বাভাবিক ভাবে না। নিজেরাও করেছে যখন চ্যাংড়া ছিল; বাপ মায়ের কাছে এমনি ঠ্যাঙ্গানিও তাই খেয়েছে। এমনি ভাবেই তো চলে এসেছে ওদের জীবন — একটানা ঢিমে ঢিমে স্রোতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে বছরের পর বছর তার ঘোলা জল আদ্যি কালের পুরনো মন, চাল-চলন আর রীতকরণের পাড়-বাঁধা হয়ে। সে স্রোত বদলাবার বাসনা কারও নেই।

মাঝে মাঝে বস্তিতে ভিন-দেশ থেকে মানুষ জন আসে। বাসিন্দারা নূতনের টানে উৎসুক হয়ে চোখ তুলে চায়। তাদের আগেকার কাজের জায়গার গল্প শোনে ভাসা ভাসা আগ্রহে। ধীরে ধীরে নূতনের রং খসে, গল্পও পুরনো হয়; খাড়া কান আর তোলা চোখ নেমে আসে। সাধারণ মজুরদের জীবন, সেই এক থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। তাতে গপ্প করার কী আছে?

কিন্তু কেউ কেউ আবার নূতন কথাও বলে। সাত জন্মে কেউ শোনেনি এমন সব কথা। কেমন যেন সন্দেহ হয়। তবু শোনে প্রত্যেকেই, তর্ক করে না। কেউ চটেও যায়, কারুর মনে আবার কিসের জানি শঙ্কা জাগে। কি যেন একটা আশার আবছা ছায়াও দোলা দিয়ে যায় কারুর মনে। অস্থির আশঙ্কা ভোলার জন্য ওরা আরো বেশি করে মদ খায়।

দশের থেকে একটু আলাদা কেউ হলেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। সে সন্দেহের কারণ তাদের অজানা। যেন ভয় পায় — হোক পানসে জোলো, কিন্তু মোটের ওপর একটা ধারায় চলছে তো জীবনটা। কে জানে কি ঝামেলা বাধাবে ওই সব লোকগুলো। নাই বা থাক সুখ, স্বস্তি তো

আছে। জীবনের ভারি বোঝাটা একই ভাবে বয়ে এনেছে ওরা। বইছে, বইবে। জেনে রেখেছে ও থেকে মুক্তি নেই। আর মুক্তিই যদি নেই, তবে হেরফের হলে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।

অতএব যারা নতুন কথা বলে, ওরা চুপচাপ তাদের পাশ কাটিয়ে যায়। নয়া মানুষগুলো অন্য কোথাও চলে যায়। কেউ কেউ কারখানায় কাজ নিয়ে থেকেও যায় কিন্তু গড্ডলিকা প্রবাহে মিশে যেতে না পেরে থাকে একপাশে...

এমনি করে গোটা পঞ্চাশ বছর কোনমতে বেঁচে থেকে লোকগুলো একে একে যায় মরে।

২

মিখাইল ভ্লাসভ-এর জীবনটাও এই একই রকমের। লোমশ শরীর; এই এতখানি পুরু ভুরুর তলায় কুতকুতে চোখ-জোড়া দিয়ে দুনিয়াটাকে ও দেখে সন্দেহ আর অবহেলার দৃষ্টিতে। কারখানার সেরা মিস্ত্রী ও, বস্তিতে ওর জুড়ি নেই গায়ের জোরে। কিন্তু ওপরওলার সাথে ব্যবহারটা কর্কশ বলে রোজগারটা বেশি হয় না। তারপর ছুটির দিনে ও কাউকে না-কাউকে ধরে ঠ্যাঙ্গাবেই। কাজেই কেউ ওকে দেখতে পারে না। ভয়ে ওর কাছে ঘেঁসেই না কেউ। পাল্টা ঠ্যাঙ্গানি দেবার চেষ্টা করেছে কেউ কেউ, কিন্তু পেরে ওঠেনি। কাউকে তেড়ে আসতে দেখলেই হলো — ভ্লাসভ্ ইঁট, পাথর, কাঠ, লোহা, হাতের কাছে যা পাবে তুলে নিয়ে দু'পা ফাঁক করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে তাক করে। ওই লোমশ হাত আর কালো দাড়ি-ছাওয়া মুখ দেখলেই লোকের পিলে চম্‌কে উঠত। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল ওর ক্ষুদে ক্ষুদে ধারাল চোখ দুটোর দৃষ্টি, যেন ছুঁচলো লোহার মতো মানুষকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়। সে কি চেহারা তখন ওর — যেন ভয়লেশহীন নির্মম হিংস্র বুনো জানোয়ারটা — ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় গর্জায়: 'আয় না শালা, কুত্তীর বাচ্চা! আয়!' দাড়ির ফাঁক দিয়ে হলদে শক্ত দাঁতগুলো ঝিলিক মারে। ও-পক্ষের আত্মারাম তখন প্রায় খাঁচা ছাড়া। গাল দিতে দিতে তারা গুটি গুটি পালায়।

ঘেন্নায় তার পেঁচার মতো চোখে আগুন ছোটে।

'এই কুত্তীর বাচ্চা!' মাথা খাড়া করে এগিয়ে যায়, চীৎকার করে বলে, আয় না দেখি, কোন শালার মরার সাধ হয়েছে...'

ও সাধ কারো নেই।

ভ্লাসভ্ কথা বড় একটা কয় না। পুলিশ হোক, বড় বড় অফিসার, ওপরওলা যেই হোক, সব্বাইকে বলে কুত্তীর বাচ্চা। ওটা ওর মুখের বুলি। বৌকে কুত্তী ছাড়া ডাকে না।

'এই কুত্তী! আমার প্যাণ্টটা ছিঁড়ে একশা হলো যে...'

ছেলে পাভেলের তখন চৌদ্দ বছর বয়েস। বাপ কেন জানি একদিন তেড়ে এসে ঝুঁটি ধরতে গেল তার। ছেলে একটা ভারি হাতুড়ি তুলে বলল:

'গায়ে হাত দিয়েছ তো...'

বার্চ গাছের ওপর মেঘের ছায়া যেমন উদ্যত হয় তেমনিভাবে ছেলের দীর্ঘ পাৎলা দেহটার সামনে খাড়া হয়ে ভ্লাসভ্ বলল, 'অ্যাঁ এন্দুর!'

হাতুড়ি ওঠায় পাভেল, 'বাস্, ঢের গুঁতোনি খেয়েছি, আর না!'

ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে লোমশ হাত দুখানা পেছনে মুড়ে নিল ভ্লাসভ্। ছোট্ট একটু হাসি ছিট্‌কে বেরয় তার মুখে।

'আচ্ছা, আচ্ছা...'

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'সাধে কি আর কুত্তীর বাচ্চা বলি...'

কিছুক্ষণ পরে বৌকে গিয়ে বলল:

'আমার কাছে আর টাকা পয়সা চাইবি না। তোর ছেলের অন্ন খাবি এখন থেকে...'

সাহস করে জবাব দেয় বৌ, 'আর তুমি টাকাগুলো মদের গেলাসে ফুঁকবে, তাই না?'

'তোর তাতে কী রে, কুত্তী! আমি মেয়েমানুষ রাখব...'

মেয়েমানুষ রাখেনি ও। কিন্তু এর পর যে দুটো বছর বেঁচে ছিল ছেলের সঙ্গে একটি কথাও কয়নি আর তাকে যেন দেখতেও পায়নি।

একটা কুকুর ছিল ভ্লাসভের, মালিকের মতোই তার বিরাট লোমশ দেহ। প্রতিদিন যাবার সময় কারখানা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যেত আর সন্ধে-বেলায় গেটের সামনে গিয়ে প্রভুর অপেক্ষায় বসে থাকত। ছুটির দিনগুলো শুঁড়িখানায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত ভ্লাসভ্। কথা বলত না কারো সঙ্গে, কেবল মানুষের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঁচড় দিত যেন খুঁজছে

কাউকে। কুকুরটা তার ঝাঁকড়া লেজ ঝুলিয়ে দিনমান প্রভুর পায়ে পায়ে ঘুরত। রাত্তিরে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরে ভ্যাসভ খেতে বসে নিজের পেয়ালায় খাওয়াত কুকুরটাকে। কোনও দিন ওটাকে গাল দেয়নি, ধরে ঠ্যাঙ্গায়নি, অথচ আদরও করেনি। খাবার পর বাসন কোসন সরাতে স্ত্রীর যদি একটু দেরি হয়েছে, টান মেরে সব মেঝেতে ফেলে দিয়ে এক বোতল ভদ্কা সামনে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে, চোখ বুজে, মুখ এতখানি হাঁ করে গান জুড়েছে। সে কী গান! সেই একঘেয়ে হেঁড়ে গলায় আঁতকে উঠত মানুষ। কুৎসিৎ আওয়াজটা গলা থেকে বেরিয়ে এসে গোঁফের সঙ্গে যেন জড়িয়ে যেত, খাওয়া রুটির গুঁড়োগুলো বেরিয়ে আসতে চাইত ওর গানের ঠেলায়। বসে বসে মোটা মোটা আঙুল দিয়ে দাড়ি-গোঁফে বিলি কাটত আর গান গেয়ে যেত একমনে। গানের কথা একটিও বোঝা যেত না। টানা টানা সুরটা শীতের রাতে নেকড়ে বাঘের কান্নার কথা মনে পড়িয়ে দিত। যতক্ষণ বোতলে ভদ্কা থাকত ততক্ষণ গান চলত। তারপর হয় বেঞ্চিতে এলিয়ে পড়ত, নয় তো টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত; গভীর একটানা ঘুম, সেই যতক্ষণ না ভোরবেলায় কলের বাঁশী বাজে। কুকুরটা ওর পাশে শুয়ে ঘুমোত।

লোকটা মারা গেল একটা নাড়ি ছিঁড়ে। পাঁচ দিন বিছানায় পড়ে ছট্ফট্ করল। মুখটা কালি মেরে গিয়েছিল। চোখ সজোরে বন্ধ করে দাঁতগুলো কড়্মড়্ করত আর থেকে থেকে বৌকে বলত:

'দে, দে আর্সেনিক দে... মেরে ফেল্ আমায়...'

ডাক্তার বলে গেল, পুল্টিশ লাগাও। আর একটা অপারেশন করতে হবে, আজই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

হাঁপাতে হাঁপাতে মিখাইল বলল, 'শালা কুত্তীর বাচ্চা! তোর কেরদানি ছাড়াই মরতে পারব। ভাগ শালা!'

ডাক্তার চলে গেলে স্ত্রী চোখের জলে ভেসে বহু কাকুতি মিনতি করল অপারেশন করাবার জন্য। মিখাইল স্ত্রীর দিকে মুঠি বাগিয়ে বলল শুধু, 'দাঁড়া ভালো যদি হই, তোকে মজাটা দেখাব!'

সকাল বেলা কারখানার বাঁশীও বাজল, আর মিখাইলও চোখ বুজল চিরদিনের মতো। কফিনে শুল মিখাইল, মুখটা খোলা, ভুরু দুটো রাগে কোঁচকান। ওর বৌ, ছেলে, কুকুরটা, দানিলো ভেসভশ্চিকভ (একটা দাগী

চোর, মাতাল, কারখানা থেকে বিতাড়িত), আর বস্তি থেকে জন কয় ভিখারী গিয়ে ওকে কবর দিয়ে এল। বৌটা নিঃশব্দে একটুখানি কাঁদল। পাভেল কাঁদল না। রাস্তায় কফিন দেখে লোকে থেমে পড়ে বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন করে বলাবলি করতে লাগল:

'পেলাগেয়া এবার বাঁচল!'

কয়েকজন বলল, 'যেমন কুকুর ছিল, তেমনি কুকুরের মতোই টেঁসে গেছে!'

কবর দেওয়া হয়ে গেলে সবাই চলে গেল; কিন্তু কুকুরটা সেই খোঁড়া মাটির ওপর বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে কবরটা শুঁকতে লাগল। কদিন পরে কে যেন মেরে ফেলল কুকুরটাকে...

৩

বাপ মারা যাবার সপ্তাহ দু'এক পরে এক রবিবার সাংঘাতিক মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরল পাভেল ভ্লাসভ। টলতে টলতে ঘরে ঢুকে ঘরের মাথার দিককার চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়ে বাপের মতো করে টেবিল পিটিয়ে চীৎকার করে হুকুম করল মাকে, 'খানা লাও!'

কাছে এসে পাশের চেয়ারে বসে মা দুই হাতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল। মা'র কাঁধে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে পাভেল বলে উঠল:

'যাও যাও, জলদি কর!' ছেলের প্রবল আপত্তি সামলে সস্নেহে বেদনার্ত স্বরে মা বলল, 'হাঁরে বোকা ছেলে!'

'তামাক খাব আমি! বাবার পাইপটা বের করে দে শীগ্গির...' পাভেল বলল জড়িয়ে জড়িয়ে। ভারি জিভটা যেন নড়তেই চায় না।

এর আগে আর কখনও ভদ্‌কা খায়নি পাভেল। ওর দেহটা দুর্বল হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি।

'আমি মাতাল? সত্যি মাতাল?' প্রশ্নটা যেন হাতুড়ি পিটিয়ে চলে মাথার মধ্যে।

মায়ের আদর আর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অস্বস্তি অনুভব করল পাভেল। বুক ঠেলে কান্না আসতে চায়। তাই আরো বেশি করে মাতলামির ভান করে।

মা ওর ভেজা আলুথালু চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আস্তে আস্তে বলল:

'ছিঃ এ কী করেছিস্, বাবা!'

ওর গা ঘোলায়। খুব খানিকটা বমিও হল। মা তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়, ফ্যাকাশে কপালটার ওপর ভিজে গামছা চাপায়। নেশা একটু কেটেছে কিন্তু তখনও চারদিকের সব যেন ঘুরছে। চোখের পাতা এমনি ভারি যে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। মুখে বিশ্রী স্বাদ। চোখের পাতা একটুখানি ফাঁক করে মায়ের চওড়া মুখখানির দিকে তাকিয়ে ভাবে:

'বোধ হয় আমি ছোট বলেই এত নেশা হয়েছে। অন্যেরাও তো খায়, কই তাদের তো কিছু হয় না। আর আমার বমি আসে...'

মায়ের কোমল স্বর কানে আসে। মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে:

'হাঁরে, এমনি করে মদ খাস্ যদি, আমায় খাওয়াবি কী করে বল তো?'

চোখ সেঁটে বন্ধ করে জবাব দেয় পাভেল:

'সব্বাই তো মদ খায়...'

মায়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ঠিকই তো বলেছে। ও নিজেও তো জানে, এক ওই শুঁড়িখানায়ই যা হোক ছিটেফোঁটা সুখের সোয়াদ পায় মানষগুলো। তবু বলে, 'তাই বলে তুই মদ ধরিসনি, বাবা। তোর বাপ তো অনেক খেয়ে গিয়েছে। তার হাতে আমার দশাটা দেখেছিস তো... তুইও আমার মুখের দিকে চাইবি না?'

মায়ের করুণ কোমল কথাগুলি শুনে পাভেলের মনে পড়ল, বাবা বেঁচে থাকতে সারা বাড়ীর মধ্যে মাকে যেন কোথাও দেখাই যেত না। মুখে একটিও কথা ছিল না, স্বামীর মারের ভয়ে যেন সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকত। সে নিজেও বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে পালিয়ে বেড়াত, বাবার সামনে পড়তে চাইত না। কাজেই মায়ের কাছ থেকে দূরে দূরেই রয়ে গেছে বরাবর। নেশাটা ক্রমে কেটে যাবার পর মাকে ও তাকিয়ে তাকিয়ে ভালো করে দেখল।

লম্বা দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে খানিকটা; হাড়-ভাঙা খাটুনি আর স্বামীর ঠ্যাঙানিতে শরীরটা গেছে ভেঙে। একেবারে নিঃশব্দে চলা-ফেরা নড়াচড়া করে এক পাশে একটু কাৎ হয়ে, যেন সর্বদাই কিসের সঙ্গে ধাক্কা খাবে এমন একটা ভয়। চওড়া লম্বাটে ফোলা ফোলা কোঁচকান মুখ। তাতে জ্বল্ জ্বল্ করছে এক জোড়া ঘন ভীরু আর্ত চোখ, বস্তির

আর দশটা মেয়ের মতোই। ডান ভুরুর ওপর দিকে একটা গভীর কাটা দাগ থাকায় ভুরুটা একটু ওপর দিকে টানা। মনে হয় ডান কানটাও বাঁ কান থেকে কিছু ওপরে। তার ফলে, সর্বদাই যেন উদ্বেগের সঙ্গে কান খাড়া করে আছে এমনি একটা ভাব মুখে। ঘন কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদার রেখা ঝিলিক দিয়েছে। সব মিলিয়ে কোমল, বিষণ্ণ, ভীরু চেহারা...

গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে মায়ের।

ছেলে আস্তে আস্তে বলল: 'কেঁদ না মা। একটু জল দাও।'

'দাঁড়া, বরফ দিয়ে জল নিয়ে আসি...'

মা ফিরে এসে দেখল পাভেল ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। টিনের বাটিটা কাঁপে থর্‌থর্‌ করে — বরফের টুক্‌রোগুলো ঠুন ঠুন করে বাজে। বাটিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে মা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আইকনগুলোর সামনে। মাতাল জীবনের কোলাহল আছড়ে পড়ছে জানালার শার্সির গায়ে। হৈমন্তী সন্ধ্যার স্যাঁতসেঁতে আঁধারে অ্যাকর্ডিয়নের সজোর আওয়াজ। কে একজন হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে। কুৎসিত ভাষায় খিস্তি করছে আরেকজন, শোনা যাচ্ছে মেয়েদের ক্লান্ত বিরক্ত গলা...

ভ্লাসভদের ছোট্ট বাড়ীখানার আবহাওয়া এখন আগের চেয়ে অনেক শান্ত সংযত। অন্য বাড়ীগুলোর চাইতে কেমন যেন একটু আলাদা রকম। পাড়ার এক ধারে ওদের বাড়ী, জলার ধার ঘেঁষে একটা উঁচু ঢালুর উপর। বাড়ীখানার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে রান্নাঘর, তাতে পাতলা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা একখানা ছোট ঘর, সেখানে থাকে মা। বাকী অংশে দুটো জানালাওয়ালা একটা সমকোণ ঘর, এক কোণে পাভেলের বিছানা আর সামনের দিকে একটা টেবিল আর খান দুই বেঞ্চি। আসবাবের মধ্যে গোটা কয় চেয়ার, একটা ছোট্ট আয়নাওলা ড্রেসিং টেবিল, কাপড়চোপড় রাখার জন্য একটা ট্রাঙ্ক, দেয়ালে একটা ঘড়ি, আর এক কোণায় রাখা দুটো আইকন।

পাভেলের চালচলনও বয়সী ছেলেদের মতোই। একটা অ্যাকর্ডিয়ন, কড়া ইস্ত্রীর খড়খড়ে শার্ট, জমকালো টাই, গালশ, ছড়ি — সব কিনে এনেছে। সন্ধে-বেলায় আড্ডায় যায়, নানারকমের নাচ শেখে, রবিবার ভদ্‌কা খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরে। কিন্তু ভদকা ওর সয় না। সোমবার ঘুম

ভাঙে মাথা-ধরা, বুক-জ্বালা, ফ্যাকাশে মুখ আর সারা দেহে যন্ত্রণা আর অবসাদ নিয়ে।

একদিন মা জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, কাল রাতে খুব ফুর্তি করলি?'

মুখ বেজার করে তেতো স্বরে জবাব দিল পাভেল, 'ছিঃ, আর বলো না। এর চেয়ে মাছ ধরা ভালো। কিম্বা একটা বন্দুক কিনে শিকার করা।'

তবে ও কাজ করে খুব মন দিয়ে, ফাঁকি দেয় না, জরিমানা হয় না, চুপচাপ থাকে, বেশি কথা বলে না; কিন্তু ওর বড়ো নীল চোখ দুটোর মধ্যে কিসের যেন অস্বস্তি। ওর মায়ের চোখও ঠিক অমনি। পাভেল বন্দুক কিনল না। মাছ ধরতেও গেল না। তবু দেখা গেল ও আলাদা পথ ধরেছে। আড্ডায় আগের চেয়ে কম যায়। রবিবারে কোথায় যেন যায়, কিন্তু বাড়ী ফেরে মাতাল না হয়ে। মায়ের তীক্ষ্ন চোখে ধরা পড়ে যে, ছেলের মুখখানা দিন দিন ধারালো হয়ে উঠছে, চোখ দুটির গাম্ভীর্য বাড়ছে, আর ঠোঁট দুটি যেন একটা কঠিন রেখায় আশ্চর্য সংবদ্ধ। মনে হয় ওর অন্তরে কী একটা নিঃশব্দ রাগ, নয়তো কোন একটা রোগ ওর দেহ ক্ষইয়ে দিচ্ছে। আগে বন্ধু-বান্ধব আসত। এখন বাড়ীতে ওকে পাওয়া যায় না বলে তারা আসা ছেড়ে দিয়েছে। মা খুশিই হয় মনে মনে, ছেলে তার কারখানার সবার থেকে আলাদা। কিন্তু আবার কেমন যেন আবছা ভয়ও দেখা দেয় — চার পাশের এঁদো গলির ভিড় থেকে সটান সরে এসে কোন্ পথেই বা চলেছে তার ছেলে।

এক এক সময় জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে পাশা, শরীর ভাল আছে তো তোর?'

'ভালোই তো আছি।' জবাব দেয় ছেলে।

'এত রোগা হয়ে গেছিস!' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মায়ের বুক ঠেলে।

বই নিয়ে আসতে লাগল পাভেল বাড়ীতে। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে; পড়া শেষ হলে লুকিয়ে রেখে দেয়। মাঝে মাঝে কি সব যেন টোকে বই থেকে। তাও লুকিয়ে রাখে...

মা ছেলের মধ্যে কথাবার্তা, দেখাশোনা কমই হয়। সকাল বেলায় নিঃশব্দে চা খেয়ে কাজে যায়। দুপুরে খেতে আসে, সামান্য দু'একটা এদিক ওদিক কথা হয় তখন। তারপর সেই সন্ধ্যায় এসে সযত্নে নেয়ে খেয়ে পড়তে বসে। অনেকক্ষণ পড়ে। রবিবার সেই সকালে বেরয়, ফেরে অনেক রাতে। মা জানে ছেলে শহরে যায়, থিয়েটর-টিয়েটর দেখে। কিন্তু শহরের

কোন বন্ধু সাত জন্মে এ বাড়ী আসে না। ছেলেও যেন দিন দিন বোবা হয়ে যাচ্ছে। যেটুকু কথা বলে, মায়ের কান ঠিক ধরে, ওর ভাষায় নূতন রীত্। আগের সেই বিশ্রী রুক্ষ কথাবার্তা নেই। নতুন ভাষায় কথা কয় ছেলে, সবটা বোঝে না মা। তা ছাড়া চালচলনও যে বদলেছে সেটাও চোখে পড়ে। আগের মতো ফুল-বাবুটি সাজে না। সাজের চেয়ে শরীর, কাপড়-চোপড় সাফ রাখার দিকে নজর বেশি। আগের মতো রাগ-চিল্লোনো নেই, চলন-বলন হয়েছে সহজ, হালকা, মোলায়েম। মায়ের ভাবনা হয়। মায়ের সঙ্গে ব্যবহারেও তার নয়া ধরন। কখনো কখনো নিজেই ঘর ঝাঁট দেয়, রবিবার নিজের হাতে বিছানা তোলে; সব সময় মায়ের কাজে সাহায্য করতে আসে। কুলি-বস্তির কোন ছেলে তো অমন করে না...

একদিন একটা ছবি নিয়ে এল পাভেল — তিন জন লোক স্বচ্ছন্দে পথ চলতে-চলতে কিসের আলোচনায় যেন ডুবে আছে। ছবিখানি টাঙ্গিয়ে রাখল দেয়ালে।

পাভেল বুঝিয়ে দিল পুনরুত্থানের পর যীশু খৃষ্ট এমায়ুস-এ যাচ্ছেন।

মার খুব ভালো লাগে ছবিখানা — কিন্তু মনে হয়, অতই যদি তোর যীশুর ওপর ভক্তি তো গির্জেয় যাসনে কেন?

তাকের ওপর বইয়ের সার বেড়ে চলে। এক ছুতোর বন্ধু বানিয়ে দিয়েছিল চমৎকার তাকটা। ওর ঘরটার চেহারা বদলে গেছে।

সাধারণত মাকে ও মা বলে ডাকে, 'আপনি' বলে। কিন্তু কখনো কখনো আদর করে বলে মা-মণি — যেমন, 'রাত্তিরে ফিরতে দেরী হবে, মা-মণি! আবার ভাবতে বসো না যেন...'

বড় ভালো লাগে মায়ের। ছেলের কথায় কী যেন এক গম্ভীর ভাব — মনের মধ্যে বসে যায়। একটুও হাল্কা কথা নেই।

কিন্তু মায়ের ভয় বাড়ে। সময় কাটে, ভয় কাটে না। কী একটা নিয়ে মেতেছে ছেলে — সাধারণ ব্যাপার নয় সেটা। মনটা ভারি হয়ে ওঠে। আবার মাঝে মাঝে ছেলের ওপর রাগ হয়। আব দশটা ছেলে কেমন হয় এ বয়সে। অথচ এ ছেলে একেবারে সন্ন্যেসী। কেমন কড়া প্রকৃতির। এই বয়সে মানায় না... আবার মনে হয়, কি জানি কোন মেয়ের প্রেমে-টেমে পড়ল না তো!

কিন্তু খালি হাতে তো মেয়ে নিয়ে ফুর্তি হয় না। এদিকে মাইনের টাকার প্রায় সবটাই ও মায়ের হাতে তুলে দেয়।

এমনি করে সপ্তাহ গেল, মাস গেল, দুটি বছর চলে গেল কোথা দিয়ে। আশ্চর্য দুটো বছর! নিঃশব্দে নীরবে চলে গেল জীবন... কত ভাবনা মনে উঠল পড়ল — সব অস্পষ্ট, আবছা। দিনে দিনে শুধু ভয় বেড়ে গেল...

৪

একদিন সন্ধে বেলা খেয়ে-দেয়ে পাভেল জানালার পরদা টেনে দিয়ে টিনের ল্যাম্পটা দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ঘরের কোণায় গিয়ে পড়তে বসল। বাসন-কোসন সরিয়ে মা রান্নাঘর থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এসে ছেলের পাশে দাঁড়াল। পাভেল মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মায়ের দিকে।

অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে মা। তার ভুরু-জোড়া কুঁচকে যায়। 'কিছু না রে খোকা, অমনি,' বলতে বলতে তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢোকে। সেখানে মিনিট খানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপর পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে এসে ছেলের পাশে দাঁড়াল।

'এই শুধচ্ছিলাম, মুখ গুঁজে এক কী পড়িস তুই!' আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করে।

বই বন্ধ করে পাভেল বলে, 'বসো মা...'

মা ধপ করে বসে যেন ভয়ংকর গুরুতর একটা কিছু শুনবে, এমনি ভঙ্গিতে পিঠটা টান করে দেয়।

মায়ের দিকে তাকায় না পাভেল। আস্তে-আস্তে বলতে আরম্ভ করে। স্বরটা কেন জানি কঠোর হয়ে ওঠে।

'এই যে সব বই পড়ছি দেখছ, এসব পড়া নিষেধ। আমরা যারা এমনি করে খেটে-খুটে খাই তাদের সম্বন্ধে সব সত্যি কথা লেখা আছে কি না, তাই পড়া নিষেধ এসব বই... এগুলো গোপনে ছাপা হয়। এ-সবের খবর পেলেই আমাকে টেনে নিয়ে জেলে পুরবে। জেল। সত্যি কথা জানতে চাই কিনা, তাই। বুঝলে?'

হঠাৎ যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে মায়ের। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে। এ যেন অন্য মানুষ, অচেনা। ওর গলার স্বরটাও যেন অন্য রকম। আগের চেয়ে গভীর, নীচু, গমগমে। পাভেল তার ঝাঁকড়া গোঁফ-জোড়ায় চিমটি কাটতে কাটতে ভুরুর নীচ দিয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে

ঘরের কোণের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলের জন্য বড় ভয় করে মায়ের, কেমন মমতা হয়।

জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা খোকা, তাহলে এসব করিস কেন?'

মাথা তুলে মার দিকে তাকিয়ে সে জবাব দিল অত্যন্ত ধীর শান্ত স্বরে, 'সত্য কথা জানতে চাই বলে।'

স্বরটা কোমল কিন্তু কঠিন। চোখে কেমন একটা একগুঁয়েমির দীপ্তি। মায়ের বুকের মধ্যে কে যেন বলে গেল, ছেলে তার কঠিন ব্রত নিয়েছে। অতি সংগোপন সাংঘাতিক সেই ব্রতের মন্ত্রে চিরকালের মতো তার দীক্ষা হয়ে গেছে। চিরকাল জীবনের সব কিছুকে নিয়তি বলে মেনে বিনা প্রশ্নে মাথা পেতেছে মা। আজও কোনও কথা খুঁজে পায় না। কঠিন দুঃখে তার হৃৎপিন্ডখানা কুঁকড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। গাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়াতে লাগল ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল।

'কেঁদো না মা, ছিঃ,' অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে পাভেল। কিন্তু মায়ের মনে হল এ তো সান্ত্বনা নয়, বিদায় নেওয়া।

'ভাব তো মা,' পাভেল বলে চলল, 'কী জীবন আমাদের এখানে। তোমার বয়স চল্লিশ, তুমি কি সত্যি করে বেঁচেছ? বাবার মার খেয়েছ — এখন আমি বুঝি কেন বাবা তোমায় মারত। নিজে যে নরক ভোগ করেছে, তার শোধ তুলেছে তোমার ওপর। কষ্ট পেয়েছে, অসহ্য মনে হয়েছে; কিন্তু কখনো বোঝেনি কেন এমন হয়। বাবা এই কারখানায় কাজ করেছে ত্রিশটা বছর। শুরু করেছিল সেই যখন মোটে দুটো বাড়ী নিয়ে এর পত্তন হয়েছিল। সেই জায়গায় এখন সাতটা।'

মন দিয়ে শোনে মা, ভয়ও হয়। কী অপূর্ব এক আলো জ্বলছে ছেলের চোখে। টেবিলে বুকটা ঠেকিয়ে, মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখখানার দিকে ঝুঁকে বলে যায় যে-সত্যকে সে জেনেছে তার বাণী। এ বিষয়ে এই ওর প্রথম বক্তৃতা। যে-সব কথা সে অত্যন্ত স্পষ্ট করে জেনেছে বুঝেছে তারি বিষয়ে সে বলতে লাগল জোয়ান বুকের সমস্ত শক্তি আর নিষ্ঠাবান ছাত্রের উদ্দীপনা নিয়ে। মাকে বোঝানর চাইতে নিজেকে পরখ করার প্রয়োজনই বেশি। মাঝে-মাঝে থামে, কথা হাতড়ায় — তখন চোখ পড়ে ওর সামনের ওই আর্ত মুখ আর অশ্রুসিক্ত ঝলমলে চোখ দুটির দিকে। ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে তারা। ওর বড় মায়া হয় মায়ের জন্য। আবার বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু এবারে অন্য কথা নয়। শুধু মায়ের নিজের জীবনের কথা:

'কোনও দিন একটুকু আনন্দ পেয়েছ, মা? মনে করে রাখার মতো কী ছিল তোমার জীবনে?'

মা শোনে, বিষণ্ন ভাবে মাথা নাড়ে। কি যেন একটা নতুন অচেনা ঢেউ দিয়েছে বুকের মধ্যে, হরষও লাগায় আবার প্রাণও কাঁদায় — ওর ভাঙ্গা বুকটায় যেন আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়। এর আগে ওর নিজের কথা এমন করে কেউ তো বলেনি। এতদিনের আবছা অস্পষ্ট কী সব ভাবনা যেন জেগে ওঠে। জীবনের সেই অস্থির অসন্তোষ, যৌবনের সেই সব নির্বাপিত চিন্তা ও অনুভূতি আবার ফিরে আসে। সইদের সঙ্গে তা নিয়ে বলা-কওয়া অনেক করেছে, কথা চলেছে কত বিষয়ে, কিন্তু সে শুধু নালিশ-ফরিয়াদ। যন্ত্রণার মূলটা খুঁজে পায়নি। আর আজ ওর ছেলে সামনে বসে আছে, সে মায়ের ব্যথা বুঝেছে, মায়ের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদেছে। গর্বে মায়ের বুক ফুলে ওঠে। তার চোখ মুখের অভিব্যক্তি, তার কথাগুলো মায়ের মনটা ছুঁয়ে যায়।

করুণা, মায়া-মমতা, এ সব যে মায়েদের জন্য নয়, একথা জানে মা।

মেয়েদের জীবন সম্বন্ধে যা বলছে পাভেল তা তো সবই জানা, অতি পুরনো তিক্ত বাস্তব। শুনে অস্পষ্ট কী একটা অনুভূতি নড়াচড়া করে, মনে আসে অজানা একটা কোমলতা।

বাধা দিয়ে মা বলে: 'কী করতে চাস এখন?'

'প্রথমে নিজের পড়াশোনা। তারপর অন্যদের শেখান। আমাদের শ্রমিকদের পড়তে হবে, জানতে হবে আমাদের জীবনে এত কষ্ট কেন।'

পাভেলের কঠিন নীল চোখ দুটো একটা কোমল আলোয় ভরে উঠল। দেখে খুশি হয়ে ওঠে মা। গালের বলি-রেখার ভাঁজে-ভাঁজে চোখের জল তখনও থরো-থরো কাঁপছে, কিন্তু শান্ত স্নিগ্ধ মৃদু হাসিতে তার ঠোঁট দুখানি ভরে উঠল। ওদিকে মনের মধ্যে লড়াই চলেছে। জীবনের সর্বনেশে চেহারাটাকে অমন খাঁটি করে বুঝেছে এই ছেলে, তার জন্য এক দিকে গর্ব, আর অন্য দিকে ভয়। ঐটুকু ছেলে, কথা বলার ধরণ তার আলাদা, অত বড় কাজ একা হাতে তুলে নিয়েছে। এই জীবনটা তো সবাই সইছে, মা অবধি। ও তো অভ্যেস হয়ে গেছে সবার। বলতে চায়: "একা তুই কী করবি রে, বাবা?"

কিন্তু বলতে পারল না। তার ছেলে আজ একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ

হয়ে উঠেছে চোখের সামনে। হয়তো একটু দূরে সরে গেছে, যাক্। তার প্রতি শ্রদ্ধাটুকুকে নষ্ট করতে মনে সরল না।

পাভেল দেখল মায়ের ওষ্ঠের স্নিগ্ধ হাসি, তার মুখের একাগ্রতা, তার চোখের জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত ভালোবাসা। মনে হল তার মাকে সে বোঝাতে পেরেছে তার সত্য। নিজের বাকশক্তিতে সে গর্বিত বোধ করল, নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেল। আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল ওর ভাষা, স্বর, বলার ভঙ্গি। কখনও হাসে, কখনও কপালটা কুঁচকে ওঠে; কখনও বা ঘৃণায় কথাগুলো আগুন হয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ করে বাজে শক্ত কথাগুলো। মা ভয় পেয়ে যায়, মাথা নেড়ে আস্তে-আস্তে বলে:

'সত্যি বুঝি?'

'সব সত্যি।' দৃঢ় কণ্ঠের জবাব আসে। সে বলে তাদের কথা যারা এই দুর্ভাগাদের ভালো করতে চেয়েছে, সত্যের বীজ বপন করেছে তাদের অন্তরে। কিন্তু জীবনের শত্রুরা জানোয়ারের মতো ওদের তাড়া করে বেড়ায়, জেলে পোরে, পাঠায় ঘানি টানতে...

'আমি দেখেছি তাদের, মা,' উত্তেজিত স্বরে চীৎকার করে ওঠে পাভেল, 'তারাই মানুষের মতো মানুষ!'

তাদের কথা ভেবে ভয় পায় মা। আবার জিজ্ঞাসা করতে চায়, "সত্যি বুঝি?" কিন্তু সাহস হয় না। নিশ্বাস বন্ধ করে পাথরের মতো বসে শোনে — বুঝতে পারে না কেমন ধারা মানুষ এরা, এই যারা ওর ছেলেকে এমন সর্বনেশে কথা বলতে আর ভাবতে শিখিয়েছে। অবশেষে বলে:

'হ্যাঁরে, ভোর যে হয়ে এল। শুতে যা এবার। একটু ঘুমিয়ে নে।'

'যাচ্ছি, মা, যাচ্ছি।' বলে পাভেল। মায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে শুধয়: 'যা বললাম বুঝতে পেরেছ, মা?'

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। 'বুঝেছি রে।' আবার চোখে জল আসে। হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে: 'ওরে সর্বনাশ হবে তোর!'

পাভেল উঠে পায়চারি করে, তারপর বলে:

'এখন বুঝলে তো আমি কোথায় যাই, কী করি! সবই খুলে বলেছি। এখন তোমার কাছে আমার এইটুকু কথা, যদি আমায় ভালোবাসো, আমায় বাধা দিও না, মা-মণি।'

'খোকা! খোকা! হয়ত এসব কথা না জানলেই আমার ভালো হত!' কাতর স্বরে মা বলে।

পাভেল মায়ের হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে। ওর উত্তেজিত দৃঢ় কণ্ঠের মা-মণি ডাকে অভিভূত হয়ে যায় মা। আর এমন করে হাত ধরাটাও একেবারে নতুন, অদ্ভুত!

'না, আমি কিছু করব না দেখিস,' তার গলা ভেঙ্গে যায়, 'কিন্তু তুই সাবধানে থাকিস্!'

সাবধান হতে বলল বটে, কিন্তু কী যে বিপদ মা নিজেই জানে না। তবু কাতর কণ্ঠে আবার বলে: 'বড্ড যে রোগা হয়ে যাচ্ছিস...'

স্নেহ-ঝরা দৃষ্টি দিয়ে পাভেলের শক্ত সুঠাম দেহখানাকে যেন একেবারে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে পরক্ষণেই নীচু গলায় বলল, 'তাই যা, তোর পথে তুই যা। আমি কক্‌খনও বাধা দেব না। কিন্তু একটা কথা বলি, লোকের সঙ্গে অত নির্ভয়ে কথাবার্তা বলিসনে। মানুষের বিষয়ে হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। ওরা একে অন্যকে দেখতে পারে না। নিজেদের মধ্যেই ওদের কী ভীষণ হিংসে, ঘেন্না, লোভ। একজনের অপকার করেই অন্যের আনন্দ। একবার যদি ওরা বোঝে তুই ওদের স্বরূপ ফাঁস করে দিয়ে ওদের বিচার করতে সুরু করেছিস ওরা তোকে ঘেন্না তো করবেই, ছিঁড়ে খাবে।'

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে পাভেল শোনে মায়ের ভয়ার্ত কথাগুলো। শেষ হলে একটু হেসে বলল:

'হ্যাঁ, মানুষ ভালো নয়। কিন্তু যেদিন থেকে জেনেছি যে, সংসারে ন্যায় বলে একটা জিনিস আছে, সেদিন থেকে ওদের একটু ভালো বলে মনে হচ্ছে।'

আবার হেসে সে বলে চলল:

'আমি নিজেই জানিনে, কেমন করে কী হলো। ছোটবেলায় কী ভয়ই করতাম সব কিছুকে। তারপর বড় হলাম যখন তখন লোকগুলোকে ঘেন্না করতে লাগলুম ওদের নীচতার জন্য। কিন্তু আবার কাউকে কেন যে ঘেন্না করতুম, তা নিজেই জানিনে। তবে এখন সব অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন ওদের ওপর আমার যেন ভারি মায়া হয়। সে যাই হোক, এখন বুঝি, লোকগুলো যদি খারাপ হয়েই থাকে সে-দোষ ওদের নয়। বুঝেছি বলে বুকটা আগের চেয়ে হালকা হয়ে গেছে...'

পাভেল থামে। যেন বুকের মধ্যে কার কথা শুনতে পায়। তারপর কী যেন ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে বলে:

'এই হলো সত্যি কথা মা!'

'হা ভগবান, তুই কী ভীষণ বদলে গেছিস!' ছেলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে মায়ের।

পাভেল ঘুমিয়ে পড়লে সন্তর্পণে নিজের খাট ছেড়ে তার বিছানার কাছে দাঁড়ায় মা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে পাভেল। সাদা বালিশটার ওপর ওর কঠিন বিবর্ণ মুখখানার প্রতিটি রেখা তীক্ষ্ণভাবে প্রকট। রাতের জামা পরে খালি পায়ে মা দাঁড়িয়ে থাকে, হাত দুখানি বুকের ওপর চাপা, ঠোঁট দুটি নড়ে কী এক অব্যক্ত ভাষার ব্যঞ্জনায়। নিষ্প্রভ চোখ থেকে গাল বেয়ে বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

৫

আবার সেই নিঃশব্দ জীবন — বড় দূরের অথচ বড় কাছের।

সপ্তাহের মাঝখানে কী একটা ছুটি পড়ল। বেরিয়ে যেতে যেতে মাকে বলল পাভেল:

'শনিবার দিন শহর থেকে কজন বন্ধু-বান্ধব আসবে, মা।'

'শহর থেকে!' কী জানি কেন হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল মা।

পাভেল বিরক্ত হয়ে একটু চেঁচিয়েই জিজ্ঞাসা করে, 'কী হলো আবার তোমার?'

এপ্রন দিয়ে চোখ মুছে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলে:

'জানি নে বাপু! এমনি...'

'ভয় করছে?'

'করবে না?' স্বীকার করে মা।

মায়ের দিকে ঝুঁকে বাপের মতো ঝাঁঝিয়ে উঠে পাভেল বলে:

'ভয়ে ভয়েই তো গেলাম সবাই। ভয় পাই বলেই তো কর্তারা আরো জুজুর ভয় দেখিয়ে কাবু করে রাখে।'

'রাগ করিসনে,' কাতর কণ্ঠে মা বলে উঠল। 'ভয় কেন পাব না বল, সারাটা জীবন ভয় করে করে প্রাণটা অবধি ভয়ের পাষাণ-চাপা হয়ে আছে যে।'

'মাপ করো, মা! কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই।' নরম হয় পাভেল।

পাভেল চলে গেল।

তিনটে দিন ভয়ে ভয়ে রইল মা। বুকের কাঁপুনি আর থামে না। যত সব অচেনা সর্বনেশেরা কি না এখানে এসে জুটবে! ওরাই তো ছেলেটাকে নতুন পথ বাতলেছে...

শনিবার দিন কারখানা থেকে এসে পাভেল হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে বেরতে বেরতে মায়ের দিকে না তাকিয়ে বলে গেল, 'কেউ এলে বলে দিও, আমি এই এলাম বলে। ভয় টয় পেয়ো না যেন...'

অসাড় হয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল মা। আঁধার মুখে তাকিয়ে পাভেল বলল:

'না হয় কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোথাও থেকে ঘুরে এসো?'

শুনে অপমানিত বোধ করল মা। মাথা নাড়িয়ে বলল:

'না, কেন ঘুরে আসতে যাব?'

নভেম্বরের শেষ। দিনের বেলায় হিম-জমাট মাটির ওপর মিহি বরফ পড়েছে। ছেলে চলে গেল। বরফগুলো খড়মড় করে ওঠে তার পায়ের চাপে। জানালার শার্সির গায়ে ঘাপটি মেরে আছে কালো কালো অন্ধকার। মা দু'হাতে বেঞ্চিতে ভর দিয়ে দোরের দিকে তাকিয়ে বসে...

মনে হল অদ্ভুত পোশাকপরা, সাংঘাতিক কতকগুলো লোক চারদিক থেকে আসছে অন্ধকারে চুপিসারে গুড়ি মেরে। কে যেন বাড়ীটাকে ঘিরে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে হদিস খুঁজছে।

কে যেন কোথায় একটা শিস দিল। চারদিকের থম্‌থমানির ওপর দিয়ে হাল্কা ভাবে কুন্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ভাসছে শব্দটা। ভারি মিঠে, কেমন যেন কান্না-জাগানো সুর। শূন্য আঁধারে কিসের সন্ধানে ঘুরছে। ওই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে — তার পর একেবারে জানালার গায়ে এসে থেমে গেল — দেয়ালের কাঠের মধ্যে যেন সেঁধিয়ে গেল।

গেটের কাছে কার পায়ের আওয়াজ — হুট্‌পাট্‌ করে আসছে কে যেন। মা চমকে উঠে দাঁড়ায়। ভুরু দুটো যেন টান খেয়ে ওপর দিকে ছিট্‌কে উঠল।

দরজা খুলে ঢুকল মস্ত বড় একটা লোমওয়ালা টুপি পরা মাথা। তারপর একটা ঢ্যাঙ্গা দেহ কুঁজো হয়ে গলে এল। ভেতরে এসে মানুষটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা নিশ্বাস নিয়ে ডান হাতটা তুলে ভরাট গলায় বলল, 'নমস্কার!'

কথা না বলে মাথা ঝুঁকিয়ে মা পাল্টা নমস্কার জানাল।

'পাভেল বাড়ী আছে?'

ধীরে ধীরে লোমের কোটটা খুলে নিল লোকটা। একটা পা তুলে টুপি দিয়ে একটা জুতো থেকে বরফ ঝাড়ল; তারপর অন্যটা থেকে। শেষে

টুপিটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে ঘরের মধ্যে এল লম্বা লম্বা পা ফেলে। একটা চেয়ার নেড়ে চেড়ে দেখল বসা চলবে কিনা। তারপর বসে পড়ে মুখের সামনে হাত আড়াল করে মস্ত একটা হাই তুলল। কদম-ছাঁট চুল; সুন্দর গোলাকার মাথার গড়ন। পালিশ করে কামান মুখ, গোঁফ-জোড়ার চিকন ডগা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। ডাগর ডাগর বেরিয়ে-আসা কটা চোখ দুটো দিয়ে ঘরখানাকে আঁতিপাঁতি করে দেখে পায়ের ওপর পা দিয়ে চেয়ারে দুলতে দুলতে জিজ্ঞাসা করল:

'নিজেদের বাড়ী না ভাড়া?'

তার মুখোমুখি বসে মা বলল:

'ভাড়া।'

'ভালো নয়!'

'পাশা আসবে এক্ষুণি, একটু বসুন।'

লম্বা লোকটা জবাব দিল শান্ত কণ্ঠে: 'বসেই তো আছি।'

মায়ের যেন বুকে বল আসে। বড় শান্ত লোকটি, গলার স্বরটা নরম, মুখখানাও সাদাসিধে। দৃষ্টিটা স্পষ্ট, প্রসন্ন। স্বচ্ছ পরিষ্কার চোখ দুটোতে ফুর্তির ঝিলিক। পরনে নীল শার্ট, কালো ঢিলে প্যাণ্টটা লম্বা বুটের ভতরে গোঁজা। লম্বা দুই ঠ্যাং, চোখা-চাখা গড়নের ঢ্যাঙ্গা দেহটা একটু নুয়ে পড়েছে। লোকটা দেখতে একটু হাস্যকর। তবু সারা মানুষটার মধ্যে আকর্ষণীয় কী যেন আছে — কাছে টানে দূরের মানুষকে। মায়ের ইচ্ছে হল ওর পরিচয় শুধয়, কোত্থেকে এসেছে, পাভেলের সঙ্গে তার কদ্দিনের আলাপ। কিন্তু অবসর দিল না সে, নিজেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল:

'অমন করে কপালে কে মেরেছে আপনার?'

জিজ্ঞাসা করার ধরনটা মমতাভরা, চোখে স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু মায়ের অপমান লাগল। ঠোঁট চেপে একটু চুপ করে থেকে অত্যন্ত কাঠ-খোট্টা রকমে জবাব দিল:

'আপনার তা দিয়ে দরকার কি?'

সমস্ত শরীরটা মায়ের দিকে ঝুঁকিয়ে জবাব দিল অতিথি:

'রাগ করছেন কেন? আমি কিছু ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি। আমার যে-মা আমায় পেলেছে তারও মাথায় অমনি একটা দাগ ছিল কিনা। একটা মুচির সঙ্গে থাকত, সেই মেরেছিল তাকে। আমার মা ছিল ধোবা, আর সেই লোকটা ছিল মুচি। আমাকে পুষ্যি নেবার পর মাতাল লোকটাকে কোথা থেকে ধরে

আনে, কপালে অনেক দুঃখু ছিল কিনা। বাপস্! কি মারই না মারত মাকে। ভয়ে আমার সারা গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত...'

তার প্রাণ-খোলা কথায় মায়ের রাগ জল হয়ে গেল। এখন ভয় হল এই অদ্ভুত অতিথির সঙ্গে সে রুক্ষ ব্যবহার করেছে, পাভেল এসে রাগ করবে না তো? অপরাধীর হাসি হেসে বলল:

'আমি ঠিক রাগ করিনি। তবে বড় হঠাৎ কথাটা পাড়লেন কিনা... আমার স্বামীর মারের দাগ ওটা। আচ্ছা, আপনি কি তাতার?'

লোকটা পা নাচিয়ে এক গাল হাসল, মনে হল ওর কান দুটো পর্যন্ত নড়ে উঠছে। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'না, এখনও হতে পারিনি।'

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে হেসে বলল মা, 'আপনার কথা শুনে রুশ ভাষা বলে মনে হয় না কিনা!'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে হাসতে অতিথি জবাব দিল, 'ঠিকই বলেছেন। রুশ ভাষার চাইতে অনেক ভালো ভাষা আমার। আমার বাড়ী কানেভ'এ। আমি খখল*।'

'এদিকে অনেক দিন আছেন?'

'শহরে এসেছি প্রায় বছর খানেক। কিন্তু কারখানায় মাত্র এই এক মাস হল। এখানেই থেকে যাব। আপনার ছেলে এবং আরো জনকয় বেশ ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।' গোঁফ জোড়া টানতে টানতে জবাব দিল অতিথি।

বেশ ভালো লাগে লোকটিকে। তার ওপরে অমন করে ছেলের তারিফ করেছে, মা'র ইচ্ছে হল প্রতিদানে কিছু একটা করে। জিজ্ঞাসা করল:

'একটু চা দিই?'

'একা খাব কেন? দাঁড়ান আসুক সবাই...' কাঁধ উঁচিয়ে জবাব দিল লোকটা।

ওর কথা শুনে আবার ভয় করে মা'র। সাগ্রহে মনে মনে নিজেকে বলে, সবাই যেন এর মতোই হয়।

বাইরে আবার পায়ের শব্দ। দরজা তাড়াতাড়ি খুলে গেল। উঠে দাঁড়ায় মা। অবাক হয়ে যায়। ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে। ছোট্টখাট্টো দেখতে, কিষান মেয়ের মতো সাদাসিধে মুখ, চুলের রাশ একটা মোটা বেণীতে বাঁধা।

---

* উক্রেন-বাসীদের রুশ ভাষায় চলতি নাম। — সম্পাঃ

‘দেরী হয়ে গেছে বুঝি আমার?’ আস্তে নরম সুরে বলল মেয়েটি।

দরজার বাইরে চেয়ে জবাব দিল খখল:

‘আরে না! হেঁটে এসেছেন?’

‘নিশ্চয়। আপনি নিশ্চয়ই পাভেল মিখাইলভিচ-এর মা! নমস্কার, আমার নাম নাতাশা...’

‘পিতৃনাম কী?’ মা জিজ্ঞাসা করে।

‘ভাসিলিয়েভ্‌না। আপনার?’

‘পেলাগেয়া নিলভ্‌না।’

‘আমাদের পরিচয় তো হয়ে গেল...’

‘হল বৈকি।’ হাসিমুখে জবাব দেয় মা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

খখল নাতাশাকে কোট-টুপি খুলতে সাহায্য করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, ‘বাইরে খুব ঠান্ডা?’

‘মাঠে বেজায় ঠান্ডা। যা হাওয়া...’

অতি পরিষ্কার কণ্ঠ। ঘন নরম। ছোট্ট মুখটুকু, ওষ্ঠ দুটি নিটোল, দিব্যি গোলগাল চক্‌চকে চেহারা। কোট্ খুলে জমে-যাওয়া লালচে হাতটা দিয়ে গোলাপী গাল দুটো ঘসতে ঘসতে আর মেঝেতে জুতো খট্‌খট করতে করতে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মা লক্ষ্য করে, মেয়েটির পায়ে গালশ নেই।

কাঁপতে কাঁপতে নাতাশা টেনে টেনে বলে: ‘উঃ এক্‌-কে-বা-র্‌-রে জ-জমে গেছি!’

‘বসুন সামোভারটা চড়িয়ে দিচ্ছি। এক মিনিটে হয়ে যাবে...’ ছুটে গিয়ে মা রান্নাঘরে ঢোকে।

মেয়েটি যেন কতকালের চেনা। মায়ের প্রাণের সমস্ত দরদটুকু ওর প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। হাসিমুখে পাশের ঘরের কথাবার্তা শোনে।

‘আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন নাখদ্‌কা, বলুন তো?’ মেয়েটি শুধয়।

আস্তে আস্তে খখল জবাব দেয়, ‘এমনি। এই বিধবাটির কী সুন্দর চোখ দেখেছেন? আমার মায়ের — মানে, নিজের মায়ের চোখও হয়ত ঠিক ঐ রকমই। প্রায়ই মনে হয় মা’র কথা। কেন জানি নে মনে হয় মা বেঁচে আছেন।’

‘কিন্তু আপনি তো বলেছেন, তিনি মারা গেছেন।’

'যিনি আমায় পেলেছিলেন সেই মা মারা গেছেন। আমি আমার নিজের মা'র কথা বলছি। হয়ত কিয়েভ্-এর রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছেন। আর ভদ্‌কা খেয়ে মাত্‌লামো করে দু গালে পুলিশের চড় খাচ্ছেন...'

'কী অভাগা ছেলে!' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মায়ের।

তাড়াতাড়ি করে নীচু গলায় কী যেন বলছে নাতাশা। গলায় উত্তেজনা। খখলের গলা ঝংকার দিয়ে ওঠে:

'এখনও খুকীটিই রয়ে গেলেন। নাক টিপলে হয়তো দুধ বেরোবে। জন্ম দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়, মানুষ করা আরো কঠিন। বুঝলেন...'

মুগ্ধ হয়ে যায় মা। ভারি ইচ্ছে করে খখলকে আদর করে দুটো কথা বলে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দরজা ঠেলে ঢুকল নিকলাই ভেসভ্‌শ্চিকভ, দাগী চোর দানিলোর ছেলে। সাধারণত লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না নিকলাই, প্যাঁচার মতো মুখ করে সবার কাছ থেকে সরে থাকে। তার জন্য ওর ওপরে লোকের অত্যাচার কম নয়।

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'নিকলাই, তুমি?'

মাকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করল না। বসন্তের দাগওয়ালা চওড়া মুখটা হাতের তেলো দিয়ে মুছতে মুছতে ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করল:

'পাভেল বাড়ী আছে?'

'না।'

ভেতরের দিকে তাকিয়ে ঘরে এসে ঢুকল:

'নমস্কার, কমরেড্...'

মা'র ভালো লাগে না। নাতাশা যে খুশি হয়ে সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে সেটা দেখে তার অবাক লাগল।

নিকলাই-এর পর এল আরো দু'জন — নেহাৎ ছেলেমানুষ। একজনের নাম ফিওদর। মা তাকে চেনে। কারখানার পুরনো কর্মী সিজভ-এর ভাইপো। চোখা মুখ, এক মাথা কোঁকড়া চুল; কপালটা উঁচু। দ্বিতীয় ছেলেটি একটু লাজুক গোছের। সোজা চুল পেতে আঁচড়ান। এ ছেলেটি চেনা নয়, কিন্তু ওকে দেখে মা'র ভয় করল না। সব শেষে এল পাভেল। তার সঙ্গে কারখানারই দু'জন শ্রমিক, মায়ের চেনা।

'সামোভার চড়িয়ে দিয়েছ মা? সোনা মণি।' মিঠে করে পাভেল বলল।

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় মায়ের কেন সে নিজেই জানে না। ছেলের জন্য কী যে করবে ঠিক পায় না। শুধয়:

'ভদ্‌কা কিনে নিয়ে আসব?'

'না না, ওসব কিছু চাই না।' হেসে জবাব দিল পাভেল।

হঠাৎ মনে হয় মায়ের — মজা দেখবার জন্য ছেলে ওকে মিছিমিছি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে ভয় দেখিয়েছে। ছেলের কানে কানে জিজ্ঞাসা করল:

'এরাই বুঝি তারা? সেই টের পেলেই যাদের পুলিশে ধরবে!'

'হ্যাঁ, এরাই।' ঘরে যেতে যেতে পাভেল বলে।

মা পেছন থেকে হাঁকল আদরের স্বরে:

'তুই কী!' আর মনে মনে ভাবল সস্নেহে, 'এখনও একেবারে ছেলেমানুষ!'

৬

সামোভারটা নিয়ে আসে মা। টেবিলের চার ধারে ভিড় করে বসে আছে সব। নাতাশা কোণের দিকটায় আলোর সামনে। হাতে একখানা বই।

'লোকের অবস্থা এমন বিশ্রী কেন—তার কারণ বুঝতে হলে...' নাতাশা বলে।

খখল জুড়ে দেয়, 'এবং তারা নিজেরাই বা এমন বিশ্রী কেন...'

'একেবারে তাদের জীবনের গোড়ায় গিয়ে পেঁছতে হবে। দেখতে হবে ভালো করে...'

'দেখো দেখো, বাছারা, ভালো করে দেখো... ভালো করে...' চা তৈরী করতে করতে বিড়বিড়িয়ে বলল মা।

সবাই চুপ হয়ে যায়।

পাভেল ভ্রূ কুঁচকে বলে, 'কী বলছ মা?'

'আমি?' সবাই তার দিকে চেয়ে আছে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বলে মা, 'এই নিজের মনেই বলছিলাম। ভাবছিলাম, সত্যি, একটু দেখ তোরা।'

নাতাশা অল্প হাসে, পাভেলও মুচকে হাসে। খখল বলল:

'চা পেয়ে বাঁচলাম। ধন্যবাদ নেন্‌কো*।'

'দাঁড়ান বাবা! ধন্যবাদটা পরে দেবেন। আগে খেয়ে তো দেখুন।' মা বলে। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি থাকায় অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'সে কি, মা!' নাতাশা জবাব দেয়, 'আপনি হলেন বাড়ীর কর্ত্রী, আমরা

* উক্রেনের লোকেরা আদর করে মা'কে বলে নেন্‌কো। — সম্পাঃ

আপনার অতিথি। আপনি থাকলে অসুবিধা হবে! কিন্তু কই মা, চা কই! জলদি জলদি। জমে গেলাম যে। পায়ের হাড়ে হাড়ে ঠক্‌ঠকানি লেগে যাচ্ছে।' শিশুর মতো কাতর গলায় বলল সে।

'এই যে দিচ্ছি, এই যে। এক মিনিট।' মা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

নাতাশা চা খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তারপর বেণীটাকে পিছনে সরিয়ে হলদে মলাটওলা সচিত্র বইটা পড়তে শুরু করে। মা চা ঢালে আর শোনে। সন্তর্পণে হাত পা নাড়ে যেন বাসন-পত্রের শব্দ না হয়। সামোভারে ফুটন্ত জলের গম্ভীর শোঁ শোঁ আওয়াজের সঙ্গে নাতাশার মিঠে গলার রেশ মিশে যায়। ঘরের মধ্যে যেন গল্পের লাটাই থেকে সুতো খুলে চলেছে... সেই কবে বুনো মানুষের দল থাকত পাহাড়ের গুহায়, পাথর ছুঁড়ে বনের পশু-পাখী শিকার করত... রূপকথার মতো লাগে। কয়েকবার ছেলের দিকে তাকিয়ে মায়ের জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে হয়—এর মধ্যে আবার নিষিদ্ধ কী আছে যে পড়তে নেই! কিন্তু শুনতে শুনতে কেমন যেন ক্লান্ত লাগে। সুতরাং অতিথিদের মুখগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল মা। ওরা কেউ টের পেল না।

নাতাশার পাশে বসেছে পাভেল। ওই সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। নাতাশা পড়ছে বইয়ের ওপর নীচু হয়ে ঝুঁকে। সামনে এসে-পড়া অবাধ্য চুলের গোছাগুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কখনও বা বই থেকে চোখ তুলে বন্ধুদের দিকে সস্নেহে তাকায়; মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে নীচুস্বরে কী যেন বলে। খখল টেবিলের উপরে বিরাট বুকটা চেপে বসে আছে আর নাকের ডগার ওপর দিয়ে আড়-চোখে চুমরানো গোঁফ জোড়া দেখছে। ভেসভ্‌শ্চিকভ কাঠের মতো সোজা হয়ে চেয়ারে বসে আছে দু হাঁটুর ওপর দু হাতের ভর দিয়ে; ভুরু নেই, পাতলা ঠোঁট, বসন্তের দাগওয়ালা মুখখানায় কোন ভাবের বিকার নেই। এ যেন মুখ নয়, মুখোস। ঝকঝকে পেতলের সামোভারের গায়ে ওর মুখের ছায়া পড়েছে, ছোট ছোট চোখ দিয়ে নিবিষ্ট মনে ও তাই দেখছে, মনে হচ্ছে নিশ্বাসও পড়ছে না প্রায়। পড়া শুনতে শুনতে ছোট্ট ফিওদরের ঠোঁট নড়ে নিঃশব্দে, যেন বইয়ের কথাগুলো আপন মনে আওড়ায়। হাঁটুর ওপর কনুই রেখে, হাতের তেলোয় মুখ চেপে ওর বন্ধু মাথা নীচু করে শুনছে। ঠোঁটের কোণে কেমন একটা চিন্তিত হাসি। যে-দুজন পাভেলের সঙ্গে এসেছে, তাদের একজনের মাথায় লাল কোঁকড়া চুল আর সবুজ ফুর্তিভরা চোখ। কেবলই উস্‌খুস করছে যেন কিছু বলতে চায়। আর একজনের কদম-

ছাঁট হালকা সোনালী চুল; মাটির দিকে চেয়ে আছে আর হাতটা মাথায় বোলাচ্ছে। মুখটা দেখা যায় না। ঘরখানায় কেমন যেন চমৎকার একটা আরামের হাওয়া। অদ্ভুত লাগে মায়ের। এমনটি তো আগে কখনও পায়নি। নাতাশার মিঠে গলা শুনতে শুনতে মনে হয় নিজের জীবনের পুরনো দিনের কথা — জলসায় কী বিশ্রী হট্টগোল চলত। ছোকরাদের মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে বেরত ভদকার গন্ধ, আর কী অশ্লীল নোংরা ছিল তাদের ভাষা। কী কুৎসিত ঠাট্টা তামাসাই না করত সবাই। মনে হতেই হৃৎপিণ্ডটা কুঁকড়ে ওঠে। মায়া হয় নিজের ওপর।

স্বামীর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা মনে পড়ে। একটা জলসা ছিল এক জায়গায়। অন্ধকার একটা বারান্দায় দেয়ালের গায়ে ওকে চেপে ধরে ঘোঁত ঘোঁত করে জিজ্ঞাসা করেছিল লোকটা: 'বল, আমায় বিয়ে করবি কি না!' অপমানে ব্যথায় মরে যাচ্ছিল ও। কিন্তু লোকটা দু' হাতের মুঠোয় শক্ত করে ওর স্তন ধরে কেবলি চাপ দিচ্ছিল। তার ভিজে গরম নিশ্বাস ভস্‌ভসিয়ে ওর মুখে চোখে এসে লাগছিল। হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল ও। হেঁচকা টান মেরে একপাশে সরে যেতে চাইছিল। কিন্তু লোকটা গর্জে উঠেছিল:

'কোথায় যাচ্ছিস? জবাব দিয়ে তবে যাবি!'

লজ্জায় অপমানে ও সরমে মরে যাচ্ছিল। মুখ দিয়ে কথা সরল না।

এমনি সময় কে একজন এসে যাওয়ায় তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেড়ে দিয়েছিল লোকটা। বলেছিল, রবিবার ঘটক যাবে। ওর কথার অন্যথা হয়নি।

চোখ বন্ধ হয়ে আসে মায়ের। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

ভেসভ্‌শিচকভ-এর প্রতিবাদের অসন্তুষ্ট কণ্ঠ শোনা যায়, 'মানুষ কেমন ছিল তা জানতে চাই নে আমি। জানতে চাই, তাদের জীবন কেমন হওয়া উচিত।'

'ঠিক কথাই বলেছ।' লাল-মাথাওয়ালা উঠে পড়ে বলে।

ফিওদর চেঁচিয়ে ওঠে, 'না, আমি তা স্বীকার করি না।'

তর্ক বেধে যায়। কথা ছোটে যেন আগুনের হল্কা। মা বোঝে না ওরা অমন করে চেঁচায় কেন। উত্তেজনায় সকলের মুখ লাল, কিন্তু চটেনি কেউ; একটি নোংরা কথা কারো মুখে নেই।

মা ভাবে, মেয়েটির জন্যই সামলে আছে ওরা।

নাতাশা নিবিষ্ট দৃষ্টিতে সবাইকে লক্ষ্য করে। ওর চোখের ভাব — যেন ভারি ছেলেমানুষ সব। ওর এই গম্ভীর ভাবখানা ভালো লাগে মায়ের।

হঠাৎ বলে ওঠে নাতাশা, 'দাঁড়ান কমরেড্‌রা...' সবাই কথা থামিয়ে ওর মুখের দিকে চায়।

'যারা বলছে আমাদের সব কিছুই জানা দরকার, তারা ঠিক কথাই বলছে। আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বললে তবেই তো যারা আঁধারে আছে তারা আমাদের দেখবে। সব কিছুর ঠিক আর সাচ্চা জবাব আমাদের হাতের কাছে থাকা চাই। সুতরাং যত সত্য আর যা কিছু মিথ্যা সবই আমাদের জানতে হবে পুরোপুরি...'

ওর কথার তালে তালে খখলের মাথা নড়ে। ভেসভ্‌শিচকভ, লাল-মাথা আর পাভেলের সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের একজন — এরা এক দল হল। মায়ের কেন জানি ভালো লাগে না ওদের।

নাতাশার কথা শেষ হলে পাভেল দাঁড়িয়ে তিনজনের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল:

'শুধু একপেট খেতে পাওয়াটাই আমাদের সব নয়। যারা আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে, আমাদের চোখে ঠুলি এঁটে রেখেছে, তাদের দেখাতে হবে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি। আমরা বোকা নই, জানোয়ারও নই যে পেট পুরে খেতে পেলেই খুশি থাকবে। আমরা বাঁচতে চাই, সাচ্চা মানুষের মতো বাঁচতে চাই! শত্রুদের দেখাতে হবে, যত নীচেই তারা আমাদের ফেলে রাখুক, যত অত্যাচারই করুক, আমরা মানুষ; এবং জ্ঞানের মাপকাঠিতে তাদের সমান হতে বাধা নেই, এমন কি তাদের চেয়ে বড় হতেও...'

ছেলের কথা শুনতে শুনতে মায়ের বুকটা গর্বে ভরে গেল। কি স্বচ্ছন্দ সুন্দর কথাগুলো বলল!

'খাবার আছে অনেকের ঘরেই,' খখল বলে, 'কিন্তু সাচ্চা মানুষ আঙুলে গোনা যায়। এই যে আমরা জানোয়ারের জীবন নিয়ে এঁদো পচা পাঁকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছি তার ওপর সেতু বাঁধতে হবে। ওই হলো আমাদের একমাত্র কাজ, বন্ধুগণ! সেই সেতুর ওপর দিয়ে তৈরি হবে ভাবীকালের মানুষে মানুষে মিতালির রাজ্যে পেঁছিবার পথ।'

ভেসভ্‌শিচকভ চাপা গলায় বলে, 'লড়াইয়ের সময় যখন এসে গেছে তখন আর হাতের ব্যথা সারাবার সময় নেই।'

মাঝরাত্তিরের পর সভা ভাঙল। সব থেকে আগে উঠে চলে গেল লাল-মাথা আর ভেসভ্‌শিচকভ। এ ব্যাপারটাও মা'র ভালো লাগল না। মনে মনে মা ভাবল, বাবা, কী তাড়া। আড়ষ্টভাবে ঝুঁকে বিদায় দিল তাদের।

'নাখদ্‌কা, আমায় বাড়ী পেঁছে দেবেন?' নাতাশা জিজ্ঞাসা করল।

'নিশ্চয়!' খখল জবাব দিল।

রান্নাঘরে গিয়ে নাতাশা তার কোট টুপি পরে। মা বলল:

'এই শীতে এমন হালকা মোজা পরেছেন! দেব এক জোড়া পশমী মোজা বুনে?'

'কিন্তু পশমের মোজায় যে ভারি চুলকোয়!' হাসতে হাসতে বলল নাতাশা।

'আচ্ছা, না চুলকোলেই তো হল।'

নাতাশা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ একটু কুঁচকে। সেই স্থির দৃষ্টির সামনে মা'র কেমন যেন বিব্রত লাগে। বলে:

'কিছু মনে করবেন না মা! আমি বোকা মুখ্যু মানুষ। কথাটা বলেছিলাম প্রাণ থেকে।'

চট করে মায়ের হাতে একটা চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে নাতাশা বলে, 'আপনি কী সুন্দর মা!'

নাতাশার পেছন পেছন যেতে যেতে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে খখল বলে, 'শুভরাত্রি, নেন্‌কো!' তার পর কুঁজো হয়ে বেরিয়ে যায়।

মা ছেলের দিকে চায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু একটু হাসছে সে।

'হাসছিস কেনরে?' অপ্রস্তুত হয়ে মা জিজ্ঞাসা করে।

'এমনি। মনটা আজ খুশি আছে কিনা।'

'দেখ আমি বুড়ো হাবড়া, বোকা মুখ্যু ঠিকই, কিন্তু ভালো জিনিসের কদর করতে জানি।' একটু অপমানিত বোধ করে বলে মা।

'তা বেশ! শুতে যাও তো এখন। অনেক রাত হল...'

'যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি।'

টেবিলের কাছে গিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে সে এঁটো বাসন-পত্রগুলো সরাতে আরম্ভ করে। মনের খুশির উত্তেজনায় গা ঘেমে উঠল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কী সুন্দর সব! এত শান্তিতে কাটল।

'ভালোই করেছিস্‌, খোকা। বড় ভালো ছেলে তোর ওই খখল আর ওই মেয়েটি। কী বুদ্ধিমতী মেয়ে। কে রে মেয়েটি?'

'শিক্ষয়িত্রী।' মেঝেতে পায়চারি করতে করতে পাভেল জবাব দেয় সংক্ষেপে।

'তাই তো দেখছি ভারি গরীব। কাপড় চোপড় দেখলেই বোঝা যায়। অমন জামায় চট করে ঠান্ডা লেগে যাবে! ওর বাবা মা কোথায় থাকেন?..'

'মস্কোতে।'

তারপর মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে গম্ভীরভাবে বলে:

'ওর বাবা মস্ত বড় লোক। লোহার ব্যবসা করেন। খান কয় বাড়ী আছে। ও এ পথে এসেছে বলে তিনি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে ঐশ্বর্যের মধ্যে বড় হয়েছে। যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। আর এখন এই রাত্তিরে একা একা পাঁচ মাইল পথ ভেঙে যেতে হবে ওকে...'

শুনে অবাক হয় মা। কপাল কুঁচকে ছেলের দিকে তাকিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে:

'কোথায় গেল? শহরে?'

'হ্যাঁ মা।'

'আহা রে! ভয় করবে না ওর?'

'ভয়ডর ওর কিছু নেই,' হেসে বলে পাভেল।

'কিন্তু গেল কেন? রাতটা এখানেই তো থাকতে পারত। আমার কাছে শুয়ে থাকত।'

'না, সে ঠিক হত না। ভোর বেলা কেউ ওকে এখানে দেখে ফেলত হয়তো। তা আমরা চাই না।'

চিন্তিতভাবে মা জানালার বাইরে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে:

'বুঝতে পারি নে, পাভেল, এর মধ্যে বিপদের কী আছে, মানা করারই বা কী আছে। খারাপ তো কিছু করছিস নে তোরা!'

ঠিক যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না, পাভেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সমর্থনের আশায়। পাভেল শান্তভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে দৃঢ় গলায়:

'না, খারাপ কিছু করি নে আমরা, কিন্তু তবু আমাদের সবাইকে জেলে যেতে হবে, জেনে রেখো।'

মা'র হাত শিউরে ওঠে। চাপা গলায় বলে:

'ভগবান করুন তোদের যেন কিছু না হয়!'

অত্যন্ত কোমল স্বরে পাভেল বলে, 'তোমায় মিথ্যে আশায় রাখব না। এড়িয়ে যাবার কোনও পথ নেই আমাদের।' একটুখানি স্নিগ্ধ হাসি খেলে যায় তার মুখে।

'শুতে যাও এবার মা। অনেক খেটেছ আজ।'

একলা পড়ে গিয়ে জানালার কাছে এসে মা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরেটা বরফে ঝাপসা, ঠান্ডা। ঝোড়ো হাওয়া বইছে, ঘুমন্ত খুদে খুদে বাড়ীগুলোর ছাদের ওপরকার জমা বরফ ঝেঁটিয়ে ফেলছে, দেয়ালের গায়ে ছোবল মেরে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, সাঁ করে নীচে নেমে রাস্তার কুচি কুচি বরফের রাশ উড়িয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মা চাপা গলায় বলে:

'যীশু! যীশু! দয়া করো!'

বুকের মধ্যে কান্না উথলে ওঠে। বিপদের কথা ছেলে তো বেশ শুনিয়ে গেল নির্বিকার চিত্তে। কিন্তু মায়ের মন রাতের প্রজাপতির মতো একটা অন্ধ ভয়ে করুণভাবে ছট্‌ফটিয়ে মরে। চোখের সামনে যেন একটা বরফ ঢাকা তেপান্তরের মাঠ। তার ওপর দিয়ে হাওয়ায় ওড়া ফালি ফালি সাদা বরফ, মিহি আর্তনাদ করে ছুটোছুটি করছে, লুকোচুরি খেলছে। মাঠের মাঝখানে চলেছে এটি ছোটখাটো মেয়ের ছায়া-মূর্তি, বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে যাচ্ছে। চলতে যেন আর পারছে না। বাতাস তার পায়ে পায়ে ঘূর্ণি খেয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, উড়িয়ে নিচ্ছে কাপড়, বরফের ছুঁচলো টুক্‌রোগুলোকে মুঠো মুঠো করে ছুঁড়ে মারছে তার চোখে মুখে। বেচারার ছোট্ট পা দুখানি ডুবে যাচ্ছে বরফে। যেমনি কন্‌কনে ঠান্ডা তেমনি রুদ্র চেহারা প্রকৃতির। হেমন্তের তুফানী হাওয়ার মার খেয়ে ছোট্ট একলা ঘাসের শীষটির মতো নুয়ে যাচ্ছে ওর দেহটা। ওর ডান দিকে জলার বুকটা থেকে পাঁচিলের মতো হয়ে আকাশ পানে উঠে গেছে গহন জঙ্গল। সেখানেই রোগা রোগা বার্চগাছ আর পাতা-ঝরা আসপেন গাছেরা ফিসফিসিয়ে কথা কইছে। ওই হোথায় দূরে দেখা যাচ্ছে শহরের আলোর ঝিলমিলি...

সারা দেহ ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মায়ের... ফিসফিস করে বলে, 'ভগবান! ভগবান! দয়া করো...'

৭

একটি একটি করে দিন যায় — কে যেন মালা জপতে থাকে — দিন গড়ায় সপ্তাহে, সপ্তাহ গড়ায় মাসে। প্রতি শনিবার পাভেলের বন্ধুরা আসে; যে-সুদীর্ঘ সোপান বেয়ে সুদূর এক লক্ষ্যের পথ ভাঙছে তারা, প্রতিদিনকার বৈঠকে তার একটি করে পৈঠা এগোয়।

নতুন নতুন মানুষ আসে। ছোট্ট ঘরখানায় যেন ধরতে চায় না। নাতাশা আসে সারা দেহে ক্লান্তি নিয়ে, হিমে কাঠ হয়ে, কিন্তু মুখের হাসিটি তেমনিই থাকে, তেমনই উচ্ছল। মা এক-জোড়া পশমের মোজা বুনে নিজের হাতে তার ছোট্ট পা দুখানিতে পরিয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় হেসেছিল নাতাশা, তারপর হঠাৎ চুপ করে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে বলল, 'আমার একজন ধাই-মা ছিল। আশ্চর্য স্নেহপ্রবণ। আমার বড় অদ্ভুত লাগে, কী দুঃখের জীবন শ্রমিকদের, কী অবিচার, কিন্তু তাদের...' অনেক দূরের, ওর কাছ থেকে বহু বহু দূরের কাদের দিকে ইশারা করে বলে, '...তাদের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বেশি নরম মন ওদের!'

ভ্লাসভা বলল, 'কী মেয়ে গো! বাপ মা সবাইকে ছেড়েছেন!..' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। মুখ দিয়ে কথা সরে না; চুপ করে যায়। নাতাশার দিকে চেয়ে এক অজানা কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে ওঠে। ওর সামনে মেঝের ওপর বসে পড়ে। নাতাশা সামনের দিকে ঝুঁকে কী যেন ভাবতে ভাবতে একটু হাসে। বলে:

'বাপ মাকে ছেড়েছি? ও কিছু নয়। আমার বাবা ভাই সবাই ভারি রুক্ষ স্বভাবের মানুষ। আবার মদ খেয়ে টং হয়ে থাকে। আমার বড় বোন আছে একটি, বড় দুঃখী... ওর স্বামী ওর থেকে বয়সে অনেক বড়। খুব বড়লোক। কিন্তু যেমনি কঞ্জুস তেমনি লোভী। মায়ের জন্য কষ্ট হয়। আপনারই মতো সাদাসিধে সরল মানুষ। এই এতটুকু ছোট্ট, ঠিক খরগোসের মতো ছুটোছুটি করেন, আর তেমনি ভীরু। এক এক সময় এত দেখতে ইচ্ছে করে মাকে...'

বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে মা বলে, 'বেচারী!'

হঠাৎ নাতাশা মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল যেন কিছু একটা ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

'না না, এক-এক সময় আমি খুবই আনন্দ পাই। মনে হয় আমার মতো সুখী বুঝি কেউ নেই!'

মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, নীল চোখ দুটো ঝল্‌সে ওঠে। দু' হাত মায়ের কাঁধের ওপর রেখে গভীর আবেশে মৃদুকণ্ঠে বলে:

'যদি জানতেন, কি বিরাট কাজ আমরা হাতে নিয়েছি... যদি বুঝতেন!..'

মা'র মনে একটু যেন ঈর্ষা দেখা দেয়।

'আমি তো বুড়ো হাব্‌ড়া, তাই মুখ্যু...' অত্যন্ত ব্যথার স্বরে বলে উঠতে যায়।

...পাভেল এখন আগের থেকে বেশি কথা বলে, আরো সাগ্রহে জোর দিয়ে তর্ক করে। দিনের পর দিন আরো যেন রোগা হয়ে যাচ্ছে। মায়ের মনে হয় নাতাশার সঙ্গে কথা বলার সময় ওর চোখের কঠিন দীপ্তি যেন কোমল হয়ে আসে। ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গি সহজ হয়, গলা নরম হয়ে আসে। মনে মনে ভাবে: 'তাই হোক, ভগবান করুন তাই যেন হয়।' মুখে মৃদু হাসি ফোটে।

বৈঠকী গরম তর্ক-বিতর্ক চরমে উঠলে খখল উঠে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা-পেটা হাতুড়ীর মতো সামনে পেছনে দুলতে দুলতে ভরাট ভারি গলায় সহজ সরল কিছু বলে, সবাই শান্ত হয়ে যায়। কাজ কাজ করে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে গোমড়া-মুখো ভেসভ্শিচকভ্, সে আর লাল-মাথা সাময়লভ্ সর্বদা তর্ক বাধায়। ওদের পেছনে থাকে ফরসা চুল ইভান বুকিন—ওকে দেখলে মনে হয় বুঝি এক্ষুনি অ্যালকালিন সল্যুশন লাগিয়ে ধোপ খেয়ে এসেছে। ইয়াকভ্ সমভ্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট মানুষ; কথা কয় কম এব মৃদু গম্ভীর গলায়। এই লোকটি আর চওড়া-কপাল ফিওদর মাজিন সর্বদা পাভেল আর খখলের পক্ষ নেয় তর্কাতর্কির সময়।

কখনও কখনও নাতাশার জায়গায় শহর থেকে আসে চশমাপরা পাতলা ফরসা দাড়িওয়ালা নিকলাই ইভানভিচ্। কোন এক দূর প্রদেশে ওর জন্ম, তার ছাপ রয়েছে ওর ভাষায়। কিন্তু এমনিতে সব দিক থেকে ওর জুড়ি নেই। কখনও বড় কিছু নিয়ে কথা কয় না। বাড়ী-ঘর কাচ্চা-বাচ্চা, রুটি মাংসের দর, ব্যবসা-বাণিজ্য, থানা-পুলিশ—এই সব, অর্থাৎ আটপৌরে জীবনের বেসাতি ওর বিষয়বস্তু। কিন্তু ওর কথায় লোকের কৃত্রিমতা, গলদ, স্থূলতা, মাঝে মাঝে তাদের হাস্যাস্পদতা, আর সব কিছুতে তাদের ত্রুটি পরিষ্কার হয়ে যায়। মায়ের মনে হয় ও যেন বহু দূরের একটা আলাদা জগতের মানুষ। সেখানে সবাই সাচ্চা মানুষ; সাচ্চা সহজ তাদের জীবন। এখানকার সব কিছুই যেন ওর কাছে নতুন। না পারছে এখানকার জীবনকে মেনে নিতে, না পারছে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে। ওর রুচিতে বাধছে। আর বাধছে বলেই এই অবস্থাটা বদলাবার জন্য ওর এই একনিষ্ঠ চাঞ্চল্যবিহীন শান্ত গভীর পণ। মুখের রংটা হলদেটে, চোখের চার ধারে মিহি বলিরেখা; গলার স্বরটা ভারি কোমল; হাত দুটি সর্বদা গরম। করমর্দন করার সময় পেলাগেয়া নিলভনার পুরো হাতখানা যেন ওর আঙুলের আলিঙ্গনে জড়িয়ে নেয়। এ রকম করমর্দনের পর বুকটা হালকা শান্ত হয়ে ওঠে।

আরো লোক আসে শহর থেকে। একটি মেয়ে আসে প্রায়ই। লম্বা রোগা

চেহারা; ফ্যাকাশে মুখখানার মধ্যে প্রকান্ড বড় বড় দুটি চোখ। নাম সাশা। চাল-চলন পুরুষালী। কালো মোটা ভুরু-জোড়াকে সাংঘাতিক ভাবে টেনে টেনে আর খাড়া নাকটার পাতলা পাশ দুটো কাঁপিয়ে ও কথা বলে। এ-মেয়েই একদিন জোর গলায় প্রথম ঘোষণা করল:

'আমরা — সমাজতন্ত্রী...'

শুনে একটা বোবা ভয়ে কাঁটা হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চাইল মা। মা শুনেছিল জারকে সমাজতন্ত্রীরা মেরেছে। বহুদিন আগের কথা সে। মায়ের তখন সবে জোয়ান বয়েস। ভূমি-দাসদের জার মুক্তি দেন, তাইতে নাকি জমিদারের দল পণ করেছিল জারকে না মেরে তারা চুল ছাঁটবে না। ঐ জন্যই নাকি ওদের সমাজতন্ত্রী নাম। তাই বুঝতে পারে না মা কেন তার ছেলে ও তার বন্ধুর দল সমাজতন্ত্রী হয়েছে।

সবাই চলে গেলে পাভেলকে মা জিজ্ঞাসা করল:

'পাশা, তুই নাকি সমাজতন্ত্রী?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?' বরাবরকার মতো সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পাভেল বলল।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে মা।

'সত্যি, পাভেল? কিন্তু তারা যে জারের বিপক্ষে! এক জারকে তো তারাই খুন করেছে!'

থুত্‌নিতে হাত বোলাতে বোলাতে ঘরময় পায়চারি করে পাভেল। তারপর একটু হেসে জবাব দেয়, 'ও সব আমাদের উদ্দেশ্য নয়।'

তারপর অনেকক্ষণ বসে ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে মাকে বুঝিয়ে বলে সব। মা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবে, "আমার ছেলে খারাপ কিছু কখনও করবে না, করতে পারে না।"

এর পর থেকে এই ভয়ংকর শব্দটা বার বার শুনে তার ধার আর ভারটা কেটে গেল। এমন তো কত কথাই ওরা ব্যবহার করে যা বোঝা যায় না, অথচ শুনতে শুনতে অভ্যেস হয়ে যায়। কিন্তু সাশাকে কেন জানি ভালো লাগে না। ও মেয়েটি এলে বড় অস্বস্তি লাগে, ভয় করে...

একদিন অসন্তোষে ঠোঁট চেপে খখলের কাছে সাশার কথা তোলে মা। বলে:

'ভারি কড়া মেয়ে। এটা কর, ওটা কর বলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় সবাইকে...'

হো হো করে হেসে উঠে খখল বলল:

'ঠিক ধরেছেন, খাঁটি কথা বলেছেন। কি বল পাভেল?' মা'র দিকে চোখ ঠেরে হেসে বলল, 'অভিজাত মেয়ে!'

শুকনো জবাব দেয় পাভেল, 'চমৎকার মেয়ে।'

'তা বটে।' সায় দেয় খখল, 'কিন্তু মুশকিল কী জান? ওর যা দরকার, আমরা তাই চাই আর করতেও পারি, সেকথা ও বুঝতে পারে না।'

মাথায় ঢোকে না এমন কী একটা ব্যাপার নিয়ে ওদের তর্ক শুরু হয়।

মা লক্ষ্য করে, সাশার হাকিমী চালটা পাভেলের ক্ষেত্রেই বেশি। সময় সময় ধমক দিতেও কসুর করে না। পাভেল হেসে চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটি ওর কোমল হয়ে ওঠে। আগে নাতাশার বেলায় এমনি হত। এ ব্যাপারটাও মায়ের ভালো লাগে না।

মাঝে মাঝে ওরা আনন্দে যেন ছেলেমানুষের মতো নাচতে থাকে। সাধারণত তা হয় খবরের কাগজে বিদেশের শ্রমিকদের খবর পড়ে। ওদের চোখ থেকে যেন খুশির ফুলকি ঝরতে থাকে। প্রাণ খুলে হেসে, পরস্পরের পিঠ চাপড়ে এক কান্ড করে তোলে। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কেউ চ্যাঁচায়, 'সাবাস জার্মান ভাইরা, সাবাস্!' নেশার আনন্দে যেন চ্যাঁচায়।

আবার একদিন হয়তো আওয়াজ ওঠে, 'ইতালীর মজদুর জিন্দাবাদ!'

অচেনা দূরের বন্ধুদের কাছে এ অভিনন্দন পেঁছিয় না। ভাষাও জানা নেই। তবু ওদের মনে হয় সেখানে গিয়ে পেঁাছেছে ওদের আওয়াজ আর উচ্ছ্বাস। না-বোঝা ভাষায়ও বোঝাবুঝি হতে বাকী থাকে না।

একদিন খখল কথা তুলল, 'চল না একটা চিঠি লিখে দিই।' ওর চোখে বিশ্বছাওয়া ভালোবাসা, 'তাহলে ওরা জানবে, এই রাশিয়াতেও ওদের বন্ধু আছে যারা একই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, একই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে পথ চলছে, যারা ওদের জয়ে আনন্দিত।'

হাসি মুখে, স্বপ্নাচ্ছন্ন লোকের মতো ওরা ইংরেজ, ফরাসী, সুইডেনবাসীদের কথা বলে। যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু সব, ভালোবাসার জন। তাদের ওরা ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, একই দুঃখ আনন্দের অংশীদার সব।

সারা দুনিয়ার শ্রমিকের একাত্মবোধ জন্ম নিল ছোট্ট ঘরখানার বন্ধ হাওয়ার মধ্যে। সবায়ের মন এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে, মা'র মনেও তার ছোঁয়াচ

লাগে। মা বুঝল না, কী এই ভাবনা। তবু তার নবীন শক্তি, আশা আর আনন্দ মাকে যেন নতুন জীবন দিয়ে গেল।

একদিন খখলকে বলল মা, 'তোমরা সব কী বল তো! দুনিয়াশুদ্ধ সব্বাই তোমাদের দোস্ত—কোথায় ইহুদী, কোথায় আরমানী, আর কোথায় অস্ট্রিয়ার মানুষ। সকলের সুখ দুঃখই তোমাদের আপন!'

'ঠিক বলেছেন নেন্‌কো। একেবারে ঠিক। আমাদের সবার হাসিকান্না এক হয়ে গেছে।' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে খখল: 'আমরা জাত ধর্ম জানিনে, আমরা শুধু জানি দোস্ত আর দুশমন। সারা দুনিয়ার যত শ্রমিক সবাই আমাদের বন্ধু, আর বড়লোক আর সরকারের দল আমাদের শত্রু। দুনিয়ার দিকে ভালো করে তাকালে বুঝি কত শ্রমিক আমরা আছি সারা পৃথিবীতে, আর কী শক্তি আমাদের। সে দেখে আনন্দের সীমা থাকে না, প্রাণের মধ্যে স্রেফ ছুটির হাওয়া বয়। জার্মান, ফরাসী, ইতালীর মানুষ — জীবনের দিকে তাকিয়ে সকলের ওই কথাই মনে হয়। আমরা সব এক মায়ের ছেলে— সেই মা হল এই এক দুর্নিবার ভাবনা, সারা দুনিয়ার শ্রমিক ভাই ভাই। ওই আমাদের অক্ষয়-মন্ত্র। ওই মন্ত্র আমাদের বুকের বল, প্রাণের আগুন। ন্যায়ের আকাশে ওই সূর্যই জ্বলছে ঝল্‌মল্‌ করে। সেই আকাশটা কোথায়, জানেন নেন্‌কো? শ্রমিকের মনে, এই এইখানে। সমাজতন্ত্রী হলেই, সে নিজেকে যাই বলুক না কেন, সে আমাদের ভাই। এক ভাবনায় বাঁধা সত্যিকার ভাই। কালকের, আজকের, চিরকালের ভাই।'

শিশুর মতো সরল অথচ দৃঢ় এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে বেড়ে ওঠে; দিনে দিনে আরো তার মহিমা বাড়ে। একটা বিরাট শক্তি হয়ে ওঠে। মা যখন তাকে দেখে, তখন আপনা থেকেই তার মনে হয়, ওই যে সূর্যটাকে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, ঠিক তারি মতো বিরাট আর জ্যোতির্ময় কী একটা জন্ম নিয়েছে।

প্রায়ই ওরা গান গায়। অতি সাধারণ সহজ চেনা গান। আনন্দ যেন উপচে পড়ে ওদের উচ্চ স্বরে। কিন্তু কখনও আবার নতুন নতুন গান করে দুঃখভরা সুরে গির্জার সঙ্গীতের মতো চাপা গলায়। ভারি সুন্দর সুর, কিন্তু একেবারে নতুন। সাধারণ গানে এমন সুর হয় না। গাইতে গাইতে কখনও ওদের মুখ লাল হয়ে ওঠে, কখনও ফ্যাকাশে। গানের কথাগুলো ঝম্‌ঝমিয়ে বাজে হাওয়ায়। অদ্ভুত জোর প্রতিটি কথায়।

বিশেষ করে একটা গান শুনে মা বিচলিত আর ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সে গানে শোনা যায় না দুঃখভরা সন্দেহ-সংশয়ের ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে পথ-খুঁজে-মরা জীবনের আর্তি, না শোনা যায় অভাব অনটন আর ভয়ের পাঁকে মুখ-থুব্‌ড়ে পড়ে থাকা জীবনের জলুস আর ব্যক্তিত্ব খোয়ান মানুষের ফরিয়াদ। একটুখানি ফাঁকা জায়গার জন্য আঁধারে হাতড়ে-ফেরা শক্তিমান মানুষের দীর্ঘশ্বাসও নেই, নেই মরীয়া মানুষের ভালো মন্দ সব কিছুর ওপর উদ্যতমুষ্টি আস্ফালন। সব কিছু ভাঙতে পারে অথচ গড়তে অক্ষম এমন অন্ধ ঘাতপ্রতিঘাতের জ্বলুনি এ গানের একটি কথাতেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায় নেই পুরনো গোলামী দুনিয়ার মন-মেজাজের লেশটুকু।

কড়া কড়া কথাগুলো আর গম্ভীর সুরটা ভালো লাগে না মায়ের। কিন্তু ভারি জোরাল রকম কী যে একটা আছে ওই গানের মধ্যে যা তার কড়া কথা আর শক্ত সুরকে ছাপিয়ে যায়। মনের মধ্যে কী-যে একটা ঘটিয়ে দিয়ে যায়, হাজার ভাবনা দিয়েও যার খেই-তলাশ পাওয়া যায় না। সেই 'কী-যে'-টাকে মা ওই ছেলে-মেয়েগুলোর চোখে মুখে দেখতে পায়। ওটা যেন ওদের পাঁজরার তলায় বাসা বেঁধে আছে। এত তার শক্তি যে কথা-সুরের বাঁধন দিয়ে তাকে ধরে রাখা যায় না। মাকেও তার সামনে মাথা নোয়াতে হয়। গভীরভাবে মন দিয়ে সে শোনে। অন্য গানে মন এমন উতলা হয় না।

এ গানটা ওরা আরো নিচুগলায় গায় কিন্তু এটাই বেশি জোরাল শোনায়। মার্চ-মাসের—নতুন বসন্তের প্রথম দিনের হাওয়ার মতো মানুষের মন-প্রাণ আচ্ছন্ন করে দেয়।

ভেসভ্‌শ্চিকভ্‌ গোমড়া মুখে বলে, 'ও গান এখন আমাদের রাস্তায় বেরিয়ে গাওয়ার সময় এসেছে।'

ভেসভ্‌শ্চিকভের বাবা আর একবার চুরি করে জেলে গেলেও বন্ধুদের শান্তভাবে বলল:

'এখন আমাদের বাড়ীতেই বৈঠক বসতে পারে।'

প্রায় প্রত্যেক দিন কারখানা ফেরতা পাভেলের কাছে ওর বন্ধুদের কেউ না কেউ আসে। এসেই বসে বসে বই পড়ে টুকে নেয়। এমনি মশগুল হয়ে যায় লেখা পড়ায় যে নাবার খাবার কথা মনেই থাকে না। চা জলখাবার খায় বই হাতে নিয়ে। মায়ের কাছে ক্রমশই সব বেশি হেঁয়ালীর মতো ঠেকে। কী অত বলা-কওয়া করে ওরা?

পাভেল প্রায়ই বলে, 'একটা খবরের কাগজ বের করতে হবে।'

অস্থির উত্তেজনায় জীবন চলে। বই'এর পর বই শেষ হয় তাদের সমান তালে।

ভেসভ্‌শিচকভ্‌ বলল একদিন, 'আমাদের নিয়ে লোকে বলাবলি করছে। শীগ্‌গিরই হাতে দড়ি পড়বে...'

খখল জবাব দেয়, 'মাছের জন্মই জালে পড়বার জন্য।'

মায়ের যেন প্রতিদিন খখলকে বেশি করে ভালো লাগে। 'নেন্‌কো' বলে যখন ডাক দেয় মনে হয় ছোট্ট একটি শিশুর কচি হাতের আদর। রবিবার পাভেলের সময় না হলে খখল এসে মাকে কাঠ কেটে দেয়। একদিন ঘাড়ে করে একটা তক্তা নিয়ে হাজির। দরজার সিঁড়িটার একটা ধাপ পচে গিয়েছিল। নিজেই কুড়ুল বের করে নিল। দিব্যি সাফ হাতে নতুন একটা ধাপ বানিয়ে বসিয়ে দিল। আর এক দিন অমনি করে এসে ভাঙ্গা বেড়াটা বেঁধে দিল। কাজ করতে করতে সর্বদা ও ভারি সুন্দর ব্যথায় ভরা কী একটা সুর ভাঁজে শিস্‌ দিয়ে।

এক দিন ছেলেকে বলল মা, 'খখল এসে থাকুক না এখানে। তোদের দু'জনেরই সুবিধে হবে, দেখা করার জন্য ছুটোছুটি করে মরতে হবে না।'

'তোমারই কষ্ট বাড়বে।' পাভেল বলল।

'তা না হয় বাড়ল। চিরকাল তো কষ্টই করে এলাম, কিন্তু সে সব ভস্মে ঘি ঢেলেছি। এবার নয় একটা ছেলের মতো ছেলের জন্যই কষ্ট করলাম একটু।' মা জবাব দেয়।

'তা দেখ! আমার তো ভালোই হয়...' পাভেল বলে।

খখল উঠে আসে এ-বাড়ীতে।

৮

বস্তির এক প্রান্তের ওই ছোট্ট বাড়ীখানার ওপর সকলেরই দৃষ্টি পড়ল। সংশয়ী চোখগুলো বাড়ীর দেয়ালটাকে সাবধানে পরীক্ষা করে দেখে। কত রকম কাহিনী ছড়ায় চারদিকে। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু লুকিয়ে আছে ওর পেছনে। রাত্তির বেলা কেউ কেউ গিয়ে ওদের জানালায় আড়ি পাতে। কখনও বা জানালার কাঁচে টোকা মারে। পর মুহূর্তেই ভয়ে পালিয়ে যায়।

একদিন শুঁড়িখানার মালিক বেগুন্‌ৎসভ্‌ ধরল মাকে। বুড়োর প্রসন্ন চেহারা, গায়ে সর্বদা একটা মোটা লাইলাক রঙের মখমলের জামা, থলথলে লাল গলায় কালো রেশমী রুমাল বাঁধা; খাড়া টিকলো পালিশ-করা নাকের

ওপর টরটয়েস্‌-শেল'এর চশমা আঁটা। ঐ জন্য লোকে ওর নাম দিয়েছে 'হাড্ডি-চোখা'।

মাকে থামিয়ে বলা নেই কওয়া নেই সাত সতের কথা এক নিশ্বাসে শুনিয়ে গেল:

'তারপর, চলছে বেশ, পেলাগেয়া নিলভনা! ছেলের খবর কী? বিয়ে-থাওয়া করবে না? বিয়ের যুগ্যি তো হল। তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিতে পারলে বাপ মা'রই রেহাই। বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হলেই ভদ্রস্থ থাকবে, সোনায় সোহাগা হবে। আমি হলে কবে ওর বে' দিয়ে দিতুম। আজকালকার ছেলে ছোকরারা কারো কথা শুনে তো চলে না। যা দিনকাল পড়েছে। চ্যাংড়াগুলোর ওপর কড়া নজর রাখা দরকার। মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি ঢোকে, তারপর কেলেঙ্কারী। ওরা সাত জন্মে গির্জায় যাবে না, আড্ডায় যাবে না। খালি ঘরের কোণায় আঁধারে বসে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর। কিসের এত গুজুর গুজুর রে বাপু? হ্যাঁঃ? লোকের ধারপাশে আসবে না। কেনরে? ভয়টা কিসের? যা বলবার মদের আড্ডায় এসো, সবার সুমুখে বলো। বাস্‌। আর সত্যি কিছু গোপন থাকে, বেশতো যাও গির্জায়। মনের মধ্যে ভেজাল থাকলেই এই সব আনাচে-কানাচে ফুসুর ফুসুর। যাক্‌, শরীর মন আপনার ভালো থাকুক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।'

তারপর সাড়ম্বরে মাথার টুপিটা খুলে, এতখানি হাত উ'চিয়ে সেটা তুলে চলে গেল বুড়ো। মা হক্‌চকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আর একদিন বাজারে দেখা ওদের প্রতিবেশী কামার-বৌ মারিয়া করসুনভার সঙ্গে। কামার মারা গেছে, বিধবা কারখানার গেটের কাছে খাবার ফিরি করে পেট চালায়। বলল সে ডেকে:

'ছেলের ওপর নজর রেখো গো, পেলাগেয়া।'

'কী বলছ?' মা শুধয়।

'বলব কী আর মা!' ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলে মারিয়া, 'কথাটা ভালো নয়। তোমার ছেলে নাকি কী সব গোপন দল টল গড়েছে চাবুকদের মতো। কী এক নাকি ধর্ম সম্প্রদায় আছে। তারা চাবুক দিয়ে মারে পরস্পরকে...'

'থামো, থামো, হয়েছে, যত সব ছাইভস্ম...' মা বলে।

'থামব কি আর মা, ধোঁয়া থাকলে আগুনও থাকবে।' মারিয়া টিপ্পনী কাটে।

মা এসে ছেলেকে বলল। ছেলে কিছু না বলে কাঁধ ঝাঁকাল, খখল তার গভীর নরম হাসিটি হাসল। মা শোনায়:

'মেয়েগুলোর চোখ তো টাটাবেই! জোয়ান মরদ হয়েছিস, গতর খাটিয়ে খাস; মদ নেই নেশা নেই। অমন বরের জন্য তপিস্যে করে মেয়েরা। আর তোরা ওদিকে ফিরেও চাইবি নে। ওরা বলে কী জানিস্? শহর থেকে খারাপ মেয়ে-মানুষ সব নাকি আসে এখানে...'

বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করে বলে পাভেল, 'তাই নাকি?..'

খখল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'জলায় সর্বদাই পচা গন্ধ। তা নেন্‌কো, গাধাগুলোকে একটু বুঝিয়ে দেবেন বিয়ে করা কাকে বলে। তাহলে আর ঘানিতে পা দেবার জন্য তাড়াহুড়ো করবে না...'

'আমি বোঝাব?' মা বলে, 'ওরা নিজেরাই বেশ বোঝে! সে দিকে টন্‌টনে জ্ঞান আছে। তবু এ ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই।'

'তার মানে যথেষ্ট জ্ঞান নেই, থাকলেই তো হিল্লে হতো একটা।' পাভেল বলে।

ওর কঠিন মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে মা।

'তোমরাই বোঝাও না ওদের! যারা একটু চালাক চতুর তাদের এখানে ডাকো...'

'না, তা হয় না।' নীরস গলায় পাভেল বলে।

'কেন, চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী?' খখল জিজ্ঞাসা করে।

'ক্ষতি এই যে সব জোড়া বেছে নেবে। তারপর দু'দিন বাদে বিয়ে করে সংসারী হবে। বাস্ খতম!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পাভেল বলে।

মা চিন্তিত হয়। কী গোঁড়া ছেলে। যেন সন্ন্যাসী। লক্ষ্য করেছে মা, ওর থেকে বয়সে বড় কমরেড্‌রাও ওর কাছ থেকে পরামর্শ নেয়, যেমন খখল। কিন্তু মনে হয় ওই গোঁড়ামির জন্য সবাই ওকে ভয় করে, ভালোবাসে না কেউ।

এক দিন রাত্তিরে মা শুতে গেছে। পাভেল ও খখল পড়ছে। হাল্কা পার্টিশনের ও-দিক থেকে ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ খখল বলে উঠল:

'নাতাশাটাকে আমার ভারি ভালো লাগে।'

একটু চুপ করে থেকে পাভেল জবাব দেয়, 'তা জানি।'

মা শুনতে পায়, খখল ধীরে ধীরে ওঠে, খালি পায়ে মেঝেতে পায়চারি করে। আস্তে আস্তে শিস্ দেয় আপন মনে। আবার গমগম করে উঠল গলা:

'কে জানে ও ব্ঝতে পেরেছে কিনা।'

পাভেল জবাব দেয় না।

'তোমার কী মনে হয়?' চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করে খখল।

'পেরেছে। তাইতো এখানে আসা ছেড়েছে...'

খখলের ভারি পা দুটো মেঝেতে ঘষটাতে থাকে। আবার ওর শিসের কোমল বিষণ্ন সুর ঘরের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ফেরে। জিজ্ঞাসা করে:

'ওকে বলব?..'

'কি বলবে?'

'বলব যে — আমি...' আস্তে আস্তে খখল আরম্ভ করে।

পাভেল বাধা দেয়, 'কেন? দরকারটা কী শুনি?'

মা শুনতে পায়, খখল থামল। চোখের সামনে যেন দেখতে পায়, হাসছে খখল।

'বাঃ, একজনকে ভালোবাসবে আর বলবে না? তাহলে লাভটা কী হল?'

পাভেল সশব্দে বইটা বন্ধ করে। জিজ্ঞাসা করে:

'কী লাভটা চাও শুনতে পাই?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনে। তারপর খখল বলে:

'তারপর?'

পাভেল ধীরে ধীরে বলে, 'দেখ আন্দ্রেই, তুমি কী চাও সেটা তোমার ভালো করে বুঝে দেখা দরকার। আমার মনে হয় না ও তোমায় ভালোবাসে। কিন্তু ধরা যাক, বাসে, এবং তোমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বুদ্ধিজীবী আর শ্রমিক। একেবারে রাজ-যোটক। তারপর ছেলেপুলে হবে। তাদের খাওয়াতে হবে একা তোমায়... খাটুনির একশেষ হবে। অন্নসংস্থান, বাড়ী-ভাড়া, কাচ্চা-বাচ্চা... এই তো হবে জীবন। কাজ আর করবে কখন। তোমাদের দুজনকেই আমরা হারাব।'

সব চুপচাপ। তার পর নরম গলায় পাভেল আবার বলল, 'এসব ছেড়ে দাও আন্দ্রেই। ওকে চঞ্চল করে তুলো না...'

কারো মুখে কথা নেই। শুধু ঘড়ির পেণ্ডুলামটার টিক্ টিক্ শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

খখল বলল, 'আমার আধখানা মন ভালোবাসে, আর আধখানাতে ঘৃণা। একে তুমি মন বলবে?'

বই'এর পাতা ওল্টানোর খস্‌খসানি শোনা যায়। পাভেল পড়তে শুরু

করেছে নিশ্চয়। মা চোখ বুজে নিথর হয়ে শুয়ে থাকে; যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভয়। খখলের জন্য বড় মায়া হয়; কিন্তু ছেলের জন্য আরো বেশি। লক্ষ্মী ছেলে...

খখল হঠাৎ বলে বসে, 'তাহলে না বলাই ভালো?'

শান্তভাবে জবাব দেয় পাভেল, 'আমার তো মনে হয় তাই ঠিক হবে।'

'বেশ তাই হবে,' খখল বলে। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বিষণ্ণভাবে বলে, 'এ অবস্থায় পড়লে তোমার কী কষ্ট হবে পাভেল...'

'কষ্ট তো হচ্ছেই...'

দেয়ালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে বাতাস শনশনিয়ে যায়। পেন্ডুলামটা নির্ভুলভাবে সময় মেপে চলে।

'এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়,' খখল বলে।

মা বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদে।

ভোর বেলা মায়ের মনে হয় আন্দ্রেই যেন একটু খাটো হয়ে গেছে। আরো ভালো লাগছে ওকে। আর তার নিজের ছেলে হামেশা যেমন — সেই রোগা সোজা দেহ। তেমনি চুপচাপ। এতদিন খখলকে মা আন্দ্রেই ওনিসিমভিচ্ বলে ডেকে এসেছে। কিন্তু আজ ভোর বেলা নিজের অজান্তেই বলে ফেলল:

'আন্দ্রিউশা,* জুতোটা মেরামত করা দরকার, নইলে ঠান্ডা লাগবে।'

'মাইনে পেয়ে নতুন জুতো কিনব এক-জোড়া।' হেসে জবাব দেয় খখল। তারপর হঠাৎ হাত দুটো মায়ের কাঁধে রেখে বলে:

'আপনিই হয়ত আমার নিজের মা। আমি কিনা আপনার কুচ্ছিৎ ছেলে, তাই লোকের সামনে স্বীকার করতে চান না। তাই না?'

মা কথা না বলে আস্তে আস্তে ওর হাতে হাত চাপড়ায়। আদর উথলে উঠতে চায়। কিন্তু ব্যথায় আর দরদে ভরে আছে বুক; মুখ দিয়ে কথা সরে না।

৯

সমাজতন্ত্রীদের কথা বলাবলি করে বস্তির মানুষ। তারা নাকি নীল কালিতে লেখা ইস্তাহার বিলিয়ে থাকে। সে-সব ইস্তাহারে থাকে কারখানা-

---

* রুশ ভাষায় আদর করে ডাকবার এই ধরন। খুব ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেই এমন ডাক চলে। — সম্পাঃ

ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা, পিটার্সবুর্গ আর দক্ষিণ রাশিয়ার ধর্মঘটীদের খবর। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকদের এক হবার ডাক আসে।

কারখানায় যাদের বেশ দু' পয়সা রোজগার সেই মধ্য-বয়সীর দল চটে যায়।

'শুধু শুধু হাঙ্গামা বাধানো। মুখ ভোঁতা করে দিতে হয় ওদের।'

ইস্তাহারগুলি তারা অফিসে দিয়ে আসে। তরুণের দল সাগ্রহে পড়ে: 'সত্যি কথা লিখেছে সব।'

বেশির ভাগের খেটে খেটে শরীর ঝাঁঝরা, মন নির্বিকার, তারা বলে অলস কণ্ঠে, 'ওঃ, ভারি তো হবে ওতে! কী আর হবে?'

তবু চারদিকে একটু সাড়া পড়ল। সপ্তাহ খানেক নতুন কোন ইস্তাহার না এলে শ্রমিকেরা বলাবলি করে, কাগজ-ছাপান বুঝি বন্ধ করে দিয়েছে...

পরের সোমবার আবার নতুন কাগজ বেরয়। শ্রমিকদের মধ্যে আবার চাপা গুঞ্জন ওঠে ।

কারখানায়, শুঁড়িখানায় অচেনা নতুন লোক দেখা যায়। এরা চারদিকে চোখ রাখে, হাজার রকম কথা জিজ্ঞাসা করে, মানুষের ঘরের খবর নেয়, আগ বাড়িয়ে গিয়ে সকলের সব কিছুতে নাক সেঁধোয়। ওরা সব প্রথমেই লোকেদের চোখে পড়ে — কারো কারো হাবভাব খুব সতর্ক সাবধানী, কারো বা অনাবশ্যক বেপরোয়া। মা বোঝে তার ছেলের কাজের জন্যই চারদিকে এত হৈচৈ। কত লোক ওর ছেলের চারদিকে জুটেছে। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় হয়, সেই সঙ্গে গর্বও।

একদিন মারিয়া করসুনভা সন্ধ্যার সময় জানালায় ধাক্কা দিল। মা পাল্লা খুলে দিতেই তার কানে জোরে ফিসফিসিয়ে বলল মারিয়া:

'একটু সাবধান থেকো, পেলাগেয়া। ছেলেরা বড়ো বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। আজ রাতে তোমাদের বাড়ী তল্লাসী হবে। ভেসভ্শিচকভ্ আর মাজিনের বাড়ীও...'

ওর মোটা ঠোঁট দুটো যেন চক্ চক্ করে শব্দ করে। থল্থলে নাকটা ফোঁসফোঁস করে; চোখের পাতা পিট্পিট্ করে আর দৃষ্টিটা ঘোরে রাস্তার এদিক ওদিক, কাকে যেন খোঁজে।

'আমি কিছু জানি না, তোমায় কিছু বলিনি, তোমার সঙ্গে আজ দেখা পর্যন্ত হয়নি। বুঝলে তো?' বলেই উধাও হয়ে গেল।

জানালাটা বন্ধ করে মা একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। কিন্তু

ছেলের আসন্ন বিপদের কথা ভেবে নিমেষে উঠে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে একটা শাল মাথায় আঁট করে জড়িয়ে ছুটে গেল ফিওদর মাজিনের বাড়ী। অসুখ করেছে ফিওদরের—কারখানায় যায়নি। জানালার পাশে বসে একটা বই পড়ছিল আর বাঁ হাতে ধরে দোলাচ্ছিল ডান হাতটা, তার বুড়ো আঙ্গুলটা খাড়া বের করে। খবরটা শুনে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। লাফিয়ে উঠল একেবারে।

'তা, তাই তো...' বলল বিড়বিড় করে।

কম্পিত হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পেলাগেয়া শুধল, 'কী করা যায় এখন!'

সুস্থ হাতটা দিয়ে কোঁকড়া চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে ফিওদর বলে, 'দাঁড়ান — অত ভয় পাবার কী আছে?'

'ভয় তো দেখছি আপনিও পেয়েছেন,' মা বলে।

'আমি?' লাল হয়ে ওঠে ফিওদর, বিব্রত হাসি হাসে। বলে, 'তা, গোল্লায় যাক... খবরটা পাভেলকে দিতে হচ্ছে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কাউকে। আপনি বাড়ী যান। ব্যস্ত হবেন না। ধরে তো আর মারবে না?'

মা বাড়ী এসে সবগুলি বই একসঙ্গে জড়ো করে তুলে নিয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে কোথায় রাখা যায়—চুল্লীটার ভেতরে, তলায়, এমনকি জলের পিপেয় পর্যন্ত। ভেবেছিল তক্ষুনি কারখানা থেকে ছুটে আসবে পাভেল। কিন্তু এল না। ক্লান্ত হয়ে রান্নাঘরের বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে মা বইগুলো চেপে। খখল, পাভেল বাড়ী এলে তবে ওঠে।

'শুনেছিস?' ওদের দেখা মাত্র জিজ্ঞাসা করে।

পাভেল হেসে জবাব দেয়, 'হাঁ শুনেছি। ভয় করছে নাকি?'

'বড্ড ভয় করছে। বড্ড ভয় করছে...'

'ভয় পাবেন না মা। তাতে তো কোনো সুবিধে হবে না।' খখল বলে।

'সে কি! সামোভারও তো চড়াওনি এখনও।' পাভেল মন্তব্য করল।

'সারাক্ষণই এগুলো নিয়ে রয়েছি...' উঠে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো বইগুলো দেখায়।

পাভেল আর খখল হো হো করে হেসে ওঠে। মা অনেকটা আশ্বাস পায়। পাভেল বেছে বেছে কয়েকখানা বই নিয়ে বাইরে চলে যায় লুকিয়ে রাখতে।

সামোভার জ্বালাতে জ্বালাতে খখল বলে:

'ভয় পাবার কিছু নেই নেন্‌কো! বরঞ্চ এটাই লজ্জার কথা যে, মানুষ

বাজেভাবে এমনি করে সময় নষ্ট করতে পারে। দেখবেন কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে আর পায়ে রেকাব লাগিয়ে বয়স্ক লোকগুলো কী ভাবে আসে। বিছানার তলা, চুল্লীর তলা, মাটির তলার ঘর, মাচান—তচ্‌নচ্‌ করে ফেলবে সব। তন্ন তন্ন করে খুঁজবে, মাকড়সার জালে মুখ গুঁজবে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করবে বিরক্ত হয়ে। শুধু বিরক্তই হবে না, লজ্জাও পাবে। আর তা ঢাকবার জন্য মেলাই তর্জাবে গর্জাবে। খুব ভালো করে জানে কী ঘেন্নার কাজ করছে ওরা। একবার আমার সর্বকিছু তন্ন তন্ন করে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে সব ফেলে চলে গিয়েছিল। আর একবার আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে চারটি মাস জেলে পুরে রেখেছিল। জেলে এমনি বসে থাকতে থাকতে সমন আসত। সৈন্য-পরিবৃত হয়ে রাস্তা দিয়ে আদালতে হাজির হতুম। কর্তাদের মধ্যে কারুর কারুর জবানবন্দী নেবার কথা থাকত। লোকগুলো বোকা, বোকা প্রশ্ন করত, কী সব বলত, তারপর আবার জেলে ফিরে আসতুম। এই ছিল কাজ। শুধু যাও আর এসো। ব্যস্‌। টাকাগুলো নিচ্ছে, কাজ দেখাতে হবে তো! তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো, আর কী!'

মা আঁৎকে ওঠে, 'কী কথা বলার ছিরি আপনার আন্দ্রিউশা!'

জানুর উপর ভর দিয়ে বসে আগুনে ফুঁ দিচ্ছিল আন্দ্রেই। লাল মুখটা একটু তুলে জবাব দেয় গোঁফ পাকাতে পাকাতে:

'কী ছিরি মা?'

'যেন কেউ আপনার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেনি...'

দাঁড়িয়ে উঠে হাসি-ভরা মুখে মাথা নেড়ে খখল বলে, 'গায়ে আঁচড় লাগেনি এমন কে আছে মা? এত আঁচড় কেটেছে আমার ওপর যে গা-সওয়া হয়ে গেছে। করবে কী বলুন? উপায় তো নেই। তা ছাড়া ওসব অপমানের কথা মনে করতে গেলে আর কাজ হয় না। শুধু সময় নষ্ট। এই তো আমাদের জীবন। প্রথম প্রথম মানুষের ওপর আমার ভারি রাগ হত। তারপর দেখলাম মিছে রাগ করা। প্রত্যেকেই ভয়ে ভয়ে আছে, পাশের লোকটা তাকে মারবে। তাই আগে আগেই তার টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা। এই তো হাল। বুঝলেন তো, নেন্‌কো?'

কথাগুলো সে বলল ভারি শান্তভাবে, খানাতল্লাসীর ভয় কোথায় একপাশে ঠেলে দিয়ে। তার বড় বড় চোখ দুটিতে একটু হাসি।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মায়ের। সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে বলে, 'আপনি সুখী হন, আন্দ্রিউশা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।'

খখল উঠে সামোভারের দিকে একটা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে আবার উবু হয়ে বসে মৃদু গলায় বলে, 'সেই সুখ আমায় একবার দিলে আর ফেরাব না। তবে হাত পাতব না তার জন্য।'

উঠোন থেকে পাভেল ফিরে আসে। দৃঢ় গলায় জানাল:

'কেউ পাত্তা পাবে না।'

তারপর হাত মুখ ধুয়ে হাতটা গামছায় মুছতে মুছতে মাকে বলল:

'ওরা যদি দেখে যে ভয় পেয়েছ, ঠিক বুঝবে ঘরে কিছু আছে। তুমি তো জানো আমরা কোন অন্যায় করছি না। আমাদের দিকে রয়েছে ন্যায়। যতদিন জান আছে ন্যায়ের জন্য লড়ব — অন্যায় বল তো বল! ভয়টা কিসের আমাদের?'

'ভাবিসনে, পাশা, ঠিক সামলে নেব আমি।' বলেই সেই মুহূর্তেই আবার ভেঙ্গে পড়ে। 'ওঃ, কতক্ষণ লাগাবে কে জানে!..'

সে রাতে পুলিশ আসেনি। সকাল বেলা উঠে ছেলেরা পাছে তার ভয়ের কথা নিয়ে ঠাট্টা করে সেই জন্য মা নিজেই ঠাট্টা করতে শুরু করে, 'আগে থেকেই এত ভয় পেয়ে গেলাম!'

১০

সেই ভয়ের রাত্তিরের প্রায় এক মাস বাদে পুলিশ এল।

সেদিন নিকলাই ভেসভ্শিচকভ্ এসেছিল। পাভেল, আন্দ্রেই আর সে ওদের খবরের কাগজ নিয়ে কথাবার্তা বলছে। প্রায় মাঝরাত্তির। মা শুয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে কথা বলছে ওরা উদ্বিগ্নভাবে। তার চাপা আওয়াজ আসছে এদিকে। ঝিমুতে ঝিমুতে শোনে মা। আন্দ্রেই সাবধানে উঠে রান্নাঘরটা পার হয়ে দরজাটা চুপি চুপি বন্ধ করে দিল। ঢাকা বারান্দায় একটা লোহার বালতি ঝনঝনিয়ে ওঠে। দরজাটা হাট হয়ে খুলে যায়। খখল এসে রান্নাঘরে ঢোকে। জোরে ফিসফিস করে বলে:

'রেকাবের শব্দ!'

মা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে কাপড় চড়াতে চেষ্টা করে। থর থর করে হাত কাঁপে। পাভেল দরজার কাছে এসে শান্ত গলায় বলে:

'তুমি শুয়ে থাক, মা, তোমার শরীর ভালো নেই।'

ঢাকা বারান্দায় একটা সতর্ক খস্ খস্ আওয়াজ শোনা যায়। পাভেল এসে দরজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কে?'

মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ধূসর পোষাক পরা লম্বা একটা

লোক এগিয়ে এল। তার পেছনে আর একজন। দু'জন পুলিশ পাভেলকে এক পাশে সরিয়ে এসে দু'দিকে দাঁড়াল। চড়া গলায় ঠাট্টা করে উঠল একজন, 'যার আশায় বসেছিলে চাঁদ, সে নয়?'

লোকটা একজন অফিসার — লম্বা লিক্‌লিকে চেহারা। কালো পাতলা গোঁফ। এই এলাকারই একজন পুলিশ, নাম ফেদিয়াকিন, মায়ের বিছানার কাছে গিয়ে এক হাতে টুপি ছুঁয়ে, অন্য হাতে মাকে দেখিয়ে, চোখ দুটো ভয়ংকর করে বলল, 'এই যে ওর মা, হুজুর। আর ওই,' পাভেলের দিকে হাত নেড়ে বলল, 'সেই লোকটা।'

'পাভেল ভ্লাসভ্?' জিজ্ঞাসা করে অফিসার চোখ কুঁচকে।

পাভেল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। গোঁফে তা দিয়ে অফিসার বলে উঠল, 'আমরা এ বাড়ী খানাতল্লাশী করব। এই বুড়ী, ওঠো! কে ওখানে?'

পাশের ঘরে উঁকি মেরে ঝট করে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'তোমাদের নাম?' ওঘর থেকে অফিসারের গলা শোনা যায়।

দুজন লোক ঢাকা বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকল। তারা সাক্ষী। একজন কারখানার ঢালাই-খানায় কাজ করে, নাম ত্‌ভেরিয়াকভ। আর একজন রীবিন, ওখানকার ফায়ারম্যান—ময়লা রং, পেটান শরীর। ত্‌ভেরিয়াকভের ভাড়াটে। চড়া মোটা গলায় মাকে বলল:

'নমস্কার, নিলভ্‌না।'

উঠে কাপড় জামা পরতে পরতে নিজের মনেই বক্‌বক্ করে মা সাহস বজায় রাখবার জন্য:

'কী সৃষ্টিছাড়া কান্ড। গেরস্তমানুষ ঘুমুচ্ছে, মাঝ-রাত্তিরে দুয়ার ঠেলাঠেলি!..'

এত মানুষ, ঘরে আর ঠাঁই নেই। সারা ঘর জুতোর কালির গন্ধে ভরে গেছে। পুলিশ দুজন আর মহল্লার দারোগা রীসকিন ভারি পা ঠুকে ঠুকে তাক থেকে বইগুলো পেড়ে এনে অফিসারের সামনে টেবিলের ওপর জড়ো করল। আর দুজন গিয়ে দেয়ালগুলোয় ঘুষি মেরে দেখতে লাগল, চেয়ারের নিচে উঁকি মারল। একজন বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল চুল্লীর ওপরে। খখল আর ভেসভ্‌শিচকভ্ এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে কাঁধে কাঁধ ঘেঁষে। নিকলাইয়ের বসন্তের দাগওয়ালা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। ওর ছোট্ট কটা চোখ দুটো যেন বিঁধে আছে অফিসারের ওপর। খখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফ পাকাচ্ছে। মা ঘরে আসতেই ফিক্ করে একটু হেসে মাথা নাড়ল সস্নেহে।

মা ভয় তাড়াবার জন্য সোজা হয়ে বুক চিতিয়ে জোরে পা ফেলে এল, স্বভাব মতো কাত হয়ে নয়। ভারিক্কি ডোণ্ট-কেয়ারি ভাবটা বেশ মজার লাগে দেখতে... ভুরু দুটো ওর কাঁপতে থাকে...

অফিসার তার ফর্সা হাতের রোগা রোগা আঙুলগুলো দিয়ে তাড়াতাড়ি বই তোলে একটার পর একটা। নিপুণ হাতে পাতা উল্টে-উল্টে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে। কোন কোন বই মাটিতে ধপ করে পড়ে যায়। কারো মুখে কথা নেই। ঘর্মাক্ত পুলিশেরা হাঁপাতে থাকে। শোনা যায় শুধু তাদের হাঁপানোর শব্দ আর রেকাবের ঠক্‌ঠকানি। আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন:

'ওদিকে দেখা হয়েছে?'

পাভেলের পাশেই দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মা; ছেলের মতোই বুকের ওপর হাত আড় করে রাখা। তারি মতো তাকিয়ে আছে অফিসারের দিকে। হাঁটু দুটো কেঁপে ওঠে। চোখের সামনে সব ঝাপ্‌সা।

হঠাৎ ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে যায়। কর্কশ গলায় নিকলাই বলে ওঠে:

'দেখবেন দেখুন, কিন্তু বইগুলো মাটিতে ফেলছেন কেন?'

মা চমকে ওঠে। ত্‌ভেরিয়াকভের মাথাটা যেন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠল। রীবিন ঘোঁত ঘোঁত করে উঠে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নিকলাইয়ের দিকে। অফিসার চোখ কুঁচকে নিকলাইয়ের বসন্তের দাগওয়ালা পাথরের মতো কঠিন মুখটার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টি হানল। আঙুলগুলো আরো তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতা উল্টোতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো কটা চোখগুলি এমন পাকায় যেন অসহ্য কী একটা ব্যথায় ওর কলজেটা দুমড়ে মুচ্‌ড়ে যাচ্ছে, এক্ষুনি যেন রাগে চীৎকার করে উঠবে।

ভেসভ্‌শিচকভ্‌ আবার বলে, 'ওহে সেপাই, বই তুলে রাখ বলছি।'

পুলিশেরা ফিরে প্রথমে ওর দিকে তারপর অফিসারের দিকে চায়। অফিসার মাথা তুলে চওড়া-দেহ নিকলাইয়ের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নাকী স্বরে টেনে টেনে বলে, 'হুঁ... তুলে রাখ।'

একজন পুলিশ নীচু হয়ে আড়চোখে ভেসভ্‌শিচকভের দিকে তাকিয়ে ছড়ান বইগুলো কুড়োতে লাগল।

মা পাভেলের কানে চুপি চুপি বলে, 'নিকলাই চুপ করলেই ভালো হয়, বাবা।'

পাভেল কাঁধ ঝাঁকানি দেয়। খখল মাথা নীচু করে।

'বাইবেল পড়ে কে?'

'আমি পড়ি।' পাভেল জবাব দেয়।

'এ সব বই কার?'

'আমার।' পাভেল বলে।

'বেশ।' বলে অফিসার চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে টেবিলের নীচে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বসে রোগা রোগা হাতের আঙুল মট্‌কায়। তারপর গোঁফ চুমরিয়ে বলে নিকলাইকে:

'তোমারই নাম আন্দ্রেই নাখদ্‌কা?'

নিকলাই এগিয়ে এসে জবাব দেয়, 'হাঁ।'

খখল হাত বাড়িয়ে ওকে পিছনে টেনে বলে:

'না, ওর ভুল হয়েছে, আমি আন্দ্রেই!..'

অফিসার হাত তুলে ভেসভ্‌শিচকভের দিকে ছোট্ট আঙুল নাচিয়ে বলে:

'চুপ করে থাক।' বলে নিজের কাগজপত্র দেখতে আরম্ভ করে।

উদাসীন চোখে জানলায় উঁকি মারে জ্যোৎস্না রাত। কেউ একজন আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল বাড়ীর পাশ দিয়ে। বরফগুলো খড়মড়িয়ে উঠল।

অফিসার মাথা তোলে। 'হুঁ! নাখদ্‌কা! তুমি তো আগে রাজনৈতিক কারণে আদালতে হাজির হয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার রস্তভ্‌-এ আর একবার সারাতভ্‌-এ। কিন্তু সেখানকার পুলিশরা আমাকে "আপনি" বলত...'

ডান চোখটা কুঁচকে একটু রগ্‌ড়ে নিয়ে ছোট্ট দাঁত বের করে অফিসার বলে:

'আপনি, তা আপনি বলতে পারেন কারখানায় অপরাধমূলক কাগজ-পত্র কোন বদমাইশটা ছড়াচ্ছে?'

একগাল হেসে ওঠে খখল। শরীরটাকে একটু দুলিয়ে জবাব দিতে যাবে, এমন সময় শোনা গেল নিকলাইয়ের বিরক্তিকর গলা:

'বদমাইশ! সে তো এই প্রথম দেখছি এখানে...'

একটা নিথর নিস্তব্ধতা। এক মুহূর্ত সব স্থির নিস্পন্দ।

মায়ের মুখের পুরনো ক্ষতচিহ্নটা যেন সাদা হয়ে ওঠে, ডান ভুরুটা উঁচিয়ে তোলে মা। রীবিনের কালো দাড়ি অদ্ভুতভাবে কাঁপতে থাকে; চোখ নীচু করে দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে থাকে সে।

তারপর অফিসার হুকুম দেয়:

'কুকুরটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

দুজন পুলিশ নিকলাইয়ের হাত ধরে ওকে টেনে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে নিকলাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'দাঁড়াও। টুপি-কোট পরিনি।'

দারোগা ঘরে ঢুকে বলল, 'চারদিক দেখে এসেছি, কোথাও কিছু নেই।'

'থাকবেও না, লোকটা বেশ ঝানু...' মুচকে হেসে বলল অফিসার।

মা ভয়ে ভয়ে অফিসারের হলদেটে মুখের দিকে তাকায়, আর শোনে তার ক্ষীণ কাঁপা ভাঙাভাঙা স্বর। বুঝতে পারে লোকটা একটা দুশমন। ওর মায়া দয়া নেই। সাধারণ মানুষের ওপর ওর রীতিমত আমিরী ঘৃণা। এমন মানুষ বড় একটা দেখেনি ও, এরা যে সংসারে আছে সে কথাই প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ভাবল, "ইনিই তাহলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন!"

'শ্রীল শ্রীযুক্ত আন্দ্রেই ওনিসিমভ নাখদ্কা, জারজ—আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

শান্তভাবে খখল জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

'পরে জানতে পারবেন।' বিনয়ের প্রলেপ-দেওয়া বিদ্বেষের সঙ্গে অফিসার জবাব দেয়। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'লিখতে পড়তে জানো?'

পাভেল জবাব দেয়, 'না।'

তীক্ষ্ন জবাব আসে। 'চোপরাও! যাকে জিজ্ঞাসা করছি সে বলবে। এই, বুড়ী, শুনছ? জবাব দাও।'

ঘৃণায় মায়ের সমস্ত অঙ্গ যেন জ্বলে যেতে লাগল। হঠাৎ ভয়ংকর কাঁপতে আরম্ভ করল, যেন ধাক্কা খেয়ে ঠান্ডা জলে পড়ে গেছে। তারপর হঠাৎ একেবারে খাড়া হয়ে উঠল, ক্ষতচিহ্নটা তামাটে রং ধরল, ভুরুটা যেন নেমে এল চোখের ওপর।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল মা, 'অত চ্যাঁচাচ্ছেন কেন? ওই তো চ্যাংড়া বয়স। মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেছেন কতটুকু?..'

পাভেল ওকে থামাতে চেষ্টা করে, 'শান্ত হও মা, শান্ত হও।'

'থাম্, পাভেল।' বলে উঠে মা ছুটে যেতে চায় টেবিলের কাছে।

চীৎকার করে ওঠে, 'কেন, কেন লোকেদের ধরেন আপনারা?'

'চুপ! তাতে আপনার কী?' ধমকে ওঠে অফিসার। 'ভেসভ্শিচকভকে নিয়ে এস।'

তারপর নাকের কাছে ধরে কী একটা কাগজ পড়তে লাগল।

নিকলাইকে আনা হল। কাগজ পড়া থামিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অফিসার, 'এই, টুপি উতারো।'

রীবিন মায়ের কাছে এসে তার কাঁধে একটু ধাক্কা দিয়ে চুপি চুপি বলে: 'অত উত্তেজিত হয়ো না, মা।'

অফিসারের কাগজ পড়ার শব্দ ডুবিয়ে নিকলাই বলে ওঠে:

'আমার হাত ধরে রেখেছে যে, টুপি খুলব কেমন করে?'

টেবিলের ওপর কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে বলল অফিসার, 'সই কর।'

সকলে সই করে। মায়ের উত্তেজনা কমে গেল, মনের আগুন নিবে যায়, অসহায় অপমানে চোখ জলে ভরে আসে। বিবাহিত জীবনের কুড়িটি বছর ধরে এমনি চোখের জল ফেলে এসেছে সে। কিন্তু শেষ কটা বছর তার তিক্ত স্বাদ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

অফিসার তার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে:

'এখনই সব চোখের জল ফুরিয়ে ফেলবেন না দেবী। এর পরে কী ফেলবেন? কিছুটা বাকি রাখুন।'

আবার রাগে মা জ্বলে ওঠে। বলে:

'মায়ের চোখের জল ফুরোয় না কখনো! আপনার মা থাকলে সে বুঝবে!'

অফিসার তাড়াতাড়ি ঝক্‌ঝকে তালা লাগান নতুন ব্রিফ্-কেসটায় কাগজ-পত্রগুলো তুলে ফেলল। তার পর হুকুম দিল:

'মার্চ!'

বন্ধুদের হাত চাপতে চাপতে পাভেল শান্তভাবে মৃদুস্বরে বলে, 'আন্দ্রেই, নিকলাই, আবার দেখা হবে।'

অফিসার এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে মেরে বলে:

'তা ঠিক, শীগ্গিরই দেখা হবে।'

ভেসভ্শিচকভ্ জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। সমস্ত ঘাড়টা লাল হয়ে উঠেছে ওর। কঠিন ক্রোধে চোখে আগুন জ্বলছে। খখল উজ্জ্বল হাসি হেসে, মাথা নেড়ে মাকে কি জানি বলে চুপি চুপি। মা তার ওপরে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে বলে:

'ভগবান দেখবেন কার ন্যায় কার অন্যায়...'

অবশেষে রেকাবের আওয়াজ তুলে চলে গেল ধূসর উর্দি-পরা লোকগুলো। সবচেয়ে শেষে গেল রীবিন। যাবার সময় পাভেলের দিকে একমনে তাকিয়ে থেকে কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল:

'আচ্ছা... তা... হলে... আ... সি...।'

একটু কেশে ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল রীবিন।

মেঝেময় বই-পত্তর কাপড়-চোপড় ছড়ান। পেছনে হাত মুড়ে ছড়ান জিনিসের ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে পায়চারি করে পাভেল বিমর্ষভাবে। বলে, 'ব্যাপারটা দেখলে তো?'

চারদিক তছ্‌নছ্‌। হতভম্ব হয়ে দেখতে দেখতে মা বিষণ্ণভাবে চুপি চুপি বলে, 'নিকলাই ওকে চটাল কেন? ..'

'ঘাবড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় পাভেল।

হাত নেড়ে আবার বলে মা, 'এল, আর ধরে নিয়ে চলে গেল!'

নিজের ছেলে ধরা পড়েনি, শান্ত হয়ে আসছে মনটা। কিন্তু যে অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটে গেল সেটা মন বুঝতে পারে না।

'টিট্‌কিরি দিল সেই হলদে-মুখোটা... আবার হুম্‌কি কত!..'

হঠাৎ যেন মন স্থির করে নেয় পাভেল। বলে, 'থাকগে, মা-মণি চল সব গুছিয়ে-ফেলা যাক।'

সেই আদরের ডাক। মায়ের দিকে মনটা যখন বড় টানে ঐ ডাকেই ডাকে পাভেল। কাছে এসে মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে:

'বড় অপমান করেছে, নারে?'

'হ্যাঁ। বড় কষ্ট। আমাকে সঙ্গে নিলেই ভালো হত...'

ছেলের চোখে যেন জল। ব্যথাটা খানিকটা অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে মা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু সান্ত্বনার ছলে বলে, 'ভাবনা কীরে? তোকে কি ছাড়বে ভেবেছিস?'

'তা ছাড়বে না জানি।'

মা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর বলল, 'কী নিষ্ঠুর রে তুই! না হয় সান্ত্বনাই দিতিস! আমি যদি ভীষণ কিছু একটা বলি তুই বলিস তার চেয়েও ভীষণ কিছু।'

মা'র দিকে তাকায় পাভেল। কাছে এসে মৃদু স্বরে বলে:

'এ ছাড়া যে আমি পারি না মা। এসব যে তোমায় সইতেই হবে!'

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মায়ের। একটু চুপ করে থাকে। তার পর ভয়ের কাঁপুনি সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে:

'হাঁরে, ওরা মারধর করে? গায়ের মাংস টেনে টেনে ছেঁড়ে? হাড়গোড় ভেঙে দেয়? উঃ, ভাবতে পারি না কী সাংঘাতিক...'

'মানুষের মনকে ভাঙে ওরা। নোংরা হাতে মুচড়ে মুচড়ে ভাঙে। সেটা আরো খারাপ...'

১১

পরের দিন জানা গেল বুকিন, সাময়লভ, সমভ্ এবং আরো পাঁচজন ধরা পড়েছে। ফিওদর মাজিন সেদিন সন্ধ্যে বেলায় এসে হাজির। তার ঘরেও তল্লাসী হয়েছে। ভারি খুশি মাজিন। ভাবছে সে মহা বাহাদুর বনে গেছে।

মা শুধয়:

'ভয় পাস্‌নিরে, ফিওদর?'

মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর। চেহারাটা চোখা হয়ে উঠল। নাকটা কাঁপতে লাগল। বলল:

'বাব্বাঃ! ভয় ছিল অফিসার বুঝি ধরে মারে। কী মোটা অফিসারটা। কালো দাড়ি, আঙুলে ইয়া বড় বড় লোম। চোখে কালো চশমা, যেন চোখই নেই ব্যাটার। গাঁক্ গাঁক্ করে সে যে কী চেল্লায় আর মেঝেতে পা ঠোকে! বলে কিনা সারাজীবন গারদে ভরে রাখবে। মার-টার কি আর খেয়েছি সাতজন্মে! বাড়ীর এক ছেলে, সবে ধন নীলমণি! আদরে আদরে মানুষ।'

ঠোঁট চেপে, একটুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকে। তারপর দু' হাত দিয়ে চুলগুলোকে পেছনের দিকে সরিয়ে লাল চোখ দুটো পাভেলের দিকে তুলে বলে:

'দেখুক না একবার হাত ছুঁইয়ে। রক্ষে রাখব না। এমনি ঝাঁপিয়ে পড়ব চাকুর মতো — কামড়ে দাঁত বসিয়ে দেব। মরণ কামড়!'

মা বলে, 'ওই তো হাড়গিলের মতো চেহারা। উনি আবার লড়বেন!'

'লড়বই তো।' আস্তে আস্তে বলল ফিওদর। তার পর চলে গেল।

পাভেলকে বলে মা, 'ওই ভেঙে পড়বে সবচেয়ে আগে, দেখিস্।'

পাভেল চুপ করে থাকে।

অল্পক্ষণ পরেই আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দরজা খুলে রীবিন ঢোকে। মুচকে হেসে বলে, 'আবার হাজির হলাম, কাল ওরা এনেছিল আমায়, আজ নিজেই এলাম।' বলে সজোরে পাভেলের হাত ঝাঁকানি দিয়ে এসে মায়ের কাঁধে হাত রাখে।

'একটু চা পাব?'

পাভেল নিরীক্ষণ করে দেখে ওর কালো দাড়ি-ছাওয়া চওড়া মুখটা আর কালো চোখ। ওর ওই শান্ত চাহনির মধ্যে খুবই অর্থপূর্ণ কী একটা যেন রয়েছে।

মা সামোভার চড়াবার জন্য রান্নাঘরে যায়। রীবিন এসে বসে টেবিলে কনুইটার ওপর ভর দিয়ে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে কালো চোখে সে তাকিয়ে থাকে পাভেলের দিকে। তার পর যেন একটা পুরানো কথার জের টেনে বলতে শুরু করে:

'তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা কইতে চাই। পাশেই তো আছ; অনেক দিন নজর করেছি। দেখছি মেলাই লোকজন আসে তোমার বাড়ীতে। অথচ মদ খাওয়া নেই, মাতলামি নেই; বুঝতেই তো পারছো — কেউ একটু ভালোভাবে থাকলেই অমনি লোকের চোখে পড়ে। আমি একটু নিজের মতো থাকি বলে তো লোকের চক্ষুশূল হয়েছি।'

কেমন যেন ভারি ভারি কথাগুলো, কিন্তু সহজভাবে বলে যায়। কালো হাতখানা দাড়িতে বুলোতে বুলোতে পাভেলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে।

'লোকে কত কী সব কইতে শুরু করেছে তোমার সম্বন্ধে। আমার বাড়ীওয়ালা বলছে তুমি নাকি নাস্তিক। গির্জেয়-টির্জেয় তো যাও না! অবশ্যি আমিও যাইনে গির্জায়। তারপর ওই কাগজগুলো। তোমারই কর্ম নিশ্চয়ই!'

পাভেল উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ।'

মা আঁতকে ওঠে। রান্নাঘর থেকে মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'তুই তো একা করিস্ না!'

পাভেল মুচকে হাসে, রীবিনও হাসে।

'বেশ-বেশ!' রীবিন বলে।

তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না দেখে একটু চটে যায় মা। সজোরে নিশ্বাস টেনে মুখ কালো করে বেরিয়ে যায়।

'বেশ! খুব ভালো করেছ কাগজ বার করে। লোকগুলোর তবু একটু টনক নড়বে। উনিশখানা, না হে?'

'হ্যাঁ, উনিশটা।' পাভেল উত্তর দেয়।

'তাহলে দেখছ তো, সব কটাই আমি পড়েছি। কতকগুলো জিনিস তেমন পরিষ্কার হয়নি। কতকগুলো অবান্তর। অবশ্য মেলা কিছু বলবার থাকলে

একটু আধটু অমন হবেই। দু চারটা এদিক সেদিকের কথা এসে যায়ই। ঠেকান যায় না।'

রীবিন হাসে একটু। ওর শক্ত সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে।

'তার পরেই, খানাতল্লাসী। তাইতেই আমার মনটা আরো এদিকে ঝুঁকল। তুমি, ওই খখল আর নিকলাই, তোমাদের স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছ...'

কথা খুঁজে পায় না রীবিন। বাইরের দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর টোকা মারে।

'হ্যাঁ, তোমরা নিজেদের মতামত ফাঁস করে দিয়েছ। অর্থাৎ, হুজুর, তোমরা তোমাদের পথ দেখ, আমরা আমাদের। চমৎকার ছেলে ওই খখল। কারখানায় এক এক সময় ওর কথা শুনি আর ভাবি, যমে মারে তো মারবে নইলে কারো বাপের সাধ্যি নেই। লোহার হাড্ডি। তুমি আমায় বিশ্বাস করো, পাভেল?'

'করি!' মাথা নেড়ে পাভেল বলে।

'ভাল। আমার দিকে একবার তাকাও! চল্লিশটি বছর বয়েস হল আমার! তোমার প্রায় দ্বিগুণ। দুনিয়াটাকে তোমার চাইতে অন্তত বিশগুণ বেশি দেখেছি। তিন বছর সেপাইগিরি করেছি। দু দুবার বিয়ে করেছি। পয়লা বৌটা মরেছে, দ্বিতীয়টাকে তালাক দিয়েছি। ককেশাসে গেছি। সেখানে দুখবরেৎস'দের* দেখেছি। তারা জীবনটাকে জয় করবে না। বুঝলে?'

মা আগ্রহভরে লোকটার শক্ত শক্ত কথাগুলো শোনে। মাঝবয়সী একটা লোক তার ছেলের সঙ্গে মন খুলে কথা কইছে দেখে ভালো লাগে মায়ের। কিন্তু মনে হল অতিথির সঙ্গে তার ছেলের ব্যবহারটা বড় রুক্ষ। ছেলের ত্রুটি পুরিয়ে নেবার জন্য মা জিজ্ঞাসা করে:

'খাবার একটু কিছু এনে দিই, মিখাইলো ইভানভিচ?'

'থাক, মা। আমি খেয়ে এসেছি। তাহলে পাভেল, তোমার মতে আমাদের জীবনটা ঠিক পথে চলছে না?'

পাভেল উঠে হাত পেছনে মুড়ে ঘরময় পায়চারি করে। বলে:

'না, ঠিক রাস্তাতেই চলেছে। নইলে আপনি আজ এমন করে মন খুলে কথা কইতে এলেন কী করে? ধীরে ধীরে সব হাতে হাত মেলাবে দেখবেন — এই আমাদের মতো মেহনতী মানুষ, সারা জীবন যারা শুধু খেটেই যায়, তারা সব এক হয়ে যাবে। আমাদের কাছে জীবনটা অন্যায়, কষ্টদায়ক। কিন্তু

* একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। — সম্পাঃ

সেই জীবনই তো আমাদের চোখ খুলে দিচ্ছে! কঠিন সত্য দেখিয়ে দিচ্ছে। কী করে তার গতি ত্বরিত করে তোলা যাবে তার নিশানাও দিচ্ছে।'

'ঠিক বলেছ,' রীবিন বলে ওঠে, 'আগা-পাছতলা বদলানো দরকার আমাদের। কিন্তু গায়ে ময়লা পড়ে খোস পাঁচড়া হলে তা ধোয়াধুয়ি করে, সাফ কাপড় জামা পরিয়ে সারিয়ে নেওয়া যায়। মনের ঘা ঘোচাবে কী করে বলতো? সেই তো ফ্যাসাদ!'

পাভেল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কারখানা আর কারখানার মালিকদের সম্বন্ধে, অন্যদেশের শ্রমিকরা কেমন করে নিজেদের অধিকার নিয়ে লড়াই লড়ছে সে বিষয়ে বলতে বলতে আরো মেতে ওঠে। রীবিন মাঝে মাঝে টেবিল চাপড়ে সায় দেয়। বলে, 'ঠিক, ঠিক!'

একবার একটুখানি হেসে শান্তভাবে বলল:

'এখনও কাঁচা বয়স হে ছোকরা, মানুষ চেন না!'

পাভেল ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, গম্ভীর হয়ে বলে:

'দেখুন, বয়স কম বেশি নিয়ে কথা নয়। ওসব কথা ছাড়ুন। মোদ্দা কথা — কার চিন্তাধারা ঠিক।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও, ভগবান টগবান দিয়েও ওরা আমাদের শুধু ভুলিয়ে রেখেছে! সত্যি, আমিও দেখছি ও সব ধর্ম-টর্ম মিথ্যে।'

এমনি সময় বাধা দেয় মা। ভগবানে বিশ্বাসটুকুকে নিবিড় শ্রদ্ধায়, একান্ত নিষ্ঠায় ভরে রেখেছে সে বুকের মধ্যে। ছেলে যখন উল্টো কথা বলে, নীরব দৃষ্টিখানি তুলে ধরে ছেলের মুখের পানে; নীরব মিনতি ঝরে পড়ে: অমন অভক্তির কথা দিয়ে সে যেন মায়ের হৃদয়ে ব্যথা না দেয়। কিন্তু তার অবিশ্বাসের পেছনে আরেকটা বিশ্বাস লুকিয়ে আছে মনে হয়, মা তাতেই সান্ত্বনা পায়। নিজের মনে ভাবে, "ওর মনের কথা আমি কেমন করে বুঝব?"

প্রথমটায় মনে হয়েছিল ছেলের কথা আধবয়েসী লোকটার ভালো লাগছে না; সেও বুঝি চটেছে। কিন্তু লোকটার সরাসরি প্রশ্ন আর সইতে পারে না মা। বাধা দিয়ে দৃঢ় গলায় বলে:

'দেখ, ও কথাগুলো একটু রয়ে-সয়ে বলো তোমরা।' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তারপর আরো জোর করে বলে চলে, 'তোমাদের মনে যা খুশি থাক। কিন্তু আমার কথা ভেবো একবার। আমি বুড়ো মানুষ। আমার দুঃখের মধ্যে ঐটুকুই তো ভরসা। ভগবানকে তোমরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে কোথায় দাঁড়াব আমি, বলতো?'

মা'র চোখে জল উথলে ওঠে। বাসন ধুতে ধুতে আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপে।

'মা, তুমি আমাদের কথা বুঝতে পারোনি,' সস্নেহে শান্তকণ্ঠে পাভেল বলে।

রীবিন তার মন্থর গভীর স্বরে বলে, 'কিছু মনে করো না, মা।' একটু হেসে পাভেলের দিকে চায়। 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার এ বুড়ো বয়সে ঐ বাতিকটুকু বাদ দেওয়া চলে না...'

পাভেল আবার বলে, 'মা, তোমার দয়ালু ভগবানের কথা বলিনি আমি। বলেছি আমাদের ধর্মের পান্ডা পুরুতরা যে রাক্ষুসে ভগবানকে খাড়া করেছে তার কথা। সে তো ভগবান নয়, জুজু। ওই জুজুর ভয় দেখিয়েই তো ওরা জন-কয় মানুষ আমাদের এতগুলোকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়...'

রীবিন টেবিল চাপড়ে চীৎকার করে ওঠে, 'হক কথা! ভগবানকেও বদলে দিয়েছে! হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে আমাদের মারে। মনে রেখো মা, ভগবান তো মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন নিজের মূর্তির আদলে, তাই না? তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই: মানুষ যখন ভগবানের মতো, তিনিও তাহলে মানুষের মতো। কিন্তু সে মিল আর কোথায়? বুনো জানোয়ারের সঙ্গেই তো দেখছি আমাদের আদল বেশি। গির্জাগুলোর বেদীতে আমাদের ভয় দেখানর জন্য কাক-তাড়ুয়া রেখে দিয়েছে! সুতরাং ওই ভগবানকে আমাদের পাল্টে নিতে হবে। ঘসে মেজে সাফ করে নিতে হবে। তাঁকে মিথ্যের পোষাক পরিয়ে রেখেছে ও ব্যাটারা। আমাদের আত্মাকে হত্যা করার জন্য তাঁকেও তারা অমন বিকৃত করে ছেড়েছে।'

কথাগুলো অত্যন্ত ধীরে নরম করেই বলছিল রীবিন। কিন্তু এক একটা কথা শেলের মতো বাজল মায়ের বুকে। ওই কালো দাড়ির ফ্রেমে আঁটা মস্ত বড় গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যায় মা। চোখে কী অদ্ভুত কালো অসহ্য দীপ্তি। ব্যথার মতো কী যেন একটা ভয় বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বলে, 'না না, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা যা খুশি বলো। এসব কথা শুনবার মতো শক্তি আমার নেই।'

মা তাড়াতাড়ি চলে গেল রান্নাঘরে। রীবিন বলে পাভেলকে:

'বুঝলে, পাভেল, ওসব মগজের কম্ম নয় খালি। কলজে চাই, কলজে।

মানুষের আত্মাটার মধ্যে কলজের একটা খাস তালুক আছে। সেখানে ওই একটি জিনিস ছাড়া আর কিছু গজায় না...'

পাভেল দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'মানুষের যুক্তিই তাকে মুক্তি দেবে।'

'না হে না,' রীবিন বলে উচ্চকণ্ঠে, জোর দিয়ে, 'যুক্তি তাকৎ জোগায় না। তাকৎ আসে কলজে থেকে, মগজ থেকে নয়।'

কাপড় ছেড়ে শুতে যায় মা। সেদিন আর প্রার্থনা করা হল না। কেমন বিশ্রী একটা অনুভূতি ওকে হিম করে তুলেছে। প্রথমে রীবিনকে মনে হয়েছিল বেশ লোক, ঘটে বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। কিন্তু এখন ওর কথা মনে হলেই মনটা বিষিয়ে উঠছে। তার গলা শুনতে শুনতে ভাবল:

'নাস্তিক! বিদ্রোহী! এখানে এল কেন?'

ধীর শান্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে চলে রীবিন:

'পবিত্র স্থান কখনো শূন্য থাকে না। ভগবানের যেখানে আসন সে জায়গাটা ক্ষতবিক্ষত। মানুষের হৃদয়ে ওটা ভারি ব্যথার জায়গা। ভগবানকে যদি বিলকুল বার করে দাও, তবে দগ্‌দগে ঘা হয়ে থাকবে ওখানটায়। কাজেই নতুন ধর্ম একটা বার করে নিতে হবে হে, পাভেল... ভগবানকে নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে, সে ভগবান হবেন মানুষের বন্ধু।'

পাভেল বলে ওঠে, 'কেন আপনাদের তো যীশুই ছিলেন!'

'যীশুর আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা ছিল না! এদিকে বললেন, আমার এই বাটিটাও চলে যাক — ওদিকে সীজারকে মেনে নিলেন। মানুষের উপর মানুষের ক্ষমতা তো ভগবান মানতে পারেন না। তিনি নিজেই সর্বশক্তিমান। কাজেই এটা মানুষের আর এটা ভগবানের — তাঁর আত্মার এমন-ধারা ভাগাভাগি করবেন কী করে তিনি... কিন্তু যীশু খৃষ্ট ব্যবসা, বিয়ে সবই স্বীকার করেছেন। ওদিকে ফল হয় না বলে ডুমুর গাছটাকে শাপ-মান্যি করলেন। আরে ফল হয় না, সে কি আর গাছটার দোষ? তেমনি মনও যদি ভালো না হয়, সে দোষ তার নয়। আমিই তো আর আমার মনের মধ্যে মন্দের বীজ পুঁতে রাখতে যাইনি!'

ঘরে দুটি স্বরের অবিরত আওয়াজ। এই লড়াই করছে, পরের মুহূর্তেই আবার যেন মিলে যাচ্ছে কোনো উত্তেজিত খেলায়। পাভেল অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে। কাঠের মেঝেটা মচ্‌মচ্‌ করে ওঠে। ও যখন কথা বলে চারদিকের আর কোন কিছুর আওয়াজ শোনা যায় না। কিন্তু যেই শান্ত

গভীর স্বর রীবিনের — পেণ্ডুলামটার ক্ষীণ টিক্ টিক্, বাইরে পাঁচিলের গায়ে তুষারের মিহি চিড়বিড়ানিটুকু অবধি শুনতে পায় মা।

'দেখ,' রীবিন বলে, 'আমি আগুন-খোঁচানোর কাজ করি। আমি বলি: ভগবান হচ্ছেন জ্বলন্ত আগুন। এই কলজেটার মধ্যেই তাঁর আস্তানা। বলে না — শব্দ-ব্রহ্ম? আবার শব্দই আমাদের আত্মা...'

'না — আমাদের বিচারবুদ্ধি!' জোর দিয়ে বলে পাভেল।

'বেশ তো, ভায়া, তাই না হয় হল। তাহলে ভগবান বুকেও আছেন, বিচার-বুদ্ধিতেও আছেন। কিন্তু গির্জায় নেই। গির্জা তো তাঁর মন্দির নয় — কবর...'

মা ঘুমিয়ে পড়ে। রীবিন কখন যে গেল টের পায় না।

এর পর থেকে প্রায়ই আসে ও। পাভেলের বন্ধু বান্ধবরা কেউ থাকলে এক কোণে চুপ করে বসে থাকে। মাঝে মাঝে কথার পিঠে বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ!'

একদিন কোণে বসে বসে সকলের দিকে কালো দৃষ্টিতে চেয়ে গোমড়া মুখে বলল:

'দেখ, এখনকার অবস্থাটা নিয়েই কথা বল। পরে কী হবে না হবে তা আমরা জানি না। গোলামীর শেকল যখন মানুষ ভাঙবে তখন নিজেদের ভালো মন্দ নিজেরাই ঠিক করে নেবে। ওদের মগজগুলোতেও অনেক কিছু ঢোকান হল, যে-সব কিছু ওরা চায় না তাও। ব্যস, তারপর ওরা নিজেরাই ভেবে দেখুক। হয়ত পুরনো দিনের সব কিছুই ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইবে — মায় নিজেদের বিদ্যে-সাধ্যি — নিজেদের সব কিছু। হয়ত দেখবে সবকিছুকে ওদের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছে, গির্জের দেবতাটিকেও। মানুষগুলোর হাতে পুঁথি-পত্তর তুলে দাও; দেখবে নিজেরাই সব হদিস-ফিকির করে নেবে। বুঝলে? এই হল আসল কথা।'

পাভেল আর রীবিন একা থাকলে তক্ষুণি লাগে অন্তহীন তর্ক, তবে মেজাজ বিগড়য় না। মা ব্যগ্র হয়ে প্রত্যেকটি কথা শোনে। বুঝতে চায় এ তর্কের মর্ম কী। মাঝে মাঝে মনে হয় — এই চওড়া-কাঁধ, কালো-দাড়িওয়ালা লোকটা আর নিজের ওই দীর্ঘ-দেহ সুগঠিত জোয়ান ছেলে — দুজনেই যেন অন্ধ হয়ে গেছে। এদিক যায়, ওদিক যায়, বলিষ্ঠ কিন্তু অন্ধ হাতে সবকিছু ধরে নাড়া দেয়, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠেলে দেয়, জিনিসপত্র পড়ে যায় ঝন্ ঝন্ করে, পায়ের তলায় পিষে যায়; তবু পায়

না পথ। এটা ছ‍ুঁড়ে ফেলে, ওটা ছ‍ুঁড়ে ফেলে, ঠিক জিনিসটি কিছ‍ুতেই মেলে না। কিন্তু ওদের নিষ্ঠা বল, আশা বল, কিছ‍ুরই কমতি নেই...

মা এখন এ সব কথা শ‍ুনতে শিখেছে। কথাগ‍ুলো যতই সাংঘাতিক হোক, যতই বে-আব্র‍ু হোক, মনের মধ্যে গিয়ে আগের মতো আর ধাক্কা দেয় না। শ‍ুনতেও শিখেছে, ঝেড়ে ফেলতেও শিখেছে। ওরা যখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, মা'র মাঝে মাঝে মনে হয় তার মধ্যেও কী একটা গভীর বিশ্বাস আছে। স্নিগ্ধ শান্ত ক্ষমার হাসি হাসে মা। রীবিনকে ভালো লাগে না, কিন্তু আগের মতো রাগও হয় না তার উপর।

প্রতি সপ্তাহে খখলের জন্য বই আর জামা-কাপড় নিয়ে জেলে যায় মা। এক দিন সাক্ষাতের অন‍ুমতিও পাওয়া গেল। ফিরে এসে সস্নেহে বলল:

'ঠিক সেই রকমই আছে। সকলের সঙ্গে বেশ খাতির, খ‍ুব ঠাট্টা মস্‌করা করছে সবাই ওর সঙ্গে। খ‍ুব কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু সে কি আর ম‍ুখ ফুটে বলবে!'

'ঠিকই করছে।' রীবিন বলে, 'দ‍ুঃখটা তো আমাদের চামড়ার মতো। রোজ্‌কার জল-ভাতের মতো দ‍ুঃখ‍ু ধান্দা, এ নিয়ে গ‍ুমর করার কী আছে? সক্কলকার চোখেই তো আর ঠুলি পরান নেই। কেউ কেউ ইচ্ছে করে চোখ বন্ধ করে থাকে। লোকে যদি বেকুব হয়, তাহলে সহ্য করাই তার কপালে থাকে...'

১২

ভ্লাসভদের ধ‍ূসর রঙের ছোট্ট বাড়ীটার ওপর ক্রমশ বেশি করে বস্তির সকলের নজর পড়ছে। তাতে একদিকে যেমন প্রচুর সন্দিগ্ধ সাবধানতা আর অস্পষ্ট শত্র‍ুতা, তেমনি অন্যদিকে একটা সরলবিশ্বাসী কৌত‍ূহলও আছে। এক এক সময় হঠাৎ কেউ আসে, চুপি চুপি চার দিকে চেয়ে শ‍ুধয় পাভেলকে:

'দেখ ভাই, তুমি তো মেলাই বই পড়েছ; আইন-কান‍ুন জানো। আমায় একটু বলে দেবে?..'

প‍ুলিশী জ‍ুল‍ুম অথবা মালিকের অন্যায় ব্যবহারের খবর নিয়ে এসেছে হয়তো সে। গোলমেলে ব্যাপার হলে এক পরিচিত উকিলের কাছে একটা চিরকুট দিয়ে পাঠিয়ে দেয় পাভেল। কিন্তু যখন পারে নিজেই একটা সমাধান করে দেয়।

নেহাত অল্প বয়স হলেও গম্ভীর প্রকৃতির এই ছেলেটির উপর ক্রমশই লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে। সব কিছ‍ুতে সোজাস‍ুজি কথা বলে, চাল নেই, ভয়

ডর নেই; যা ধরবে তাই করে ছাড়বে। চোখ কান সব খোলা — একমনে সব শোনে। যে-কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি হলে খুঁজে বের করবেই মানুষে মানুষে সম্পর্কের অন্তহীন দৃঢ় যোগসূত্রটি।

একটা ব্যাপারে পাভেলের খুব মর্যাদা বেড়ে গেল।

কারখানার চার দিকটা ঘিরে পচাপানায় ভরা একটা জলা ছিল। জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল জলাটা। গ্রীষ্মকালে হলদে রঙের গ্যাস উঠত আর মশার ডিপো হয়ে থাকত। গোটা বস্তিতে ঘরে ঘরে জ্বর লেগে থাকত ওই কারণে। জলাটা কারখানারই সম্পত্তি। সেবার এক নতুন ডিরেক্টর এলেন। তিনি দেখলেন ওটার জল-নিকাশের বন্দোবস্ত হলে বেশ দু'পয়সা মুনাফা হয়, সেই সঙ্গে পিট নিষ্কাশন করাও সম্ভব। সুতরাং বস্তি-উন্নয়নের জিগির তুলে জল-নিকাশের খরচ বাবদ শ্রমিকদের মজুরির রুব্‌ল পিছু এক-কোপেক কাটার হুকুম দিয়ে ফরমান জারী করলেন।

শ্রমিকরা ক্ষেপে গেল। বিশেষ করে আরো ক্ষেপল ট্যাক্সটা দিতে হবে শুধু শ্রমিকদেরই, কর্মচারীদের মাপ।

নোটিশটা বেরল শনিবার। পাভেল সেদিন কারখানায় আসেনি, শরীর ভালো ছিল না। সুতরাং কিছুই জানতে পারেনি ও। পরের দিন গির্জায় প্রাতঃকালীন উপাসনার পর ওর কাছে এল কারখানার ঢালাই-খানার পুরনো কর্মী বুড়ো সিজভ — সৌম্য চেহারা; আর এল সেই লম্বা মেজাজী মেকানিক মাখোতিন। তাদের কাছেই শুনল ও ব্যাপারটা।

ধীরে সুস্থে সশ্রদ্ধ ভাবে বলল সিজভ, 'আমরা বয়স্করা বৈঠক করে ব্যাপারটার আলোচনা করেছি। তুমি সব জান-শোন, তাই তোমার কাছে আমাদের পাঠান হয়েছে জানবার জন্য যে ডিরেক্টর আমাদের পয়সা দিয়ে মশা মারতে পারবেন এমন কোন আইন আছে কিনা।'

মাখোতিন তার কুঁতকুতে চোখ লাল করে বলল, 'চার বছর আগে শালারা টাকা নিয়েছে গোসলখানা করবে বলে। তিন হাজার আট শ' রুব্‌ল উঠেছিল। সে শালার গোসলখানার টিকিটিও চোখে দেখলুম না আজ অবধি।'

ব্যাপারটা যে অন্যায় বুঝিয়ে দিল পাভেল। তা ছাড়া ওই ব্যাপারটায় মস্ত মুনাফা লুটবে কারখানার মালিকেরা। মুখ হাঁড়ি করে চলে গেল দু'জনে। মা ওদের এগিয়ে দিয়ে এসে হেসে বলল:

'তুই দেখি বুড়োদেরও বুদ্ধি যোগাস্‌!'

পাভেল জবাব দিল না। টেবিলে গিয়ে ভুরু কুঁচকে খস্ খস্ করে কী একটা লিখে মাকে ডেকে বলল:

'একটা কাজ করবে মা? এই চিঠিটা শহরে নিয়ে যাবে এক জায়গায়...'

'বিপদ টিপদ আছে?'

'আছে বৈকি! সেখানে আমাদের কাগজ ছাপা হয়। এই কোপেক নিয়ে আমাদের এ-ব্যাপারটা এবারকার কাগজে বের করতে হবে।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি আমি...'

এই প্রথম কাজের ভার পাওয়া ছেলের কাছ থেকে। কিছু গোপন না রেখে ব্যাপারটা বুঝিয়েও দিয়েছে, তাইতে মা মহা খুশি।

তৈরী হতে হতে বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি, এইভাবেই শুষছে ওরা। হ্যাঁ, কী নাম বললি? ইয়েগর ইভানভিচ্, না?'

মায়ের ফিরতে রাত হল। অত্যন্ত ক্লান্ত হলেও বেশ খুশি।

'সাশাকে দেখলাম ওখানে। তোকে নমস্কার জানিয়েছে। ইয়েগর ইভানভিচ্ ভারি সাদাসিধে মানুষ। খুব ফুর্তিবাজ। বেশ মজা করে কথা বলে।'

পাভেল আস্তে আস্তে বলে, 'তোমার তাহলে ভালো লেগেছে ওদের, বেশ ভালো।'

'কি সাদাসিধে রে ওরা। মানুষ সাদাসিধে হলে খুবই ভাল। তোকে ওরা সকলেই খুব মানে দেখছি...'

সোমবারও পাভেল কাজে যেতে পারল না। মাথা ধরেছে। দুপুরে খাবার ছুটির সময় ফিওদর ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত। ভীষণ উত্তেজিত। হাঁপাচ্ছে। কিন্তু খুব খুশি।

'শীগ্গির চল,' ও চেঁচিয়ে বলল, 'সারা কারখানায় কী কাণ্ড! তোমাকে ডাকছে। সিজভ ও মাখোতিন বলল তুমিই সব চেয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারবে। শীগ্গির এসো, দেখবে।'

পাভেল চুপচাপ জামা কাপড় পরতে শুরু করে দিল।

'মেয়েরাও সব এসে জোর চেঁচাচ্ছে।'

মা বলল, 'দাঁড়াও, আমিও আসছি। কী, ব্যাপার কী?'

পাভেল বলল, 'চলো মা।'

এক রকম দৌড়েই চলল ওরা। কারো মুখে কথা নেই। উত্তেজনায় মায়ের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে খুব বড় একটা কিছু ঘটবে।

কারখানার গেটে একদল স্ত্রীলোক রেগে চীৎকার করছে। ইয়ার্ডে ঢুকে ওরা তিনজন গিয়ে পড়ল একটা উত্তেজনামুখর ঘন জটলার মধ্যে। মা দেখল কামারশালার লাল ইটের দেয়ালের দিকে পিঠ করে একটা পুরনো লোহালক্কড়ের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সিজভ, মাখোতিন, ভিয়ালভ আর আরো জন পাঁচ-ছয় মাঝবয়সী শ্রমিক। এদের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে শ্রমিক মহলে। সকলেরই মুখ এদিকে।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে ভ্লাসভ আসছে।'

'ভ্লাসভ! এদিকে, এদিকে চলে এসো হে...'

চারদিক থেকে চীৎকার ওঠে, 'এই চুপ চুপ। গোল করো না।'

কাছেই কোথা থেকে রীবিনের মসৃণ স্বর শোনা যায়:

'এ আমাদের হকের লড়াই, ভাইসব। কানাকড়ির জন্য লড়তে আসিনি। পয়সাটার জন্য হেদিয়ে মরছি না আমরা — আমাদের পয়সাটা তো অন্য পয়সার চাইতে বেশি গোল নয়। তবে হ্যাঁ, ওজনে ভারি বটে। বড় সাহেবের রুবলের চাইতে আমাদের একটি কোপেকের ওজন বেশি—রক্ত বেশি আছে তাতে। কোপেকের জন্য ভাবছি না, ভাবছি রক্ত, ন্যায়ের কথা। বুঝলে কিনা!'

ভিড়ের মধ্যে যেন ধপ করে পড়ে শব্দগুলো, উত্তেজিত কোলাহল ওঠে:

'হক কথা কইছ, দোস্ত! হক্ কথা।'

'বাঃ খাসা। জবর বলা বলেছ।'

'এই যে ভ্লাসভ এসেছে। ভ্লাসভ!'

সকলের কণ্ঠ এক হয়ে মিশে শব্দের ঘূর্ণি ঝড় ওঠে। তলিয়ে যায় মেশিনের ঘর্‌ঘর্‌, বাষ্পের ভস্‌ভসানি, তারের ঝন্‌ঝনানি। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসে হাত নেড়ে, আগুন-ছড়ানো তীক্ষ্ণ ভাষায় পরস্পরকে উত্তেজিত করে। শ্রান্ত মানুষগুলোর পাঁজরার তলায় গোপনে যে অসন্তোষ গুমরে আছে আজ সেটা নাড়া খেয়ে যেন আগুন হয়ে উঠেছে; জয়ের উল্লাসে হাজার শিখা তুলে নাচতে নাচতে আকাশ পানে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে কালো ডানা; দুর্নিবার এক শক্তির টানে মানুষকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে ছিনিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে বিদ্বেষ রূপান্তরের জ্বলন্ত অগ্নি-শিখায়, আছড়ে ফেলছে পরস্পরের গায়ে। জটলার ঠিক মাথায় উঠেছে ধুলো আর ঝুলকালির মেঘ, ঘর্মাক্ত মুখগুলো জ্বলে উঠছে, গাল ভিজে গেছে চোখের কালো জলে, কালো কালো মুখের মধ্যে ঝলকে উঠছে চোখ আর দাঁতগুলো।

পাভেল সিজভ্ আর মাখোতিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'কমরেডগণ!' ডাক দিল ও।

মায়ের চোখে পড়ল, পাভেলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে; ঠোঁট কাঁপছে। অজানতেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে মা। বিরক্ত চীৎকার ওঠে, 'কেন ঠেলছো অমন করে?'

মা ধাক্কা দেয়, ধাক্কা খায়। কিন্তু থামলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে, দাঁড়াতে হবে ছেলের পাশে। কনুই দিয়ে, কাঁধ দিয়ে ঠেলে সামনে এগিয়ে আসে মা।

বুক ভরে পাভেল ডাকে, 'কমরেডগণ!' এক উদ্দাম আনন্দ যেন ঢেউ দিয়ে উঠছে ভেতর থেকে। কথাটার গভীর অর্থ আছে তার কাছে। ওর গলা বন্ধ হয়ে আসে। ইচ্ছে হয় ন্যায়ের স্বপ্নে উদ্দীপ্ত ওর হৃৎপিন্ডটাকে উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এইসব লোকেদের সামনে। আবার হাঁকে, 'কমরেডগণ!' এই ডাকে বুকে শক্তি আসে। আনন্দের জোয়ার জাগে।

'আমাদেরই দৌলতে দুনিয়া বেঁচে আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরাই সবার রুটি জোগাই। আমরাই গির্জা গড়ি, কারখানা বানাই; শেকল তৈরী করি; টাকাও বানাই আমরাই...'

'ঠিক বলেছ,' চীৎকার করে ওঠে রীবিন।

'খাটবার বেলায় আমরা প্রথম, কিন্তু জীবনে আমাদের স্থান সবচেয়ে পেছনে। কে ভাবে আমাদের কথা? আমাদের ভালো কে চায়? কেউ কি আমাদের মানুষ বলে মনে করে? না, কেউ না, কেউ না!'

প্রতিধ্বনির মতো কে একজন বলে উঠল, 'কেউ না!'

বলতে বলতে পাভেল ক্রমশ নিজেকে সামলে নেয়, তার স্বর সহজ শান্ত হয়ে আসে। ভিড় ওর দিকে এগিয়ে আসে। সহস্র-শীর্ষ এক দেহ। সহস্র ব্যগ্র-চোখের নিবিষ্ট দৃষ্টি বক্তার মুখের ওপর তুলে ধরে তার প্রতিটি কথা যেন নিঃশেষে পান করছে জনতা।

'যতদিন না আমরা মনে প্রাণে জানব যে আমরা সবাই ভাই, এক পরিবারের মানুষ, একজোট হয়ে দাবির লড়াইয়ে হাত মেলাবার শপথ নিচ্ছি, ততদিন আমাদের ভাগ্য ফিরবে না।'

একটা কর্কশ গলায় চীৎকার ওঠে, 'আসল কথায় এসো!' মায়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল লোকটা।

দুদিক থেকে দুটি প্রতিবাদের ধমক শোনা যায়:

'ফোড়ন কেটো না বলছি।'

কেউ কেউ কপাল কোঁচকায়, বিষণ্ণ চোখে তাদের অবিশ্বাস। চিন্তান্বিতভাবে অনেকে আবার পাভেলের মুখ দেখে সন্ধানী দৃষ্টিতে।

কেউ-বা বলে, 'লোকটা সমাজতন্ত্রী। কিন্তু ভারি সেয়ানা হে!'

একচোখো একটা ঢ্যাঙ্গা লোক বলে, 'না হে, বেশ বলছে। খাঁটি কথা বলছে।'

'কমরেড্‌গণ! এটা বোঝার সময় হয়েছে যে, আমাদের কেউ সাহায্য করবে না। আমাদের সহায় আমরা নিজেরা। শত্রুকে দাবাতে যদি চাই তবে আমাদের এক শপথ নিতে হবে — সকলের তরে সকলে আমরা, সকলে আমরা একের তরে।'

মাখোতিন শূন্যে বদ্ধ-মুষ্টি আস্ফালন করে বলে:

'হক কথা বলেছে পাভেল!'

পাভেল বলে চলে, 'কোথায় ডিরেক্টর সাহেব? তাঁকে ডাকা দরকার।'

জনতার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা বয়ে গেল। দুলে উঠল জনসমুদ্র। বহু কণ্ঠ একসঙ্গে হাঁকল:

'ডাকো ডিরেক্টরকে, ডাকো।'

'একটা প্রতিনিধিদল পাঠান হোক তাঁর কাছে।'

মা ঠেলেঠুলে আরও সামনে আসে। নীচ থেকে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে গর্বে বুক ভরে ওঠে। পাভেল দাঁড়িয়ে আছে বুড়োদের মধ্যে, সবাই যাদের মান্য করে। তারা সবাই শুনছে তার কথা, তাকে সমর্থন করছে সকলে। অন্যদের মতো পাভেলের মাথা গরম হয়নি, ভাষায় এতটুকু খারাপ কিছু নেই, দেখে মায়ের ভালো লাগে।

গালিগালাজ, ক্রুদ্ধ চীৎকার চারধার থেকে চোখা চোখা হয়ে ছোটে, যেন টিনের চালে শিলা বৃষ্টি হচ্ছে। পাভেল তার বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে যেন জনতার মধ্যে কী খোঁজে।

'প্রতিনিধি পাঠান হোক, প্রতিনিধি!'

'সিজভ্‌!'

'ভ্লাসভ্‌!'

'রীবিন, রীবিন! দাঁতের পাটি শক্ত আছে হে রীবিন-এর।'

হঠাৎ চীৎকার থেমে একটা চাপা আওয়াজ ওঠে:

'নিজেই আসছে, নিজেই আসছে...'

'ডিরেক্টর সাহেব!..'

লম্বাটে মুখ, সূক্ষ্মাগ্র দাড়ি, দীর্ঘকায় একজন কাকে পথ করে দেয় ভিড়ের মানুষ—সে শুধু একটা হাত লোক সরানোর ভঙ্গিতে একটু নেড়ে নেড়ে চলছে, কারো গায়ে হাত ঠেকছে না। চোখ কুঁচকে দুনিয়া-দেখা-প্রভুর পাকা দৃষ্টি দিয়ে মানুষগুলোর মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে সে চলেছে। লোকে টুপি খুলে ফেলে, মাথাগুলো নুয়ে যায়। লোকটি প্রতি-নমস্কার না করে এগিয়ে আসে। ওরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোবা হয়ে যায়, অপ্রস্তুতের মতো বোকাটে হাসি হাসে, আর হাতে নাতে ধরা-পড়ে-যাওয়া দুষ্টু ছেলের মতো 'আর করবো না' গোছের মুখ করে চেয়ে থাকে।

মায়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লোকটার কঠিন দৃষ্টি মায়ের মুখের উপর দিয়ে পিছলে গিয়ে পড়ে সেই লোহালক্কড়ের স্তূপটার সামনে। কে যেন একখানা হাত বাড়িয়ে দিল উঠতে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু সেদিকে তাকালও না সে, জোর একটা স্বচ্ছন্দ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পাভেল আর সিজভ'এর সামনে।

'ব্যাপারটা কী? এ কিসের মিটিং হচ্ছে? কাজ বন্ধ রেখেছ কেন সব?'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য সব নিঝুম। হাজার মাথা নড়ছে, ক্ষেত-ভরা গমের শীষের মতো। সিজভ্ টুপি খুলে, একটু কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা নীচু করল।

'জবাব দাও!' ডিরেক্টর চীৎকার করে ওঠে।

পাভেল সামনে এসে দাঁড়ায়। সিজভ আর রীবিনের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার কাছে আমাদের দাবি পেশ করবার জন্য সহকর্মীরা আমাদের তিনজনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। আমাদের দাবি, পয়সা-কাটার যে হুকুম জারী করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা হোক।'

পাভেলের দিকে না তাকিয়ে ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

পাভেল জোর গলায় বলে, 'কারণ আমরা মনে করি ওটা অন্যায় ট্যাক্স।'

'আপনি কি মনে করেন জলার জল-নিকাশের প্রস্তাবটা আমাদেরই স্বার্থে, মজুরদের লুটবার জন্য, ওদের ভালোর জন্য নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' পাভেল জবাব দেয়।

রীবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে ডিরেক্টর, 'আপনারও ওই মত?'

'আমাদের সকলেরই এক মত।'

সিজভের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি মশায়?'

'আমারও ঐ মত। আমাদের পয়সাটা না-হয় নাই কেড়ে নিলেন।' সিজভের মাথাটা যেন আরও ঝুঁকে যায়, মুখে একটা অপরাধের হাসি।

ধীরে ধীরে সমস্ত জনতাকে একবার দেখে নিয়ে ডিরেক্টর কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়, পাভেলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে:

'আপনাকে তো বুদ্ধিজীবী গোছের লোক মনে হয়। আপনিও বুঝতে পারছেন না জলাটা পরিষ্কার হলে কত উপকার হবে?'

সকলে শুনতে পায় এমনি গলায় পাভেল বলে, 'কারখানার খরচায় হলে সবাই বুঝবে।'

শুক্‌নো জবাব আসে, 'কারখানা তো দান-ছত্র খুলে বসেনি! আমার হুকুম, এই মুহূর্তে সকলে কাজে ফিরে যাও।'

কোনো মুখের দিকে না চেয়ে সাবধানে লোহালক্কড়ের খোঁচা বাঁচিয়ে নামতে যায় ডিরেক্টর।

ভিড়ের মধ্যে অসন্তোষ গুনগুনিয়ে ওঠে।

ডিরেক্টর থেমে পড়ে হাঁকে, 'এর মানে?'

স্তব্ধতা ভেঙে একটা একক কণ্ঠ শোনা যায়:

'নিজেই কাজ করোগে যাও!'

শুকনো ধারাল গলায় ডিরেক্টর বলে, 'পনের মিনিটের মধ্যে যদি সবাই কাজে হাত না দিয়েছ, প্রত্যেকের জরিমানা হবে, আমার হুকুম।'

আগের মতোই পথ করে চলে যায় ডিরেক্টর ভিড়ের মধ্য দিয়ে। এবার কিন্তু পেছন পেছন একটা চাপা গর্জন শোনা যায় আর ডিরেক্টর যতই দূরে যায় চীৎকার ততই উঁচুতে ওঠে।

'আর যাবে কথা বলতে ওর সঙ্গে?'

'হলো তো, খুব হয়েছে! হায়রে কপাল!'

পাভেলের দিকে ফিরে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে:

'এবার কী করতে হবে বল তো উকিল মশাই।'

'খুব বলেছ হে পাভেল। কিন্তু ডিরেক্টর তোমার সব কথা মন থেকে মুছে ফেলে দেয় যে!'

চারদিক থেকে প্রশ্ন — এবার তারা কী করবে।

চীৎকার জোরালো হয়ে ওঠে। জবাব দেয় পাভেল, 'আমার প্রস্তাব, যতক্ষণ না আমাদের দাবি আদায় হয়, আমরা কাজ বন্ধ রাখব।'

চারদিক থেকে উত্তেজিত টীকা-টিপ্পনী ওঠে:

'বোকা পেয়েছ আমাদের?'

'তার মানে, ধর্মঘট বলতে চাও?'

'একটা কোপেকের জন্য?'

'কেন, ধর্মঘট নয় কেন?'

'আমাদের সবাইকে জবাব দিয়ে দেবে..'

'তাহলে কাজ করবে কে শুনি?'

'জোগাড় করে নেবে!'

'যুডাসের দল?'

১৩

পাভেল নেমে এসে মায়ের পাশে দাঁড়ায়।

জনতা উত্তেজিত, ওদের উত্তেজিত কথা-কাটাকাটি চেঁচামেচি শোনা যায়।

রীবিন পাভেলের কাছে সরে আসে। বলে, 'স্ট্রাইক হবে না। যত সব হাড় হাভাতের দল। বড়ো জোর শ' তিনেক তোমার পক্ষে যদি আসে তা হলেই বেশি। এত আবর্জনা এক কোদালে উঠবে না...'

পাভেল নীরব। সহস্র-শির জনতা ওর চোখের সামনে দুলছে; ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে, কী যেন দাবি ওই দৃষ্টিতে। একটা অস্থিরতায় ওর বুকটা আন্দোলিত হয়। এত যে কথা, এত বোঝান, সব কি হাওয়ায় উড়ে গেল, চিহ্নও নেই কোথাও। বহুদিনের তৃষার্ত মাটির ওপর ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টির মতোই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বড় ক্লান্ত, মন মরা হয়ে বাড়ীর দিকে ফেরে পাভেল। মা আর সিজভ পেছনে। রীবিন পাশে, কানের কাছে বক্ বক্ করতে করতে চলেছে:

'বক্তৃতাটা বেশ দিলে, কিন্তু ঠিক ওদের মনের মধ্যে ঢোকেনি। একেবারে ওদের কলজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। খালি যুক্তি-তর্ক দিয়ে ওদের বোঝান যাবে না। একেবারে ভেতর তাক্ করে ছুঁড়ে দিতে হবে আগুন। ইয়া বড়ো পা, এই পাতলা মিহি জুতোয় আঁটবে কেন?'

সিজভ বলে মাকে, 'তা আমাদের বুড়োদের মরার সময় এসেছে। এখন সব নতুন কালের নতুন ধাঁচের মানুষ। আমরা কী ভাবে বেঁচেছি? হামাগুড়ি দিয়েছি, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সেলাম করেছি! আর আজকাল! এখনকার ছোঁড়াদের মগজ খুলেছে—হয়তো আরও বেশি ভুল করছে তারা, কিন্তু মোট কথা, আমাদের মতো নয় ওরা। ডিরেক্টরের মুখের উপর সমানে সমানে

জবাব দিয়ে এল... যাক্। বাবা পাভেল, তা হলে পরে দেখা হবে'খন। যে ভাবে সবার হয়ে লড়ছ, খুব ভালো। ভগবান তোমার সহায় হবেন। হয়ত পথ খুঁজে পাবে!'

চলে গেল সিজভ।

রীবিন গজ্ গজ করে, 'যাও, মরোগে যাও। উঃ এরা আবার মানুষ! মানুষ নয়, পুটিং! পুটিং! ছেঁদা বোজাবার পুটিং। ডেলিগেট ডেলিগেট করে কারা চেঁচিয়েছিল জান পাভেল? ওরাই রটিয়ে বেড়িয়েছিল তুমি সমাজতন্ত্রী, আর যত গোলমাল বাধাচ্ছ তুমি। ভেবেছে চাকরি যাবে ছোঁড়াটার, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।'

পাভেল জবাব দেয়, 'ওদের দিক থেকে ওরা ঠিকই করেছে!'

'তা বইকি! নেকড়ে যখন নেকড়ের মাংস ছিঁড়ে খায়, ঠিক করে বইকি...' রীবিনের মুখ কালো হয়ে ওঠে, স্বরটা কেমন অদ্ভুত কাঁপা কাঁপা।

'শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না হে! কষ্ট সইতে হবে, রক্ত দিয়ে কথা ভেজাতে হবে তবে...'

সারাদিন ছন্ন-ছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ায় পাভেল: ক্লান্তিতে যেন দেহটা চলে না; মনটা কেমন ভারি হয়ে আছে, ওর জ্বালা-ধরা চোখ দুটো চারদিকে কি যেন খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। মা লক্ষ্য করে।

'কী হয়েছে রে পাশা?' সাবধানে জিজ্ঞাসা করে।

'মাথা ধরেছে একটু।' কী একটা ভাবতে ভাবতে পাভেল জবাব দেয়।

'একটু শোগে যা। আমি ডাক্তারকে খবর দিই...'

'না, মা, দরকার নেই।' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সে। তারপর মৃদু গলায় বলে, 'আমার বয়েস কম, জোরও নেই তেমন। সেই হয়েছে মুশকিল! ওরা আমায় বিশ্বাস করেনি, আমার সত্যি কথাটিকে ঘিরে দাঁড়াল না, মানে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারিনি। আমার এত বিশ্রী লাগছে! নিজের ওপর নিজেরই রাগ হচ্ছে।'

ওর নিভে-যাওয়া মুখখানার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে মা। চুপি চুপি বলে:

'একটু সবুর কর! আজ বোঝেনি, কাল বুঝবে...'

উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে পাভেল, 'বুঝতেই হবে ওদের!'

'হ্যাঁ, আমি পর্যন্ত তোর সত্য দেখতে পেয়েছি।'

পাভেল মায়ের কাছে এসে বলে:

'তুমি কী ভালো, মা...' বলেই চলে যায়।

চমকে ওঠে মা। ছেলের শান্ত কথাগুলো যেন হঠাৎ আগুনের ছোঁয়া লাগিয়ে দিল গায়ে। হাতটা বুকের ওপর ধরে সে চলে গেল, যেন সযত্নে বহন করে নিয়ে চলেছে ছেলের আদর।

সেই রাত্তিরে আবার পুলিস এল। মা ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাভেল শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। ঘরে বাইরে ওপরে নীচে সারা বাড়ীটা ওরা তীব্র আক্রোশের সঙ্গে তছ্‌নছ্‌ করে ফেলল। সেদিনকার সেই হলদে-মুখো অফিসার—ঠিক সেদিনের মতোই ঠাট্টা, টিট্‌কিরি, অপমান আর আঁতে-ঘা দিয়ে কথা, তেমনি নিষ্ঠুর উল্লাস। মা এক কোণে চুপ করে বসে। চোখ থাকে ছেলের দিকে। নিজের উত্তেজনা চেপে রাখতে চেষ্টা করে পাভেল। কিন্তু অফিসারটা যখন গায়ে হুল ফুটোচ্ছে হাতখানা তার নিস্‌পিস্‌ করে। মা বোঝে কী কষ্টে ছেলে জবাব না দিয়ে চুপ করে আছে, পুলিসের ওই ঠাট্টা মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে। প্রথম দিনকার মতো আজ আর ততো ভয় করেনি মা'র। আজ এই ধূসর উর্দি-পরা নিশাচরগুলোর ওপর ঘৃণাই হয় বেশি। এই ঘৃণাই তার ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে।

পাভেল এক ফাঁকে মায়ের কানে কানে বলে, 'আমায় নিয়ে যাবে...'

'জানি...' মাথা নীচু করে স্তিমিত স্বরে বলে মা।

বুঝতে বাকি ছিল না মায়ের, আজকে মজুরদের কাছে পাভেল যা বলেছে তাতে তার হাজতবাস হবে। কিন্তু সবাই তো ওর কথায় সায় দিয়েছিল। তারা সবাই নিশ্চয় লড়বে পাভেলের জন্য। তাহলে আর বেশি দিন ওকে আটকে থাকতে হবে না...

ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদার ইচ্ছে হয় মায়ের। কিন্তু অফিসারটা সামনে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। ওর ঠোঁট আর গোঁফের বাঁকা ভঙ্গিতে বেশ বোঝা যাচ্ছে লোকটা চায় মা কাঁদুক; ওর হাত পা ধরে কাকুতি মিনতি করুক। শক্ত হয়ে বুক বেঁধে দাঁড়ায় মা। হাত ধরে ছেলের। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, তবু অতি ধীরে, অতি নরম সুরে বলে:

'আচ্ছা, আয় তবে। দরকারী জিনিস নিয়েছিস তো সব?'

'সব নিয়েছি। মন-টন খারাপ করো না কিন্তু তুমি...'

'ঠাকুর তোর সহায় হোন...'

পাভেলকে নিয়ে চলে গেল। একটা আর্ত চাপা কান্নায় ঐখানেই বেঞ্চির ওপর ভেঙে পড়ে মা। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। অমনি করেই বসত ওর

স্বামী। গভীর ব্যথা আর অসহায়তায় মনটা যেন নিঃসাড় হয়ে গেছে। মাথাটা এলিয়ে আসে দেয়ালে। ধীরে ধীরে টানা অস্ফুট স্বরে অনেকক্ষণ ধরে সে কাঁদল। আহত হৃদয়ের সবখানি ব্যথা যেন গলে গলে বেরিয়ে এল কান্না হয়ে। আর চোখের সামনে অসাড় একটা দাগের মতো দাঁড়িয়ে রইল পুলিশ-কর্তার পিঙ্গল মুখখানা, তার বিরল-কেশ গোঁফ আর উল্লসিত বাঁকা চোখ। মায়ের বুকের মধ্যে জমে ওঠে গভীর কালো ঘৃণার মেঘ। যারা সন্তানকে কেড়ে নেয় মায়ের কাছ থেকে, তাদের প্রতি ঘৃণা। ছেলের অপরাধ কী? সে শুধু ন্যায়বিচার চেয়েছিল।

বড় ঠাণ্ডা। শার্সিতে বৃষ্টির শব্দ। মায়ের মনে হয়, ধূসর পোশাক-পরা কারা যেন সব রেকাবে একটু শব্দ তুলে পাহারাওলার মতো বাড়ীর চারদিকে ঘুরছে। বিরাট লম্বা ওদের হাত, লাল চওড়া মুখের মধ্যে চোখের চিহ্ন নেই কোথাও।

কেবলি বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠে: 'আমাকেও কেন নিয়ে গেল না?'

কারখানার বাঁশী বাজে, কাজের ডাক আসে। আজ যেন ওই শব্দটার মধ্যে জোর নেই। আওয়াজ নীচু, চাপা। দরজা ঠেলে ঢোকে রীবিন। মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। দাড়ির জল মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করে মাকে:

'নিয়ে গেছে ওকে?'

'নিয়ে গেছে সর্বনেশেরা।' নিশ্বাস ফেলে বলল মা।

একটু হেসে রীবিন বলে, 'ওতো জানাই ছিল। আমার বাড়ীতেও তল্লাসী হয়েছে কাল। পাঁতি পাঁতি করে সব দেখেছে। অনেক গালাগালও করেছে— তবে ক্ষতি করেনি কিছু। তাহলে নিয়ে গেল পাভেলকে! ডিরেক্টর চোখ টিপল, পুলিশ মাথা নাড়ল, আর একটা লোক গারদে চলে গেল! জোট মিলেছে ভালো — একজন জনতাকে দুইছে, আর অন্যরা শিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে...'

মা উঠে দাঁড়ায়। উত্তেজিত হয়ে বলে, 'তোমাদের ওর হয়ে লড়া উচিত। ও তো সকলের জন্যই জেলে গেল।'

'কে লড়বে?'

'কেন, সবাই?'

'হুঁ। তাই বুঝি ভাবছ? সে গুড়ে বালি!'

হেসে বেরিয়ে যায় রীবিন মন্থর পায়ে। ওর নিষ্ঠুর কথা শুনে মা যেন আরও মুষড়ে পড়ে।

"ওকে যদি ওরা মারে — খুব যদি অত্যাচার করে..."

কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে ছেলের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহটা... ভয়ে যেন হিমের স্রোত বয় বুকটার মধ্যে। চোখ জ্বালা করে।

সেদিন না জ্বলল উনুন, সারাটা দিন না করল রান্নাবাড়া। এক ফোঁটা চাও পড়ল না মুখে। রাত্রে এক টুকরো রুটি চিবিয়ে শুয়ে পড়ল। এত খালি এত একলা তো কোনো দিন লাগেনি। বিশেষ করে এদিকের এই কটা বছর কেটেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর সুন্দর কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় থেকে। কত ছেলে-মেয়েতে বাড়ীখানা ভরে থেকেছে, তাদের কথা, কাজ, প্রাণচাঞ্চল্য ঘিরে ছিল ওকে। আর সর্বদা সবার আগে ছিল ছেলের সেই গম্ভীর মুখ। সেই গড়ে তুলেছিল এই জীবন—উৎকণ্ঠায় ভরা তবু কী ভালোই না লাগত। আজ সে নেই তাই সব ফাঁকা।

১৪

সারাটা দিন আর নিদ্রাহীন রাত যেন কাটতেই চায় না। পরের দিনটাও যেন পায়ে পাথর বেঁধে চলল। মা আশা করে ছিল, কেউ না কেউ আসবেই, কিন্তু কেউ এল না। সন্ধে হয়, তার পর রাত্রিও। বাইরে বৃষ্টির দীর্ঘশ্বাস; দেয়ালের গায়ে তার রিমঝিম কান্না। চিমনির ভেতর শোঁ শোঁ করছে বাতাস। মেঝের তলা দিয়ে কী একটা যেন সুড়সুড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ছাদ থেকে। ঘড়িটার টিক্‌টিকের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশে যাচ্ছে বৃষ্টির বিষণ্ন টিপ্‌টিপ্‌। সারা বাড়ীটা যেন দুলছে আস্তে আস্তে। পরিবেশটা মনে হয় অপ্রয়োজনীয়, একটা নিথর মৃত্যু-পুরী...

কে যেন মৃদু ঘা দিল জানালায়। একবার, দুবার... এ তো হামেশাই চলত। ভয় পায়নি কোন দিন। কিন্তু আজ চমকে উঠল মা। একটা খুশি যেন চমকে উঠল বুকের মধ্যে। কিসের যেন একটা প্রত্যাশায় উঠে দাঁড়ায় মা। তাড়াতাড়ি একটা শাল জড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে দেয়...

সাময়লভ্‌। তার পেছন পেছন কে আর একজন। কোটের ওল্টানো-কলার আর কপাল-ঢাকা টুপিতে প্রায় পুরো মুখটা ঢাকা।

'ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি?' সরাসরি জিজ্ঞাসা করে সাময়লভ্‌, নমস্কার না সেরেই। ওর স্বরটা উদ্বিগ্ন, মুখখানা দীপ্তিহীন। এ-রকমটা ওকে বড় একটা দেখা যায় না।

'না, ঘুমইনি।' জবাব দেয় মা, তারপর অপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সাময়লভের সাথীটি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে। টুপি খুলে বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা আঙ্গুলের হাতখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বহুদিনকার পরিচিতের মতো সহজভাবে বলে:

'আরে, মা যে আমায় চিনতেই পারলেন না!'

হঠাৎ কেন জানি খুশি হয়ে ওঠে মা। বলে, 'আরে আপনি, ইয়েগর ইভানভিচ্?'

'হ্যাঁ, মা, আমি।' গির্জার স্তোত্রপাঠকদের মতো লম্বা লম্বা চুলওয়ালা মস্ত বড় মাথাটা মায়ের সামনে ঝুঁকিয়ে সে বলে। ভারি মুখখানা হাসি-হাসি, ক্ষুদে ক্ষুদে ধূসর চোখদুটি কোমল দৃষ্টিতে মায়ের দিকে নিবদ্ধ। গোলগাল বেঁটে মোটা লোকটি দেখতে ঠিক সামোভারের মতো। মোটা গর্দান, খাটো হাত। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সাঁই সাঁই করে নিশ্বাস ফেলছে আর বুকের মধ্যে উঠছে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ।

মা বলে, 'একটু ও-ঘরে যান, আমি কাপড়টা পরে নিই।'

ভুরুর নিচ দিয়ে তাকিয়ে সাময়লভ উদ্বিগ্নভাবে বলে, 'মা, আপনার সঙ্গে আমাদের একটা কাজ আছে!'

ইয়েগর ইভানভিচ পাশের ঘরে গিয়ে সেখান থেকেই কথা বলতে লাগল:

'নিকলাই ইভানভিচ্‌কে জানেন তো? সে আজ জেল থেকে বেরিয়েছে...'

মা বলে ওঠে, 'সেও জেলে ছিল?'

'দু' মাস এগার দিন। সেখানে পাভেল, খখলের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। ওরা দুজন আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে। আর পাভেল আপনাকে ভাবনা করতে বারণ করেছে। আর বলেছে যে এ-পথ তারা বেছে নিয়েছে বলে, মাঝে মাঝেই এমনি ছুটি মিলবে গারদের লোহার শিকের পেছনে। আমাদের মালিকেরা পাকা বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। যাক, এবারে কাজের কথায় আসি। কাল কত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে জানেন?'

'সে কি? আমি তো ভেবেছি পাভেল একাই।'

'ওর আগেই ধরা পড়েছে আটচল্লিশ জন।' শান্তভাবে ইয়েগর ইভানভিচ বলে, 'আরও অনেককেই ফাঁসাবে মালিকেরা। এ শর্মাও রক্ষা পাবে না...'

একটু বিমর্ষভাবে সাময়লভ বলে, 'আমায়ও ছাড়বে না।'

মায়ের বুকটা যেন একটু হালকা হয়ে সহজভাবে নিশ্বাস পড়ে। পাভেল তাহলে একা নয়!

কাপড় পরে মা ফিরে আসে প্রসন্ন হাসি হেসে। বলে, 'এত লোককে যখন ধরেছে, তখন বেশিদিন আর আটকে রাখবে না...'

'হ্যাঁ তা ঠিক,' ইয়েগর ইভানভিচ বলে, 'তবে যদি আমরা কোনো মতে ওদের এই কারসাজিটা নষ্ট করতে পারি, তবে সব বেটা বোকা বনে যাবে। আসল কথা, এখন যদি কারখানায় কাগজ যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তবে সেই দুঃখের ব্যাপারটা পুলিশেরা খুশী হয়ে দাঁড় করাবে পাভেল এবং আর যে কজন মহৎ কমরেড আটক আছে, তাদের বিরুদ্ধে...'

মা ভয়ে প্রায় চীৎকার করে ওঠে, 'সে কী? কী বলছেন?'

'এতো অতি সহজ কথা, মা!' ইয়েগর ইভানভিচ নরমভাবে বলে, 'মাঝে মাঝে পুলিশের লোকও কার্যকারণ সম্পর্কটুকু ধরতে পারে। আচ্ছা, দেখুন— পাভেল বাইরে ছিল, কাগজও ছিল। ও নেই, কাগজও নেই। তার মানে কাগজটা ওরই কাণ্ড। পুলিশের একটা স্বভাব হচ্ছে এই, এমনভাবে গ্রাস করতে শুরু করবে যে একটু-আধটু ছাড়া আর কিছুই বাদ পড়বে না।'

'বুঝলাম সব, কিন্তু হে ভগবান, উপায় কী!' কাতরভাবে বলে মা।

রান্নাঘর থেকে সাময়লভের গলা শোনা যায়, 'শালারা কাউকে কি আর বাকি রেখেছে? সব্বাইকে ধরেছে... কিন্তু কাজ যে করে হোক চালু রাখতেই হবে। নইলে জেলে যারা আছে তাদেরও বাঁচানো যাবে না, আর আমাদের কাজও পণ্ড হয়ে যাবে।'

ইয়েগর ইভানভিচ মুচকে হেসে বলে, 'কাজ চালাবার লোক নেই। জিনিস তো মেলাই। চমৎকার কাগজ বই সবই আছে। নিজের হাতে তৈরি করেছি। কিন্তু কারখানায় নিয়ে যাবে কে?'

'সকলকে গেটে তল্লাসী করে তবে কারখানায় ঢুকতে দিচ্ছে।' সাময়লভ বলে।

মায়ের মনে হয়, ওরা যেন কিছু আশা নিয়েই ওর কাছে এসেছে। সাময়লভের কথা শেষ না হতেই বলে মা, 'তাহলে?'

সাময়লভকে দরজার কাছে দেখা যায়। বলে:

'সেই যে খাবার ফিরি করত,—করসুনভা, তার সঙ্গে জানা আছে আপনার মা?..'

'আছে বৈকি!? তাকে দিয়ে কী হবে?'

'তাকে একটু বাজিয়ে দেখুন না, যদি সে পারে?'

মা হাত নেড়ে আপত্তি জানায়:

'ওর দ্বারা হবে না। বড্ড বকুনতুড়ে। শেষে যদি বেরিয়ে যায় যে কাগজ-পত্র এখান থেকে যাচ্ছে! না না, ওকে ছেড়ে দাও।'

হঠাৎ যেন প্রেরণা আসে মায়ের, চুপি চুপি বলে ওঠে:

'আমায় দেবেন, আমায়। ঠিক নিয়ে যাব। মারিয়াকে বলব আমায়ও ওর সঙ্গে কাজে নিতে। নিজের পেট তো চালাতে হবে! কাজ করতে হবে। ওর সঙ্গে আমিও খাবার নিয়ে যাব কারখানায় বেচতে। আমি ঠিক করে নেব, দেখবেন আপনারা।'

বুকের ওপর হাত চেপে ধরে গড়গড় করে অনেকগুলো কথা বলে যায়। ভরসা দিয়ে বলে যে সে সবকিছু করবে, ভালোভাবে লুকিয়ে করবে, শেষ কালে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে, 'দেখুক ওরা, জেল থেকেও হাত চলে আমার পাভেলের। দেখুক, ভালো করে দেখুক!'

তিন জনেরই মুখ আলো হয়ে উঠল। ইয়েগর হাতে হাত ঘষতে ঘষতে হেসে বলে:

'চমৎকার, চমৎকার মা! কী ভালোই যে হবে আপনি জানেন না। সত্যি মস্ত একটা কাজ হবে।'

সাময়লভও হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'যদি এটা করা যায় তাহলে জেলে গিয়েও মনে হবে গদি-আঁটা কেদারায় বসতে যাচ্ছি।'

ইয়েগর তার কর্কশ গলায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে:

'সত্যি মা, আপনার জুড়ি নেই!'

মা মৃদু হাসে। এখন সে ভালোভাবেই বুঝতে পারে কাগজবিলি যদি চালু থাকে কারখানায় তবে পুলিশের সন্দেহ পাভেলের ওপরে পড়বে না। কোথা থেকে মনের মধ্যে জোর আসে—হবেই হবে, সে পারবেই এ কাজ করতে। আনন্দে মা শিউরে ওঠে।

ইয়েগর বলে, 'পাভেলের সঙ্গে জেলে যখন দেখা হবে বলবেন, তার মা খুব ভালো।'

হাসতে হাসতে সাময়লভ বলে, 'আমারই সব চাইতে আগে দেখা হবে তার সঙ্গে।'

'ওকে বলবেন কাজ পড়ে থাকবে না, যা কিছু করা দরকার আমি নিশ্চয়ই করব। ও যেন তা জানে,' মা বলে।

ইয়েগর শুধয়, 'সাময়লভকে যদি না ধরে?'

'তবে আর কী করব!' মা বলে।

দুজনেই হেসে ওঠে। মা বুঝতে পেরে অপ্রস্তুত হয়ে নিজেও আস্তে আস্তে কৌতুকের হাসি হেসে উঠে পড়ে ওদের সঙ্গে। চোখ নামিয়ে বলে, 'নিজের দুঃখের সময় অন্যের দুঃখের কথাটা মনে থাকে না।'

ইয়েগর সান্ত্বনা দেয়, 'তাই হয় মা। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যেন পাভেলের কথা ভেবে মনটন খারাপ করবেন না। দেখবেন ও বাইরে যা ছিল তার চেয়েও ভালো হয়ে আসবে জেল থেকে। আমাদের মতো মানুষের বাইরে থাকলে বিশ্রামই বা কোথায়। পড়াশোনার সময় নেই। জেলে যেতে পারলে দেহটা বিশ্রাম পায়, পড়াশোনারও প্রচুর সময় হয়। তিনবার আমার শ্রীঘর দর্শন হয়ে গেছে মা। প্রত্যেকবার মন অনেক কিছু লাভ করেছে যদিও জেলে থাকাটা সুখের নয়।'

'আপনার তো বড় নিশ্বাসের কষ্ট দেখছি!' ইয়েগরের সরল মুখখানার দিকে তাকিয়ে মা বলে।

একটা আঙুল তুলে জবাব দেয় ইয়েগর, 'তার একটা কারণ আছে। আচ্ছা তাহলে সব কথা ঠিক, কেমন? কাল জিনিস-পত্র সব পাবেন। আবার চাকা ঘুরবে মা; কত কাল থেকে তাল তাল সব আঁধার জমেছে। সব গুঁড়িয়ে যাবে ওই চাকার তলায়। আমাদের মুক্ত বাণী জিন্দাবাদ, মায়ের প্রাণ জিন্দাবাদ! আচ্ছা আসি তাহলে, কাল দেখা হবে।'

মায়ের সঙ্গে করমর্দন করে সাময়লভ বলে, 'আসি মা। বাবাঃ, আমার মায়ের কাছে এ-ধরনের কথা তো উচ্চারণই করতে পারতাম না।'

মা উৎসাহ দিয়ে বলে, 'ভাবনা নেই, বাবা। একদিন সবাই বুঝবে।'

ওরা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে মা। ঘরের মাঝখানে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। ভাষাহীন সে আরাধনা রূপ নিল আজ কতগুলো মানুষের জন্য একান্ত উৎকণ্ঠায়, যাদের পাভেল টেনে নিয়ে এসেছে তার জীবনের মধ্যে। সরল, সাধারণ মানুষগুলি, একা একা কিন্তু কী অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ, মা আর তার আইকনের মাঝখানের সমস্ত অবকাশ ওরা ভরে দিয়েছে।

ভোর বেলা উঠে মা মারিয়া করসুনভার কাছে গেল।

স্বভাবসুলভ সোরগোল তুলে অভ্যর্থনা করে তেলচিটে জামা পরা মারিয়া।

সহানুভূতির সঙ্গে শুধয় মোটা হাতটা দিয়ে মায়ের পিঠ চাপড়ে, 'খারাপ লাগছে, তাই না? মনটন খারাপ করো না। ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ব্যাটারা? নিক না! এতে লজ্জার কী আছে? এতদিন চোর ডাকাত ধরেছে। এখন মুখ-পোড়ারা হক্কের পাওনা চাইছে বলে লোকদের গারদে পুরছে। হয়ত পাভেল কিছু একটা ঠিক মতো বলতে পারেনি। কিন্তু ও সকলের পক্ষ নিয়ে বলেছে, মনে মনে সবাই একথা জানে। কাজেই ভাবনা করো না তুমি। কবুল করুক আর না করুক সবাই জানে দোষটা কার। এই তোমার কাছে আসব আসব করে, সময় কি আর পাই? কাঁড়ি কাঁড়ি রান্না মাথায় নিয়ে ঘোরা। কিন্তু তাও তুমি দেখে নিও, আমায় ভিক্ষে মেগে মরতে হবে। কড়ির মুখ কি দেখতে পাই আমার নাগরদের জ্বালায়! যেখানেই যাই না কেন, রেহাই নেই—ছোঁ মারবার জন্য ঠিক ওঁৎ পেতে আছে। গোটা দশেক রুবল কোন মতে যদি জমল কোত্থেকে কোন বেজন্মা এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। আমায় ওরা ছিঁড়ে খাবে হাড়-মাস অবধি। বাবাঃ, মেয়ে-মানুষ হয়ে কেউ যেন না জন্মায়। একলা থাকা বড় ঝকমারি কিন্তু নাগর জুটিয়েছ কি মরেছ!'

মারিয়াকে মাঝপথে থামিয়ে ভ্লাসভা বলে, 'আমায় তোমার সঙ্গে নাও না। তোমায় সাহায্যের জন্য এসেছি।'

মারিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কী বলছ? বুঝতে পারছি না।' মা খুলে বললে মাথা নাড়ে মারিয়া। বলে:

'এ আবার বলতে হয়! আমার ভাতারের কাছ থেকে কি বাঁচন আমায় বাঁচিয়েছিলে। কত করে লুকিয়ে রেখেছিলে আমায়। আমি এখন তোমায় অভাব থেকে বাঁচাব না? সকলেরই তোমায় দেখা উচিত। সবার ভালো করতে গিয়েই তো তোমার ছেলেকে জেলে যেতে হল। বড় ভালো ছেলেটা তোমার, সব্বাই বলে। সব্বাই কত দুঃখ করে ওর জন্য। এই যে সব ধরপাকড় করছে, কর্তাদের এতে ভালো হবে ভেবেছ? দেখই না কারখানায় কী হয়। খুব খারাপ ব্যাপার। কর্তারা ভাবছেন, ঠ্যাঙে দড়ি কষলেই বুঝি লোকে দূরে যেতে পারবে না। আসলে ওরা দশজনকে মারে আর একশো জনকে খেপিয়ে তোলে।'

এইসব কথাবার্তার ফলে পরের দিন দুপুর বেলা মারিয়ার খাবারের বিরাট দুটো পাত্র নিয়ে কারখানায় এল ভ্লাসভা। আর মারিয়া গেল বাজারে সওদা নিয়ে।

কারখানায় ঢুকতেই এই নতুন পসারিনী শ্রমিকদের চোখে পড়ে যায়। কয়েক জন কাছে এসে উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, 'কাজে নেমেছো? তা বেশ।'

কেউ কেউ সান্ত্বনা দিয়ে বলে পাভেলকে শীগগির ছেড়ে দেবে, কেউ দুটো দরদের কথা বলে তার কাতর হৃদয়কে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কেউ বা চুটিয়ে গাল দেয় ডিরেক্টর আর পুলিশকে। মায়ের নিজের মনেও তার প্রতিধ্বনি জাগে। কারো বা চোখে নিষ্ঠুর উল্লাস। সময়-রক্ষক ইসাই গরবভ দাঁত চেপে বলে:

'আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তোর ছেলেকে ফাঁসি কাঠে লটকাতাম। বের করে দিতাম মানুষ ক্ষ্যাপানো!'

এই ভয়ংকর শাসানি শুনে ভয়ে মা'র হাড়ের ভেতরে পর্যন্ত শিরশির করে ওঠে। কোনও জবাব না দিয়ে শুধু লোকটার ছোট্ট মেচেতা-ধরা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে নেয়।

কারখানার শান্তি ভেঙে গেছে। এখানে সেখানে জটলা পাকিয়ে শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কয়। ফোরম্যান অস্থির হয়ে ওঠে। টিকটিকির মতো ওদের পেছন পেছন ফেরে। পেছন থেকে ছোটে গালিগালাজ আর বিদ্রূপের হাসি।

মায়ের পাশ দিয়ে সাময়লভকে ধরে নিয়ে গেল দুজন পুলিশ। তার একটা হাত পকেটে আর একটা হাত লালচুলগুলো ঠিক করছে। পেছন পেছন প্রায় শ'খানেক শ্রমিক, পুলিশদের টিট্‌কারি আর গাল দিতে দিতে চলেছে।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'কি হে গ্রিশা, ছুটিতে চললে বুঝি?'

আর একজন বলল, 'ভারি মান দিচ্ছে আমাদের আজকাল। দু-পা বেরোলেই সেপাই-সান্ত্রী আগে পাছে চলে।' বলে কুৎসিত ভাষায় গাল দিয়ে উঠল।

এক-চোখো ঢ্যাঙা একজন শ্রমিক রেগে বলল, 'চোর ডাকাত ধরে পেট পোষাচ্ছে না ওদের, মনে হচ্ছে। তাই ভাল-মানুষের ব্যাটাদের ধরতে লেগেছে...'

'রাতের অন্ধকারে ধরপাকড় করলেই তো হয়। কিন্তু এখন দেখছি, বেজন্মার দল দিন দুপুরেই ধরপাকড় চালিয়েছে,' আর একজন কে বলে।

পুলিশেরা ভুরু কুঁচকে থাকে, চেষ্টা করে কোন কিছু না দেখার, ভান করে যেন এই সব গালাগালি কানে ঢুকছে না। তাড়াতাড়ি চলে। তিন জন শ্রমিক মস্ত বড় একটা ধাতুর পাত এনে ধরে বলল:

'হুঁশিয়ার, পাকড়ানেওয়ালা!'

মায়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাময়লভ্ নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে যায়। মুচকে হেসে বলে, 'টান দিয়েছে, মা।'

নীরবে মাথা নোয়াল মা। জোয়ান সত্যনিষ্ঠ ছেলেগুলো কেমন হাসতে হাসতে জেলে যাচ্ছে। মনের ভেতরটা নাড়া খায়। মাতৃসুলভ দরদে আর স্নেহে ওর বুক ভরে যায়।

কারখানা থেকে ফিরে সারা দিন মারিয়ার ওখানে কাটল তার কাজের সাহায্য করে আর তার বক্‌বকানি শুনে। বাড়ী ফিরতে রাত গড়িয়ে গেল। হিমশীতল, নিরানন্দ শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে। অনেকক্ষণ ধরে এঘর ওঘর করে মা; অশান্ত মন, কী যে করবে ভেবে পায় না। রাত বাড়ে। কই ইয়েগর ইভানভিচ তো এল না এখনও কাগজপত্র নিয়ে। ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে মা।

বাইরে সাদা সাদা চাপ চাপ বরফ পড়ে; জানলার শার্সিতে লেগে থাকে আলতো হয়ে। গলে নিঃশব্দে বেয়ে বেয়ে পড়ে, পেছনে থাকে শুধু একটা ভিজে দাগ। মনে পড়ে যায় ছেলের কথা...

একটা সতর্ক টোকা পড়ে দরজায়। মা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। সাশা। বহুদিন মেয়েটার দেখা পাওয়া যায়নি। মায়ের প্রথমেই নজরে পড়ল অস্বাভাবিক মোটা হয়ে গেছে সাশা।

'নমস্কার সাশা! বহুদিন দেখিনি। ছিলেন না বুঝি এখানে?' বড় খুশি মা। অন্তত খানিকক্ষণ তো একা থাকতে হবে না।

মৃদু হেসে সাশা বলে, 'না। জেলে ছিলাম। নিকলাই ইভানভিচকে মনে আছে? আমরা একসঙ্গেই ছিলাম।'

'মনে আছে বৈকি!' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মা, 'ইয়েগর ইভানভিচ্ বলছিলেন বটে যে নিকলাই ইভানভিচ জেলে আছেন। কিন্তু আপনার কথা তো জানতাম না... কেউ তো বলেনি!..'

'তাতে আর কী হয়েছে?.. ইয়েগর ইভানভিচ আসবার আগে আমায় জামা কাপড় বদলে নিতে হবে।' চারদিকে তাকিয়ে সাশা বলে।

'একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি...'

'কাগজপত্র নিয়ে এসেছি...'

চঞ্চল হয়ে ওঠে মা, 'কোথায়? দিন শীগ্‌গির!'

সাশা কোটের বোতাম খুলে গা ঝাড়া দেয়। খসখস শব্দ তুলে ঝরা পাতার মতো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে কাগজ। মা হাসে আর কুড়োয়।

'তাই বলুন! আর আমি ভাবছিলাম অত মোটা হলেন কেমন করে। হয়তো বিয়ে থাওয়া করেছেন, ছেলেপুলে হবে। সর্বনাশ, কত কাগজ এনেছেন! আর এই বোঝা নিয়ে এতটা পথ হেঁটে এলেন?'

'হ্যাঁ হেঁটেই এসেছি।' বলে সেই দীঘল শরীর সাশা। মুখটা রোগা রোগা দেখাচ্ছে। ডাগর চোখ দুটো আরো ডাগর দেখাচ্ছে রোগা মুখটায়। চোখের কোলে কালি পড়েছে।

'এই জেল থেকে বেরিয়ে এলেন, একটু বিশ্রাম দরকার নিশ্চয়ই অথচ আপনি...' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলে মা।

শিউরে ওঠে সাশা। বলে:

'কী করব, উপায় নেই। পাভেল মিখাইলভিচের কথা বলুন, মা। গ্রেপ্তার হবার সময় খুব বিচলিত হয়েছিলেন কি?' মাথা নীচু করে জিজ্ঞাসা করে সাশা, মায়ের দিকে তাকাতে পারে না। কম্পিত আঙুল দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে।

মা জবাব দেয়, 'কিছু নয়। সে তো নিজেকে কিছুতেই প্রকাশ করবে না।'

'শরীর ভালো আছে তো?' কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করে সাশা।

'জন্ম অবধি তো অসুখ-বিসুখ করেনি কখনও। তা বড্ড কাঁপছেন যে মা! দাঁড়ান, আপনাকে চা করে দিচ্ছি, আর একটু রাস্‌প্‌বেরীর মোরব্বা।'

'বাঃ চমৎকার। কিন্তু এত রাত্তিরে বড্ড কষ্ট হবে যে আপনার। দিন আমিই করে নিচ্ছি।'

মা সামোভারটায় আগুন দিতে দিতে একটু তিরস্কারের সুরে বলে, 'হ্যাঁ, পরিশ্রমটা আপনার বড্ড কম হয়েছে কিনা?' সাশা রান্নাঘরে এসে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে একখানা হাত মাথার পিছনে দিয়ে।

'তবুও জেলে গেলে মানুষ একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। সারা দিন সেই

অভিশপ্ত কর্মহীনতা। অথচ বাইরে কত কাজ... খাঁচায় পোরা জন্তুর মতো বসে থাক...'

'কিন্তু শুনুন, এত যে কষ্ট তার পুরস্কার কে দেবে আপনাদের।' মা শুধয়। তার পর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজেই জবাব দেয়:

'কেউ দেবে না, এক ভগবান ছাড়া। কিন্তু আপনি তো আবার ভগবানেও বিশ্বাস করেন না।'

মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় সাশা, 'না।'

আবেগে ভরে মা বলে ওঠে, 'বিশ্বাস করি না আপনার ও-কথা।' তারপর হাতের ছাই-কালি তাড়াতাড়ি এপ্রনে মুছে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে চলে:

'আপনাদের বিশ্বাসকে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন না। ভগবানে বিশ্বাস যদি নাই থাকে, তবে এ পথে এলেন কেমন করে?'

কার যেন নিচু গলা আর পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায় বারান্দায়। মা ত্রস্ত হয়ে ওঠে; সাশাও লাফিয়ে ওঠে।

'দাঁড়ান, দরজা খুলবেন না,' ফিসফিস করে বলে সাশা, 'কে জানে কে। যদি পুলিশ হয়, তাহলে মনে থাকে যেন আপনি আমায় চেনেন না... অন্ধকারে ভুল করে এখানে এসে পড়েছি। দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। আপনি আমায় তুলে এনেছেন। ভিজে কাপড়-চোপড় ছাড়াবার সময় এই কাগজগুলো বেরিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলেন তো?'

'ওরে আমার মেয়ে! আমি অমন কথা বলতে যাব কেন?' মনটা মায়ের গভীরভাবে দুলে ওঠে।

সাশা কান পেতে থাকে। বলে:

'দাঁড়ান দাঁড়ান... বোধহয় ইয়েগর...'

সে-ই বটে। শ্রান্ত ক্লান্ত, ভিজে কাকটি হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল সে।

'আরে সামোভার একেবারে তৈরী যে। দুনিয়ায় এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছু নেই। আরে সাশা! আপনি এসে গেছেন!'

মস্ত বড় ভারি কোটটা খুলতে খুলতে অনর্গল কথা বলে চলল ইয়েগর। রান্নাঘরটা ওর হাঁপানির সাঁই সাঁই শব্দে ভরে উঠল।

'মা, এই যে ক্ষুদে মহিলাটিকে দেখছেন, এ'কে কিন্তু কর্তারা দুচোখে দেখতে পারেন না। জেলার নাকি কী বলেছিল। মেয়ে হাঁক দিল, চাও ক্ষমা, নইলে উপোস করব। আটটি দিন জলস্পর্শ করেনি। আমাদের মায়া

ছেড়ে গিয়েছিল আর কি। প্রাণটুকু কোন মতে ধুকপুক করছিল। মন্দ হত না, কী বলেন! — আমার মতো এমনি একখানা ভুঁড়ি দেখেছেন?'

বলে নিজের ঝুলে পড়া বিশ্রী ভুঁড়িটা খাটো হাতে ধরতে ধরতে পাশের ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে ওদিক থেকে ওর কথা চলে অনর্গল।

অবাক হয়ে মা শুধয়, 'সত্যি আটদিন খাননি?'

'কী করা যাবে বলুন। ক্ষমা না চাইলে তো ছাড়তে পারিনে!' জবাব দেয় সাশা। যেন কাঁপুনি ধরে তার। মায়ের মনে হয়, কী কঠিন নির্বিকার একরোখা ভাব। যেন তিরস্কার রয়েছে ওই কাঠিন্যে। তাই তো বটে। জিজ্ঞাসা করে:

'মরে গেলে কী হত?'

'কী আবার হত! কিন্তু ক্ষমা চাইলে শেষ পর্যন্ত। অপমান সহ্য করা মানুষের উচিত নয়।' শান্তকণ্ঠে বলে সাশা।

আস্তে আস্তে মা বলে:

'হুঁ... অথচ আমাদের মেয়েদের সারা জীবন অপমানই সইতে হয়...'

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে ইয়েগর, বলে, 'যাক্, বোঝাটা নামানো গেছে। কই সামোভার তৈরী? দাঁড়ান দাঁড়ান আমি আনছি ওটা...'

পাশের ঘরে গিয়ে সে নিয়ে এল সামোভারটা তুলে:

'আমার বাবা দিনে ক' গ্লাস চা খেতেন জানেন? বিশ গেলাসের কম নয়। তাই তিনি সুখে শান্তিতে সুস্থ সবল দেহে জীবন কাটিয়ে গেছেন তিয়াত্তরটি বছর। ওজন তাঁর ছিল আট পুদ, ভস্ক্রেসেন্স্ক গ্রামে গির্জায় ডিকনের কাজ করে গেছেন দিব্যি।'

মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আপনি কি পাদ্রী ইভানের ছেলে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! বাবাকে আবার আপনি কী করে চিনলেন?'

'আমার বাড়ীও যে ঐ গ্রামেই!'

'ঐ গ্রামেই! কার মেয়ে আপনি?'

'আপনার একেবারে পাশের বাড়ী। সেরিওগিনের মেয়ে আমি।'

'আরে সেই খোঁড়া নিল্? খুব জানি তাঁকে। বহুবার তাঁর কানমলা খাবার সৌভাগ্য হয়েছে...'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। হাসছে আর হাজারটা প্রশ্ন করছে। হাসিমুখে তাদের দিকে চেয়ে সাশা চা তৈরি করে। বাসনের ঠুন্ঠুন শব্দে সজাগ হয়ে ওঠে মা।

'কিছু মনে করবেন না। কি রকম যেন খেয়াল ছিল না। নিজের দেশের মানুষ দেখতে পেলে কী ভালোই যে লাগে...'

'আমারই তো ক্ষমা চাওয়া উচিত। একাই আসর গুলজার করছি। কিন্তু রাত যে দশটা বাজল। হাঁটতেও হবে এখন অনেকটা...'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে মা। 'কোথায় যাবেন? শহরে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন? এই অন্ধকার, জল পড়ছে। আর শরীরটাও তো আপনার দেখছি ভারি ক্লান্ত। রাতটা না হয় এখানেই থেকে যান। ইয়েগর ইভানভিচ রান্নাঘরে শোবেন। আপনি আর আমি এখানে শোব'খন।'

সাশা শুধু বলে, 'না মা, উপায় নেই, যেতেই তবে আমায়।'

'চলেই যাক। এখানে লোকে চেনে ওকে। কাল সকালে যাবার সময় কারো চোখে পড়তে পারে। ঠিক হবে না ওটা।' ইয়েগর বলে।

'কিন্তু যাবে কী করে? একা যাবে?'

মুচকে হেসে ইয়েগর বলে, 'হ্যাঁ মা, একাই যাবে।'

সাশা নিজেই এক কাপ চা ঢেলে এক টুকরো কালো রুটিতে নুন লাগিয়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে। খেতে খেতে কী যেন ভাবতে ভাবতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'কী করে এত রাতে একা যাওয়া-আসা করেন আপনারা? নাতাশাকেও দেখেছি এইরকম। আমি হলে পারতাম না। আমার তো ভয় করে।' বলে ভ্লাসভা।

ইয়েগর জবাব দেয়, 'ওঁরও ভয় করে মা। তাই না সাশা?'

'নিশ্চয় করে।' সাশা বলে।

মা একবার ওর দিকে আর একবার ইয়েগরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'কী... কঠিন লোক বাপু আপনারা!'

চা শেষ করে সাশা নীরবে ইয়েগরের সঙ্গে করমর্দন করে রান্নাঘরে যায়। মা সঙ্গে সঙ্গে যায়। দরজার কাছে গিয়ে সাশা বলে:

'পাভেল মিখাইলভিচের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন। ভুলবেন না কিন্তু মা।'

দরজার হাতল ধরে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ সুরে বলে:

'আপনাকে চুমু খাব, মা?'

মা নীরবে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে চুমু খায়।

'ধন্যবাদ।' বলে মাথাটা একটু নোয়ায় সাশা, তারপর বেরিয়ে যায়।

মা ঘরের মধ্যে এসে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে বাইরে তাকায় জানালা দিয়ে। অন্ধকার চারদিকে। অঝোরে ঝরছে ভেজা বরফের খই।

ইয়েগর জিজ্ঞাসা করে, 'প্রজরভদের মনে আছে, মা?'

পা ফাঁক করে বসে জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে চা খায় ইয়েগর। মুখখানা লাল, ঘর্মাক্ত, তৃপ্তিতে ভরা।

'তা আছে বৈকি!' বলে একপাশে এগিয়ে আসে মা টেবিলের কাছে। বসে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ইয়েগরের দিকে তাকিয়ে টেনে টেনে বলে:

'আহারে, সাশা পেঁছুবে কী করে শহরে!'

ইয়েগর সায় দেয়, 'হ্যাঁ, ভারি কষ্ট হবে। জেলই ওকে দুর্বল করে দিয়েছে। এর থেকে আগে ওর শরীর অনেক ভালো ছিল... তাছাড়া যত্নে মানুষ হয়েছে... বোধহয় ফুস্‌ফুসে দাগও পাওয়া গেছে একটা...'

কোমল স্বরে বলে মা, 'ও কে বলুন তো!'

'গাঁয়েরই এক জমিদারের মেয়ে। বাপটা নাকি বড্ড খারাপ মানুষ, ও বলে। ওরা বিয়ে করবে ঠিক করেছে, জানেন মা?'

'ওরা মানে কারা?'

'সাশা আর পাভেল। কিন্তু হতে পারল কই! সে বাইরে তো ইনি জেলে। আর ইনি বাইরে তো সে জেলে।'

একটু থেমে বলে মা, 'আমি জানতাম না। পাশা তো নিজের কথা কিছুই বলে না...'

মেয়েটার জন্য আরো কষ্ট হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতিথির প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে মনটা। তার দিকে ফিরে বলে:

'একটু পেঁছে দিয়ে এলেন না কেন বেচারীকে?..'

ইয়েগর শান্তভাবে উত্তর দেয়, 'তা সম্ভব নয়! এখানে আমার কত কাজ। সক্কাল বেলা উঠে বেরিয়ে যাব। সারাদিন ঘুরতে হবে। তার ওপর বুকের কলকব্জাগুলো দেখছেন তো!'

'বড় ভালো মেয়ে!' মা অন্যমনস্কভাবে বলে। ইয়েগরের কাছ থেকে এইমাত্র শোনা খবরটাই মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে। প্রাণে ঘা লেগেছে। খবরটা কিনা শুনতে হল বাইরের লোকের কাছ থেকে। ভুরু কুঁচতে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুখখানা কেমন হয়ে ওঠে।

'সত্যি ভালো মেয়ে,' ইয়েগর বলে, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার জন্য

বুঝতে পারছি। কিন্তু কত দুঃখ করবেন! আমাদের মতো সব বিদ্রোহীদের জন্যেই যদি দুঃখ করতে বসেন তো আপনার কলজেটাই ক্ষয়ে যাবে। আর সত্যি বলতে কি, আরামে থাকিনে মা আমরা। আমাদের একজন কমরেড হালে এসেছে নির্বাসন থেকে। ও যখন নিজ্‌নি নভগরদ-এ এল, তখন তার বৌ-ছেলে তার জন্য অপেক্ষা করছে স্মলেন্‌স্ক্‌-এ। তারপর সে যখন এল স্মলেন্‌স্ক-এ বৌ-ছেলে ততক্ষণে মস্কোর গারদে। এবার বৌ-এর পালা সাইবেরিয়া যাওয়ার। আমারও বউ ছিল। বড় চমৎকার মেয়ে। কিন্তু এমন জীবনের পাঁচ বছরের মধ্যেই কবরে আশ্রয় নিতে হল বেচারাকে...'

গপ্‌ করে একবারে একগ্লাস চা গিলে ফেলল সে। তারপর বলে চলল ওর জীবনের কাহিনী। কতবার কারাদণ্ড ও নির্বাসন হয়েছে সে-কথা শোনায়। জেলে মার খাওয়ার কথা, নানান বিপদের কথা, সাইবেরিয়ায় উপোসের বিষয়ে বর্ণনা। এমনি আরো কত দুঃখের ইতিহাস। মা ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়, জীবনে কত কষ্টই পেয়েছে, কত অত্যাচার আর অপমান সহ্য করেছে অথচ এ মানুষটা তার কথা অমন ঠাণ্ডা হয়ে বলছে কী করে, যেন কিচ্ছুটি নয়...

'যাক্‌গে। আসুন দেখি এবার কাজের কথা পাড়া যাক।'

স্বরটা বদলে গেল, মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, কারখানায় কাগজপত্র মা নেবে কী করে। মা অবাক হয়ে যায়, এ ব্যাপারের প্রতিটি খুঁটিনাটি হিসাব অবধি ওর নখাগ্রে।

কাজের কথা শেষ হয়ে গেলে আবার ওঠে নিজেদের গাঁয়ের কথা। তামাশা করতে করতে হালকা করেই বলে ইয়েগর। মায়ের মন ততক্ষণ পাড়ি জমিয়েছে পেছন-পানে। সেই ফেলে-আসা জীবনটা যেন একটা জলা। মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে নির্বিকার মাটির ঢিবি। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট ফার্‌ গাছ, সাদা রং-এর বার্চ আর সরু সরু কী একটা ভয়ে কম্পিত আসপেন গাছ। বার্চগুলো বড্ড ধীরে ধীরে বাড়ে। পাঁচ বছরের মধ্যে পচা জলা মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা ঝরে পচে যায়। বসে বসে স্বপ্ন দেখে মা। কেন জানি মন টনটন করে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি মেয়ের ছবি — ধারালো একরোখা মুখ। তুষার-ঝরা আঁধার রাত্তিরে ক্লান্ত শরীরে একলা পথ ভাঙছে মেয়েটা... ছেলেটা গারদে। হয়ত-বা চোখের পাতা তার এক হয়নি। শুয়ে শুয়ে ও ভাবছে... না, মায়ের কথা নয়, মায়ের কথা ভাবছে না সে। আরো নিকট একজন লোক আছে তার। নানা বর্ণের

এলোমেলো মেঘের মতো ওই ঘন ভাবনাগুলো এসে আঁধার করে ছেয়ে ফেলে মনটাকে...

ইয়েগর হেসে বলে, 'মায়ের দেহ আর বইছে না। চলুন, শুয়ে পড়া যাক।'

বুকের মধ্যেটা বিশ্রী রকম তেতো হয়ে ওঠে। জ্বালা করে। শুভরাত্রি জানিয়ে সাবধানে একপাশে রান্নাঘরে চলে যায় মা।

সকাল বেলায় খাবার সময় ইয়েগর বলে:

'যদি পুলিশে ধরে আর জিজ্ঞাসা করে, কোত্থেকে পেলেন এসব ধর্মবিরোধী কাগজপত্র, কী বললেন!'

'বলব, তাতে তোদের কী?'

'কিন্তু ওকথা বললে শুনবে কেন? তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এটা ওদেরই কাজ। জেরা করে করে জেরবার করে ছাড়বে।'

'বলব না তবু।'

'ধরে নিয়ে গিয়ে গারদে পুরবে।'

'পুরুক। তবু জানব অন্তত ঐটুকু আমি পারি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমায় তো চায় না কেউ। আর তাছাড়া ওরা শুনেছি অত্যাচার করবে না...'

মায়ের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে ইয়েগর বলে, 'তা করবে না ঠিকই। কিন্তু ভালো লোকদের নিজেদের বাঁচিয়ে চলাই উচিত...'

'আপনাদের কাছ থেকে তো এ রকম দৃষ্টান্ত পাই না।' একটুখানি হেসে বলে মা।

ইয়েগর চুপ করে একটু পায়চারি করে কাছে এসে বলে:

'দেখছি বড় কষ্ট হচ্ছে আপনার।'

'শুধু আমার কেন, সকলেরই।' হাত নেড়ে মা বলে, 'হয়ত যারা বোঝে তাদের কাছে কম... আমিও এখন বুঝতে পারি একটু একটু, কিসের জন্য ভালো লোকেরা লড়ছে...'

'বুঝে নিলেই তো হয়ে গেল। তবে সবখানেই আপনার দরকার আছে, সেরকম প্রত্যেকটি মানুষেরই।' গম্ভীরভাবে বলে ইয়েগর।

ওর দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসে মা।

দুপুর বেলা কাগজপত্র জামার মধ্যে বেশ করিৎকর্মার মতো শান্তভাবে

লুকিয়ে নিয়ে কারখানায় যাবার জন্য মা তৈরী হয়ে নিল। এমন নিপুণ ভাবে করল যে, ইয়েগর দেখে জিভ দিয়ে একটা খুশির শব্দ করে বলল:

'খাসা হয়েছে। গুসের গুৎ! (খুব ভাল!) জানেন — এক বালতি বীয়ার খেয়ে জার্মানরা এ কথা বলে। অতগুলি কাগজ ঠুসেছেন, কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক যেমনটি ছিলেন তেমনি—আধবয়সী, ঢ্যাঙ্গা মোটা মহিলা—এই যা। আজ এই শুরুর দিনে যত দেবতা আছেন সবাই যেন আপনাকে আশীর্বাদ করেন, এই প্রার্থনা করছি।'

আধ ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে কারখানার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মা শান্তভাবে। মনের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের জোর। দু'জন রক্ষী নিতান্ত অভদ্রভাবে সকলের জামা কাপড়ের ওপরে হাত দিয়ে চেপে চেপে দেখে তবে ঢুকতে দিচ্ছে। তার বদলে ইনাম পাচ্ছে শ্রমিকদের হাসি-টিট্‌কারি আর গালিগালাজ। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ আর লম্বা-ঠ্যাং, লাল-মুখো একজন লোক, খুদে খুদে চঞ্চল দুটি চোখ। মা বাঁকটাকে কাঁধ বদলে নেয় আর চোখ নীচু করে দেখে লম্বা-ঠ্যাংকে। বুঝতে পারে লোকটা টিক্‌টিকি।

একজন লম্বা, কোঁকড়া-চুলওয়ালা, মাথার পিছনে টুপি নামানো শ্রমিককে রক্ষীরা তল্লাসী করছিল; শ্রমিকটি চেঁচিয়ে বলল, 'পকেট তালাস করে কী হবে; মাথাটা তালাস করতে পার তো কাজ হবে।'

একজন রক্ষী জবাব দেয়, 'তোর মাথায় উকুন ছাড়া আছে কী রে শালা?'

শ্রমিকটি পালটা জবাব দেয়, 'শালা, যা উকুনের ল্যাজে দৌড়ো!'

টিক্‌টিকিটি ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে একবার ওদিকে তাকিয়ে থুথু ফেলে মাটিতে।

মা বলে, 'বুড়ো মানুষ, ছেড়ে দে বাবারা, বোঝার ভারে পিঠ বেঁকে যাচ্ছে!'

বিরক্ত হয়ে রক্ষী একজন জবাব দেয়, 'যাও যাও, ভাগো। তুমিও দেখছি মুখ না খুলে যেতে পার না!'

ভেতরে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বোঝা নামিয়ে কপালের ঘাম মুছে চারদিকে তাকায় মা।

গুসেভ্‌রা দু'ভাই ছুটে এল। দুজনেই মিস্ত্রী।

'কেক আছে, কেক?' বড় ভাই ভাসিলি কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে।

'কাল এনে দেব।' মা বলে।

ওদের সংকেত। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দু'ভাইয়ের মুখ।

'ও মাগো মা, কাণ্ডটা দেখ...' আনন্দে ফেটে পড়ে ইভান।

ভাসিলি মাটিতে উবু হয়ে বসে খাবারের পাত্রটার ভিতরে দেখে। চোখের পলকে এক পুলিন্দা কাগজ ওর বুকের মধ্যে ঢোকে।

'আর খেতে বাড়ী যাব না রে ইভান! এখান থেকেই কিনে খাওয়া যাবে,' উচ্চ স্বরে বলতে বলতে আর এক পুলিন্দা কাগজ নিয়ে জুতোর মধ্যে রাখে। 'নতুন লোক, আমরা উৎসাহ না দিলে কে দেবে?'

'তাইতো!' বলে ইভান হেসে উঠল।

মা সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে হাঁকে:

'সুপ, সুপ চাই, গরমাগরম খাবার চাই!'

আর পুলিন্দা পুলিন্দা কাগজ পাচার করে দু'ভাই-এর হাতে। প্রত্যেকটি পুলিন্দা দেবার সময় পুলিশের বড় কর্তার মুখটা যেন অন্ধকার ঘরে চোখের সামনে দেশলাইয়ের হলদে আগুনের মতো ফস্ করে জ্বলে ওঠে। আর নিষ্ঠুর উল্লাসে মা তাকে মনে মনে বলে:

"এই নে, এই নে!"

তারপরে আর এক পুলিন্দা। "এই নে!"

শ্রমিকরা বাটি নিয়ে খাবার কিনতে আসে। কাছে এলেই ইভান গুসেভ জোরে জোরে হাসে। কাগজের পুলিন্দা থেকে মা'র হাত সরে আসে খাবারের পাত্রে।

'হাত দু'খানা আপনার খাসা, পেলাগেয়া নিলভনা।' হাসতে হাসতে দু'ভাই বলে।

গোমড়া মুখে একজন স্টোকার বলে, 'অভাবে পড়লে লোকে ইঁদুরও ধরে। রোজগেরে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে বেজন্মারা। এই যে, তিন কোপেকের নুড্ল্ দাও! যাক্গে মা, ভাবনা করো না। চলে যাবে এক রকম।'

মা মৃদু হেসে জবাব দেয়, 'দুটো দরদের কথা শোনালে, ধন্যবাদ।'

যেতে যেতে বলে স্টোকার, 'মিঠে কথায় ট্যাঁকের কড়ি তো আর খরচ হয় না...'

মা আবার হাঁকে:

'গরম সুপ, খাবার চাই, খাবার!'

মনে মনে ভাবে, কী-ভাবে ছেলের কাছে আজকের এই দিনটার কথা বলবে; ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই পুলিশের বড় কর্তার রাগে-

ফোলা হলদে মুখ। কালো গোঁফজোড়া নড়ে উঠছে কী করবে ঠিক না পেয়ে। আর ওল্টানো ঠোঁট-জোড়ার ফাঁক দিয়ে বিরক্তভাবে ঝলক্ দিয়ে দিয়ে উঠছে সাদা সাদা চাপা দাঁতগুলো। মায়ের বুকের মধ্যে খুশি যেন গান গেয়ে যায় সুরেলা পাখির মতো। নিপুণভাবে নিজের কাজ করতে করতে চতুরভাবে ভুরু নাচিয়ে নিজের মনেই সে বলতে থাকে, 'এই যে আরো!'

১৬

সন্ধ্যা বেলা ঘরে বসে চা খাচ্ছে মা। এমন সময় বাইরে কাদার মধ্যে ঘোড়ার খুরের ছপ্ছপানি শোনা গেল। তারপরেই একটা চেনা গলার ডাক। লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল রান্নাঘরে, দরজার দিকে। ততক্ষণে পায়ের দ্রুত শব্দটা বারান্দায় এসে উঠেছে। চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে এল। খুঁটিটায় ভর করে পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা খুলে দেয়।

একটা পরিচিত গলা বলে ওঠে, 'নমস্কার নেন্কো।' তার পরেই রোগা লম্বা দুখানা হাত এসে কাঁধে লাগে।

হতাশায় মুষড়ে গেল বুকটা; আবার ওদিকে আন্দ্রেইকে দেখে আনন্দেরও সীমা নেই। হতাশা আর আনন্দ মিলে এক বিপুল কূলপ্লাবী আবেগের ঢল নামল। তার উষ্ণ স্রোতের মাঝে হাবুডুবু খেতে খেতে অবশেষে ঢেউয়ের ঠেলায় উপর পানে উঠে ছিট্‌কে পড়ল আন্দ্রেইয়ের বুকে। আন্দ্রেইয়ের হাত কাঁপে, সেই হাতেই শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মাকে। অঝোর বুক-চাপা কান্নায় মা ভেঙে পড়ে। আন্দ্রেই তার চুলে হাত বুলিয়ে সুরেলা গলায় বলে:

'ছিঃ নেন্কো, অমন করে কাঁদতে নেই। মন খারাপ করছেন কেন? আমি আপনাকে এই বলে দিলাম, দেখবেন ওকে শীগ্‌গিরই ছেড়ে দেবে। ওর বিরুদ্ধে কিচ্ছু পায়নি পুলিশ, কেউ একটা কথাও বলেনি। সবাই ভিজে বেড়ালটির মতো বোবা বনে বসেছে...'

দু' হাতে জড়িয়ে ধরে মাকে সে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। মা ওর কাছ ঘেঁষে কাঠবেড়ালীর মতো হাতে তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে শোনে, লোভীর মতো মনপ্রাণ দিয়ে যেন পান করে প্রতিটি কথা।

'পাভেল আপনাকে ভালোবাসা জানিয়েছে। বেশ ভালো আছে শরীর, মনও যতদূর ভালো থাকতে পারে আছে। প্রচুর লোক ওখানে! কম করেও প্রায় শ'খানেককে ধরেছে। কারখানা থেকে তো আছেই, শহর থেকেও

অনেককে এনেছে। এক একটা সেলে তিন চার জন করে রেখেছে। জেলের কর্তারা ভালো আর বড্ড শ্রান্ত ক্লান্ত। শয়তান পুলিশগুলো তাদের ওপর যত কাজের বোঝা চাপিয়েছে তাতেই তারা নাজেহাল। খুব বেশি কড়াকড়ি ছিল না, আমাদের বলতো, দোহাই আপনাদের মশায়রা, একটু চুপচাপ থাকবেন, নইলে আমরা বিপদে পড়ব। কোন অসুবিধা ছিল না। মেলা-মেশা, গাল-গল্প, বই খাবার দেয়া-নেয়ায় কোনও অসুবিধা ছিল না। তাই বেশ ছিলাম। জায়গাটা পুরনো আর একটু নোংরা এই যা। তবে কড়া নিয়ম-কানুন কিছু নেই। সাধারণ কয়েদীরাও ভারি চমৎকার। অনেক সাহায্য করেছে আমাদের। আজ বুকিন, আমায় আর অন্য চার জনকে ছেড়েছে। পাভেলও এল বলে বেরিয়ে। তবে ভেসভ্শিচকভকে শীগ্গির ছাড়ছে না। ওখানে গিয়েও সেই ওর অবিরাম গালিগালাজ। পুলিশ তো ওর ওপর বিষম খাপ্পা। হয় একদিন আদালতে নিয়ে হাজির করবে নয়তো ধরে ঠ্যাঙ্গাবে। পাভেল ওকে সামলাবার কত চেষ্টা করে। বোঝায়, শত গাল দিলেও কিছুই হবে না, গণ্ডারের চামড়া। সে কিন্তু সমানে চেঁচাতেই থাকে, ঘায়ের খোসার মতো তুলে দেব বেটাদের এ-দুনিয়া থেকে! পাভেলের ব্যবহার খুব ভালো। ধীর স্থির শান্ত। ওকে ছাড়বেই শীগ্গির দেখবেন...'

'শীগ্গির!' একটু আশ্বস্ত হয়ে কোমল হাসি হেসে মা আওড়ায় কথাটা। 'তা আমি জানি।'

'তাহলে আর কান্নাকাটি কেন? আমায় একটু চাটা দিন, আর এত দিন কী করলেন কেমন ছিলেন সব শোনান দেখি।'

সারা অঙ্গে স্নিগ্ধ হাসি ভরে মায়ের দিকে তাকায় ও; ভারি দরদ ও কোমলতায় ভরা সে-চাউনি। বিষাদ-ছাওয়া ভালোবাসা আগুনের ফুলকির মতো ঝিলমিলিয়ে ওঠে ওর গোল চোখের তারায়।

'কত ভালোবাসি আপনাকে আন্দ্রিউশা, আপনি জানেন না।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে মা। নিরীক্ষণ করে দেখে ওর শীর্ণ মুখটা। খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ির ঝোপে কেমন মজার হয়ে আছে চেহারাটা।

চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে খখল বলে, 'না, মা, একটুখানি পেলেই আমি খুশি। আমি জানি আপনি আমায় কত ভালোবাসেন; আপনার মস্ত বড় বুকখানায় সবার জন্যই ঠাঁই আছে।'

'না। সবার সঙ্গে আপনার কথা নয়। আপনার যদি মা থাকত অমন ছেলের জন্য সবাই তাকে হিংসে করত...'

মাথা নেড়ে খখল দু'হাত দিয়ে জোরে জোরে মাথাটা ঘষতে থাকে।

'মা আমারও আছে। কিন্তু কোথায় কে জানে...' স্বরটা কেমন যেন নিভে আসে।

'জানেন আজ কী করেছি?' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে মা। তারপর শোনায় কারখানায় কাগজপত্র বিলনোর কাহিনী। আনন্দে ব্যগ্রতায় উত্তেজনায় ঘটনায় একটু রং দিয়ে ফেলে, কথা আটকিয়ে যায়।

খখল প্রথমে চোখ বড়ো করে অবাক হয়ে শোনে, তারপর হো হো করে হেসে উঠে পা নেড়ে আনন্দে কপালে হাত চাপড়ে চেঁচায়:

'সাবাস্! সাবাস্! আচ্ছা বাহাদুর মেয়ে তো আপনি, নেন্কো! তা খুব ভালোই হয়েছে সকলের পক্ষে, বিশেষ করে পাভেলের। শুনে কী খুশিই যে হবে পাভেল!'

সারা দেহটাকে সে দোলায়, আঙুল মটকায়, মনের আনন্দে শিস্ দেয়। ওর প্রাণের খুশির বিচ্ছুরণে মায়ের পূর্ণ প্রাণের সাড়া জাগে — তেমনি প্রবল, তেমনি বিশাল হয়ে।

বুকের কপাটটা যেন খুলে গেল মায়ের। কলকলিয়ে কথার ঝরণা ছুটল নেচে নেচে জল ছিটিয়ে, খুশির আলোয় ঝিলমিলিয়ে।

'দেখুন, নিজের জীবনটার কথা ভাবি... হায় ভগবান! কেন যে বেঁচে ছিলুম জানিনে। খেটেছি... মার খেয়েছি... স্বামী ছাড়া আর কাউকে দেখিনি... খালি ভয়ে ভয়ে থেকেছি, ভয় ছাড়া আর কিছুই জানিনি। স্বামী যতদিন বেঁচে ছিল, পাভেল যে কোথা দিয়ে কেমন করে বড় হল, সে খেয়ালও রাখতে পারিনি; ছেলেটাকে ভালবাসতুম কি না তাও জানতুম না। দিন রাত্তিরের এক কাজ আর এক চিন্তা ছিল কী করে ভালো ভালো খাবার দিয়ে পাষণ্ডটার পেট পোরাব, তার মন যুগিয়ে চলব। পান থেকে চুণ খসলেই তো ধরে মারবে। উঃ অষ্টপ্রহর কী যে ভয়ে ভয়ে থাকতে হত! একদিনও ভালো মুখে একটা কথা বলেনি। কী মার মারত, সবায়ের ওপরে নিজের আক্রোশ যেন বউ'এর ওপরে ঝাড়ত। বিশটি বছর অমনি করে কেটেছে। বিয়ের আগে যে কেমন ছিলুম তা স্রেফ্ ভুলে গিয়েছিলুম। ভাবতে চেষ্টা করি, কিছু মনে পড়ে না, সব ঝাপসা হয়ে গেছে যেন আমার চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। ইয়েগর ইভানভিচ এসেছিলেন। আমরা এক গ্রামেরই মানুষ।

এটা ওটা কত কথা বললেন উনি... আমার মনে আছে শুধু বাড়ীগুলোর কথা, মানুষগুলোর কথা। বাস্ ঐ পর্যন্ত। কিন্তু তারা যে কী বলত, কী করত, কেমন করে থাকত, তাদের কার কী হল কিছুই মনে পড়ে না। অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে পড়ে! একটা নয়, দুটো। আমার সব কিছু যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। মার দিতে দিতেই আমার আত্মাটাকে একেবারে কুলুপ-এ'টে দিলে... আমি বদ্ধ কালা, অন্ধ হয়ে রইলুম...'

ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মতো হাঁপাতে থাকে মা। সামনের দিকে ঝুঁকে স্বরটাকে আরো নীচু করে আবার বলে চলল:

'স্বামী মারা গেলে তবে আমি ছেলের দিকে ফিরেছি। সে আবার তখন এইসব কাজে ভিড়েছে। কী যে কষ্ট হত আমার কী বলব। বড় খারাপ লাগত, ওর জন্য বড় দুঃখ হত... কেবলি ভাবতুম, ওর কিছু হলে আমি থাকব কেমন করে? সারাক্ষণ ভয়ে আমার বুক কাঁপত। ওর কপালেও যে কী আছে ভাবতে আমার বুক ফেটে যেত...'

একটু থেমে মাথাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে অর্থপূর্ণভাবে বলে মা: 'আমাদের মেয়েদের ভালোবাসা সত্যিকার ভালোবাসা নয়!.. আমরা শুধু ভালোবাসি নিজেদের যেটুকু দরকার, তার ওপরে যেতে পারিনে। কিন্তু আপনার দিকে যখন তাকাই — নিজের মায়ের জন্য কত কষ্ট আপনার মনে, কিন্তু কিসের জন্য মা আপনার দরকার? তারপর আরো যে-সব ছেলে জেলে পচছে, সাইবেরিয়ায় যাচ্ছে, কেন? না, দুনিয়ার মানুষের জন্য... জান দিচ্ছে সব... কচি কচি মেয়েগুলো হিমের রাত্তিরে জল-কাদা-বরফ ভেঙ্গে ক্রোশের পর ক্রোশ একলা হে'টে শহর থেকে এখানে আসছে... কেন? কেন এত কষ্ট সয় ওরা? কে এসব করায় ওদের? না ওদের বুকের মধ্যে আছে খাঁটি ভালোবাসা। তারপর আছে ওদের গভীর বিশ্বাস। আমি ও ভালোবাসা আর বিশ্বাস কোথায় পাব আন্দ্রিউশা! আমি শুধু আমার এইটুকুনি ভালোবাসি, যা আমার বুকের কাছটিতে আছে।'

'পারেন না? কে বললে পারেন না?' অভ্যাসমত মুখ ফিরিয়ে হাত দিয়ে মাথা গাল চোখ ঘষতে ঘষতে বলে খখল। 'সবাই তার কাছের জিনিসটাকেই ভালোবাসে। কিন্তু কলজে যার মস্ত বড়

সে দূরের জিনিসকেও কাছের করে নিতে জানে। আপনি অনেক কিছু করতে পারেন মা। অনেক বড় কাজ। আপনার মাতৃস্নেহ কত উদার...'

'ভগবান করুন, তাই হোক,' ধীরে ধীরে বলে মা। 'আমি বুঝতে পারছি এখন, এই হল আসল বাঁচার পথ। আন্দ্রেই, আপনাকে সত্যি আমি ভালোবাসি, হয়তো পাভেলের চাইতেও বেশি। ও যে নিজের মধ্যেই ডুব মেরে থাকে... দেখুন না, সাশাকে বিয়ে করতে চাইছে, তা যদি আমাকে একটা কথা বলত মুখ ফুটে... আমি তো ওর মা...'

আপত্তি করে খখল, 'না মা, ভুল! হ্যাঁ, এটা ঠিক যে ওরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসে। আমি জানি ভালো করে। কিন্তু বিয়ে ওদের কস্মিনকালেও হবে না। সাশা চাইলেও চাইতে পারে। কিন্তু পাভেল রাজী হবে না...'

'সত্যি?' বিষণ্ণ চোখ দুটি খখলের দিকে তুলে চিন্তিতভাবে বলে মা, 'হ্যাঁ, তাই তো। নিজের সুখ-শান্তিও ডালি দিচ্ছে এরা...'

'পাভেলের মতো মানুষ হয় না! লোহার মতো শক্ত মন ওর...' খখলের গলার স্বর নরম শোনায়।

মা চিন্তিতভাবে বলে চলে, 'এখন তো জেলে বসে আছে। ভাবতে সত্যি ভয় করে, কিন্তু আগের মতো ততটা নয়। এখন জীবনই অন্য রকম হয়ে গেছে, আমার ভয়-ডরের চেহারাও বদলে গেছে। এখন সবার জন্যই ভয় করে। আমার মনটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। আমার অন্তর মুক্ত হয়ে বাইরের দিকে চোখ মেলেছে। মনটা বড় ভারি হয়ে যায়, আবার একটা সুখও পাই। অনেক কিছুই বুঝিনে আমি। আপনারা যে ধর্মে বিশ্বাস করেন না, সেটা আমার বড় প্রাণে লাগে। কিন্তু কী করব? দেখছি আপনারা সব হীরের মত মানুষ। মানুষের জন্য, সত্যের জন্য দুনিয়ার দুঃখ মাথায় তুলে নিয়েছেন। কোন্ সত্য আপনাদের তা বুঝি এখন। বুঝি বড়লোকগুলো যদ্দিন আছে, কিচ্ছু পাবে না সাধারণ মানুষেরা — না একটু আনন্দ, না তার হক্কের পাওনা। এখন তো আপনাদের মধ্যে আছি; মাঝে মাঝে রাত্তির বেলা পুরনো সব কথা মনে হয়। ভাবি আমার জোয়ান বয়সের সব শক্তি পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার কচি প্রাণটুকু হাতের মুঠোর চাপে গেছে চূর্ণ হয়ে। ভারি কষ্ট হয় নিজের জন্য। মনটা তেতো হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু

আজকাল জীবনটা আমার অনেক ভালো হয়ে উঠেছে। একটু একটু করে নিজেকে বুঝতে পারছি...'

খখল চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। তার শীর্ণ দেহটা ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে সাবধানে পায়চারি করে। চেষ্টা করে যাতে আওয়াজ না হয়। চাপা স্বরে আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে:

'চমৎকার বলেছেন! একটি ইহুদী ছেলে ছিল কের্চ্ সহরে, জানেন! সে কবিতা লিখত। একদিন লিখল:

নির্দোষী যারা প্রাণ দিল করে জীবনপণ
সত্যের বলে লভে আজ তারা নবজীবন!..

ছেলেটি নিজেও মারা গেল পুলিশের হাতে কের্চ শহরেই। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসল ব্যাপার হল, সত্যকে ও চিনেছিল, সত্যের বীজ অনেকটা ছড়িয়ে দিয়ে গেছে ও মানুষের মধ্যে। বিনা-দোষে যারা খুন হয়েছে, আপনিও তাদের একজন মা...'

মা আবার বলে, 'এখন আমারও মুখ খুলেছে। নিজের কথা আমি কান পেতে শুনি। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। সারাটা জীবন কেবল এই ভাবনাই ভেবেছি যে, রাত ভোর হলেই যে নতুন দিনটি আসে, কী করে তার আলো থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখব, কী করে গুটিসুটি হয়ে থাকব সবার চোখের বাইরে, যাতে কেউ আমার ধার পাশ দিয়ে না আসে, আমাকে না ছোঁয়। কিন্তু এখন আর তা ভাবিনে, এখন ভাবি অন্য মানুষের কথা। হয়তো আপনাদের কাজকর্ম ঠিক বুঝিনে আমি। কিন্তু সকলকেই ভালোবাসি। সবাই আমার আপনজন, সবার জন্য ভাবি। অহরহ এই কামনাই করি সব্বাই যেন সুখী হয়। বিশেষ করে আপনি, আন্দ্রিউশা।'

মায়ের কাছে আসে আন্দ্রেই। তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে। শুধু বলে, 'ধন্যবাদ, মা।' তারপর তাড়াতাড়ি সরে যায়। মনের মধ্যে এত ঢেউ-ভাঙানিতে অবসন্ন হয়ে পড়ে মা। ধীরে ধীরে নীরবে পেয়ালা ধোয়। বুকের মধ্যে আনন্দের এক নিঃশব্দ শান্ত উষ্ণ স্রোত বয়ে চলে।

খখল পায়চারি করতে করতে বলে, 'নেন্‌কো, ভেসভ্‌শিচকভটাকেও যদি একটু ভালোবাসতেন। ওর বাপটা একটা কুৎসিত বুড়ো, জেল খাটছে এখন। জানালা দিয়ে তাকে দেখলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে ওর

ছেলে। আরম্ভ করে গালাগালি। এটা ঠিক নয়। মনটা বড় ভালো নিকলাইয়ের। কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর সব ভালোবাসে, ঘেন্না করে শুধু মানুষকে। দেখলেন তো মানুষ ঘটনা-চক্রে কী হয়?'

মা যেন নিজের মনেই বলতে থাকে, 'হ্যাঁ, মা'র তো পাত্তা নেই... বাপটা চোর, মাতাল...'

শুতে যায় আন্দ্রেই। অলক্ষ্যে মা তার উদ্দেশে শূন্যে ক্রুশচিহ্ন আঁকে। আধ ঘণ্টাখানেক পরে ডাকে:

'ঘুমিয়েছেন, আন্দ্রিউশা?'

'না, কী হল?'

'শুভ-রাত্রি।'

'ধন্যবাদ, নেনকো! ধন্যবাদ!' কৃতজ্ঞচিত্তে বলে আন্দ্রেই।

১৭

পরের দিন পেলাগেয়া কারখানার গেটে এলে রক্ষীরা অভদ্রভাবে তাকে থামিয়ে হুকুম দেয়, 'নামাও সব, তল্লাসী করব।'

'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!' শান্তভাবে প্রতিবাদ করে মা। রক্ষীরা হাত দিয়ে অনুভব করে করে দেখে ওর জামাকাপড়।

'চুপ কর!' বেজার মুখে হুমকি দিয়ে ওঠে একজন রক্ষী।

আরেকজন ওর কাঁধ ধরে একটু ঠেলে দিয়ে বলে, 'নিশ্চয় পাঁচিলের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেয়।'

মা ভেতরে এলে সিজভ্ এগিয়ে এল প্রথম। চারদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে:

'শুনেছ মা?'

'কী?'

'আবার সেই সব কাগজ। রুটির ওপর নুন ছিটোনর মতো চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছে কারা যেন। কত তল্লাসী, কত ধরপাকড়! আমার ভাইপো মাজিনটাকে নিয়ে গেল, তোমার ছেলেটাকেও। এখন? এখন তো দেখতে পেলি ব্যাটারা, যে মিছিমিছি ওদের ধরেছিস।'

মুঠো করে দাড়িটা চেপে ধরে মায়ের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, 'আমার সঙ্গে একটু দেখা করবে? তুমি তো একেবারে একা...'

ধন্যবাদ জানিয়ে মা সওদা হাঁকে আর চারদিক নিরীক্ষণ করে। কী একটা ব্যস্ততা। অমনতর তো দেখা যায় না! সবাই যেন ভয়ানক উত্তেজিত। এই জটলা পাকাচ্ছে, এই আবার ছড়িয়ে পড়ছে, এখান থেকে সেখানে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি; কেউ দিচ্ছে টিট্‌কিরি, কেউ বাহবা। জবরদস্ত দুঃসাহসী রকমের একটা কিছু ঘটে গেছে, কারখানার কালিঝুলিভরা হাওয়ায় যেন তার গন্ধ পায় মা। বয়স্ক শ্রমিকরা সাবধানে কেমন যেন অর্থপূর্ণভাবে হাসে। ওপর-ওয়ালারা এদিক-ওদিক ঘুরছে। ভারি চিন্তিত দেখাচ্ছে ওদের। পুলিশেরা ছুটোছুটি করছে। দূর থেকে দেখতে পেলেই যারা জটলা করছিল, তারা সরে যায়, অথবা চুপ করে যায়; নিঃশব্দে ওদের বিরক্ত ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে মনে হয় সবাই যেন এইমাত্র সযত্নে স্নান করে এসেছে। মাঝে মাঝে বড় গুসেভের চেহারাটা দেখা দেয়। ছোট গুসেভ হেসে হেসে একটু দুলে চলেছে।

মায়ের পাশ কাটিয়ে ছুতোর্-খানার ফোরম্যান ভাভিলভ্ যায়। সঙ্গে তার রেজিস্টাররক্ষক ইসাই। খুদে রোগা মানুষ -- মাথাটা পিছনে আর বাঁ দিকে ফিরিয়ে ভাভিলভের লম্বা চওড়া ভরাট মুখের দিকে তাকিয়ে তার ছাগল-দাড়ি নেড়ে আলাপ করতে করতে পথ চলে।

'ভারি তামাশা পেয়েছে ওরা, বুঝলেন ইভান ইভানভিচ! রাষ্ট্র ধ্বংসের কথা উঠলেও ওরা খুসি, বলেইছেন তো বড় সাহেব। এখন আর বাছা-টাছা নয়। একেবারে চষে দাও সব সমান করে...'

হাত পেছন দিকে রেখে এগিয়ে চলেছে ভাভিলভ। আঙুলগুলো শক্তভাবে একটা আরেকটার সঙ্গে জড়ান। উঁচু গলায় বলে:

'আরে শালা, ছাপ্‌গে না তোর যা খুশি। কিন্তু আমায় নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করেছিস তো...'

ভাসিলি গুসেভ মায়ের কাছে আসে:

'আরেকবার খেতে এলুম। বড় ভালো জিনিস তোমার।' তারপর চোখ কুঁচকে, স্বরটা আরো নামিয়ে বলে:

'খুব হয়েছে ব্যাটাদের। খুব তাক করেই মেরেছেন। খুব ভালো।'

স্নেহভরে মাথা নাড়ে মা। বড় ভালো লাগছে। সারা বস্তির মধ্যে শয়তানীতে এ লোকটার জুড়ি নেই। অথচ গুপ্ত বিষয়ে আলাপের সময় কী সম্মান করেই না তার সঙ্গে কথা বলছে। তাকে আপনি বলছে। তারপর কারখানার এই উত্তেজনা তাতেও মা বড় খুশি। মনে মনে ভাবে:

"আমার জন্যই তো..."

তিনজন অদক্ষ শ্রমিক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে। মা শুনতে পায়:

'কোথাও পেলাম না...'

আরেক জন বলে, 'একটু শুনতাম কী আছে ওর মধ্যে, পড়তে তো পারিনে নিজে। কিন্তু যাই বল বাবা, দেখতে পাচ্ছি খুব তাগ্‌ করে ঠিক জায়গাটিতে মেরেছে।'

তৃতীয় জন চারদিকে তাকিয়ে বলে:

'চল বয়লারের ঘরে যাই।'

গুসেভ মায়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে:

'কী হচ্ছে দেখছেন তো!'

খুশি মনে বাড়ী ফেরে পেলাগেয়া। আন্দ্রেইকে বলে:

'লেখাপড়া জানে না বলে এখন কত পস্তাচ্ছে সবাই। ছোট-বেলায় আমি পড়তে জানতাম। কিন্তু এখন ভুলে গেছি।'

'আবার শিখুন না?' খখল বলে।

'এই বয়সে? হাসবে যে লোকে...'

তাক থেকে একটা বই তুলে নেয় আন্দ্রেই। মলাটের ওপরকার লেখা থেকে একটা অক্ষর ছুরি দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এটা কী বলুন!'

'র!'

'এটা?'

'আ...'

বড় লজ্জা করে মা'র। মনে হয় আন্দ্রেইয়ের চোখ দুটো চুপি-চুপি হাসছে। তাকাতে পারে না ওর দিকে মা। কিন্তু না, ওর মুখ গম্ভীর, স্বর ধীর শান্ত।

জোর করে একটু হেসে বলে, 'আমায় সত্যি পড়াতে চান নাকি?'

'দোষ কী?' জবাব দেয় আন্দ্রেই, 'আগে যদি কিছু শিখে থাকেন, সহজেই মনে পড়বে আবার। সত্যি যদি শিখতে পারেন — আমাদেরই জিত। যদি না পারেন, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

'জানেন তো একটা কথা আছে — ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকলেই ঠাকুর হওয়া যায় না।'

মাথা নেড়ে খখল বলে, 'হ্ঁ, তা যদি বলেন তো অনেক কথাই তো আছে। যেমন, ধরুন — কম জানলেই ঘুম জমে। কথাটা কি মিছে? কিন্তু এসব কথা হচ্ছে পেটের কথা। এসব কথা দিয়ে পেটটা আত্মাকে বেঁধে রাখতে চায় যাতে বেশি সহজভাবে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এখন বলুন, এটা কী?'

'ল।'

'বাঃ বেশ! দেখছেন কেমন ভাবে পা দুটো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা বলুন, এটা কী?'

ভুরু কুঁচকে চোখের দৃষ্টি জোর করে ভুলে-যাওয়া অক্ষরগুলি প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করে, অলক্ষ্যে নিজেকে সে চেষ্টায় ভাসিয়ে দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই কিন্তু চোখ জ্বালা করতে আরম্ভ করে। জল আসে ক্লান্ত চোখে। কিন্তু তারপর সত্যি সত্যি কান্না এসে যায়। দুঃখের কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে:

'শিখছি, লেখাপড়া শিখছি! চল্লিশ বছর বয়েসে, বসে বসে অ আ ক খ করছি।'

সান্ত্বনা দেয় খখল, 'কাঁদবেন না! আপনার কী দোষ। আপনার তো কোনো উপায় ছিল না! তবু ওরকম জীবন যে কী সাংঘাতিক বিশ্রী, সেটুকু তো আপনি বুঝতে পেরেছেন। হাজার হাজার লোক আপনার চেয়ে অনেক ভালো জীবন পেতে পারে, তবু তারা থাকে জানোয়ারের মতো আর তাই নিয়ে তাদের গর্ব কত! কিন্তু সে জীবনে কী আছে? আজ দেখছি মানুষ খাটছে খাচ্ছে। কালও তাই। সারাজীবনই ঐ করবে। এক সময় বিয়ে করবে, ছেলেপুলে হবে; আর ছেলেপুলেদের নিয়ে খেলা করবে। কিন্তু যেই তারাও বড় হয়, মুখ বাড়ে, পেট বাড়ে, তখনই ফ্যাসাদ বাধে। তখন আরম্ভ হয় গালিগালাজ আর শাপ-মন্যি। সারাদিন চ্যাঁচায়: শুয়োরগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব আর কদিন। বাড়ুক শীগ্‌গির, খাটার সময় হয়েছে। ছেলেপুলেকে পোষা জন্তুতে পরিণত করতে চায়, কিন্তু তারা নিজেদের পেটের জন্য খাটতে শুরু করে। আর আবার সেই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি। মানুষের মনের এই যে দাসত্বের শেকল, এই শেকল ভাঙার ব্রত যারা গ্রহণ করে, আসল মানুষ তারাই। আপনিও তো এই কাজই হাতে তুলে নিয়েছেন মা, আপনার যতটুকু শক্তি...'

'আমি? আমি কীইবা করতে পারি!'

'ওকথা বলছেন কেন? আমরা সবাই বৃষ্টির মতো। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা ফসল ফলাবার কাজে লাগে। বুঝেছেন! পড়তে একবার আরম্ভ করুন তো দেখি...' হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর উঠে পড়ে পায়চারি করতে আরম্ভ করে।

'দেখুন, পড়তেই হবে আপনাকে। পাভেল আসবে আর আপনি ওহোঃ!'

'আন্দ্রিউশা, বয়েস কম থাকলে সব সহজ হয়। কিন্তু বয়েস বাড়লেই — দুঃখ বাড়ে অথচ শক্তি কমে, আর মগজ তো একেবারেই যায়...'

১৮

সেদিন সন্ধে বেলায় খখল গেছে বাইরে। মা বাতি জ্বালিয়ে মোজা বুনতে বসল। কিন্তু মন বসে না। উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে বেড়াল খানিক, তারপর গিয়ে রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে আবার ফিরে এল ভুরু কুঁচকে। জানালার পরদাগুলো টেনে দিয়ে তাক থেকে একখানা বই পেড়ে নিল। তারপর টেবিলে গিয়ে বসল। কয়েকবার চারদিকে তাকিয়ে বই খুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে পড়তে আরম্ভ করল। বাইরে কোনো শব্দ হলে চম্‌কে উঠে হাত দিয়ে বই ঢাকে আর কান পেতে শোনে... তারপর আবার আরম্ভ করে ফিস্‌ফিস করে, কখনো চোখ খুলে কখনো বা চোখ বুজে:

'জ-য়ে জীবন, ম-য়ে মাটি...'

দরজা ধাক্কাচ্ছে কে। মা লাফিয়ে উঠে বইটা তাকের ওপর গুঁজে দিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে শুধয়, 'কে?'

'আমি।'

রীবিন এল দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে।

'আগে তো কে জিজ্ঞাসা করতে না! ও, একা আছ? ভাবলাম খখলটা আছে। আজ দেখলুম কিনা ওকে... তা জেলে থেকে কিচ্ছু কমতি হয়নি ওর, তেমনিই আছে দেখছি।'

বসে মাকে বলে, 'বসো, বসো, কথা আছে...'

লোকটার দৃষ্টিতে একটা হেঁয়ালি। যেন অনেক কিছু জানে। মা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে।

ভারি গলায় আরম্ভ করে রীবিন, 'দুনিয়ায় সবই তো কড়ির খেলা। জন্মাতে কড়ি, মরতেও কড়ি। বিনা পয়সায় কিছুটি পাবে না। এই এত যে সব বই-পত্তর, এর কড়ি আসে কোত্থেকে বলতে পারো?'

মা একটা বিপদ আঁচ করে নেয়। আস্তে আস্তে বলে:

'না, আমি আর কী করে জানব।'

'আমিও বুঝতে পারিনে। তারপর এসব লেখে কে?'

'বিদ্বান লোকেরাই লেখে, আর কে লিখবে...'

দাড়ি-ঢাকা মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

'ভদ্দরলোকেরাই গো, ভদ্দরলোকেরাই। তারাই লিখে সব ছাড়ছে চারদিকে। কিন্তু আবার ভদ্দরলোকদের বিরুদ্ধেই যে লেখা সব! বুঝিয়ে দিতে পারো, গাঁটের কড়ি খরচ করে এরকম নিজেদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের খেপিয়ে দিয়ে লাভটা কী?'

মা'র চোখ পিট পিট করে। একটা আতঙ্কের চীৎকার বেরিয়ে আসে মুখ থেকে।

'কী ভাবছ, কী?..'

ভালুকের মতো চেয়ারে ধীরে ধীরে ঘুরে বলে রীবিন, 'যা বলেছ! হঠাৎ যখন কথাটা মগজে ঢুকল, চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে গেল আমারও!'

'কিছু আঁচ করেছ?'

'ধোঁকা, সব ধোঁকা! অবশ্যি হাতে নাতে প্রমাণ কিছুই নেই। তবে বেশ বুঝতে পারছি — বেটাদের শয়তানি সব। ভদ্দরলোকেরা তো ধড়িবাজ কম নয়! আমি হক্ কথাটা জানতে চেয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি সব। ভদ্দরলোকদের ধার পাশ দিয়েও যাচ্ছে না আর এ শর্মা। ব্যাটারা দরকার হলেই ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে গট্ গট্ করে যেন পুলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে...'

রীবিনের বিষণ্ণ কথাগুলো যেন মায়ের বুকে এসে বেঁধে।

আর্তস্বরে বলে ওঠে মা, 'যীশু! যীশু! পাশা কি এসব বুঝতে পারছে না? অন্যেরাও কি পারছে না?..'

চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইয়েগর, নিকলাই ইভানভিচ্, সাশার মুখ। সাচ্চা মানুষের গম্ভীর মুখ — মায়ের মন বলে — না-না — হতে পারে না...

মাথা নেড়ে বলে, 'বিশ্বাস করি না আমি। আমি জানি ওরা সত্যনিষ্ঠ।'

'কাদের কথা বলছ?' চিন্তিত মুখে রীবিন বলে।

'সব্বার কথাই বলছি... সব ক'জনকেই তো দেখেছি আমি!'

'ঠিক দিকে তোমার নজর যায়নি। আর একটু দূর পানে তাকাও দেখি।' মাথা নীচু করে বলে ও। 'হতে পারে আমাদের কাছের মানুষেরা কিচ্ছুটি জানে না। নিজেদের বিশ্বাস নিয়েই তারা আছে। কিন্তু হতেও তো পারে ওদের পেছনে স্বার্থপর সব মানুষ আছে। নইলে বাবা অমনি অমনি নিজেদের গাল পাড়ে...'

তারপর আবার বলে, 'দেখ, এই সব ভদ্দর আদমিদের দিয়ে ভালো কিছু হবে না।' কৃষক মানুষ, অনেক কষ্ট করে কথাটা ওকে মেনে নিতে হয়েছে, এমনি সুর ওর কথায়।

আবার সংশয়ে মন দোলে মায়ের। জিজ্ঞাসা করে:

'তাহলে কী করতে চাও এখন?'

মায়ের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে থাকে রীবিন। তারপর বলে:

'আমার কথা শুধচ্ছ? ভদ্দর লোকদের কাছ থেকে তফাত থাকো... ব্যস্। বুঝলে কিনা!'

আবার আঁধার হয়ে ওঠে তার মুখ। নীরব হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার বলে:

'ছোকরাদের সঙ্গে থেকেই কাজ করতে চেয়েছিলাম। পারতামও। লোককে কেমন করে বোঝাতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু ওদের আর বিশ্বাস নেই। কাজেকাজেই চলে যাব।'

মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। কী যেন ভাবে।

'একাই যাব আমি। গাঁয়ে, শহরতলিতে, সব জায়গায় গিয়ে লোক ক্ষেপাব। নিজেদের ভাগ্য ওদের নিজের হাতে নিতে হবে। একবার যদি কথাটা বোঝে ওরা, খুঁজে-পেতে নিজেরাই পথের হদিশ করে নেবে। আমার কাজ শুধু ওদের সমঝানো। ওদের আশা বল, মগজ বল, বেবাক ওদের নিজেদের মধ্যে বুঝলে কিনা।'

বড় মায়া হয় মায়ের, ভয়ও করে লোকটার জন্য। লোকটাকে কোনও দিন ভালো লাগেনি। আজ হঠাৎ মনে হয় বেশি আপনার জন হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত নরম স্বরে বলে:

'ধরবে যে...'

রীবিন তাকায় মায়ের দিকে, তার পর শান্ত স্বরে বলে:

'হ্যাঁ ধরবে। কিন্তু আবার ছাড়বে। আবার আরম্ভ করব আমি...'

'চাষীরাই ধরিয়ে দেবে তোমায়, তারপর ঠুসবে গারদে...'

'মেয়াদ ফুরোলে বেরব! তখন আবার শুরু করব। আর চাষীদের কথা বলছ? কবার ধরবে ওরা? একবার, দুবার। তারপর নিজেরাই দেখবে আমায় বেঁধে না রেখে আমার কথা শোনাই ভালো। আমি বলব, বাপুহে! বিশ্বাস না হয় নাই করলে, শোনই না দুটো কথা। আর কথা শুনলে বিশ্বাস করবে।'

ধীরে ধীরে, যেন প্রত্যেকটি শব্দকে ওজন করে করে উচ্চারণ করে।

'ঢের দেখলাম এ কয়দিনে। শিখেওছি একটু আধটু...'

মাথা নাড়তে নাড়তে অতি বিষণ্ণভাবে বলে মা, 'কিন্তু মিখাইলো ইভানভিচ, সর্বনাশে পড়বে যে!'

কালো গভীর চোখ দুটো তুলে চায় মায়ের দিকে। উৎসুক দৃষ্টি, কী যেন শুধতে চায়। পালোয়ান-মার্কা দেহটা সামনের দিকে নুয়ে আসে; হাত দুটো আঁকড়ে ধরে চেয়ারটাকে। কালো দাড়ির ফ্রেমের মধ্যে মুখখানা ফ্যাকাশে ঠেকে।

'বীজের কথা যীশু খৃষ্ট কী বলেছেন মনে করে দেখ। — নতুন করে জন্মাবার জন্যই বীজ মরে। কিন্তু অত শীগ্গির আমার মরণ হবে না। সেয়ানা আছি আমি।'

উসখুস করতে করতে চেয়ার থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

'যাই দেখি একবার পানশালায়। লোকজনের সঙ্গে দুদণ্ড বসি। খখল বুঝি আর আসে না। এসেই আবার পুরনো জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছে?'

মা একটু হেসে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।'

'বেশ বেশ! তাকে বলো আমার কথা...'

ধীরে ধীরে পাশাপাশি হেঁটে রান্নাঘরে যায় দুজন। দুএকটা সামান্য কথা হয়, কিন্তু কেউ চোখ তুলে কারো দিকে তাকায় না।

'আসি তাহলে।'

'এসো। কারখানায় নোটিস্ দিচ্ছ কবে?'

'দেওয়া হয়ে গেছে।'

'কবে যাচ্ছো?'

'কাল সক্কাল বেলা। আচ্ছা এবার চলি।'

সদর দরজার কাছে এসে জবুথবু হয়ে দেহটা নুয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারান্দায় বেরল।

মায়ের বুকের মধ্যে কী একটা সংশয় দোল দিয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনে — ভারি পায়ের শব্দগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। নিঃশব্দে

ফিরে এসে পাশের ঘরে গিয়ে জানালার পরদা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে মা। স্তব্ধ নিঝুম আঁধার বাইরে।

'রাত্তিরেই বাঁচি!' মনে মনে বলে মা।

চলে-যাওয়া মানুষটির জন্য মায়ের বুকটা টনটন করতে থাকে। কী চওড়া, শক্ত লোকটা!

আন্দ্রেই ফিরল খুশিতে টগ্‌বগ্‌ করতে করতে।

মা রীবিনের কথা বলে। ও চেঁচিয়ে ওঠে:

'যেতে দিন, যেতে দিন। ওর খুশিমত ঘুরুক, ফিরুক, লোককে জাগাক। আমাদের সঙ্গে কদম ফেলে চলা ওর মুশকিল। এখনও সেই নিজের, চাষীসুলভ ধ্যান-ধারণায় মগজ পোরা। আমাদের কথা সেখানে স্থান পায় না...'

'ভদ্দরলোকেদের কথা বলছিল,' অতি সাবধানে বলে মা, 'একেবারে ফেল্‌না কথা নয় বোধহয়। যদি ঠকায়!'

'কী, মনে লেগেছে?' হাসতে হাসতে বলে আন্দ্রেই। 'সত্যি নেন্‌কো, আমাদের টাকা যদি থাকত! কী ভাবে চলছি, জানেন? চলছি অন্য লোকের টাকায়। নিকলাই ইভানভিচ্‌ পঁচাত্তর রুবল পায় মাসে। তা থেকে আমাদের পঞ্চাশ রুবল দেয়। অন্যরাও তাই করে। কত সময় ছাত্ররা আধপেটা খেয়েও এক এক কোপেক করে জমিয়ে আমাদের হাতে তুলে দেয়। তা, ভদ্দরলোক নানান রকম আছে। কেউ তোমাদের দিকে ফিরেও চাইবে না; কেউ ঠকাবে; কিন্তু যারা সেরা তারা আমাদের সঙ্গে ভিড়ে যাবে...'

হাততালি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আবার বলে যায়:

'আমাদের চূড়ান্ত জয় এখনও বহু দূরে — ঈগল-পাখী যতদূর ওড়ে তার চেয়েও অনেক দূরে। তবু পয়লা মে'র দিনে একটা ছোটখাট উৎসব করব। মজা হবে।'

রীবিনের কথায় মায়ের মনে যে ভয় হয়েছিল, আন্দ্রেইয়ের কথায় তা দূর হয়ে গেল। মাটির দিকে চেয়ে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে ঘরময় পায়চারি করে বলতে লাগল খখল:

'এক এক সময় বুক এমন ভরে ওঠে মা। যেখানেই যাও, সবাইকে মনে হয় কমরেড্‌। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! মনে হয় সবার বুকে ওই এক আগুন জ্বলছে। সবাই সাচ্চা মানুষ, সবাই হাসিখুশি, বিনা কথায় তাদের বোঝাবুঝি হয়ে যায়... আলাদা আলাদা সুর বাজছে তাদের বুকের মধ্যে, তবু সব মিলিয়ে একটা সমবেত সংগীতের মতো। সুর নয়তো যেন ঝরণা।

সব গিয়ে একই নদীতে মিশছে। আর সেই নদী চওড়া হয়ে মুক্তছন্দে নব-জীবনের আনন্দ-সাগরে গিয়ে পড়ছে...'

নিশ্চল হয়ে বসে থাকে মা। নড়তে সাহস হয় না, পাছে খখলের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। নিবিষ্ট চিত্তে শোনে ওর কথা। আর সবায়ের চেয়ে ওর কথাই মা বেশি মন দিয়ে শোনে। অমন সহজ করে বলতে কেউ পারে না। কথাগুলো একেবারে সোজা গিয়ে বুকের মধ্যে পেঁছয়। পাভেল তো আগামী দিনের স্বপ্ন নিয়ে কখনো কিছু বলে না। অথচ আগামী দিনের দুনিয়ার মানুষের ঘরে ঘরে আনন্দের সওগাত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে খখলের কথায়, তার প্রাণের একটা অংশ যেন ভবিষ্যতে পড়ে আছে। পাভেল আর তার কমরেড্‌দের জীবন, তাদের কাজ-কর্মের অর্থ মা এরি মধ্যে খুঁজে পায়।

মাথাটাকে মস্ত ঝাঁকানি দিয়ে খখল বলে:

'তারপর চমক ভাঙে। দেখি চারদিক হিম, থম্‌থমে আর আবর্জনার স্তূপ। সবাই শ্রান্ত ক্লান্ত, খিটখিটে রুক্ষ মেজাজ...'

ব্যথায় গলাটা ভারি হয়ে আসে:

'ব্যথার কথা হলেও মা, মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। বরঞ্চ ভয় করবেন। এমন কি ঘৃণা করবেন। মানুষের দুটো দিক আছে। হয়তো মানুষকে আপনি শুধু ভালোবাসতেই চাইবেন। কিন্তু পারবেন কী করে? যে-মানুষ বুনো জন্তুর মতো কেবলি আপনাকে তাড়া করবে, মনে করবে না যে আপনি মানুষ, আপনার মধ্যেও মানুষের আত্মা আছে, আপনার মানুষের চেহারাটা অবধি থেঁতলে বিকৃত করে দেবে, তাকে ক্ষমা করবেন কী করে? না, ক্ষমা করা চলে না! এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয় — নিজে না হয় সব সইলে। কিন্তু অত্যাচারীর কাজে সায় দেওয়া কখনো চলবে না। মানুষ ঠ্যাঙাবার কায়দা আর আমার পিঠের ওপর মক্‌শো করবে — তা সইব কেমন করে?'

ওর চোখে যেন একটা হিম শিখা জ্বলে ওঠে। মাথাটা বেঁকে যায় একরোখাভাবে। আরো দৃঢ় ভাবে বলে:

'আমায় স্পর্শ করুক আর না করুক, অন্যায়কে বরদাস্ত করবার অধিকার আমার নেই। সংসারে আমি একা নই। আজ হয়ত আমায় কেউ মেরে গেল। আমি হেসে বললুম, যাক্‌গে, ও কিছু না। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। আমার ওপর তাকতটা পরীক্ষা করে, কাল হয়ত গিয়ে আর একজনের গায়ের চামড়া

তুলে দেবে। তাই সকলকে সমান চোখে দেখা যায় না। নিজের মনটাকে কড়া পাহারায় রাখা উচিত। এটা আমার আপন, এটা আমার পর—এমনি করেই বেছে নিতে হয়। ব্যাপারটা আরামদায়ক নয় মোটেই, তাই না? কিন্তু এটাই সত্যি।'

কেন জানি মা'র সাশার কথা মনে পড়ে, আর মনে পড়ে সেই পুলিশ-অফিসারের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মা, 'আচালা আটায় আর কেমন রুটি হবে!..'

'ওই তো মুশকিল, মা!' খখল গলাটাকে উঁচু করে বলে।

'সত্যি তাই।' স্বামীর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে — মস্ত বড় একটা ভারি শেওলা-জমা পাথর যেন, রুক্ষ কালো চেহারা। ভাবতে চেষ্টা করে, নাতাশাকে যদি খখল বিয়ে করে, আর পাভেল সাশাকে, তাহলে কেমন হয়।

আগের কথার জের টেনে উত্তেজিত হয়ে আবার বলে খখল:

'কিন্তু কেন এমন হয়, বলতে পারেন? অত্যন্ত সোজা কথা। এতই সহজ যে হাস্যকর। সব মানুষ সমান স্তরে নেই। সব সমান করে দিয়েই দেখা যাক। মানুষের মনের আর হাতের যা সৃষ্টি, সব কিছুর সমান হিস্সা দাও সবাইকে। কাউকে ভয় দেখিয়ে, হিংসে দিয়ে দাবিয়ে রেখো না; লোভ আর অজ্ঞানতার অন্ধকূপে বন্দী করে রেখো না...'

প্রায়ই এরকম কথা চলে দুজনের মধ্যে।

কারখানায় আবার কাজ হয়েছে নাখদকার। মাইনে এনে সব মায়ের হাতে তুলে দেয়। পাভেলের কাছ থেকে যেমন করে নিত, ঠিক তেমনি শান্তভাবেই নেয় মা।

এক এক দিন চোখে হাসির চমক তুলে বলে খখল:

'একটু পড়ি আসুন না, নেনকো!'

মা হাসে, কিন্তু কিছুতেই আসবে না। আন্দ্রেইয়ের হাসিটায় অস্বস্তি বোধ করে। একটু চটে মনে মনে ভাবে, 'এটা যদি ঠাট্টার ব্যাপারই হয়ে থাকে তো বলতে আসা কেন বাপু।'

কিন্তু প্রায়ই এমনি কথার সব অর্থ জিজ্ঞাসা করে, যা কথাবার্তায় সচরাচর ব্যবহার হয় না। জিজ্ঞাসা করার সময় মুখটা নির্লিপ্ত ঔদাস্যে আরেক দিকে ফেরানো থাকে। আন্দ্রেই আন্দাজ করে গোপনে পড়াশোনা

করছে মা। তার লজ্জাটা বোঝে, আজকাল আর ওর কাছে বই নিয়ে বসার কথা বলে না।

একদিন মা বলল, 'আন্দ্রিউশা, আজকাল ভালো দেখতে পাচ্ছি না যেন। মনে হচ্ছে চশমার দরকার।'

'বেশ তো, রবিবার নিয়ে যাব শহরে ডাক্তারের কাছে, চশমা হবে,' জবাব দেয় আন্দ্রেই।

১৯

তিনবার মা পাভেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইতে গেল, তিনবারই অত্যন্ত ভদ্র মার্জিতভাবে ফিরিয়ে দিলে পুলিশের পাকা-চুল, বেগনি-গাল আর মস্ত-নাক-ওয়ালা জেনারেল।

'আরও সপ্তাহ খানেক অপেক্ষা করতে হবে, মা। তারপর দেখা যাবে। এখন তো কোনো মতেই হয় না...'

গোলগাল মোটা চেহারা লোকটার; দেখে মনে হয় একটা টস্‌টসে টোপা জাম অনেক দিন পড়ে থেকে ছাতা ধরেছে। হলদে ধারাল একটা কাঠি নিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে শাদা দাঁতগুলো খোঁটে হরদম; সামান্য সবুজ ছোট চোখ দুটোয় অমায়িক হাসি; গলার স্বরটা হামেশাই বেশ মোলায়েম ভদ্র।

খখলকে বলে মা, 'লোকটা ভদ্র। সর্বদা কেমন হাসি মুখ...'

'তা বটে,' জবাব দেয় খখল, 'ওদের সবাই অমনি ভদ্র। মুখের হাসি ঘোচে না ওদের। ওদের কাছে হুকুম আসে — শ্রীমান অমুক সাতিশয় বুদ্ধিমান ও সাধু ব্যক্তি, কিন্তু আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। অতএব ইহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়াইবেন। — এবং এরা হেসে ফাঁসি দেয়। তারপর আবার হাসতে থাকে।'

'আমাদের এখানে খানাতল্লাসী করতে যে অফিসারটা এসেছিল, সে লোকটা অনেক সহজ। এক নজরেই বোঝা যায় লোকটা কুত্তার মতো...'

'ওরা কেউ মানুষ নয়। সব হাতুড়ী। মানুষকে বেহুঁশ করে রাখা ওদের কাজ। স্রেফ যন্ত্র। ওদের দিয়েই তো আমাদের মতো মানুষদের শায়েস্তা করে। এমনি শায়েস্তা করে যাতে আমরা একেবারে ওদের

হাতের পুতুল বনে যাই। আমাদের চালাবার মতো করেই ওদের গড়া হয়, বিনা প্রশ্নে নির্বিচারে ওরা হুকুম তামিল করে।'

ছেলের সঙ্গে দেখা করার হুকুম মিলল শেষ পর্যন্ত রবিবার। জড়সড় হয়ে মা গিয়ে বসল জেল-আফিসের এক কোণে। ছোট নোংরা ঘরটা। ছাদ এসে প্রায় মাথায় ঠেকে। আরও কয়েকজন এসেছে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে। বোঝা গেল এরা এর আগেও এসেছে এখানে। আসা যাওয়ায় পরিচয় হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। আস্তে আস্তে মাকড়সার জাল বোনার মতো করে আলাপের জাল বুনে চলেছে।

'শুনেছেন ব্যাপার?' হাঁটুতে হ্যান্ড ব্যাগ রাখা থলথলে মুখ মোটাসোটা একটি স্ত্রীলোক বলল, 'আজ প্রার্থনার সময় গাইয়ে ছেলেদের একজনের কান টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে গির্জার সেক্সটন...'

পেন্সন-পাওয়া অফিসারের উর্দি-পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেশ জোরে কেশে টিপ্পনী কাটেন, 'ভারি শয়তান ও ছোঁড়াগুলো!'

ওধারে ওই টাক-পড়া বেঁটে মানুষটা, খাটো ঠ্যাং, ল্যাংলেঙ্গে দুই হাত, থুত্নিটা যেন বেরিয়ে এসেছে, অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছে আর ভাঙা গলায় ভারি উত্তেজিত হয়ে বলছে:

'দিন দিন সব জিনিসপত্রের দাম চড়ছে। তাই মানুষও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। মাঝারি রকমের গরুর মাংস, তার দাম কিনা পাউন্ড পিছু চোদ্দ কোপেক, আর রুটি উঠল গিয়ে আড়াই কোপেকে...'

কয়েদীরা আসে যায়। সকলের পরনে সেই এক ছাই রঙের পোশাক আর ভারি চামড়ার জুতো। আধো-আলো আধো-অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে সবাই চোখ পিটপিট করে। একজনের পায়ে বেড়িও ছিল।

জেলের সব কিছুই এমন অদ্ভুত রকমের শান্ত আর সাদাসিধে যে অস্বস্তি লাগে দেখে। মনে হয় এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানকার মানুষগুলো। একদল বন্দী-জীবনকে নসীব বলে মেনে নিয়ে চুপচাপ মেয়াদ পালন করছে, আর একদল পাহারা দিয়ে চলছে অলসভাবে, অন্য একদল ক্লান্তভাবে নিয়মমাফিক আসে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। মায়ের মন আর ধৈর্য মানতে চায় না। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় চারদিকে। অবাক হয়ে যায় জায়গাটার বিষণ্ণ সরলতায়।

পাশেই বসেছিল এক বৃদ্ধা। মুখের চামড়া কুঁচকে কুঁকড়ে গেছে কিন্তু চোখ দুটিতে বয়সের ছোঁয়া লাগেনি। রোগা ঘাড় ফিরিয়ে সকলের কথা শুনতে যায়, সকলের ওপর ঘুরে বেড়ায় ওর অদ্ভুত চটুল দৃষ্টি।

পেলাগেয়া নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করে:

'কাকে দেখতে এসেছেন?'

'ছেলেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত সে।' বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলে উঁচু গলায়, 'আর আপনি?'

'আমিও ছেলেকেই দেখতেই আসছি। ও মজুর, কারখানায় কাজ করে।'

'কী নাম?'

'ভ্লাসভ।'

'এ নাম তো শুনিনি কোনোদিন। অনেক দিন আছে?'

'প্রায় সপ্তাহ সাতেক হল...'

বৃদ্ধা বলে, 'আমার ছেলে — ন' মাস।' ওর স্বরে যেন গর্বের অদ্ভুত একটা আভাস।

টেকো লোকটি বক্‌বক করে বলে, 'লোকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে... সবাই উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে। সবাই চ্যাঁচাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। অথচ মানুষের দাম নামছে। হেস্তনেস্ত করার লোক নেই।'

'ঠিক বলেছেন,' অফিসার বলে, 'সত্যি তাই। এখন একটা জবরদস্ত গলার হাঁক চাই — চুপ করো! বুঝলেন কিনা... জবরদস্ত গলা চাই...'

জোর জমে ওঠে আলাপ; সবাই যোগ দেয় তাতে। জীবন সম্পর্কে নিজের নিজের মতামত জানাতে সবাই ব্যস্ত। কিন্তু কথা কয় চাপা স্বরে। মায়ের কেমন অস্বস্তি লাগে। এদের সঙ্গে তার মেলে না। নিজের বাড়ীতে কথাবার্তা অন্য রকম, অনেক স্পষ্ট, অনেক সহজ-সরল। তাছাড়া বাড়ীতে ওরা মুক্ত-কণ্ঠে কথা কয়।

স্থূলবপু, চৌকোণা লাল দাড়ি জেলর এসে নাম ডাকে মায়ের, ওকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখে নেয়। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যায়, বলে, 'আমার সঙ্গে এসো...'

লোকটার পা তাড়াতাড়ি চলে না। মায়ের ইচ্ছা হয় পেছন থেকে ধাক্কা মারে। ছোট্ট একটা ঘরে পাভেল দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে। হাতখানা ধরে এসে মা। একটু হাসে, চোখের পাতা দ্রুত ওঠানামা করে। মুখ দিয়ে কথা সরে না। খালি চাপা গলায় বলে:

'এই যে... ওরে... ওরে...'

পাভেল মায়ের হাত চাপতে চাপতে বলে, 'শান্ত হও মা।'

'না, কিছু না।'

একটা নিশ্বাস ফেলে জেলর বলে:

'মা শোন! দূরে দূরে দাঁড়াতে হবে যে একটু!' তারপর সশব্দে একটা হাই তোলে।

মা'র শরীর কেমন আছে, বাড়ীর কথা, একথা-সেকথা জিজ্ঞাসা করে পাভেল... কিন্তু আরো কিছু শুনতে চায় মা। ছেলের চোখের দৃষ্টিতে খোঁজে না-শুধনো প্রশ্ন। কিন্তু কিছুর ইশারা মেলে না। তেমনি শান্ত, ধীর। মুখটা শুধু একটু ফ্যাকাশে হয়েছে, চোখ দুটো যেন আরো বড় বড় দেখাচ্ছে।

মা বলে, 'সাশা তার নমস্কার জানাতে বলেছে তোকে।'

পাভেলের চোখের পাতা চমকে ওঠে, মুখখানা কোমল হয়ে যায়। হাসি ফোটে। মায়ের বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে ওঠে একটা তীব্র ব্যথায়।

'তোকে কখন ছাড়বে ওরা?' একটু বিরক্তির সঙ্গে শুধয় আহত স্বরে, 'কেন যে তোকে আটকে রেখেছে, বুঝিনে বাপু। সেই কাগজগুলি তো আবার পড়ছে কারখানায়...'

পাভেলের চোখ আনন্দে জ্বলে ওঠে। 'আবার?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে।

'ওসব আলোচনা নিষেধ এখানে।' ঝিমোন স্বরে বলে জেলর, 'খালি বাড়ী ঘরের কথা, ব্যস...'

মা প্রতিবাদ করে বলে, 'এ বুঝি পারিবারিক কথা হল না?'

'তা বলতে পারিনে। তবে ওসব আলাপ করার হুকুম নেই এখানে।' নিরুৎসুক জবাব আসে জেলরের।

পাভেল বলে, 'বাড়ীর কথাই বলো মা। কী করছ এখন?'

মায়ের চোখে একটা বাল-সুলভ দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে যায়:

'জানিস? আমি কারখানায় নিয়ে যাই এসব...'

একটু থেমে হেসে বলে চলে, 'এই বাঁধাকপির ঝোল, পরিজ, আরো কত কী সব খাবার জিনিস। মারিয়া রাঁধে, আমি বেচতে নিয়ে যাই...'

পাভেল বোঝে। চুলের মধ্যে হাত চালায়। চাপা হাসিতে মুখ কেঁপে ওঠে।

'যাক ভালোই হয়েছে। কাজ থাকলে মন খারাপ হয় না।' ছেলের এত কোমল কণ্ঠ কখনও শোনেনি মা।

'সেই কাগজগুলো পাওয়া যেতে আমাকেও তল্লাসী করে ছেড়েছে,' মা বলে একটু অহঙ্কার করে।

'ফের!' জেলরের স্বর এবার একটু যেন আহত, 'বলেছি না এসব নিষেধ এখানে! লোককে আটকে রাখা হয় যাতে বাইরের ব্যাপার জানতে না পারে। আর সেই বাইরের কথাই আবার তুমি তুলছো! কোন্ কথা বলা বারণ তা বোঝা দরকার!'

পাভেল বলে, 'থাক মা। মাতভেই ইভানভিচ ভারি ভালো লোক। ওঁকে চটিও না। খুব খাতির আমার সঙ্গে। অন্যদিন এখানে থাকে বড় সাহেবের সহকারী। আজকে দৈবাৎ উনিই এখানে আছেন।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জেলর বলে, 'সময় হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, এসো মা। মনটন খারাপ করো না। ছেড়ে দেবে শীগ্গিরই...'

জড়িয়ে ধরে চুমু খায় মাকে। আনন্দে বিচলিত হয়ে কান্না আসে মায়ের।

'বাস্ বাস্। চলো এবার।' বলল জেলর, তারপর মাকে নিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলে:

'কেঁদো না! শীগ্গিরই ছাড়বে। সব্বাইকে ছেড়ে দিচ্ছে... এক তিল জায়গা নেই এখানে...'

বাড়ী ফিরে মা এক গাল হেসে সব কথা বলে খখলকে। ভুরু দুটো কাঁপতে থাকে ওর।

'খুব কারসাজি করে বলেছি। ঠিক বুঝতে পেরেছে। নইলে অমন আদর, অমন কথার স্বর তো দেখা যেত না। কোনো দিন অমন করেনি!' বলতে বলতে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে একটা।

খখল হাসে। বলে, 'আপনি যে কী! মানুষ কত কিছু চায় আর মায়েরা চায় খালি আদর কাড়তে...'

'না না, দেখতেন যদি আর যারা এসেছিল।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে মা, 'সব ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেগুলোকে জেলে পুরে রেখেছে। কিন্তু কেমন করে সব আসে, বসে থাকে, রাজ্যের কথা নিয়ে বকবক করে। শিক্ষিত লোকেরাই এমন হলে বোকা-মুখ্যুদের কাছ থেকে আর কী আশা করেন?..'

'ব্যাপারটা খুবই সোজা,' অভ্যস্ত কায়দায় মুচকে হেসে বলে খখল, 'আইন জিনিসটা আমাদের চেয়ে ওদের বেলায় নরম, আর আইনের ফ্যাঁকড়াও আছে ওদের জন্যই। তাই নিজেরা যখন আইনের প্যাঁচে পড়ে তখন মুখ ভ্যাংচায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। নিজের হাতের লাঠি পিঠে পড়লে ব্যথাটা একটু কমই বাজে!'

২০

সেদিন সন্ধে বেলা মা বসে মোজা বুনছে আর খখল পড়ে শোনাচ্ছে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যে দাস-বিদ্রোহের কাহিনী। দরজায় খুব জোরে ধাক্কা দিল কে। খখল গিয়ে খুলে দিল। ভেসভ্‌শিচকভ্‌। বগলে ছোট্ট একটা পুঁটলি। টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলা, হাঁটু পর্যন্ত কাদা।

'যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। আলো দেখলাম। ঢুকে পড়লাম। ভাবলাম দেখা করে যাই। সোজা জেল থেকে আসছি।'

মায়ের হাতে সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে অদ্ভুত স্বরে বলে:

'পাভেল প্রণাম জানিয়েছে...'

বসল ভেসভ্‌শিচকভ্‌, কেমন একটা অনিশ্চিত ভঙ্গীতে। সারা ঘরটা পাঁতি পাঁতি করে দেখে। দৃষ্টিতে তার স্বাভাবিক বিষাদ আর সংশয়ের ছায়া।

মায়ের কোনো কালে ভালো লাগেনি ওকে। ওর টোল পড়া নেড়া মাথা আর ছোট ছোট চোখগুলো দেখে কেমন যেন ভয় করত সর্বদা। কিন্তু আজ মা খুশি হয়ে উঠল ওকে দেখে। মায়ের কথায় হাসিতে স্নেহ ঝরে পড়ল।

'কী রোগা হয়ে গেছ! একটু চা দিই ওকে আন্দ্রিউশা!'

রান্নাঘর থেকে হেঁকে বলে খখল:

'সামোভার জ্বালিয়ে দিচ্ছি।'

'পাভেল কেমন আছে? তোমার সঙ্গে আর কাউকে ছেড়েছে?'

মাথা নীচু করে নিকলাই।

'না, একা আমাকেই। পাভেল অপেক্ষা করছে। ধৈর্য আছে বটে।' তারপর মাথা তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে চাপা দাঁতের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বলে:

'আমি ওদের বলি, ব্যস ছেড়ে দাও আমাকে!.. না যদি ছাড়ো

বাবা, তবে কাউকে খুন করব, নিজেও খুন হব। তারপর ছেড়ে দিল।'

অস্পষ্টভাবে কী যেন বলে মা, সরে আসে তার কাছ থেকে। লোকটার কোঁচকান চোখের ধারাল দৃষ্টির সামনে অনিচ্ছায় চোখ বুজে ফেলে। রান্নাঘর থেকে খখল চ্যাঁচায়:

'ফিওদর মাজিন কেমন আছে হে? কবিতা লেখে?'

'হ্যাঁ। ওসব বুঝিটুঝি নে।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে নিকলাই। 'নিজেকে কী ভাবে ও? ক্যানারী পাখী? খাঁচায় রাখো তাও গান গাইবে। কিন্তু যাক্‌গে—বর্তমানে এটুকু বুঝছি যে আমার বাড়ী যাবার ইচ্ছে নেই...'

মা বলে, 'কী আছে বাড়ীতে? শূন্যপুরী, উনুনে আগুন নেই। ঠাণ্ডায় জমে আছে সব...'

ভেসভ্‌শিচকভ কিছু বলে না, শুধু চোখ কোঁচকায়। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটা সিগারেট ধীরে সুস্থে জ্বালিয়ে মুখে দেয়। তার পর বিষণ্নভাবে হেসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কেমন করে ধূসর ধোঁয়াগুলো পাকিয়ে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

'তা হবে। সবই জমে আছে হিমে। গিয়ে দেখব, আরসোলা আর ইঁদুর জমে পড়ে আছে মেঝের এখানে ওখানে। রাতটা আমায় থাকতে দেবে এখানে, পেলাগেয়া নিলভনা?' মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করে মায়ের দিকে না তাকিয়ে।

'নিশ্চয়।' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে মা। ওর বড় অস্বস্তি লাগে কেন জানি।

'আজকাল বাপ-মায়ের জন্য ছেলেকে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়...'

চমকে উঠে শুধয় মা, 'কী বলছ?'

মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে ও। বসন্তের দাগওয়ালা মুখটাকে মনে হয় অন্ধ মানুষের মুখ।

একটা সশব্দ নিশ্বাস ফেলে আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে নিকলাই:

'বলছিলাম বাপ-মায়ের জন্য ছেলেকে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়। কই, তোমার জন্য পাভেলের তো কখনো তা হবে না। অথচ আমি বাপের জন্য লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। অমন বাপের বাড়ীতে আর পা দিচ্ছি নে... আমার বাপ নেই... ঘর নেই... পুলিশ নজরবন্দী করে আমাকে ছেড়ে না দিলে আমি চলে যেতাম সাইবেরিয়ায়... সেখানে যত লোককে ওরা চালান করেছে, তাদেরকেই মুক্ত করে দিতাম, তাদের পালাবার ব্যবস্থা করতাম...'

মায়ের স্পর্শকাতর হৃদয়টা ওর ভেতরের যাতনা বোঝে, কিন্তু তবু মনে দরদ জাগে না।

চুপ করে থাকলে হয়ত মানুষটা ভাববে কিছু একটা, তাই বলে মা, 'হ্যাঁ, এমন যদি হয়... তবে অন্য কোথাও যাওয়াই ভালো।'

আন্দ্রেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে হাসতে হাসতে:

'কী নিকলাই, কী এত প্রচার করছ?'

উঠতে উঠতে মা বলে, 'যাই খাবার জোগাড় করিগে...'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ খখলের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে ওঠে নিকলাই:

'কতগুলি মানুষকে খুন করে ফেলা দরকার বলে মনে করি।'

'হুঁ। কেন বল তো?' খখল জিজ্ঞাসা করে।

'স্রেফ্ দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার...'

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খখল তাকিয়ে থাকে নিকলাই'এর দিকে পকেটে হাত রেখে। ওর রোগা লিক্‌লিকে দেহটা দোল খায়। নিকলাই বেশ আঁটসাঁট হয়ে বসে আছে চেয়ারে। ওকে ঘিরে ঘিরে সিগারেটের ধোঁয়ার জাল তৈরী হচ্ছে। লালের ছোপ পড়ে দাগড়া দাগড়া হয়ে উঠেছে তার ধূসর মুখটা।

'ইসাই গর্‌বভ'এর ঘাড়ে গর্দানে আলাদা না করেছি তো আমার নাম নেই!'

'কেন, বল তো?'

'ব্যাটা নিজে টিকটিকি, আর আমার বাপটার মাথাটাও খেল। তার জন্য বাপও টিকটিকি হতে চায়।' বিষণ্ণ ঘৃণার সঙ্গে বলে ভেসভ্‌শিচকভ।

'এই কথা!' বলে ওঠে খখল। 'কিন্তু তাতে তোমার কীহে? ও অপবাদ তোমায় দেবে শুধু নেহাৎ মূর্খরা!..'

গোঁজ হয়ে নিকলাই বলে, 'বোকা চালাক সব সমান। সব দেখা আছে। এই তোমার আর পাভেলের কথা বলছি। দুজনেই তো খুব চতুর। বল তো শুনি একবার, তোমাদের কাছে কি আমি ফিওদর মাজিন বা সাময়লভের সমান? বা তোমরা নিজেদের যে চোখে দেখ, পার তেমনি করে আমায় দেখতে? মিথ্যে কথা বলো না, বাবা। বিশ্বাস করব না... সবাই আমায় একটেরে ঠেলে রেখেছে...'

খখল ওর পাশে বসে। অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে:

'তোমার মনটা ব্যথায় ভরে আছে, নিকলাই।'

'হ্ুঁ! আর তোমাদেরও ঠিক তাই... রোগী সবাই। খালি রোগের তফাৎ। তোমরা ভাব তোমাদের ব্যথাটা আমার চেয়ে অনেক উ'চু দরের। নইলে সব শালাই সমান। বল তুমি কী বলতে চাও! শ্বনি!'

ওর তীক্ষ্ম চোখ দ্বটো আন্দ্রেইয়ের ম্বখের ওপর যেন বি'ধে থাকে। দাঁত বের করে জবাবের অপেক্ষা করে নিকলাই। লালের ছাপ লাগা ম্বখের ভাব এতটুকু বদলায়নি। মোটা ঠোঁট দ্বটো মাঝে মাঝে কাঁপতে থাকে। কিসের জ্বালায় যেন।

ভেসভ্শিচকভের জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে ওর অন্তরঙ্গ নীল চোখ দ্বটি তুলে ধরে খখল বলে, 'কী বলব! বলবার কিছ্ব নেই। যার ব্বকে কাঁচা ঘা, তার সঙ্গে তর্ক করা চলে না, ভাই। তাতে তার দ্বঃখই বাড়ে। তা আমি জানি।'

চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলে নিকলাই:

'আমার সঙ্গে তর্ক করা চলে না, তর্ক করতে জানিই না।'

'দেখ, আমি মনে করি আমরা প্রত্যেকেই ভাঙা কাচের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটছি, দ্বর্যোগে তোমার মতো প্রত্যেকেরই হাঁফ ধরেছে...'

'থাক্—কিছ্ব বলো না আমায়। বলবার মতো কিছ্ব নেই তোমার। আমার ভেতরটা নেকড়ের মতো গোঙাচ্ছে!..' ধীরে ধীরে বলে ভেসভ্শিচকভ।

'না, কিছ্ব বলতে চাইনে। তবে জানি যে এভাবটা কেটে যাবে। একেবারে না হলেও কিছ্বটা যাবে।'

ম্বচকে হেসে নিকলাই'এর কাঁধ চাপড়ে বলে যায় আন্দ্রেই:

'বাচ্চাদের হাম হওয়ার মতো হে। একবার না একবার হবেই সব্বার। শরীরটা শক্ত থাকলেই বাঁচোয়া। দ্বর্বলদের বড় কষ্ট। এও তেমনি। মান্বষ নিজেকে যখন খ্বঁজে পায় অথচ দেখে জীবনে আর তার স্থান নেই তখনই এই রোগেই সে কাহিল হয়। মনে হয়, তোমাকে ভারি উমদা একটা খাবার চীজ মনে করে দ্বনিয়া-শ্বদ্ধ্ব লোক হাঁ করে খেতে আসছে। কিন্তু খানিক বাদেই দেখবে—তুমি নও শ্বধ্ব, মেলাই মান্বষ আছে তোমার মতো। তখন হাঁফ ছেড়ে উঠবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই লজ্জা পাবে এই কথা ভেবে যে, তোমার টিম্‌টিমে ঘণ্টীটি নিয়ে গির্জার ঘণ্টা-ঘরে উঠেছিলে গ্বমর করে। সবগ্বলো ঘণ্টা বাজলে তোমার ঘণ্টীর আওয়াজ শোনাই যেত না। পরে ব্বঝতে পারবে, মিলন সংগীতে তোমার ঘণ্টীটির ক্ষীণ আওয়াজ

কানে আসে, কিন্তু একলা বাজলেই পুরানো ঘণ্টাগুলো স্রেফ তেলের মধ্যে মাছির মতো ডুবিয়ে রাখবে ওকে। বুঝলে তো কী বলতে চাইছি?'

মাথা নেড়ে নিকলাই বলে, 'হয়তো বুঝেছি। কিন্তু বুঝলেও বিশ্বাস করি না।'

হেসে খখল তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে শব্দ করে করে পায়চারি করতে আরম্ভ করে।

'একটা ছেকড়া গাড়ি তুমি। আমিই কি আগে বিশ্বাস করতাম!'

'কেন, ছেকড়া গাড়ি কেন?' খখলের দিকে তাকিয়ে একটু বেজার হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে নিকলাই।

'তুমি দেখতে সেরকম, তাই।'

হঠাৎ মুখটা এতখানি হাঁ করে হো হো করে হেসে ওঠে নিকলাই।

'কী হল, অত হাসছ কেন?' অবাক হয়ে খখল ওর সামনে এগিয়ে আসে।

'এই, মনে হচ্ছিল কী জান? তোমার মনে যে কষ্ট দেয় সে নেহাতই গাধা।' নিকলাই জবাব দেয় মাথা নাড়তে নাড়তে।

'আমার মনে আবার কষ্ট কে দিল?' খখল বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

ভালো-মানুষী আর পিঠ-চাপড়ান ধরনের হাসি হাসে ভেসভ্‌শিচকভ। বলে:

'তা জানি না বাপু। তবে জানি তোমায় যে কষ্ট দেবে সে নিজেই মনে মনে খুব লজ্জা পাবে।'

খখল হাসে, 'এই তাহলে, তা কোথায় চলেছ!'

রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক শুনে খখল উঠে যায়।

নিজেকে একা পায় ভেসভ্‌শিচকভ। চারদিকে চায়। মোটা-চামড়ার তৈরী ভারি বুট-আঁটা পা দুটোকে ছড়িয়ে দেয়। পায়ের থোরাটা টিপে টিপে দেখে; একটা হাত ওপরে তুলে একমনে তেলোটা নিরীক্ষণ করে, তার পর দেখে তেলোর পেছন দিকটা। হলদে রঙের লোমে ঢাকা মোটা মোটা আঙুলগুলো। হাতটা দুলিয়ে উঠে পড়ে।

আন্দ্রেই সামোভার নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে নিকলাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আন্দ্রেইকে দেখে শুকনো হাসি হেসে বলে উঠল:

'নিজের চেহারাখানা অনেক দিন দেখিনি। দেখলেই যে বাবারে-মারে করে পালাবে সব।'

আন্দ্রেই গভীর কৌতূহলে তাকায়। বলে:

'চেহারাটার দিকে হঠাৎ নজর গেল কেন?'

'সাশা বলে মুখই নাকি মনের আয়না,' আস্তে আস্তে বলল ভেসভ্শিচকভ।

'স্রেফ বাজে কথা।' চেঁচিয়ে ওঠে খখল। 'ওর চেহারাখানা কী? নাকটা বঁড়শীর মতো, চোয়ালের হাড্ডিগুলো যেন ছুরির ফলা। কিন্তু ওর মনটা? ঠিক যেন তারা!'

নিকলাই ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে।

তারপর চা খেতে বসে সবাই।

নিকলাই মস্ত বড় একটা আলু নিয়ে রুটিতে নুন ছিটিয়ে চিবতে লাগল ষাঁড়ের মতো। খেতে খেতেই জিজ্ঞাসা করে:

'তারপর এখানকার হালচাল কেমন?' তার মুখ ভর্তি খাবার।

কারখানায় প্রচারের কাজ বাড়ানোর কথাই বলে আন্দ্রেই। নিকলাই আবার বেজার মুখে চাপা গলায় বলে:

'উঃ, বড্ড সময় লাগছে। বড্ড সময়। আরও তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার...'

মা তাকায় ওর দিকে। একটা বিদ্বেষ গুমরে ওঠে মনের মধ্যে।

'জীবন তো ঘোড়া নয় যে চাবুক কষে ছুটনো যাবে।'

নিকলাই মাথা নাড়ে জেদী ভাবে।

'বড় দেরী। ধৈর্য ধরে আর বসে থাকতে পারি না আমি। কী করব বল তো?'

জবাবের আশায় খখলের মুখের দিকে চায়। একটা পরম অসহায়তা ফুটে ওঠে ওর হাতের ভঙ্গীতে।

মাথা নীচু করে বলে আন্দ্রেই:

'আমাদের নিজেদেরও শিখতে হবে, অন্যদেরও শেখাতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের কাজ।'

ভেসভ্শিচকভ জিজ্ঞাসা করে, 'তবে লড়াই শুরু হবে কবে?'

হেসে জবাব দেয় খখল, 'তা জানিনে; তবে এটুকু জানি যে তার আগে বহুবার হারতে হবে আমাদের এবং যতদূর বুঝি, হাতে হাতিয়ার তোলবার আগে মগজগুলোকে সশস্ত্র করতে হবে...'

নিকলাই আবার খাবার দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে। মা গোপন-দৃষ্টিতে ওর চওড়া মুখটা নিরীক্ষণ করে, খোঁজে, ওই ভারি চৌকোন দেহটার মধ্যে ভালো লাগবার মতো কিছু মেলে কিনা।

নিকলাইয়ের তীক্ষ্ম ছোট চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মায়ের ভুরু দুটো কাঁপতে থাকে অপ্রস্তুতভাবে। আন্দ্রেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। হঠাৎ হাসির কথায় মেতে ওঠে, তারপর হঠাৎ শিস দিতে আরম্ভ করে কথার মাঝখানেই।

মায়ের মনে হল, ও বুঝতে পারছে আন্দ্রেইয়ের মনে কিসের অস্বস্তি। নিকলাই গুম হয়ে বসে থাকে। খখল যত কথা জিজ্ঞাসা করে, নেহাত অনিচ্ছায় কাটা কাটা জবাব দেয়।

ছোট্ট ঘরখানায় আবহাওয়া গুমট হয়ে ওঠে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় মা আর আন্দ্রেইয়ের। দুজনেই এক-এক বার চোরা দৃষ্টিতে তাকায় অতিথির দিকে।

অবশেষে উঠে পড়ে নিকলাই। বলে:

'আমি শুতে চাই। জেলে সেই খালি বসে বসে কাটান। হঠাৎ ছেড়ে দিল। চলে এলাম। বড্ড ক্লান্ত আমি।'

রান্নাঘরে শুতে যায় ও। কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে, তারপর সমস্ত শব্দ থেমে যায় যেন লোকটা মরে গেছে। সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলে চুপি চুপি আন্দ্রেইকে বলে মা:

'কী সব সাংঘাতিক জিনিস ওর মাথার মধ্যে...'

'হ্যাঁ মা, গোলমেলে ছেলে, কিন্তু ও থাকবে না বেশি দিন। আমিও এক কালে অমনি ছিলাম।. প্রাণের মধ্যে আগুনটা ভালো করে যখন জ্বলে না তখন অনেক কালিঝুলি দেখা দেয়! আপনি শুয়ে পড়ুন, নেন্‌কো। আমি আর একটু পড়ি, তারপর শোব।'

ঘরের এক কোণে একটা সুতীর পরদা ঝোলান। তার আড়ালে মায়ের বিছানা। অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করে মা। হৃদয়ের গভীর তল থেকে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। তার উষ্ণ রেশটা অনেকক্ষণ কানে আসে আন্দ্রেইয়ের। তাড়াতাড়ি করে বইয়ের পাতা উল্টে চলে, কপালটা উত্তেজিতভাবে রগড়ায়, লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে গোঁফের ডগা পাকায়, পা ঘষে মেঝেতে এদিক থেকে সেদিক। ঘড়িটা টিকটিক করে চলে; বাইরে হাওয়ার হাহাকার।

মায়ের চাপা স্বর শোনা যায়, 'হায়রে ভগবান! এত লোক সংসারে! সবার বুকেই ব্যথা। সুখী মানুষ কি নেই সংসারে?'

খখল জবাব দেয়, 'আছে বৈকি, নেন্‌কো! আছে। আরো অনেক থাকবে অল্প দিন পরেই...'

বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনটা ছুটে চলল। প্রতিদিন নতুন কিছু একটা ঘটে, এখন আর ভয় করে না মায়ের। বাড়ীতে আরো ঘন ঘন কত নতুন মানুষ আসে সন্ধে বেলা। চাপা গলায় কথা বলে আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে। কেমন, ব্যস্তসমস্ত উদ্বিগ্ন ভাব ওদের। তারপর রাত্তির বেলা কোটের কলার তুলে দিয়ে চোখ পর্যন্ত টুপি নামিয়ে নিঃশব্দে সন্তর্পণে ওরা আঁধারে মিলিয়ে যায়। ওদের চাপা উত্তেজনার ভাবটা মা বেশ অনুভব করে। সবাই যেন হাসতে গাইতে চায়, কিন্তু সময় কোথায় ওদের। সব সময় তাড়া। কোথায় যেন যাবার ব্যস্ততা। ওদের মধ্যে কারো কারো গুরু গম্ভীর চেহারা; চোখাচোখা কথা। কেউ কেউ ফুর্তিবাজ, যৌবনের শক্তিতে যেন ঝলমল করছে। কেউ কেউ আবার অত্যন্ত শান্ত, চিন্তাশীল। কিন্তু মায়ের চোখে ওদের সবার মধ্যে মিল আছে — সবাই ওরা সমান দৃঢ়সংকল্প, প্রত্যয়বান। প্রত্যেকটি মুখ একেবারে আলাদা, তবু যেন তারা সবাই মিলে এক হয়ে মিশে যায় আর একজনের শীর্ণ একখানি মুখের সঙ্গে—সেই শান্ত দৃঢ়সংকল্প, গভীর স্বচ্ছ মুখ, গাঢ়-চোখ কোমলে-কঠিনে মিলিয়ে সে এক বিচিত্র দৃষ্টি, যীশু খৃষ্ট যখন এমায়ুস-এর পথে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে যে দৃষ্টি ঝরেছিল, ঠিক সেই রকম।

মা গোনে তাদের সংখ্যা; মনে মনে ছবি আঁকে, ঘিরে আছে এরা পাভেলকে। শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে আছে পাভেল সেই মানুষের অরণ্যে।

একদিন একটি মেয়ে এল শহর থেকে আন্দ্রেইয়ের জন্য একটা পুলিন্দা নিয়ে। চালাক চতুর মেয়ে, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। যাবার সময় মায়ের দিকে তাকিয়ে তার খুশি খুশি চোখ দুটোকে ঝিলমিলিয়ে বলে গেল:

'আসি, কমরেড!'

হাসি চেপে মা বলল, 'আসুন।'

মেয়েটি চলে গেলে হাসিমুখে জানালা দিয়ে দেখতে লাগল নতুন এই কমরেডটির যাওয়া। ছোট ছোট পা ফেলে তড়বড়িয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। ও যেন বসন্তের ফুল, তেমনি সরস তাজা; প্রজাপতির মতোই হালকা ওর দেহ।

মনে মনে বলে মা, 'ওরে মেয়ে, আমি তোর কমরেড্। ভগবান করুন

যোগ্য কমরেড যেন তোর মেলে। তার হাত ধরে সারা জীবন যেন চলতে পারিস।'

কেমন যেন একটা ছেলেমানুষী সারল্য আছে এই শহুরে ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে। মনে মনে পিঠ-চাপড়ান ধরনের হাসি হাসে মা। কী গভীর বিশ্বাস ওদের। দিনে দিনে তার গভীরতা মা দেখছে চোখের সামনে। সংশয়ের রাস্তা থাকে না তাতে। দেখে অবাক লাগে। এই অবাক লাগার মধ্যে কী যে সুখ! ওরা স্বপ্ন দেখে ন্যায়ের জয় হবে। ওদের এই স্বপ্ন এক অদ্ভুত উষ্ণতায় আদরে ভরে রাখে মায়ের বুকটা। ওদের কথা শুনতে শুনতে কী জানি এক অজানা বিষাদে মনটা ছেয়ে যায়, দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। তার মনকে সবচেয়ে নাড়া দেয় ওদের সহজ সরল ভাব, নিজেদের প্রতি মনোরম ঔদাসীন্য।

জীবন সম্বন্ধে ওদের কথাবার্তা এখন অনেকটা বুঝতে পারে মা। অনুভব করে মানুষের দুঃখের আসল গোড়াটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে। ওদের অধিকাংশ চিন্তাগুলোই মা মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবে ওরা যে জীবনকে নিজেদের মতো করে গড়বে, আর সমস্ত মেহনতী মানুষকে নিজেদের আগুনে টেনে আনবার যে যথেষ্ট শক্তি ওদের আছে—সে কথা কেন জানি বিশ্বাস করতে চায় না মন। মনের গভীরে সংশয় থেকে যায়। কী করে হবে? সবাই তো পেট পুরে খাবার চিন্তায় ব্যস্ত। অন্ন জুটলেই একটা দিনের জন্য খাওয়া বাদ দিতে রাজী হবে কি কেউ? কেউ না। তারপর এত কষ্ট সইতেই বা আসবে কজন? আর সে তো এক দিন, দুদিনের কথা নয়। পথের শেষে যে সোনার রাজ্যে মানুষে মানুষে ভাই ভাই হয়ে বাস করে, কটা লোকের চোখে সেটা পড়বে? এমন নানা কারণে এই সব ভালো ভালো ছেলেমেয়েগুলো মায়ের মনে একেবারে শিশুই থেকে যায়, তাদের মুখভরা দাড়ি আর ক্লান্ত চেহারা সত্ত্বেও।

মাথা নেড়ে মনে মনে বলে, "আহা, বাছারে আমার!"

এখন কিন্তু ওদের জীবনের ধারা কী চমৎকার, গভীর, বুদ্ধিদীপ্ত। সুখের কথা বলে, যা নিজেরা জেনেছে তাই মানুষকে শেখাতে প্রাণপাত করে। মা বোঝে, এত বিপদ, ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও কী করে এ জীবন ভালো লাগা সম্ভব। নিজের ফেলে-আসা জীবনটার এঁদো অন্ধকার গলি-ঘুপচির দিকে পেছন ফিরে তাকায়। মোচড় দেয় বুকটার মধ্যে। এই নতুন জীবনে তাকেও দরকার, এই একটা শান্ত চেতনা নিজেরি অজানতে মনে গড়ে উঠেছে।

কোন কাজে যে সে লাগতে পারে একথা আগে কখনো ভাবেনি। এখন পরিষ্কার চোখে দেখতে পাচ্ছে, তাকে অনেকের দরকার। এ এক নতুন ব্যাপার। ভারি ভালো লাগে। হেঁট মাথাটা উঁচু হয়ে ওঠে...

নিয়মিতভাবে কারখানায় ইস্তাহার নিয়ে যায় মা; মনে করে এ ওর কর্তব্য। গোয়েন্দারা ওকে রোজ দেখে; বিশেষ নজর দেয় না। কয়েকবার তল্লাসীর পাল্লায় পড়েছে, কিন্তু সর্বদাই কাগজ কারখানায় পেঁছনোর পরের দিনে। আর যেদিন কিছু থাকে না ঠিক সেই দিনই মা চলাফেরায় এমন ভাব করে যে সন্দেহ হয় রক্ষীদের। তারা ওকে ধরে, তল্লাসী করে, ও রাগ করে, তর্ক করে। দেখায় যেন ভয়ানক অপমান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওদের অপ্রস্তুত করে নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে বুক ফুলিয়ে চলে যায়। এ ভারি মজার খেলা।

ভেসভ্‌শিচকভ কারখানায় কাজ আর পেল না। একটা কাঠ-ব্যবসায়ীর কাছে কাজ জুটে গেল। বস্তিতে নিয়ে যায় কাঠ, তক্তা আর জ্বালানি। মা প্রায় রোজই দেখে ওকে। হয় ভারি একটা ভিজে কাঠের গুঁড়ি, নয় পাঁজা করে বাঁধা কতগুলো তক্তা ঝ্যাঁকর্‌ ঝ্যাঁকর্‌ করতে করতে টেনে নিয়ে চলেছে দুটো পুরনো হাড্ডিসার কালো ঘোড়া। অতিরিক্ত মেহনতে ওদের ল্যাঙল্যাঙে ঠ্যাংগুলো ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপে, মাথাটা অনবরত বিষণ্ণ ক্লান্তভাবে নড়ে। নিষ্প্রভ, জুলুম-সওয়া চোখগুলো মিটমিটিয়ে চায়। নিকলাই পাশে পাশে হাঁটে — ময়লা, ছেঁড়া পোষাক, পাঁচমণী এক জোড়া বুট, টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। আলুথালু চেহারা, ঠিক যেন সদ্য-ওপড়ান একটা গাছের গুঁড়ি। মাটির দিকে তাকিয়ে সে-ও মাথা নাড়ে। ঘোড়াগুলো অন্ধের মতো যখন তখন পথ চলতি মানুষ, গাড়ী-ঘোড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। গালি-গালাজ শাপ-মন্যি বোলতার ঝাঁকের মতো এসে পড়ে নিকলাই-এর ওপর। ও না দেয় জবাব, না তোলে চোখ। তীক্ষ্ণ একটা শিস্‌ দিয়ে চাপা গলায় হাঁকে ঘোড়াদের, 'হট্‌ হট... চল্‌ চল্‌...'

বিদেশী খবরের কাগজ বা নতুন বই-পত্তর এলে পড়বার জন্য আন্দ্রেইয়ের কাছে কম্‌রেডরা জড়ো হয়। নিকলাইও আসে। দু-এক ঘণ্টা চুপচাপ এক কোণে বসে মন দিয়ে শোনে। পড়া শেষ হলে তর্কবিতর্ক চলে অনেকক্ষণ, কিন্তু ভেসভ্‌শিচকভ তাতে যোগ দেয় না। সবাই চলে গেলে বিরস মুখে আন্দ্রেইকে জিজ্ঞাসা করে:

'কার দোষ সবচেয়ে বেশি?'

'"এটা — আমার" যে প্রথম মুখ থেকে বার করেছিল তার! কিন্তু সে তো হাজার হাজার বছর আগে মরে গেছে। তার পেছনে ধাওয়া করে তো লাভ হবে না বিশেষ!' ঠাট্টার সুরে বলে আন্দ্রেই। কিন্তু চোখে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দেয়।

'তারপর বড় লোক আর তাদের পেটোয়ারা?'

মাথাটা ধরে, গোঁফ চুমরোতে চুমরোতে খখল অত্যন্ত সহজ ভাষায় মানুষের কথা, তাদের জীবনের কথা বলে। এমন ভাবে বলে যে মনে হয় সাধারণভাবে দোষটা সকলেরই। খুশি হয় না নিকলাই। মোটা মোটা ঠোঁট দুটো চেপে অবিশ্বাসের সুরে বলতে থাকে, এ হতেই পারে না কক্খনও। তারপর চলে যায় অত্যন্ত বিরক্ত বিরস মন নিয়ে।

একদিন বলে বসে, 'উঁহুঃ, দোষ কারো না কারো আছেই। আর এখানেই আছে তারা। একেবারে আগা-পাছ-তলা চষে আগাছার মতো সব উপড়ে ফেলতে হবে। মায়া দয়া চলবে না।'

মা বলে, 'তোমার কথাও তো ইসাই অমনি বলছিল একদিন!'

একটু চুপ করে থেকে ভেসভ্শিচকভ জিজ্ঞাসা করে, 'ইসাই?'

'হ্যাঁ। শয়তানের হাঁড়ি। সবার ওপরে চোখ রাখে আর হাজার রকম প্রশ্ন করে সবাইকে। আজকাল আমাদের এ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। জানালা দিয়ে উঁকি মারে যখন তখন...'

'উঁকি মারে?' ভেসভ্শিচকভ ফিরে বলে।

মা তখন বিছানায় শুয়ে, তাই ওর মুখটা দেখতে পেল না। কিন্তু বুঝতে পারল বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে, কারণ খখল নিকলাইকে ঠান্ডা করার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'তা মারুক না, বয়ে গেল। খেয়ে দেয়ে কাজ না থাকে তো মারুক উঁকি যত খুশি...'

নিকলাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'থামো। ওই একজন দোষী!'

'ওর অপরাধটা কী হে?' খখল তাড়াতাড়ি বলে, 'ও বোকা সেইটেই ওর অপরাধ?'

জবাব দিল না ভেসভ্শিচকভ। চলে গেল।

আস্তে আস্তে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে টেনে পায়চারি করে আন্দ্রেই। লম্বা লম্বা পা মেঝেতে ঘষে। খালি পা, জুতো খোলা, পায়চারি করবার সময় পায়ের শব্দে যাতে মা'র ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্য সে সব

সময়েই জুতো খুলে রাখে। মা ঘুমোয়নি, নিকলাই চলে যাবার পর উদ্বিগ্ন স্বরে বলে:

'ওকে আমার বড় ভয় করে।'

খখল ধীরে ধীরে বলে, 'হুঁ। বড় বদরাগী ছোকরা। ইসাই-এর নাম ওর সামনে আর কখনও নেবেন না যেন নেন্‌কো। লোকটা সত্যিই পুলিশের টিকটিকি।'

'তাতে আর আশ্চর্য কী? ওর একজন আত্মীয় তো পুলিশে কাজ করে।'

খখল চিন্তিতভাবে বলে, 'ব্যাপারটা হল এই যে, নিকলাই ওকে ধরে ঠেঙিয়ে দিতে পারে। দেখছেন তো সাধারণ মানুষের মন কী রকম হয়ে উঠেছে আমাদের ক্ষমতা-ধারী প্রভুদের দৌলতে! আমাদের নিকলাই-এর মতো মানুষ যেদিন বুঝতে পারবে কী অন্যায় আর অবিচারটা ওরা পাচ্ছে, সহ্যের সীমা যখন ছাড়িয়ে যাবে, কী অবস্থা তখন হবে ভেবে দেখুন। আকাশটা ওরা রক্তে স্নান করিয়ে দেবে আর সেই রক্তে পৃথিবীটা সাবানের মতো গলে গলে ফেনা হয়ে উঠবে...'

চাপা গলায় চীৎকার করে ওঠে মা, 'কী ভয়ানক, আন্দ্রিউশা!'

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে আন্দ্রেই বলে, 'তা মাছি পেটে গেলে তো বমি হবেই। যাহোক, ওদের রক্তের প্রতিটি বিন্দু পরিষ্কার হয়ে ধুয়ে যাবে লোকের চোখের জলের ধারায়, যে জল ওরা মানুষের চোখ থেকে ঝরিয়েছে!'

তারপর হঠাৎ মৃদু হেসে বলে, 'ন্যায় হলেও তাতেই বা সান্ত্বনা কোথায়?'

২২

একদিন ছুটির দিনে দোকান থেকে ফিরে এসে দরজা খুলেই নিস্তব্ধ হয়ে যায় মা। আনন্দে সর্বাঙ্গ এমন অভিষিক্ত হয়ে ওঠে যেন গ্রীষ্ম-কালের উষ্ণ বৃষ্টি-ধারায় নেয়ে এসেছে এইমাত্র। ঘরে পাভেল-এর গলা।

'এই যে মা এসেছে!' চেঁচিয়ে ওঠে খখল।

ঘাড় ফেরায় পাভেল। মুখখানা ওর আলো হয়ে উঠল। মা বোঝে সেই আলোর মধ্যে দিয়ে পাভেল তাকে বিশেষ একটা কিছু দিচ্ছে।

‘এসেছিস... বাড়ি এসেছিস,’ অস্ফুট স্বরে বলে মা, তারপর ছেলের এই হঠাৎ আগমনে অভিভূত হয়ে বসে পড়ে।

পাভেলের পাণ্ডুর মুখখানা নেমে আসে মায়ের দিকে। ঠোঁট কাঁপে। চোখের কোণে জল দেখা যায়। কথা কইতে পারে না। বোবা দৃষ্টিতে ছেলেকে দেখে মা।

খখল ওদের পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে গেল মাথা নিচু করে শিস দিতে দিতে।

পাভেল মায়ের হাতটা কম্পিত আঙুল দিয়ে চেপে ধরে গভীর নিচু স্বরে বলে, ‘মাগো, মা, আমার মা! তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব মা!’

ছেলের মুখের ভাবে আর কণ্ঠস্বরে মায়ের বুক আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। ছেলের মাথায় হাত বোলায় মা আর থামাতে চেষ্টা করে নিজের হৃদয়ের আলোড়ন। বলে:

‘যীশুর দোহাই, অত ধন্যবাদ কিসের?’

‘আমাদের এই বড় কাজটাতে তোমারও হাত লেগেছে যে। সেইজন্য ধন্যবাদ!’ তারপর আবার বলে, ‘মা-ছেলেতে মনের ব্যাপারেও মিল হওয়ার মতো সুখ খুব কমই জোটে।’

নিঃশব্দে লোভীর মতো ছেলের প্রতিটি কথা যেন পান করে মা। ছেলেকে কী ভালোই যে লাগে, কত কাছের লোক, চেহারার কী দীপ্তি।

পাভেল বলে, ‘আমি বুঝতে পারতাম তোমার কত মন খারাপ লাগছে। আমাদের কত জিনিস তোমার মনকে কষ্ট দিয়েছে। ভেবেছিলাম কখনো আমাদের সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না, আমাদের চিন্তা তোমার চিন্তা হয়ে উঠবে না। শুধু নীরবে সব কিছু সহ্য করে চলবে সারা জীবন যেমন করেছ। আমার বড্ড খারাপ লাগত!..’

‘অনেক জিনিস আন্দ্রিউশা বুঝিয়ে দিয়েছেন,’ মা বলে।

পাভেল হাসে, ‘ও আমায় তোমার কথা বলেছে।’

‘ইয়েগরও। আমরা দুজনে এক জায়গারই মানুষ! আন্দ্রিউশা আমার আবার পড়াতেও চেয়েছিলেন...’

‘আর তুমি লজ্জায় পড়তে আসনি, লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে পড়েছ, কেমন?’

'ধরে ফেলেছেন বুঝি!' অপ্রস্তুত হয়ে মা বলে। তারপর অত্যন্ত আনন্দে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে: 'কোথায় ও! ইচ্ছে করেই বেরিয়ে গেছে আমাদের অসুবিধে হবে ভেবে। নিজের মা তো নেই...'

পাভেল বাইরের দরজা খুলে ডাক দেয়, 'আন্দ্রেই! কোথায় হে?'

'এই যে আমি। কাঠ কাটছি।'

'এসো এখানে।'

তক্ষুণি এল না আন্দ্রেই। একটু দেরী করেই এল। এসে সোজা সংসারের কথা পেড়ে বসল:

'কাঠ প্রায় ফুরিয়েছে। নিকলাইকে বলতে হবে, কিছু কাঠ দিয়ে যায় যেন। পাভেল-এর দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, নেন্‌কো! মনে হচ্ছে কর্তারা বিদ্রোহীগুলোকে জেলে নিয়ে জামাই আদরে রাখে, শাস্তি দেয় না...'

মা হেসে ওঠে। তখনও আনন্দের বিহ্বলতা যায়নি, থামেনি বুকের মধুর নৃত্য। কিন্তু এরই মধ্যে একটা সতর্কতার অনুভূতি জেগেছে, ছেলের সেই সর্বদা শান্ত, গম্ভীর স্বরূপ মা দেখতে চেয়েছিল। সবই আজ বড় মধুর। জীবনের এই বৃহৎ সুখকে বুকের তলায় চিরস্থায়ী করে রাখতে চায় মা, ঠিক যেমন এসেছে, তেমনি প্রবল, প্রাণবন্ত করে। এতটুকু তার নষ্ট হতে দেবে না। পাখী-ধরা নতুন পাখী পেলে যেমন তাড়াতাড়ি তাকে ঢেকে রাখে, তেমনি মাও এই সুখকে ঢেকে দিল ক্ষিপ্র হাতে।

মা ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'খাবে চল। খাওনি তো কিছু নিশ্চয়ই এখনও, পাশা।'

'না। কাল জেলার বলে দিল আজ ছাড়া পাব। তাই আজ খেতে পারিনি কিছু...' বলে পাভেল। 'জানো, বাইরে বেরিয়ে প্রথমেই দেখা সিজভের সঙ্গে। রাস্তার ওধার দিয়ে যাচ্ছিল। আমায় দেখে এদিকে চলে এল, নমস্কার জানাল। আমি ওকে বললাম, আমি তো এখন বিপজ্জনক ব্যক্তি — পুলিশের নজরে আছি, আমার সঙ্গে সাবধান হয়ে চলাই ভাল। গা করল না। ভাইপোর কথা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কী জিজ্ঞাসা করল শুনলে অবাক হয়ে যাবে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করল — ফিওদর ঠিকমত চলছে তো? আমি বললাম, জেলে আবার ঠিকভাবে চলাচলি কী? বলে — না, বলছিলাম কী, কমরেড্‌দের নামে লাগানি-ভাঙ্গানি করেনি তো? আমি বললাম, না, সে ভালো ছেলে। বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। শুনে দাড়িতে

হাত বুলোতে বুলোতে খুব গর্বিতভাবে বলল, আমাদের সিজভদের মধ্যে খারাপ লোক পাবে না!'

'বেশ মাথাওয়ালা লোক,' খখল বলে, 'অনেক কথা হয়েছে আমার ওর সঙ্গে। লোকটা ভালো। ফিওদরকে ছাড়বে নাকি শীগ্গির?'

'বোধ হয় সব্বাইকেই ছাড়বে। কারো বিরুদ্ধে তো পায়নি কিছু। এক ওই ইসাই যা বলে। ওর আবার বলবার কী আছে?'

মা যাওয়া আসা করছে, চোখ রয়েছে ছেলের দিকে। আন্দ্রেই পেছনে হাত দিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাভেল-এর কথা শুনছে। আর পাভেল পায়চারি করছে ঘরময়। দাড়ি রেখেছে পাভেল, চাপ চাপ কালো দাড়ি ঘন হয়ে কুঁকড়ে আছে গালের ওপরে। পাভেলের ময়লা রঙে খানিকটা কমনীয়তা এসেছে যেন।

খাবার নিয়ে এসে মা বলে, 'বোস তোরা।'

খাবার সময় আন্দ্রেই রীবিন-এর কথা বলে। দুঃখিত হয়ে বলে পাভেল:

'আমি থাকলে যেতে দিতুম না ওকে। কী সম্বল নিয়ে গেল লোকটা সঙ্গে করে? শুধু হিজিবিজি পোরা মাথাটা আর অনেক রাগ, এই তো!'

খখল হেসে বলে, 'চল্লিশ বছর বয়স যে লোকটার, তা ছাড়া নিজেরই মনের মধ্যেকার বাঘ-ভল্লুকের সঙ্গে অনেক হাতাহাতি করে কাটাল, তাকে পোষ মানান চাট্টিখানি কথা নয়...'

তর্ক বাধে দুজনে। এমন তর্ক যার সব কথা মা বুঝতে পারে না। খাবার পরেও তর্ক চলে। দাঁতভাঙা সব কথার যেন তুফান। মাঝে মাঝে সহজ কথাও বলে।

পাভেল জোরের সঙ্গে বলে, 'এক পাও পিছোলে চলবে না আর। এখন জোর কদমে এগিয়ে যেতে হবে।'

'অর্থাৎ দুদ্দাড় করে গিয়ে পড়বে লাখো মানুষের মধ্যে আর তারা আমাদের দুষমন ভাববে...'

ওদের কথাবার্তা শুনে মা বুঝতে পারছে পাভেলের চাষীদের দিকে ঝোঁক নেই। এদিকে খখল বলছে মুজিকদেরও বুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা করা একান্ত দরকার। আন্দ্রেইয়ের কথা মা বেশি ভালো বোঝে। মনে হয় সে-ই ঠিক কথা বলছে। কিন্তু ও পাভেলকে কিছু বললেই মা উৎকর্ণ হয়ে, সচকিত হয়ে ওঠে; ছেলে কী জবাব দেয় শোনার জন্য নিশ্বাস বন্ধ

করে প্রতীক্ষা করে। নিশ্চিন্ত হতে চায় খখলের কথায় ও রাগ করেনি। কিন্তু দুজনে সমানে চীৎকার করে চলে, কেউ কারও কথায় রাগ করে না।

কখনও মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, সত্যি?'

মৃদু হেসে জবাব দেয় পাভেল, 'সত্যি মা!'

ক্ষ্যাপায় খখল বলে, 'ভোজটা মশায়ের তো জুটেছিল ষোড়শোপচারে। কিন্তু ভালো করে চিবিয়ে খেলেন না বলেই তো গলায় আটকে গেল। জলটল খান এক ঢোঁক!'

'ইয়ারকি ছাড়ো।' পাভেল বলে।

'ইয়ারকি-ই বটে — শ্রাদ্ধের ইয়াকি!..'

মা মৃদু হাসে আর মাথা নাড়ে...

২৩

বসন্ত কাছিয়ে এল। বরফ গলে নীচেকার কাদা, ময়লা জেগে উঠল। প্রতিদিন কাদা বাড়ে। বস্তিটা জীর্ণ, নোংরা কুৎসিত দেখায়। দিনের বেলা ছাদ থেকে টিপটিপ করে জল চোয়ায় আর ধোঁয়াটে দেয়ালগুলো যেন ঘামে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে ওঠে। রাত্তির বেলা তাতে সাদা সাদা বরফ ঝুলে থাকে। আরো ঘনঘন সূর্যের মুখ দেখা যায়। শোনা যায় জলের কলকলানি, জলার দিকে ছুটে চলেছে।

মে দিবস পালনের প্রস্তুতি চলে।

দিনটার অর্থ আর গুরুত্ব বুঝিয়ে কারখানায় আর বস্তিতে কাগজ ছড়ায়। যে-সব ছেলেরা এতদিন এ-সব থেকে দূরে ছিল, এবার তারাও বলে:

'সেটা করতে হবে হে!'

ভেসভ্শিচকভ তার আঁধার হাসি হেসে বলে:

'এবার লুকোচুরি খেলার সময় গিয়েছে!'

ফিওদর মাজিনের ভারি উৎসাহ। বড় রোগা হয়ে গেছে ও, চলা ফেরা কথায় সব সময় এমন একটা স্নায়বিক অস্থিরতা, যেন বন্দী লার্ক। ওর সঙ্গে সর্বদা থাকে ইয়াকভ্ সমভ্। মুখে কথা নেই, বয়সের তুলনায় বড় বেশি গম্ভীর। শহরে একটা কাজ পেয়েছে ইয়াকভ। সাময়লভ্ (জেলে থেকে ওর চুলগুলো আরো লাল হয়ে গেছে), ভাসিলি গুসেভ,

বুকিন, দ্রাগুনভ এবং আরো কয়েকজন জেদ ধরল মিছিলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবে। কিন্তু পাভেল, খখল, সমভ্ এবং অন্য কয়েকজন আপত্তি করে।

ইয়েগর এসে হাজির। সেই হাঁপানি, ক্লান্ত দেহ। ঘামছে। ঠাট্টা করে বলে:

'বন্ধুগণ, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা বদলাবার জন্য আমরা প্রাণপাত করে পরিশ্রম করছি। এই মহৎ কর্মকে জয়যুক্ত করার জন্য আমার এক জোড়া নূতন জুতো কেনা অত্যন্ত প্রয়োজন।' বলে নিজের ভিজে আর ছেঁড়া জুতো জোড়ার দিকে দেখায়। 'আমার গালশটার বর্তমান অবস্থা মেরামতের বাইরে। প্রতিদিন আমার পা ভিজে যায়। আমরা প্রকাশ্যে ও দ্বিধাহীনভাবে বর্তমান-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আগে বসুন্ধরার উদরে আশ্রয় গ্রহণ করবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। অতএব কমরেড সাময়লভ-এর সশস্ত্র মিছিলের প্রস্তাবের পরিবর্তে আমার প্রস্তাব এই যে, বর্তমানে আমাকে এক জোড়া নূতন বুটরূপ অস্ত্র-দ্বারা সজ্জিত করা হোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পন্থাতেই একটি প্রথম-শ্রেণী মারামারির তুলনায় সমাজতন্ত্রের জয় অধিকতর সহজ হবে!..'

উন্নততর জীবন লাভের জন্য নানা দেশের মানুষ কী ভাবে সংগ্রাম করছে, সে-সব কাহিনী এই রকম সালংকার ভাষায় ও শ্রমিকদের শোনায়। মা'র বড় ভালো লাগে ওর কথা শুনতে। শুনতে শুনতে মনে হয় — যেন ওই বেঁটে-মোটা লালমুখো মানুষগুলোই আসলে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে চতুর শত্রু। ওরা নির্লজ্জ লোভী, নিষ্ঠুর, এক ফোঁটা মায়া দয়া নেই ওদের মনে। ওরা শুধু মানুষকে ঠকায়, শোষে আর পেষে। রাজা খারাপ হলে জনসাধারণকে খ্যাপায় ওরা রাজার বিরুদ্ধে। আর জনসাধারণ অত্যাচারী রাজাকে তাড়িয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঠকিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেয় তারা। কাজের বেলায় কাজী — কাজ ফুরেলই পাজী! বাধা দিলে হাজার হাজার মানুষকে উৎপীড়ন করে।

একদিন সাহস করে কথাটা খুলে বলে মা ইয়েগরকে। বলে, ইয়েগরের বক্তৃতা শুনে কী ধরনের ছবি সে মনে মনে এঁকেছে। বলতে গিয়ে লজ্জা পায়, বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করে:

'ঠিক বলছি তো?'

শুনে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায় ইয়েগর। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুক ঘষতে ঘষতে বলে:

'ঠিক বলেছেন মা, একেবারে ঠিক। ইতিহাস-রূপী ষণ্ডটাকে একেবারে শিং ধরে পাকড়েছেন দেখছি। আপনার ছবিতে এখানে সেখানে খালি একটু চড়া রং হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ওই বেঁটে মোটা লোকগুলিই মানুষের আসল শত্রু, ওরা ডাঁশ — গরীব মানুষ-গুলোর রক্ত খেয়েই ওরা বেঁচে থাকে। বুর্জোয়া নাম ঠিকই রেখেছিল ফরাসীরা। মনে রাখবেন কথাটা — বুর্জোয়া। আমাদের চিবিয়ে চিবিয়ে খায়, রক্ত শোষণ করে।'

'মানে বড় লোকেরা?'

'যা বলেছেন। ওই তো ওদের দুর্ভাগ্য। শিশুর খাদ্যের মধ্যে তামা মিশিয়ে দিন, দেখবেন তার হাড্ডিগুলো আর বাড়বে না, বামন হয়ে থাকবে। তামার বিষে দেহটা বাড়তে পায় না, আর সোনার বিষে আত্মাটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে থাকে। পাঁচ কোপেকের রবার বলের মতো ধূসর, মরা...'

ইয়েগরের কথাই হচ্ছিল একদিন। পাভেল বলে:

'দেখ আন্দ্রেই, মুখে যারা বেশি হাসে, তাদেরই মনে বেশি ব্যথা...'

একটু চুপ করে থেকে চোখ কুঁচকে খখল বলে, 'তোমার কথা সত্যি হলে গোটা রাশিয়ার মানুষ হাসতে হাসতে মরে যেত...'

নাতাশা এল। আর এক শহরে জেলে ছিল এতদিন। বিশেষ বদলায়নি। মা লক্ষ্য করেছে, ও এলে খখল বেশি খুশি হয়ে ওঠে। রীতিমত মেতে ওঠে। খুঁচিয়ে খেপিয়ে, সবার পেছনে লেগে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। নাতাশাও প্রাণ খুলে হাসে। কিন্তু সে যাবার পর খখল যেন ঝিমিয়ে পড়ে। ক্লান্ত পা দুখানি বিষণ্ণভাবে টেনে টেনে পায়চারি করে আর আপন মনে শিস দিয়ে তার সেই শেষহীন গানের সুর ভাঁজে।

সাশাও আসে প্রায়ই। সর্বদা ভ্রূকুটিকুটিল, সর্বদা ব্যস্তসমস্ত ভাব, দিন দিন কেমন জানি ধারাল চোখা চোখা হয়ে উঠছে।

একদিন ও যাবার সময় পাভেল গেল ওকে এগিয়ে দিতে। দরজাটা খোলাই ছিল, বন্ধ করে দিতে ভুলে গেছে পাভেল। মা শুনতে পেল দ্রুত কথাবার্তা:

'তাহলে ঝান্ডা আপনার হাতেই থাকবে?' সাশা শুধয়।

'হ্যাঁ।'

'একেবারে স্থির?'

'হ্যাঁ। ওতেই আমার অধিকার।'

'তার মানে আবার জেল?'

পাভেল নিরুত্তর।

'আচ্ছা, অন্য...' বলতে গিয়ে কথা বেধে যায় সাশার।

'কী?'

'অন্য কারো হাতে ছাড়তে পারেন না?..'

'না।' উচ্চ স্বরে জবাব আসে।

'আরেকবার ভেবে দেখুন... সবার ওপর আপনার এত প্রভাব, প্রত্যেকে ভালোবাসে আপনাকে... আপনি আর নাখদকা হলেন... এখানকার সর্বপ্রধান ব্যক্তি। ভেবে দেখুন, এদের মধ্যে থাকলে কত কাজ করতে পারবেন। আর ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বেরুলেই তো ধরে নিয়ে যাবে। অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে, আর শীগ্গির ছাড়বে না এবার।'

মায়ের মনে হল, ওর স্বরে শঙ্কা আর বেদনা। এ বেদনা মায়ের চেনা। ঠাণ্ডা জলের ফোঁটার মতো পড়ে মেয়েটার কথা মায়ের বুকে।

পাভেল বলে, 'না, আমি স্থির করে ফেলেছি। ও আর বদলান যাবে না।'

'আমি যদি বলি, তবুও না?'

হঠাৎ পাভেলের গলার স্বর কঠোর হয়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি বলে:

'ও ভাবে কথা বলবেন না। আপনি কী?'

'আমিও তো মানুষ!' ধীরে ধীরে সাশা বলে।

'হ্যাঁ! ভালো মানুষ!' চাপা স্বর, যেন গলা ধরে গেছে, এমন ভাবে বলে, 'আমার খুবই প্রিয়। তাই... তাই বলছি অমন কথা আমায় বলবেন না আপনি...'

সাশা বলে, 'আচ্ছা, আসি তাহলে।'

পায়ের শব্দে মা বুঝল সাশা ছুটে চলেছে। পাভেল উঠোন পর্যন্ত গেল পেছন পেছন।

ভয়ে মায়ের বুকটা কুঁকড়ে যায়। কী নিয়ে ওরা কথা বলছিল, বুঝতে পারে না; কিন্তু মন বলে—বড় দুঃখের দিন আসছে... ভাবে, কী করতে চায় ও?

পাভেল ফিরে আসে আন্দ্রেই-এর সঙ্গে। মাথা নাড়তে নাড়তে খখল বলে, 'না, জ্বালালে দেখছি এই ইসাইটা! কী করা যায় ওকে নিয়ে?'

'ওকে বলতে হবে ওর কারবার ছাড়তে।' ভুরু কুঁচকে পাভেল বলে।

মা জিজ্ঞাসা করে মাথা নীচু করে, 'তুমি কী করবে, পাশা?'

'কখন? এখন?'

'পয়লা... পয়লা মে'তে?'

'ওঃ,' চাপা স্বরে বলে পাভেল, 'আমাদের ঝাণ্ডাটা মিছিলে আমিই বয়ে নিয়ে যাব সবার আগে আগে। তাতে সম্ভবত আবার জেলে যেতে হবে।'

মায়ের চোখে যেন কতগুলো ছুঁচ ফুটল; মুখ শুকিয়ে গেল। পাভেল তার হাতটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে তাতে নিজের হাতটা বোলাতে লাগল।

'আমায় যেতেই হবে। সেটাই উচিত।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলে মা, 'আমি তো কিছু বলিনি।' ছেলের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে ওর চোখের কঠিন দীপ্তির সামনে মা আবার মাথা নামায়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মায়ের হাত ছেড়ে দেয় পাভেল। একটু তিরস্কারের সুরে বলে, 'কোথায় খুশি হবে! না তার উল্টোটাই করছ! কবে যে আমাদের মায়েরা হাসতে হাসতে ছেলেদের মরতে পাঠাতে পারবে তাই ভাবছি!..'

খখল বিড়বিড় করে ওঠে, 'ওরে বাসরে, আবার সুরু হয়েছে সেই পুরনো সুর ভাঁজা।'

মা আবার বলে, 'আমি তো বলিনি কিছু! তোকে আমি বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু আমার যে কষ্ট হয়... কী করব, আমি যে মা...'

সরে যায় পাভেল। কঠোর স্বরে বলে:

'ভালোবাসা পায়ের বেড়ীও হতে পারে...'

কথাগুলো যেন শেলের মতো বাজে মায়ের বুকে। চমকে ওঠে মা। বলে:

'পাশা, পাশা, আর বলিস না...' ভয় হয়, পাছে আরো কঠিন কথা বলে পাভেল। 'আমি বুঝি না-করে তোমার উপায় নেই... করতেই হবে কমরেড্‌দের জন্য...'

'না, কমরেড্‌দের জন্য নয়। আমার নিজেরই জন্য।'

নীচু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঠল আন্দ্রেই। মাথাটা দরজার চেয়ে উঁচু, তাই একটা হাঁটু বাঁকিয়ে এক কাঁধে খুঁটিতে ভর দিয়ে আর এক

কাঁধ, ঘাড় আর মাথা বের করে দাঁড়াল দরজার কাঠামোয়, ওর বড় বড় চোখগুলি আঁধার হয়ে পাভেলের মুখের ওপর গেঁথে যায় — পাথরের ফাটলের মধ্যে গিরগিটীর মতো দেখায় ওকে। বলে:

'হুজুর, অধীনের আর্জি, সংকল্পটা ত্যাগ করলেও মন্দ হয় না।'

মায়ের চোখে প্রায় জল এসে যায়। ছেলেকে তার কান্না দেখাতে না চেয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'হায় হায়, ওদিকের সব ভুলে গেছি যে...'

তার পর ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে যায়। মনের ব্যথায় এক কোণে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে অঝোরে কাঁদে। চোখের জলের ধারায় বুঝি বুকের রক্ত ঝরে পড়ছে, তাই এত দুর্বল।

ও ঘরে চাপা স্বরে বচসা চলছে। আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে শোনা যায় খখল বলছে:

'কী ভেবেছ বল তো? ওঁকে যন্ত্রণা দিয়ে খুব ফুর্তি লাগছে, না?'

'ওরকম কথা বলার অধিকার তোমার নেই!' চীৎকার করে ওঠে পাভেল।

'বোকার মতো তুমি যা খুশি তাই করে যাবে, আর বন্ধু হয়ে আমি সাক্ষীগোপালের মতো চুপচাপ দেখে যাব? অমন করে বললে কেন? বোঝ না কিছু?'

'শক্ত হওয়া দরকার। হ্যাঁ না যাই বলব, শক্ত হয়ে বলতে হবে।'

'ওঁকেও?'

'সবাইকেই। ভালোবেসে পায়ে শেকল বেঁধে পেছন দিকে টানবে অমন ভালোবাসা, দোস্তি চাই না আমি...'

'ওঃ মস্ত বড় পালোয়ান! হয়েছে! হয়েছে! বাহাদুরি জানা আছে সব। যাও না গিয়ে, বল না দেখি সাশার কাছে। কথাটা বলা উচিত ছিল তাকেই...'

'বলেছি তো...'

'এমনি করে? মিথ্যে কথা। আস্তে আস্তে, নরম করে, আদর করে বলেছ ওকে। শুনিনি, তবে ঠিক জানি। আর মায়ের কাছে যত বীরত্ব। বীরত্ব না ছাই, তার দাম কানাকড়ির বেশি নয়।'

চোখের জল মুছে উঠে পড়ে মা। কি জানি, খখলটা কী বলে বসবে। হয়ত ছেলের মনে লাগবে... তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রান্নাঘরে এসে ঢুকে জোরে জোরে বলতে আরম্ভ করে। ভয়ে দুঃখে স্বর কাঁপছে, 'উঃ কী ঠান্ডারে, বাবাঃ। কে বলবে শীত চলে গেছে...'

অনর্থক সে এদিক থেকে ওদিক সরাতে লাগল রান্নাঘরের জিনিসপত্র। ও ঘরের চাপা কথা যাতে শোনা না যায় তাই আরো উঁচু-পর্দায় ওঠে মায়ের গলা:

'সব উল্টাপাল্টা চলছে। এদিকে মানুষের মগজ তাতছে, আর ওদিকে বাইরে পাল্লা দিয়ে হিম পড়ছে। আর আর বছর এমনি দিনে কী সুন্দর রোদ ওঠে...'

ওদের গলা থেমে যায়। থমকে দাঁড়ায় মা।

'শুনেছ?' খখল বলে নিচু গলায়, 'একটু বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার চাইতে ঢের বেশি বড় ওঁর মনটা।'

'একটু চা-টা খাবে তোমরা?' গলাটা কেঁপে ওঠে মা'র। উত্তরের অপেক্ষা না করে কাঁপুনিটা লুকোবার জন্য বলে, 'বাপরে, জমে গেলাম!'

পাভেল ধীরে ধীরে মায়ের কাছে আসে মাথা নীচু করে। মুখে কাঁপছে অপরাধের হাসি। বলে:

'আমায় ক্ষমা কর মা। আমি এখনও ছোট— তোমার অবোধ ছেলে...'

ছেলের মাথাটা বুকে চেপে ধরে মা।

'আমার কথা ছেড়ে দে,' ব্যথায় বলে ওঠে, 'চুপ! একটি কথাও না! ভগবান জানেন, তোর পথেই যাবি তুই। কিন্তু আমার মনটাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করিসনি! মা সন্তানের জন্য ভাববে না? না ভেবে সে কি পারে?.. তোদের সবার জন্য আমি ভাবি। তোরা সবাই আমার আপনজন। আমি তোদের জন্য না ভাবলে আর কে ভাববে বল?.. দেখছিসই তো, সবাই সব কিছু ছেড়ে চলেছে তোর পেছন পেছন... আঃ পাশা!'

অথই চিন্তা বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। বিরাট বহ্নি-জ্বালার মতো। একটা বিপুল বেদনা-ভরা আনন্দ হৃৎপিণ্ডটাকে চিরে-ফেড়ে ফালি ফালি করে দেয়। কিন্তু তা বোঝাবার ভাষা কোথায় পাবে মা! হাত নেড়ে বোবা ব্যথায় তীব্র তীক্ষ্ন যন্ত্রণাভরা দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চায়...

'মা, ক্ষমা করো। এখন সব বুঝতে পারছি।' মাথা নিচু করে অর্ধোচ্চারিতভাবে বলে পাভেল। তার পর মৃদু হেসে মা'র দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে সলজ্জভাবে বলল:

'এ আমি কখনো ভুলব না, কক্‌খনো না!'

সরে এসে পাশের ঘরে তাকিয়ে বলে মা — স্বরে একটু মিনতির সুর:

'আন্দ্রিউশা, আর চ্যাঁচামেচি করবেন না ওর সঙ্গে। আপনি তো ওর চেয়ে বড়...'

মায়ের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাস্যকর ভাবে ঘোঁৎঘোঁৎ করে ওঠে আন্দ্রেই:

'হুঁ, শুধু চ্যাঁচামেচি? হয়েছে কী মা? ধরে ঠ্যাঙাব এর পর!'

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দেয় মা:

'আপনি হীরের টুকরো মানুষ...'

হাত দুটো পেছনে রেখে, মায়ের পাশ কাটিয়ে ও রান্নাঘরে চলে যায় মাথাটাকে ষাঁড়ের মতো নুইয়ে। ওর গম্ভীর অথচ বিদ্রুপের স্বরটা কানে আসে মা'র:

'সামনে থেকে হটে যাও পাভেল! নয়তো মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাব। ঘাব্‌ড়ে গেলেন নাকি, ও নেন্‌কো? ঠাট্টা, স্রেফ ঠাট্টা। আমি সামোভারটা চাপাচ্ছি। আহা কী ছিরির কয়লা! ভিজে যে সব একশা!'

চুপ করে যায়। মা এসে দেখে মেঝেতে বসে সে খুব কষে ফুঁ দিচ্ছে সামোভারে।

'ঘাবড়ে যাবেন না, ওর কেশ-স্পর্শ করব না আমি।' বলে চোখ না তুলে। 'আমি পাথর নই, মা, সেদ্ধ গাজরের মতোই নরম তুলতুলে। এই পালোয়ান, কান বন্ধ করো! সত্যি আমি পাভেলকে ভালোবাসি, মা। কিন্তু ওর ওই জামাটা আমার পছন্দ নয়। জানেন তো, নতুন জামা পরেছে ও একটা। ওর খুব পছন্দ জামাটা। সুতরাং ভুঁড়ি বাগিয়ে যাকে পায় তাকেই ঠেলে দেখিয়ে বেড়ায়—দেখ হে কী সুন্দর জামা আমার! বেশ তো, ভালো তো ভালোই। কিন্তু তাই বলে অত ঠেলাঠেলি কেন? এমনিই তো বেশ ঠাসাঠাসি!'

মুচকে হেসে পাভেল বলে, 'আর কতক্ষণ বিড়বিড় করবে হে? একটা মারলেই তো হয়!'

সামোভারের দুইদিকে ঠ্যাং ছড়িয়ে মেঝেতে বসে খখল তাকিয়ে থাকে তার দিকে। মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সস্নেহ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর মাথার পিছনটা আর লম্বা বাঁকা ঘাড়ের দিকে। পিছনে হেলিয়ে হাতের ওপর দেহের ভর রেখে, ঘাড় ফিরিয়ে ও মা আর ছেলের দিকে তাকায়। একটু আরক্ত চোখ মিট্‌মিট করে বলল:

'বেশ আছ বাপু তোমরা দুজন।'

পাভেল ঝুঁকে পড়ে ওর হাত ধরে খপ্ করে।

চাপা স্বরে বলে খখল:

'এই টানলে পড়ে যাব কিন্তু...'

মা বলে, 'লজ্জা কিসের। দুজনে চুমু খাও, কোলাকুলি কর! যত জোরে পার, যত বেশি জোরে...'

পাভেল বলে, 'কী হে, চাও?'

'করলেই হয়,' উঠে বলে খখল।

নিবিড়, গভীর আলিঙ্গনে মিলে যায় দুটি দেহ আর একটি প্রাণ, তপ্ত হয়ে ওঠে বন্ধুত্বের উত্তাপে।

মায়ের গাল বেয়ে অশ্রু গড়ায়—এবারে সুখের অশ্রু, জল মুছে বলে মা বিব্রতভাবে:

'মেয়েরা কাঁদতে ভারি ভালোবাসে! সুখেও কাঁদে, দুঃখেও কাঁদে...'

আস্তে করে পাভেলকে সরিয়ে দেয় খখল। চোখ মুছতে মুছতে বলে:

'খুব হয়েছে, ভাগো এখন! বাবাঃ, কী কয়লা তোমার। ফুঁ দিয়েছি আর যত ছাই ছিটকে এসেছে চোখে...'

জানালার কাছে বসে পড়ে পাভেল। আস্তে আস্তে বলে:

'ও চোখের জলে লজ্জা নেই...'

মা গিয়ে বসে পাভেলের পাশে। নতুন অভয়-মন্ত্র পেয়েছে মা। বিষণ্ণ মন, তবু তাতে আছে শান্তি আর তৃপ্তি।

খখল ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে:

'উঠবেন না, নেন্‌কো, একটু বসে বিশ্রাম করে নিন। যা ঘোল খাইয়েছে আপনাকে... বাসন-পত্র আমি নিয়ে অসছি।'

ওর মিঠে সুরেলা গলাটা শোনা যায়:

'বেশ্ চেখে নেওয়া গেল জীবনকে, একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষের আসল প্রাণ-ঢালা জীবন...'

'যা বলেছ।' মায়ের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় পাভেল।

মা বলে, 'সব কিছু আলাদা হয়ে গেল; সুখ দুঃখ সব...'

'তাই তো হওয়া উচিত!' খখল বলে, 'কারণ মানুষের প্রাণ নতুন করে জন্ম নিচ্ছে, নেন্‌কো! মানুষ চলেছে সামনের দিকে, চারদিক যুক্তি বিচারের আলোয় আলো করে। ডাক দিয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার মানুষকে, "নানা দেশের মানুষ ভাই! এক হও; এক পরিবারে যুক্ত হও!" সে ডাক

শুনে সমস্ত প্রাণগুলো তাদের সাচ্চা টুকরো নিয়ে জোট বাঁধছে। সব মিলে মিশে একটা মস্ত বড় প্রাণ হয়ে উঠছে—ভারি জবরদস্ত, আর এমনি তার আওয়াজ যেন রুপোর ঘণ্টা...'

মা ঠোঁট চেপে কাঁপুনি বন্ধ করে, চোখ চেপে বন্ধ করে চোখের জল রোখে।

পাভেল হাত তুলে কী যেন বলতে যায়, কিন্তু মা ওকে টেনে এনে কানে কানে বলে, 'চুপ, বলতে দে...'

খখল দরজার গোড়ায় দাঁড়ায়। বলে চলে, 'এখনই হয়েছে কী! অনেক দুঃখ সইতে হবে মানুষকে। অনেক রক্ত ঝরবে। কিন্ত আমার বুকের মধ্যে আর মগজটার মধ্যে যে দৌলত আছে তার তুলনায় সে দুঃখ আর রক্ত কতটুকু!.. আলোর ধনে ধনী ওই আকাশের নক্ষত্রের মতো আমি। অফুরন্ত আনন্দ আমার মধ্যে! কেউ কিছুতেই তা নষ্ট করতে পারবে না। সেই তো আমার শক্তি। তাই আমি সব কিছু বইতে পারি, সব কিছু সইতে পারি।'

চা খেতে খেতে মাঝ রাত্তির গড়িয়ে গেল কথায় কথায় — মানুষের কথা, জীবনের কথা, আগামী দিনের কথা... অন্তরঙ্গ আলাপ।

মা শোনে, যখন স্পষ্ট করে বোঝে তখন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে; মন উধাও হয়ে যায় নিজের অতীতে; অতীতের দুঃখভারাক্রান্ত ভোঁতা জীবনটার এক-একটা ঘটনার কথা ভাবে মা। মনের সেই পাথরের নজীর দিয়ে সমর্থন করে নিজের চিন্তাকে।

আর ভয় করে না মায়ের। আজকে এই অন্তরঙ্গ আলাপের উষ্ণতায় সব ভয় গলে ঝরে যায়। বহুদিন আগের একটি দিনের কথা মনে পড়ে। সে-দিনও ঠিক এমনি লেগেছিল। ওর বাবা সে-দিন বলেছিল:

'যা বলি তাতেই মুখ বাঁকাচ্ছিস কেন? এক বেকুব পেয়েছিস তোকে বিয়ে করার জন্য। যা! মেয়েরা সকলেই তো বিয়ে করে, সকলেরই ছেলে হয়, আবার ছেলেপুলে মাত্রেই মাবাপদের দুঃখকষ্ট দেয়! তুই কি মানুষ নস?'

বাপের কথায় সে-দিন পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল মা ওর সামনের পথটা, আঁকাবাঁকা আঁধার নিষ্ফলা পথ, নিয়তির মতো। যেতেই হবে ওপথে, আর গতি নেই! অতএব এক অন্ধ শান্তিতে মন ভরে গিয়েছিল। আজও তাই। আবার নতুন নতুন দুঃখ সইতে হবে। কিন্তু এবার নিজের মনেই কাকে যেন বলতে থাকে:

'নাও নাও! এই নাও!'

মনটা হাল্কা হয়ে আসে এতে। টান টান তারের মতো কী একটা যেন গ্নগ্ন নিয়ে কাঁপতে থাকে ব্কের মধ্যে।

কিন্তু প্রতীক্ষায় বিক্ষ্দ্ধ বিষণ্ণ আত্মার গভীরে অস্পষ্ট আশা জেগে থাকে; কিছ্তেই মরে না সে-আশা। যাবে না, সব যাবে না! সব কেড়ে নিয়ে একেবারে রিক্ত করে দেবে না ওরা। একটা কিছ্ থাকবেই...

২৪

সে-দিন সকাল বেলা, পাভেল আর আন্দ্রেই সবে কাজে বেরিয়ে গেছে, করস্নভা এসে জানালায় উত্তেজিতভাবে ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করে বলল:

'ইসাই খ্ন হয়েছে। দেখবে তো চল...'

মা চম্‌কে ওঠে। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো খ্নীর নামটা যেন চমকে ওঠে মনে। গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞাসা করে:

'কে খ্ন করলে?'

'তোমার জন্য মড়ার পাশে বসে আছে কিনা সে! সাবড়ে কেটে পড়েছে!'

রাস্তায় চলতে চলতে বলে:

'আবার তল্লাসীর হিড়িক পড়বে। হেস্তনেস্ত করবে আবার। তোমার ছেলেরা বাড়ী ছিল কাল, তাই রক্ষে। নিজ চোখে দেখলাম কিনা। মাঝ-রাতে বাড়ী ফিরতে ফিরতে জানালা দিয়ে দেখি সবাই মিলে টেবিল ঘিরে বসে আছ...'

ভয়ে কালো হয়ে মা বলে ওঠে, 'কী বলছ গো! আমার ছেলেরা? এ কি কেউ ভাবতে পারে?'

করস্নভা বলে, 'কে আবার মারতে আসবে বাপ্, তোমার ব্যাটার সাঙ্গোপাঙ্গোরা নিশ্চয়! ও মান্ষটা ওদের পিছে টিকটিকির মতো লেগে থাকত, কেই বা না জানে...'

মায়ের গলা যেন বন্ধ হয়ে আসে, কথা বলতে পারে না। এক হাতে ব্ক চেপে ধরে।

'কী হল গো? তোমার ভয় কী? ওর যা হবার তাই হল। শীগ্গির করে চল, নয়তো নিয়ে যাবে...'

মন কালো সন্দেহে ছেয়ে যায়। ভেসভ্শিচকভ নয় তো?

'এই কান্ড তাহলে!' অসাড় মনে ভাবে মা।

পোড়া বাড়ীটার ওখানে, কারখানা থেকে বেশি দ্রে নয়, লোকে

লোকারণ্য—অনেক মেয়ে, তার চেয়েও বেশি ছেলেপুলে, দোকানী-পসারী, শুঁড়িখানার চাকরবাকর। পুলিশও এসেছে। কলরব শোনা যাচ্ছে, যেন ভিমরুলের চাকে ঘা পড়েছে। মানুষগুলোর পায়ে পায়ে পোড়া কয়লার ছাই উড়ছে। পুলিশ-দলের সঙ্গে এসেছে বুড়ো জমাদার পেৎলিন। লম্বা লোকটার মুখে একগোছা ফুরফুরে সাদা দাড়ি আর বুকের ওপরে নানা মেডেল।

একটা আধ-পোড়া কাঠে হেলান দিয়ে মাটির ওপর আধ-শোয়া, আধ-বসা অবস্থায় রয়েছে ইসাই-এর দেহটা। ডান কাঁধের ওপর হেলে আছে খালি মাথাটা; ডান হাতটা পাৎলুনের পকেটে, আর বাঁ হাতের আঙুলগুলো যেন মাটি খিমচে আছে।

মা ওর মুখের দিকে তাকায়। ক্লান্তভাবে পা ছড়িয়ে বসে আছে—পায়ের ফাঁকে টুপিটা, একটা চোখ ঝাপসাভাবে তাকিয়ে আছে ওই দিকে। ঠোঁটদুটি ফাঁক, যেন অবাক হয়ে হাঁ করে আছে মানুষটা। লালচে দাড়িটা একপাশে বেরিয়ে আছে। ওর রোগা টিংটিঙে দেহটা, চোখা মাথা আর হাড্ডি বের-করা দাগড়া দাগড়া মুখ যেন মরণের আক্ষেপে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা, ক্রুশের চিহ্ন আঁকে। বেঁচে থাকতে ওকে দেখে মায়ের ঘেন্না হত, আজ কিন্তু তার কেমন স্নিগ্ধ মায়া লাগে।

কে একজন চাপা গলায় বলে, 'রক্ত-টক্ত নেই, দেখেছ? বোধহয় কিলিয়ে সাবড়ে দিয়েছে।'

আর একটা রাগের গলা শোনা যায়, 'ব্যাটা চুকলিবাজ! আর মুখ খুলতে হবে না বাছাধনের...'

পুলিশ-জমাদার সজাগ হয়ে ওঠে। হাত দিয়ে মেয়েদের সরিয়ে হুমকি দেয়:

'কোন ব্যাটা বল্লেরে?'

ওর ধাক্কায় লোকজন সরে যায়। কেউ ছুটে পালায়। কে একটা লোক বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে।

মা বাড়ী ফিরে আসে। মনে ভাবে, "কেউ একটিবার আহা করলে না!"

নিকলাই-এর চওড়া শরীরটা ফুটে ওঠে চোখের সামনে। হিম কঠিন পাথুরে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে দৈত্যের মতো মানুষটা। ডান হাতখানা ঝাঁকাচ্ছে যেন এইমাত্র বড্ড লেগেছে।

ছেলেরা বাড়ী এলে শুধয়, 'কাউকে ধরেছে নাকি রে?'

খখল বলে, 'কী জানি, শুনিনি কিছু।'

দুজনেই বড্ড বিমর্ষ, মা লক্ষ্য করে। জিজ্ঞাসা করে আস্তে আস্তে:

'নিকলাই-এর ওপর কারো সন্দেহ হয়েছে নাকি রে?'

'না।' স্পষ্টভাবে জবাব দেয় পাভেল। ওর চোখগুলি কেমন কঠিন, কথাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ। 'বোধ হয় সন্দেহও করে না। কারণ কাল দুপুরে ও নদীর দিকে গেছে, আজও ফেরেনি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওর কথা...'

'ভগবান রক্ষে করেছেন!' একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে মায়ের। 'বাঁচলাম বাবা...'

খখল মায়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে। ভাবতে ভাবতে মা বলে:

'লোকটা শুয়ে আছে, মুখে চমকে ওঠা ভাব। মাগো! কারো যদি একটু কষ্ট হয়! বেচারা একটা মিঠে কথা শুনতে পেল না! দেখাচ্ছে এই এতটুকুনি! যেন ভাঙা টুকরো, যেখানে ভেঙ্গে পড়েছিল সেখানেই পড়ে আছে...'

খাবার সময় হঠাৎ হাতের চামচেটা ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে পাভেল:

'কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছিনে!'

'কী?' খখল শুধয়।

'খাবার জন্য জন্তু মারলেও কাজটা ভালো নয়। বুনো জানোয়ারকে মারে, সেটা বোঝা যায়। মানুষ যদি বুনো জন্তুর মতো নিজের ভাইদের খেতে যায়, আমিও তাকে খুন করতে পারি। কিন্তু ইসাই-এর মতো তুচ্ছ মানুষ! ভাবছি ও মানুষের জান নিতে হাত সরল কার?..'

খখল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে:

'বুনো জন্তুর চাইতে ওই বা কম ছিল কিসে? মশা এক-ফোঁটা রক্ত খায়। তবু তাকেও তো মারি আমরা!'

'হ্যাঁ তা মারি। কিন্তু আমি ঠিক তা বলছি না... বলছিলাম, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা আর কি?'

আর একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দেয় আন্দ্রেই:

'তা কী করা যাবে!'

পাভেল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে:

'অমন পদার্থকে তুমি মারতে পারতে?'

গোলগোল চোখে পাভেলের দিকে তাকিয়ে মাকে ঝট করে একবার দেখে নিয়ে ব্যথিত অথচ দৃঢ় স্বরে খখল বলে: 'আমাদের সিদ্ধির জন্য, কমরেডদের জন্য আমি সব করতে পারি। দরকার হলে নিজের ছেলেকেও খুন করতে পারি...'

মা অস্থির হয়ে করুণ গলায় বলে ওঠে, 'আঃ, কী যা তা বকছেন!'

'কী করব মা! জীবনটাই এমনি!..' একটু হেসে বলে ও।

'সত্যি, জীবনটাই অমনি...' আস্তে আস্তে পাভেল বলে।

হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে উঠে পড়ে আন্দ্রেই, যেন ভেতর থেকে তাকে একটা কিছু খোঁচাচ্ছে। বলে:

'কী করব বল! মানুষকে ঘৃণা করতে হয়, যাতে তাড়াতাড়ি সেদিন এসে পড়ে যেদিন সব মানুষকেই আমাদের পছন্দ হতে পারে। প্রগতির পথ যারা আগলে রাখবে, পদের লোভে, স্বার্থের খাতিরে জনসাধারণকে যারা বেচে দেবে, তাদের সরিয়ে ফেলা ছাড়া উপায় কী? সৎ মানুষদের পথে যখন কোনো জুডাস দাঁড়িয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগের জন্য, তখন আমি যদি সেই জুডাসকে খতম না করি, তবে আমিই জুডাস হয়ে উঠব। তুমি বলবে, তাতে আমার অধিকার নেই? অথচ বড় কর্তারা এই যে সৈন্য-পুলিশ, জল্লাদফাঁসুড়ে, জেলখানা, বেশ্যাখানা, কালাপানি, আরো এমনি হাজারো নরকের পাহারা দিয়ে নিজেদের শান্তি আর স্বার্থ আগলাচ্ছেন, সে-অধিকার তাঁরা কোথায় পেলেন? যে-মুগুর দিয়ে আমাদের গুঁতোচ্ছেন তাঁরা, মাঝে মাঝে সে মুগুরটা হাতে তুলে নেব, ছাড়ব না। সে-মুগুর যদি আমার হাতে আসে, সেটা কি আমাদের দোষ? ওরা আমাদের টিপে মারছে পাইকারী হারে। হেতের তুলবার অধিকার আমার আলবৎ আছে। হেতের মুঠো করে ধরব, এবং যে দুষমন আগ বাড়িয়ে আমাদের কাজ পন্ড করতে আসবে তার মাথাটাও নেব। এই তো জীবন! সে জীবনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো, সে জীবন আমি চাই না। আমি জানি ওসব অপদার্থদের রক্তে সার নেই! নিস্ফল রক্ত!.. কিন্তু আমাদের রক্ত! মাটির বুকে বৃষ্টি পড়লে বসুন্ধরা যেমন ফলবতী হন, তেমনি আমাদের রক্ত থেকে জন্ম নেবে সত্য। আর ওদের দূষিত রক্ত মাটিতে পড়লে চোঁ করে শুকিয়ে যাবে, একটু চিহ্নও থাকবে না। ও আমার জানা আছে। কিন্তু কাউকে সত্যি যদি খুন করতে হয়, আমি করব। পাপ যদি হয়ই, মাথা পেতে নেব!..

আমি মরলে আমার পাপ আমার সঙ্গেই যাবে, আগামী দিনের গায়ে তার কোনও দাগ থাকবে না। থাকলে আমারই গায়ে থাকবে। আর কোথাও লাগবে না।'

ঘরের এ মাথা ও মাথা পায়চারি করে বেড়ায় ও। যেন নিজের একটা অংশ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলছে নিজের হাতে এমনি ভঙ্গি। ওর দিকে তাকালে মা'র বুকটা টন্ টন্ করে ওঠে, ভয় হয়। মনে হয় ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে ওর ভেতরে, কোনো একটা ভাঙ্গন ধরেছে। এতক্ষণে খুনের সেই ভয়ানক কথাটা মা'র মন থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভেসভ্শিচকভ যদি না করে থাকে, তবে ওদের দলের আর কারো কর্ম নয়।

পাভেল মাথা নীচু করে শোনে আন্দ্রেইয়ের কথা। সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে গোঁ ধরে বলে চলেছে:

'কখনও কখনও এগিয়ে যাবার পথে নিজের বিরুদ্ধেও যেতে হয়। সব কিছু দিতে হয় — নিজের হৃদয় পর্যন্ত। যে ব্রত গ্রহণ করেছি, তার জন্য জান দেওয়া তো সহজ কথা। তার অনেক বেশি দিতে হয় — প্রাণের চেয়ে যা বেশি দিতে হয় তাই দিতে পারলে দেখবে তোমার কাছে যা সবচেয়ে বড়, যে-সত্যের জন্য লড়ছ, তা কত বিশাল, কত জোরদার হয়ে উঠেছে!..'

ঘরের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। মুখ ফ্যাকাশে, আধ-বোজা চোখ। উদ্যত হাতে গভীর শপথের ভাষা:

'আমি জানি, সময় আসবে যখন প্রতিটি মানুষ আর সকলের কাছে তারার মতো হয়ে উঠবে। তাদের রূপে তারা নিজেরাই মুগ্ধ হবে। পৃথিবীর বুকে থাকবে শুধু মুক্ত-মানুষ। মুক্তি তাদের মহিমা দিয়েছে। প্রত্যেকটি হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাবে। কারো মনে দ্বেষ হিংসে থাকবে না। জীবন রূপ পাবে মানুষের সেবায় — মানুষের মূর্তি পাবে স্বর্গের দেউল। কিছুই মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয়। মানুষ সেদিন সুন্দর হবে; সত্য আর সুন্দরের মুক্তিতে পাবে সে তার বীজমন্ত্র। আর যে-মানুষ সারা পৃথিবীকে কোল দিতে পারবে, তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে, সর্ব-বন্ধন মুক্ত সে মানুষ হবে নরোত্তম, কারণ সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ওই মুক্তিতে। এই নব-জীবনের মানুষই রচনা করবে মহাজাতি...'

মিনিটখানেক চুপ করে থাকে খখল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে:

'ঐ জীবন... ঐ জীবন সাধনার জন্য আমার সর্বস্বপন...' ওর স্বরটা যেন আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত।

ওর মুখ কেঁপে ওঠে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের বড় বড় ফোঁটা।

পাভেলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মাথা তুলে ও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় খখলের দিকে। মায়ের মনে আশংকার কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। চেয়ার ছেড়ে একটু উঠে দাঁড়ায় ও।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে পাভেল:

'কী? কী হল তোমার?'

খখল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ছিটকে উঠে দাঁড়ায় একেবারে সোজা হয়ে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে:

'আমি সব জানি... আমার চোখের সামনেই ঘটেছে...'

মা ছুটে গিয়ে ওর দু'হাত চেপে ধরে — ও ডান হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু মায়ের হাতে শক্ত করে ধরা। উৎকণ্ঠিত চাপা স্বরে বলে মা:

'চুপ চুপ, লক্ষ্মীটি...'

'দাঁড়ান!' মোটা গলায় বিড়্‌বিড়্‌ করে বলে আন্দ্রেই, 'কী করে কী হল সব বলছি...'

জল-ভরা চোখে মা চায় তার দিকে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে:

'না, না! বলবেন না আন্দ্রিউশা! বলবেন না...'

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে পাভেল। ছলছল চোখে, বিবর্ণমুখে মুচকি হেসে আস্তে আস্তে বলে ও:

'মা ভেবেছে, তুমিই বুঝি...'

'না, মোটেই তা ভাবিনি। বিশ্বাসই হয় না আমার, হবেও না। নিজের চোখে দেখলেও না।'

হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে খখল। ওদের দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে:

'দাঁড়ান। না, আমি নই। আমি খুন করিনি — তবে ব্যাপারটা আটকাতে পারতাম...'

পাভেল বলে, 'থাক, আন্দ্রেই থাক!'

আন্দ্রেইয়ের দীর্ঘ দেহটা থরথর করে কাঁপে। পাভেল এক হাত দিয়ে বন্ধুর একখানা হাত চেপে ধরে, আর এক হাত রাখে ওর কাঁধে

যেন কাঁপুনি থামাবার জন্যই। আন্দ্রেই তাদের দিকে মাথা নুইয়ে বলে কাটা কাটা স্বরে:

'তুমি জান পাভেল, আমি মোটেই চাইনি। তবু ঘটে গেল। তুমি তো এগিয়ে গেলে। আমি আর দ্রাগুনভ মোড়ের কাছে রয়ে গেলাম। এমন সময় ইসাই এল। এক পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল... দ্রাগুনভ বলল, সারা রাত্তির আমার পেছনে লেগে থাকে, আজ মেরেই ফেলব ওকে। বলে চলে গেল। আমি ভাবলাম বাড়ী গেল... তারপর ইসাই আমার কাছে এল...'

লম্বা একটা নিশ্বাস নেয় খখল।

'কী অপমানটাই করল আমাকে কুকুরটা। অমন করে কেউ আমায় বলতে সাহস পায়নি কোন দিন।'

মা নীরবে ওকে টেনে এনে অবশেষে টেবিলের কাছে বসিয়ে নিজে ওর পাশে বসে। দুজনের কাঁধে কাঁধ লেগে থাকে। পাভেল সামনে দাঁড়িয়ে বিরস মনে নিজের দাড়িতে চিমটি কাটে।

'ও বলল পুলিশের খাতায় নাকি আমাদের প্রত্যেকের নাম আছে। আমাদের মে-দিবসের অনুষ্ঠানের ঠিক আগেই নাকি সব্বাইকে ধরবে। জবাব দিইনি। একটু হাসলাম, কিন্তু আমার ভেতরটা টগবগ্ করে ফুটছিল। বলতে লাগল, আমি এত বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে এ ভুল পথে যে কেমন করে এলাম। এদিকে না এসে যদি...'

থেমে বাঁ হাত দিয়ে মুখ মুছে নিল। ওর চোখে অদ্ভুত একটা শুকনো দীপ্তি।

'বুঝতে পারছি!' পাভেল বলে।

'হ্যাঁ, এদিকে না এসে যদি আইন কানুনের সেবায় লাগতাম?'

খখল বদ্ধ মুষ্টি আস্ফালন করে দাঁতে দাঁত চেপে বলে:

'তাই বটে। শয়তান কাঁহাকা। ওকথা না বলে যদি আমায় দুঘা মেরে যেত... ওর পক্ষেও ভাল হত। মনে হল ওর পচা বোট্‌কা গন্ধওলা থুথু আমার বুকের ভেতরটায় ছিটিয়ে দিলে। সইতে পারলাম না।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নেয় আন্দ্রেই। চাপা, তীব্র ঘৃণার স্বরে বলতে থাকে:

'ওর মুখে একটা চড় কষিয়ে চলে এলাম। হঠাৎ শুনি পেছনে দ্রাগুনভের গলা। চুপি চুপি বলছে — এইবার তোমায় হাতেনাতে ধরেছি! দ্রাগুনভ নিশ্চয়ই মোড়েই ঘাপটি মেরে ছিল...'

থেমে আবার বলে খখল:

'পেছন ফিরে আর তাকাইনি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম... মারের শব্দ কানে এল... না থেমে চলে এলাম এমনি ভাবে যেন একটা ব্যাংই মাড়িয়ে মেরে ফেলেছি। কাজ করছি এমন সময় ছুটে এল সব চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে — ইসাইকে মেরে ফেলেছে কে। বিশ্বাস হল না। কিন্তু আমার হাতটা যেন অবশ হয়ে গেল, কিছুতেই কাজ করতে পারছিলাম না। ঠিক যে ব্যথা তা নয়, যেন একটু খাটো হয়ে গেল...'

আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল হাতটার দিকে।

'ওই কুৎসিত দাগ বুঝি আর জীবনে যাবে না...'

মা কোমল স্বরে বলে, 'কিন্তু তোর মনটা সৎ হলেই হল!'

দৃঢ়ভাবে বলে খখল, 'না, দোষের কথা নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন বিশ্রী! এর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইনি।'

পাভেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'বুঝতে পারছি না। খুন তো তুমি করনি। কিন্তু ধর যদি তুমিই করতে...'

'ভাই, তুমি যখন জান যে একটা মানুষ খুন হচ্ছে, অথচ বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করছ না...'

'বুঝতে পারিনে, বাপু,' পাভেল আবার বলে দৃঢ় কণ্ঠে, তারপর একটু ভেবে যোগ করে, 'মানে বুঝতে পারছি, কিন্তু অনুভব করতে পারছি না।'

বাঁশী বেজে ওঠে। কঠোর আহ্বান। মাথাটা একপাশে হেলিয়ে শোনে খখল, তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে:

'আজ কাজে যাব না...'

'আমিও না।' পাভেল বলে।

'আমি স্নানাগারে যাচ্ছি।' বলে তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় নিয়ে অত্যন্ত বিরস মনে বেরিয়ে যায় খখল।

মা সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। চলে গেলে বলে:

'যাই বলিস্, পাভেল, মানুষ মারা মহা পাপ। কিন্তু তার জন্য কাউকে দোষী করিনে আমি। ইসাই-এর জন্যই কষ্ট হয় আমার। লোকটা এতই

তুচ্ছ। সকালে যখন দেখলাম, মনে পড়ে গেল, তোকে ফাঁসিতে লটকাবে বলে শাসিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ও মরাতে আমার ফুর্তিও হয়নি, ওর ওপর ঘেন্নাও হয়নি। শুধু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু এখন... এখন আর তাও হয় না...'

চিন্তিতভাবে চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ মা। তারপর যেন অবাক হয়ে হেসে বলে, 'কী সব যা তা বলছি, দেখ দেখিনি!'

ধীরে ধীরে পায়চারি করে পাভেল। মাথা নীচু করে বিষণ্ন মুখে কী যেন ভাবে। ওর জবাব থেকে বোঝা যায় মায়ের কথা ওর কানে যায়নি:

'এই হলো জীবনের চেহারা। পরস্পরের ওপর মানুষের মন কী রকম বিশ্রী ভাবে বিষিয়ে আছে দেখেছ? মারতে চায় না, তবু হাত উঠে যায়। আর মারছ কাকে? না, নেহাৎই একটা তুচ্ছ প্রাণী, যে তোমার আমার আর পাঁচজনের মতোই বঞ্চিত। বরঞ্চ বুদ্ধি নেই বলে ও আরও দুর্ভাগা। পুলিশ, গোয়েন্দারা আমাদের শত্রু। কিন্তু তারাও আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের মতোই তাদেরও রক্ত শুষছে রক্ত-চোষারা। আমাদের যেমন মানুষ বলে গণ্য করে না, ওদেরও তাই। কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু লোককে জুজুর ভয় দেখিয়ে একে অন্যের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। হাত-পা বেঁধে, যাঁতা কলে পিষছে ওদের, রক্ত শুষে শুষে খাচ্ছে। জুলুম জবরদস্তি করে ওদের দিয়ে ভাইকে ঠ্যাঙাচ্ছে। ওদের তো আর মানুষ করে রাখেনি, ওদের হাতের ডান্ডা-বন্দুক আর ইঁট পাথর যেমন, ওরাও তেমনি। আবার জাঁক করে বলছে ওই নাকি রাষ্ট্র!..'

মায়ের কাছে আসে। বলে, 'এ যে কত বড় অন্যায় মা, এমনি করে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা! প্রাণে মারার চেয়ে আত্মাকে মারা। এর চেয়ে ঘৃণ্য হত্যা আর কী আছে! ওদের আর আমাদের মধ্যে তফাৎটা বুঝতে পাচ্ছ তো? একজন চড় মারলে তাতেই কত লজ্জা, কত গ্লানি, আর কষ্ট। গা ঘিনঘিন করে। আর ওরা, নির্মমভাবে হাজার হাজার লোককে অকাতরে প্রতিদিন মারছে ওরা! একটুকু বিবেক দংশন নেই; বরঞ্চ ফুর্তি করতে করতেই ওরা মানুষ মারে। কিন্তু কেন? স্রেফ নিজেদের স্বার্থে। টাকা-কড়ি আর আখের গুছোবার জন্য, আর মানুষদের ওপরে মালিকানা কায়েম করার জন্য আমাদের শুষে শুষে, নিংড়ে নিংড়ে শেষ করে ফেলে। একবার ভাবো দেখিনি মা! একটা গোটা মানবতার টুঁটি টিপে মেরে তার আত্মাকে বিকৃত বিকল করে ছেড়ে দেওয়া? ওরা কি

সত্যি নিজেদের জন্য করে এই জঘন্য কাজ — না মোটেই নয়। করে ওদের পংজি আগলাবার জন্য। বাইরের দৌলত রক্ষার জন্য, আত্মার দৌলতের জন্য নয়...'

নীচু হয়ে মায়ের হাতখানা ধরে একটু জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে:

'কী যে সাংঘাতিক, লজ্জার, কুৎসিত ব্যাপার মা, যদি জানতে সব, তাহলে বুঝতে পারতে আমাদের সত্য, দেখতে কী উজ্জ্বল সে সত্য!..'

মা উঠে পড়ে। বুকের ভেতর যেন তুফানের তোলপাড় চলে। ইচ্ছে হয় ছেলের হৃদয়ের সঙ্গে নিজের হৃদয়খানিকে এক করে দিয়ে এক আলোক শিখায় মিশিয়ে দেয়।

অতি কষ্টে অস্ফুট-স্বরে বলে:

'ওরে দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর! একটু... একটু বুঝতে পারছি... একটু দাঁড়া!..'

২৫

বাইরের দরজায় কার যেন জোর পায়ের শব্দ। দুজনেই চম্‌কে উঠে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে যায়। থপ থপ করে রীবিন ঢোকে। হাসিমুখে তাকিয়ে বলে:

'নাও, এলাম হে। আমি বাপু আছি সর্ব ঘটেই — এই হেথায়ও হাজির হয়েছি।'

ভেড়ার চামড়ার জামা গায়ে, গাছের বাকলের জুতো পায়ে, আর মাথায় লোমওলা টুপি। বেল্টে গোঁজা এক জোড়া কালো দস্তানা।

'আরে পাভেল! দিলে ছেড়ে? তা বেশ। তা তুমি কেমন আছ গো পেলাগেয়া নিলভনা?' সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিকিয়ে এক গাল হেসে কুশল শুধয় সবার। গলার স্বরটা আগের চেয়ে আরো কোমল। দাড়ি আরো বেড়ে উঠে রীতিমত অরণ্য হয়ে উঠেছে।

খুশি হয়ে ওঠে মা। নাকে আসে আলকাতরার স্বাস্থ্যকর কড়া ঝরঝরে গন্ধ। কালো ধ্যাবড়া হাতে করমর্দন করতে করতে বলে, 'বড় খুশি হলাম তোমায় দেখে...'

অতিথির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে পাভেল:

'এ যে দেখছি মুজিক ভাই এল।'

কোট টুপি আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে রীবিন বলে, 'হ্যাঁ, আবার মুজিকই হয়েছি। তোমরা তো ভদ্রলোক বনছ একটু একটু, আমি না হয় উল্টোটাই হলাম...'

রং বেরং-এর শার্টটা ঠিক করতে করতে ঘরে ঢোকে সে আর নিরীক্ষণ করে দেখে চারদিক।

'আসবাবপত্র তো নতুন কিছু দেখছি না, তবু বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে! তারপর, শোনাও দেখি তোমাদের সব কথাবার্তা।'

পা অনেকখানি ফাঁক করে, হাঁটুর ওপর হাতের তেলোয় ভর দিয়ে বসে রীবিন। মুখে মৃদু হাসি; জবাবের প্রতীক্ষা করতে করতে গাঢ় চোখ দুটি দিয়ে পাভেলের মুখে কী জানি খোঁজে।

পাভেল বলে, 'বেশ চলছে সব।'

রীবিন হাসে। বলে, 'বড়াই করব না। জমি চষি, বীজ বুনি। চোখের সামনে গাছ হয়, ফসল ফলে। তারপর, আর কি—বীয়ার চোলাই—আর বাকী বছরটা ঘুম! তাই না? কী বল হে দোস্তরা।'

পাভেল ওর মুখোমুখি বসে বলে, 'আপনার খবর বলুন দেখি, মিখাইলো ইভানভিচ্!'

'বেশ আছি। থাকি ইয়েগিলদেয়েভোতে—নাম শুনেছ? চমৎকার গ্রাম। বছরে দুবার মেলা হয়। হাজার দুইয়ের বেশি বাসিন্দা আছে। সবাই রেগে আছে। কিন্তু দুরবস্থার শেষ নেই। এক ফোঁটা জমি নেই কারো। চষতে হয় বরগা নিয়ে চষো। আমি মজুরী খাটছি একটা ছিনে-জোঁকের কাছে। পচা মড়ার ওপর যেমন পোকা গিজ্‌গিজ্ করে, তেমনি ওই ছিনে-জোঁকের দল গিজ্‌গিজ্ করছে জায়গাটায়। কয়লা পুড়িয়ে আলকাতরা বানানো আমার কাজ। এখানে যা পেতাম তার সিকি পাই, খাটি ডবল। সাতজন আছি আমরা ওই ছিনে-জোঁকটার ওখানে। সব জোয়ান মানুষ, ভারি ভালো সব। আমি ছাড়া সব ওখানকারই লোক। লেখাপড়া একটু আধটু সবাই জানে। ওদের একটার নাম ইয়েফিম, ভারি গোঁয়ার।'

'আপনি আলাপ আলোচনা করেন?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে পাভেল।

'জিভে তো আর কুলুপ মেরে রাখিনি। তোমাদের বই-পত্তর—খান চৌত্রিশ হবে, সব নিয়ে গেছি। কিন্তু বাপু সবচেয়ে বেশি চালাই বাইবেল। অনেক কিছু পাওয়া যায় ওতে। বেশ মোটা বই। তা ছাড়া শাস্তর। ওটার ওপর বিশ্বাস টিশ্বাস রাখা দরকার।'

পাভেলের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসে।

'ভাবছ বুঝি ঐ পর্যন্তই দৌড়! না হে না, বই-পত্তর নিতে এসেছি আরো কিছু। ওই ইয়েফিম ছোঁড়াও আছে আমার সঙ্গে। আলকাতরা দিয়ে আজ মালিক পাঠালে এদিকে। ঐ মওকায় একটু চক্কর দিয়ে গেলাম। দাও দেখি কী দেবে। ইয়েফিমটা আসার আগেই সেরে সুরে ফেল। সব অন্ধি-সন্ধি ছোঁড়ার না জানাই ভালো।'

মা রীবিনের দিকে তাকায়। ওর পোষাক ছাড়া আরো কিছু যেন বদলেছে, ধরন-ধারণ যেন আগের মতো অত ভারিক্কী নেই। সে সরল দৃষ্টি আর নেই, তাতে চালাকী ঝিলিক দিচ্ছে।

পাভেল বলে, 'মা একটু নিয়ে আসবেন? ওরা জানে কোন বই। বলবেন গাঁয়ে পাঠাতে হবে।'

'যাচ্ছি, এই এলাম বলে, শুধু সামোভারটা প্রস্তুত হোক।'

রীবিন মুচকে হেসে বলে, 'তুমিও ভিড়েছ গো, পেলাগেয়া নিলভনা? তা বেশ। আমাদের ওখানে মেলা লোক বই টই চায়। ওখানকার মাষ্টার মশাইটির কীর্তি। বেশ লোক, যদিও গির্জার গুষ্টি। ভার্স্ট সাতেক দূরে একজন মাষ্টারণীও আছে। ওরা অবশ্য এসব নিষিদ্ধ বই টই ছোঁয় না— সরকারী চাকরীতে—এসব ভয় পায়। কিন্তু এ বই আমার দরকার—বেশ ঝাল-মশলাদার বই, বুঝলে? পুলিশ টুলিশ বা পাদ্রী মশাইয়ের চোখে যদি পড়ে মাষ্টার বেচারাদের বিপদ ঘটবে। আমি অবশ্য একটু সরে থাকব, আড়ালে আবডালে।'

নিজের চালাকীতে বেশ আত্ম-প্রসন্ন। গাল ভরে হাসে।

মা ভাবে মনে মনে, "চেহারাটি ভাল্লুকের মতো অথচ বুদ্ধিতে তো দেখছি শেয়াল..."

পাভেল শুধয়, 'মাষ্টারদের যদি সন্দেহ করে, তবে ধরে জেলে পুরবে নাকি?'

'নয়তো কী?' রীবিন জবাব দেয়।

'কিন্তু দোষ তো আপনার, জেলে তো আপনারই যাওয়া উচিত...'

'অবাক করলে তুমি?' হাঁটু চাপড়ে বলে রীবিন। 'আমায় সন্দেহই করবে না! বই-পত্তর ভদ্দরলোকের জিনিস। আমরা চাষাভুষো মানুষ। কোত্থেকে এল বই-পত্তর, ওই মাষ্টাররাই জবাব দেবে...'

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে পাভেল। ছেলের এই ভঙ্গীটুকু মায়ের চেনা—রীবিনের ব্যাপারটা পাভেলের ঠিক বোধগম্য হয়নি এবং সে রেগেছে।

সাবধানে নরমভাবে বলে মা, 'মিখাইল ইভানভিচ কাজ করবেন নিজে, কিন্তু তার দায় চাপাবেন অন্যের ঘাড়ে। কেমন?'

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দেয় রীবিন, 'সময় সময় তাই।'

'আচ্ছা মা,' শুক্‌নোভাবে বলে ওঠে পাভেল, 'কেউ যদি, ধরো আন্দ্রেই, আমার পেছনে লুকিয়ে কিছু করল অথচ তার জন্য জেল হল আমার। তখন কেমন লাগবে তোমার?'

মা চম্‌কে ওঠে। পাভেলের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে মাথা নেড়ে বলে, 'কমরেডদের চোখে ধুলো দেবে? পারবে কী করে?'

'ওহেঃ, বুঝেছি হে বুঝেছি, কী বলতে চাইছ, পাভেল!' টেনে টেনে বলে রীবিন, তার পর ঠাট্টা করে চোখ ঠেরে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বুঝলে মা, ব্যাপারটা খুব জটিল!' তার পর আবার পাভেল-এর দিকে ফিরে বলে মাষ্টার মশাইয়ের মতো, 'বুদ্ধি সুদ্ধি পাকেনি এখনও, দোস্ত! বেআইনী কাজ করতে গেলে অত মান-মর্যাদার কথা ভাবলে চলে না। নিজেই ভেবে দেখ! জেলে যাবার কথা বললে! পয়লা তো যাবে যার কাছে বেআইনী কাগজপত্র পাওয়া গেল সে। মাষ্টাররা নয়। দ্বিতীয় নম্বর হল, আমরা যা বলি আর মাষ্টাররা যা পড়ায়, সবই হরেদরে এক জিনিস। ওরা খালি কর্তাদের পাশ-করা বই পড়ায়। তার কথাগুলো আলাদা আর তার মধ্যে সত্যিটা কিছু কম আছে। ঐটুকুই যা তফাৎ। সোজা কথায়, আমি চলি গট্‌গটিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে। আর ওরা যায় অলিগলি দিয়ে। আমি যা চাই ওরাও চায় তাই। মানে, কর্তাদের কাছে দুইয়ের কসুরই সমান! কী বল, ঠিক কি না! তিন নম্বর হল—যতই করুক ওরা, ওদের বেলায় আমার কিছু আসে যায় না। শত হলেও পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার সেপাইয়ে দোস্তি হয় না কখনও। তবে হ্যাঁ, চাষী ভাইরা হলে অন্য কথা। তাদের সঙ্গে হয়ত অমনটি করব না! এ দিকে ওই মাষ্টারটা একজন পাদ্রীর ছেলে, বুঝলে! আর মাষ্টারণীর বাপ হচ্ছে জমিদার। এদের এখন এই ছোটলোকগুলোর জন্য এত মাথা-ব্যথা কেন হে? আমি চাষা-ভুষো মানুষ। ওই সব ভদ্দরলোকদের মন-মেজাজ বোঝা আমার কর্ম নয়। আমি শুধু আমারটুকুনি জানি! হাজার বছর তো তেনারা জ্যান্ত চাষীদের গতর থেকে ছাল-চামড়া তুলেছেন। সেটা বেশ বুঝেছি। কিন্তু আজ এই যে বলা নেই কওয়া নেই, দরদ উথলে উঠল, আর নিজের

হাতে আমাদের আঁধার চক্ষের ঠুলি খসাতে লেগে গেলেন, ওটা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না। পরীর গপ্প মালুম হচ্ছে। পরীর গপ্প-টপ্পর ধার ধারিনে বাপু! বুঝলে কিনা ব্যাপারটা। কোথায় আমি, আর কোথায় তেনারা -- মানে ওই ভদ্দরলোকেরা। আসমান-জমিন তফাৎ। এই ধরো, শীতকালে তুমি একটা ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলেছ। হঠাৎ দেখতে পেলে, সামনে দিয়ে কী যেন একটা চলে গেল। নেকড়ে হতে পারে, শেয়াল হতে পারে, কুকুরও হতে পারে। এত দূরে যে বুঝতেই পারা গেল না কী সেটা।'

মা ছেলের দিকে তাকায়—কেমন শুকনো শুকনো দেখায় ওকে। রীবিন আত্ম-সন্তুষ্টভাবে নিরীক্ষণ করে ওকে। উত্তেজিত হয়ে দাড়িতে হাত বোলায়, তার চোখে একটা ক্রূর ঝিলিক খেলে যায়। বলে:

'ভদ্রতা টদ্রতার সময় নেই এখন আর। ভারি কঠিন হয়েছে জীবন। কুকুর তো ভেড়া নয়, বাপু হে। তারা মেজাজ-খুশি মতো ঘেউ ঘেউ করবেই...'

চেনা মুখগুলো ভেসে ওঠে মায়ের চোখের সামনে। বলে:

'ভদ্দরলোকেরাও গরীবের জন্য জান দেয়। কত ভদ্দরলোক তো জেলেই গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়...'

'ওঃ, তাদের কথা আলাদা!' জবাব দেয় রীবিন, 'তা ওদের ব্যাপার, ওদের জাতই আলাদা। মুজিকরা বড়লোক হয়ে ওপর পানে ওঠে ভদ্দরলোক হয়। আর ভদ্দরলোকেরা গরীব হয়ে মাটিতে নেমে আসে, মুজিক হয়। এই তো দেখছি। হাত খালি হলেই লোকে সৎ হয়। মনে আছে পাভেল আমায় কী বলে বুঝিয়েছিল? কে কেমন করে থাকে, তাইতেই তার রীত-চরিত্তির, মন-মেজাজ বোঝা যায়। বুঝলে কি? এদিকে তো মজদুর বলবে "হ্যাঁ", তো মালিক বলবে "না"। আর মালিক বলবে "হ্যাঁ", তো মজদুর বলবে "না"। মুজিক ভদ্দরলোকের ব্যাপারও ঐ। চাষীর পো একদিন যদি পেট পুরে দুটো খেলে তো জমিদার শালার পেট ফাঁপতে লাগবে। তবে সব স্তরেই বদমাইস লোক কিছু না কিছু থাকেই। তাই সব মুজিকদের সমর্থন করতে আমি রাজি নই...'

খাড়া দাঁড়িয়ে ওঠে ওর বলিষ্ঠ কালো দেহটা। মুখ নিষ্প্রভ, দাড়ির গোছা কেঁপে উঠেছে, যেন নিঃশব্দে ও দাঁত কড়মড় করছে। একটু নরম সুরে আবার বলতে আরম্ভ করে:

'পাঁচ পাঁচটা বছর কারখানায় কারখানায় ঘুরেছি। গ্রাম যে কী একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে গাঁয়ে গেলাম, তাকিয়ে দেখলাম আর আমার চমক ভাঙ্গল। এভাবে থাকতে পারব না, বুঝলে হে! আর পারব না। গাঁয়ের যে কী হাল, হেথা বসে তার আন্দাজ করতেই পারবে না। ক্ষিদে ওদের নিত্য সাথী। নিজের ছায়ার মতো পেছনে লেগে আছে অষ্টপ্রহর। এক টুকরো রুটির পিত্যেশ নেই কোথাও। ক্ষিদে ওদের তো খাচ্ছেই, ওদের আত্মাকে অবধি গিলে খাচ্ছে। মানুষের চেহারাই কি আছে নাকি ওদের? ক্ষিদের জ্বালায় সেটা অবধি গেছে। কোন মতে ধুক্‌পুকিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু সে বাঁচন মরার বাড়া। গলে-পচে যাওয়া... সরকারী গোলামরা শকুনির মতো ঘিরে থাকে ওদের; কোন ফেলনা-ফালতু জিনিসে হাত দিলেও রক্ষে নেই... একবার তা চোখে পড়লে জিনিসপত্র তো কেড়েকুড়ে নেবেই, তারপর ঘুষি মেরে চোয়ালের হাড়টিও আর আস্ত রাখবে না...'

মুখ ফিরিয়ে রীবিন পাভেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে টেবিলে হাত রেখে।

'আমারো গা ঘুলিয়ে উঠল। পয়লা তো মনে হয়েছিল বুঝি পারব না। মনে মনে নিজেকে খুব ধমকে দিলাম। খবরদার! পালানো টালানো চলবে না। ক্ষিদের রুটি হয়তো জোগাতে পারব না, কিন্তু খিচুড়ী তো পাকাতে পারব! মানুষের অপমানে আমার গায়ের চামড়া চড়চড় করতে লাগল, সেই অপমান আজো কলজের মধ্যে ছুরির ফলার মতো বিঁধে আছে।'

ধীরে ধীরে পাভেলের পাশে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে আর হাত কাঁপছে।

'তোমার সাহায্য চাই পাভেল। আমায় বই দাও — এমন বই দাও, যা পড়ে ওদের চোখের ঘুম পালায়। বুঝলে হে, যেমন তেমন জিনিসে হবে না, চোখা চোখা সজারুর কাঁটা চাই। মাথার খুলির নিচে সজারুর কাঁটা বসাতে হবে। যারা তোমাদের সব বই টই লেখে, তাদের বলে দিও গাঁয়ের লোকেদের জন্যও যেন লেখে কিছু। এমনি করে লিখবে, যেন টগবগিয়ে ফোটে লেখাগুলো, মানুষগুলোর বুকে আগুন জেবলে দেয়,— মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানটাই দিয়ে দেয়!'

তারপর হাত তুলে প্রতিটি কথা অতি স্পষ্ট করে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে বলে:

'মরণ দিয়েই তো মরণকে জিততে হয়। মরব কি অমনি? মুর্দাগুলোকে ফিরে বাঁচিয়ে তোলার জন্য মরব। দুনিয়া জোড়া লাখ লাখ মানুষকে বাঁচাবার

জন্য হাজারে হাজারে জান আমাদের দিতে হবে। বুঝলে কি না! আরে মরণ তো সোজা — মানুষগুলো জাগুক, মানুষগুলো উঠুক!'

মা সামোভার নিয়ে আসে। আড়চোখে তাকায় রীবিনের দিকে। ওর কথার ধারে আর ভারে মা যেন নুয়ে পড়ে, ওকে দেখে কেন জানি আজ স্বামীকে মনে পড়ে। অমনি করেই দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ত তার; শার্টের আস্তিন গুটোবার সময় হাতখানা অমনি করেই উঠত। এমনিই অস্থির রাগী ছিল মানুষটা, কিন্তু কথা কইত না। এ লোকটা মনের কথা প্রকাশ করতে জানে, তাইতেই ওকে অত ভয় করে না।

পাভেল মাথা নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আপনারা শুধু আমাদের মালমশলা দিন, খবরের কাগজ বার করব আপনাদের জন্য...'

মা ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর মাথা নেড়ে কাউকে কিছু না বলে গায়ের কাপড় টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

'বেশ কথা। দেব তোমায় মালমশলা। কিন্তু ভাষাটা যেন খুব সোজা ঝরঝরে হয় হে! বাছুরেও যেন পড়ে বুঝতে পারে।' রীবিন বলে।

রান্নাঘরের দরজা খুলে কে একজন ভেতরে আসে।

'এই যে ইয়েফিম! আরে এসো, এসো, ইয়েফিম এসো! আর এই পাভেল! পাভেল, তোমায় এরই কথা বলছিলাম।'

পাভেলের সামনে দাঁড়ায় লম্বামত একটি ছেলে; চওড়া মুখ, সোনালী চুল, খাটো একটা ভেড়ার লোমের কোট গায়ে, টুপিটা হাতে ধরা। ভুরুর নীচ দিয়ে ধূসর চোখ তাকিয়ে থাকে পাভেলের দিকে। চেহারা দেখে মনে হয় খুব জোয়ান। মোটা গলায় বলে:

'ভারি খুশি হলাম আপনাকে দেখে,' করমর্দন করে হাত দুটো নিজের সোজা চুলগুলির মধ্যে বুলিয়ে দেয়। তাকিয়ে দেখে চারদিক। বইয়ের তাকটার দিকে চোখ পড়তেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

পাভেলের দিকে চোখ টিপে রীবিন বলে, 'এই রে, ঠিক চোখ পড়েছে!' ইয়েফিম ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায়, তারপর বইগুলো দেখতে দেখতে বলে ওঠে:

'ওরে বাস্! কত বই! কিন্তু পড়বেন কখন? গাঁয়ে থাকলে মেলা সময় পেতেন...'

'কিন্তু মেলা ইচ্ছেটি আর থাকত কি?' পাভেল বলে।

'বারে! তা কেন? লোকের মগজগুলো চাঙ্গা হতে সুরু করেছে। "ভূ-তত্ত্ব"? সে আবার কী?'

বুঝিয়ে দেয় পাভেল।

বইটা তাকে রাখতে রাখতে ইয়েফিম বলে: 'আমাদের এ বইয়ে দরকার নেই।'

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রীবিন বলে, 'অত সব পৃথিবীর খবর জেনে চাষাভুষোরা কী করবে। জমি বিলি করা হল কী ভাবে তার হদিস্‌টা পেলেই হল। জমিদার ব্যাটারা চোখের ওপর দিয়ে কেমন করে চুরি করল! এ্যাঁ? দুনিয়াটা ঘুরছে না দাঁড়িয়ে আছে তা জেনে কোন ইষ্টিটা লাভ হবে! আমাদের ফসল নিয়ে কথা। তারপর দুনিয়াটা আসমান থেকে লট্‌কে থাক আর হেঁট মাথা করে বাদুড়-ঝোলাই ঝুলুক, তা আমাদের কী!'

আর একটা বইয়ের নাম পড়ে ইয়েফিম, '"দাসত্বের ইতিহাস", এ কি আমাদের কথা?'

অন্য একটা বই ওর হাতে তুলে দিয়ে পাভেল বলে, 'এর মধ্যে আমাদের দেশের ভূমিদাসদের কথা কিছু আছে।' বইখানা উল্টে পাল্টে রেখে দিল ইয়েফিম। বলে:

'এতো সেকেলে কথা।'

'আপনার নিজের জমি আছে?' জিজ্ঞাসা করে পাভেল।

'হ্যাঁ। আমাদের তিন ভাইয়ের আছে বৈকি কয়েক বিঘে। কিন্তু স্রেফ বালি। বাসন মাজা যায়, বাস্‌ ঐ পর্যন্ত!..'

এক মুহূর্ত থেমে আবার বলে চলে:

'জমি ছাড়ান দিয়ে ক্ষেত মজুরী করছি এখন। কী করব! জমি তো পেটের অন্ন যোগাতে পারে না, শুধু পায়ের বেড়ি হয়ে আছে। বছর তিনেক হল ক্ষেত-মজুরের কাজ করছি। সেপাই-এর কাজ করতে হয় শরৎকালে। মিখাইলো কাকা বলে, যেও না। সেপাইদের দিয়ে নাকি আজকাল মানুষ খুন করায়। কিন্তু আমি বলি, কেন যাব না? ওসব হত আগে, স্তেপান রাজিন বা পুগাচভের সময়েও। এখন সব বদলাতে হবে তো! আপনি কী বলেন?' প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পাভেলের দিকে।

হেসে জবাব দেয় পাভেল, 'নিশ্চয়ই, সময় হয়েছে! কিন্তু কাজটা খুব কঠিন। সৈন্যদের কী বলা উচিত আর কেমন করে বলা উচিত তা জানা দরকার...'

ইয়েফিম বলে, 'তা শিখব!'

ওর দিকে একটা কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে পাভেল বলে, 'কর্তারা টের পেলে গুলি করবে।'

ছেলেটি শান্তভাবে বলে, 'হ্যাঁ, ওরা ছেড়ে দেবে না!' তারপর আবার বই দেখতে লাগল।

রীবিন বলে, 'চা-টা খেয়ে নাও, ইয়েফিম, শীগ্গির শীগ্গির যেতে হবে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, খাচ্ছি। বলুন তো বিপ্লব কাকে বলে? বিদ্রোহকে?'

ফিরে এল আন্দ্রেই। মুখ চোখ লাল, এখনও যেন বাষ্প বেরুচ্ছে দেহ থেকে। মুখে একটা বিরস ভাব। নিঃশব্দে ইয়েফিমের সঙ্গে করমর্দন করে রীবিনের পাশে গিয়ে বসে পড়ল; ওকে দেখে একটু হাসল।

রীবিন ওর হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বলে, 'কী হে, কী হলো, মুখখানা অমন ভার কেন?'

খখল জবাব দেয়, 'এমনি!'

ইয়েফিম আন্দ্রেইয়ের দিকে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করে, 'ও-ও কি কারখানায় কাজ করে?'

আন্দ্রেই বলে, 'হ্যাঁ। কেন বল তো!'

রীবিন জবাব দেয়, 'এর আগে কারখানার লোক দেখেনি। ওর ধারণা ওরা সব আলাদা জীব...'

'কী হিসেবে?' জিজ্ঞাসা করে পাভেল।

ইয়েফিম আন্দ্রেইকে একমনে নিরীক্ষণ করে বলে, 'তোমাদের বাপু বড় চোখা চোখা হাড্ডি। আমাদের চাষার হাড্ডির অত ধার নেই...'

রীবিন যোগ করে, 'চাষী ব্যাটারা বেশি শক্তভাবে ভূঁয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের পায়ের তলায় মাটি অনুভব করে। মাটির ছোঁয়াটুকুনি-- ব্যস্। কিন্তু কারখানার মজুর — পাখি! পাখি! ঘর নেই, বাড়ী নেই, দেশ মাটি কিচ্ছু নেই... আজ হেথা কাল হোথা। মেয়েমানুষও ওদের এক ঠেঁয়ে বেঁধে রাখতে পারে না, কিছু হল তো সেলাম ঠুকে ফুড়ুৎ! চলল একটা ছেড়ে আরেকটার তালাশে। কিন্তু চাষাভুষোরা কোনখানটিতে যাবে না, মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। আপন ভূঁয়েই থেকে ঘর দুরস্ত করে নিতে চায় ওরা। এই যে তোমার মা এসেছে ফিরে।'

ইয়েফিম পাভেলের কাছে এসে বলল, 'আপনার দু'একটা বই আমায় পড়তে দেবেন?'

'দেব বৈকি!' সাগ্রহে জবাব দেয় পাভেল।

লোভে চক্‌চক্‌ করে ওঠে ইয়েফিমের চোখ। তাড়াতাড়ি বলে:

'শীগ্গিরই ফেরত পাঠাব। আলকাতরা নিয়ে হরদমই তো আমাদের লোকজন এদিকে আসছে যাচ্ছে।'

রীবিন জামা পরে বেল্ট এঁটে তৈরী। হাঁক দেয়, 'চল হে!'

বইগুলো দেখিয়ে ইয়েফিম একগাল হেসে বলে, 'কী মজা! খুব পড়তে পাব!'

ওরা চলে গেলে আন্দ্রেইয়ের দিকে ফিরে পাভেল বেশ উত্তেজিতভাবে বলে ওঠে:

'কেমন লাগল শয়তানদের?'

ধীরে ধীরে টেনে টেনে জবাব দেয় খখল, 'হুঁ-উ-উঁ! এক জোড়া ঝোড়ো মেঘ আর কি...'

'কি রকম বদলে গেছে মিখাইলো!' মা বলে, 'কে বলবে দেখে কারখানায় মজুরী খেটেছে কোনোদিন! একেবারে খাঁটি মুজিক, আর কী সাংঘাতিক হয়েছে দেখতে!'

চায়ের গেলাশ হাতে নিয়ে বসে বসে ভুরু কোঁচকায় আন্দ্রেই। পাভেল বলে:

'প্রথম থেকে ছিলে না! থাকলে দেখতে লোকের মনের মধ্যে কী কাণ্ড চলছে। তুমি তো মানুষের মন নিয়ে পাগল! কত কথাই যে বলল রীবিন! আমি তো থ মেরে গেলাম, মুখে কথা সরল না!.. ওঃ, মানুষের ওপরে ওর কী কম বিশ্বাস! মানুষের কোন দামই নেই ওর কাছে। মা ঠিক বলেছেন, ওর ভেতরে সাংঘাতিক শক্তি আছে।'

'সে আমি দেখেই বুঝেছি!' বিরস মুখে জবাব দেয় খখল। 'মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে কর্তারাই। তাই জনসাধারণ যখন উঠবে, তারা কিছু বাকী রাখবে না। সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবে। ফাঁকা মাটি চায় ওরা। একেবারে খাঁ-খাঁ করা শূন্য মাটি। তা ওরা সব ফাঁকা করেই নেবে। সব কিছুই ঝেড়ে ফেলবে!'

একটি একটি করে ধীরে ধীরে কথাগুলো বেরিয়ে আসে। বোঝা যায় অন্য কিছু ওর চিন্তাকে ছেয়ে আছে। কাছে এসে মা সন্তর্পণে ওর গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'ছিঃ, আন্দ্রিউশা! অমন করে না। চাঙা হয়ে ওঠো।'

'দাঁড়ান, নেন্‌কো, দাঁড়ান।' শান্ত কোমল স্বরে বলে খখল। তারপর সহসা যেন জ্বলে ওঠে। টেবিল চাপ্‌ড়িয়ে বলে:

'দেখে নিও, পাভেল! একবার খাড়া হয়ে দাঁড়ালে চাষীরা জমি ফাঁকা করে দেবে। প্লেগের মতো সব পুড়িয়ে, ভেঙ্গে ছারখার করবে — ওদের জীবনের কালো ইতিহাসটার কোন চিহ্ন রাখবে না...'

আস্তে আস্তে পাভেল বলে, 'তারপর ওরাই আমাদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'

'বাধা হতে দেব না, সেটাই আমাদের কাজ! রাশ টেনে রাখব। আমরাই ওদের সব চেয়ে আপনার জন। আমাদের ওরা বিশ্বাস করবে এবং আমাদের পথ মেনে নেবে।'

পাভেল বলে, 'গাঁয়ের জন্য একটা খবরের কাগজ বার করতে বলছিল আমায় রীবিন।'

'খুব ভালো কথা!'

'একটু তর্ক করলে হত রীবিনের সঙ্গে। না করে খারাপ লাগছে।' সংক্ষিপ্ত হাসি হেসে বলে পাভেল।

মাথাটা ঘষতে ঘষতে শান্তভাবে জবাব দেয় খখল: 'মেলা সময় পাবে তার। তুমি তোমার বাঁশী বাজিয়ে যাও, যাদের পা এখনো মাটিতে আটকে যায়নি, তারা নাচবে ওই তালে তালে। ঠিকই বলেছে রীবিন, পায়ের তলার মাটিকে আমরা অনুভব করি না। চাইও না। আমাদেরই মাটিটাকে ধরে কষে নাড়া দিতে হবে কিনা! একবার নাড়া দেব, বাঁধন ঢিলে হবে। আরেকবার, ব্যস্‌...'

মা হেসে বলে, 'সবই ভারি সোজা তোমার কাছে আন্দ্রিউশা!'

'নয় তো কী? জীবনটাই তো সোজা!' খখল বলে।

খানিক পরে বলল, 'আমি একটু মাঠে যাচ্ছি বেড়াতে...'

'সে কী? এই তো নেয়ে এলে। ঠান্ডা বাতাস লাগবে।'

'বাতাস লাগাই তো চাই।'

'দেখো, ঠান্ডা লাগে না যেন। তার চেয়ে শুয়ে ঘুমোও।' দরদভরা সুরে পাভেল বলে।

'না। আমি যাচ্ছি।' বলে জামা কাপড় পরে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

'ওর মনটা খুব ভারি।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলল।

'এখন যে ওকে "তুমি" করে বললে সেটা খুব ভালো করেছ,' পাভেল বলে।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বলে:

'তাই নাকি! কি জানি, খেয়াল করিনি তো! সত্যিই ও আমার খুব আপনার জন হয়ে দাঁড়িয়েছে!'

'তোমার মনটাই যে নরম!' কোমলভাবে বলে পাভেল।

'তোদের — মানে তোর, তোর বন্ধুদের কোন কাজে যদি লাগতে পারতাম! সাহায্য করতে পারতাম!..'

'ভাবছ কেন? সব শিখে যাবে।'

একটু হেসে মা বলে:

'অন্তত বিনা ভাবনায় থাকাটাও যদি শিখতে পারতাম!'

'থাক মা, এসব কথা আর না! খালি এটুকু মনে রেখো যে, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।'

কাঁদলে পাছে পাভেল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে তাই তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে মা।

একটু রাত করেই ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরে আন্দ্রেই। ফিরেই সোজা বিছানায় গিয়ে পড়ে।

'বাপস্, মনে হচ্ছে মাইল দশেক হেঁটে এসেছি...'

'কাজে লেগেছে?' জিজ্ঞাসা করে পাভেল।

'কথা-টথা নয়, ঘুমুচ্ছি আমি।'

আর একটিও কথা বলল না আন্দ্রেই, যেন মরে গেছে।

একটু পরেই এল ভেসভ্শিচকভ। সেই চিরকেলে ছেঁড়া ময়লা পোষাক, মুখে বিরক্তভাব।

ঘরময় থপথপ পায়চারি করতে করতে পাভেলকে জিজ্ঞাসা করে:

'ইসাইকে খুন করল কে, কিছু শুনেছ?'

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় পাভেল।

'তাহলে একজন পাওয়া গেছল, যার কাজটা করতে গা ঘিনঘিন করেনি। তা আমিই তো ফতে করতে যাচ্ছিলাম। আমারই উচিত ছিল। এ কাজটা সবচেয়ে আমারই যুগ্যি!'

'ওসব কথা ছেড়ে দাও, নিকলাই!' কোমল স্বরে বলে পাভেল।

'উরে বাস্‌রে!' স্নেহভরে বলে মা, 'মনখানা তো নরম অথচ হাঁকডাক দেখ না। কেন রে?'

নিকলাইয়ের বসন্তের দাগ-লাগা মুখখানাও ভালো লাগে এই মুহূর্তে মায়ের।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিকলাই বলে, 'আমার তো আর কিছু করবার যোগ্যতা নেই, এসব ছাড়া! কী ভাবি সর্বদা জানো? আমার জায়গাটা কোথায়? কোথাও তো আমার জায়গা নেই। লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়। আমি তাও পারি না। সব বুঝি; জুলুম অত্যাচার সব দেখি—কিন্তু কথাটা ঠিক জুগিয়ে বলতে পারি না। আমার অন্তরটাই বোবা।'

পাভেলের কাছে এগিয়ে আসে। মাথাটা নীচু হয়ে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলটা খুঁটতে থাকে। খানিকক্ষণ পরে বলে, কেমন যেন একেবারে ছেলে মানুষের মতো করে করুণভাবে:

'দেখ, আমাকে খুব শক্ত কাজ দাও তো কিছু। কোন অর্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই, এভাবে আর আমি বাঁচতে পারছি না। তোমাদের কত কাজ। আমি দেখি কী ভাবে সব কাজ বাড়ছে — কিন্তু ব্যস্‌, এক পাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছি আর কাঠ বইছি। এ ভাবে কি বাঁচা যায়! দাও, ভাই, খুব শক্ত দেখে কিছু কাজ আমায় দাও!'

পাভেল ওর হাতটা ধরে কাছে টেনে আনে।

'দেব বইকি!..'

পার্টিশনের ওদিক থেকে খখলের গলা শোনা যায়:

'ও হে, আমাদের টাইপ-বসানোর কাজ করবে? শিখিয়ে দেব।'

নিকলাই ওর কাছে এগিয়ে যায়। বলে:

'যদি সত্যি শিখিয়ে দাও তো আমার ছুরিটা দিয়ে দেব তোমায়...'

'চুলোয় যাক তোমার ছুরি!' চীৎকার করে হঠাৎ হেসে উঠল খখল।

নিকলাই তবু বলে, 'খুব ভাল ছুরি!' পাভেলও হাসে এবারে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে নিকলাই বলে, 'আমায় ঠাট্টা করছ?'

খখল বিছানা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে। বলে, 'করছিই তো! এই চল না একটু মাঠে বেড়িয়ে আসি! কী চমৎকার চাঁদ উঠেছে। যাবে?'

পাভেল বলে, 'চল!'

নিকলাই বলে, 'আমিও যাব। খখল যখন হাসে তখন আমার ভারি ভালো লাগে...'

খখল মুচকে হেসে ওঠে, 'তুমি উপহার দেবে শুনলে আমারও চমৎকার লাগে হে।'

কাপড়-জামা পরতে রান্নাঘরে যায়। মা বিড়বিড় করে বলে, 'গরম জামা কিছু পরে নাও...'

ওরা বেরিয়ে গেলে মা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। তারপর আইকনের দিকে তাকিয়ে চুপিচুপি বলে, 'রক্ষা করো ভগবান, ওদের সহায় হও!..'

২৬

দিনগুলো এমনি ছুটে চলেছে, এমনি ব্যস্ততায় যে মে-দিবসের কথা ভাববার ফুরসুৎও নেই মায়ের। সারা দিনের হৈহল্লা, ব্যস্ততার পর বিছানায় যখন শ্রান্ত দেহটা এলিয়ে পড়ে মা'র, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। ভাবে, "দিনটা তাড়াতাড়ি এলেই হয়..."

ভোর বেলা কারখানার বাঁশী বাজে — ছেলেরা তাড়াতাড়ি খেয়ে কাজে যায়। মস্ত বড় কাজের ফিরিস্তি দিয়ে যায় তারা। সারাদিন খাঁচায় পোরা কাঠবেড়ালীর মতো মা কেবলি এদিক ওদিক ছটফটিয়ে ছুটোছুটি করে — ওদের খাবার তৈরী, পোস্টারের আঠা, কালি... তারপর কারা সব প্রায়ই আসে, পাভেলের জন্য চিরকুট রেখে যায়। ওরা যেমনি আসে আবার তেমনি গা-ঢাকা দিয়ে চলে যায়। ওদের সেই উত্তেজিত ভাব মা'র রক্তে যেন নেশা ধরিয়ে দেয়।

প্রতিদিন ভোর বেলা উঠেই দেখা যায় পাঁচিল, দরজা, এমন কি পুলিশ ফাঁড়ি অবধি পোস্টারে ছেয়ে আছে — মে-দিবসে যোগ দেবার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান। কারখানায়ও প্রতিদিন প্রচুর পোস্টার লেগে থাকে। প্রতিদিন পুলিশ এসে শ্রমিক-বস্তিতে ঢুকে গালিগালাজ করে পোস্টারগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু খাবার সময় আবার নতুন প্রচারপত্র যেন হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ে মানুষের পায়ের কাছে। শহর থেকে গোয়েন্দার আমদানি হয়। তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। দুপুর বেলা টিফিনের ছুটিতে হল্লা চলে, ফুর্তিতে শ্রমিকের দল আনা-গোনা করে; টিকটিকিরা চোখ রাখে তাদের ওপর। পুলিশ হিমসিম খেয়ে যায়। তাদের দশা দেখে হাসে শ্রমিকেরা। বুড়োরাও হাসে, টিপ্পনী কাটে।

এখানে সেখানে জটলা, আর পোস্টারগুলো নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা। জীবন যেন টগবগ করে ফুটছে। এবারের এই বসন্তের মরশুমে জীবনে একটু রং লাগল; প্রত্যেকেরই মনে নতুন কিছু এসেছে। কারো বা জ্বালার ওপর জ্বালা; তারা প্রাণ-ভরে গাল দেয় এই জঞ্জালগুলোকে। কারো বা মনে মনে আব্‌ছা একটুখানি কিসের আশা, কিসের ভয়। আর কারো মনে প্রখর আনন্দ (তাদের সংখ্যা সবচেয়ে কম), আজকের এই বিপুল জাগরণ যে তারাই ঘটিয়েছে, এই চেতনায়।

পাভেল আর আন্দ্রেইয়ের চোখে ঘুম নেই। বাড়ী ফেরে ওরা রাত পোহালে। ক্লান্ত, শুষ্ক চেহারা, গলা কর্কশ। মা জানে সারা রাত ওরা বনে, জলায় বসে সভা করে। সারা রাত্তির সওয়ারী পুলিশ বস্তীর চারধারে টহল দেয়; গোয়েন্দা আর টিকটিকিরা ঘাপটি মেরে থাকে যেখানে সেখানে। একেক জনকে দেখলে চিলের মতো ছোঁ মারে, আর জটলা দেখলেই ভেঙ্গে দেয়। ধরপাকড়ও চলে। মার বুঝতে বাকী নেই যে যে-কোন রাত্রেই ছেলে দুটোকে ধরে নিয়ে যাবে। নিক, ওদের ধরেই নিক। মনে হয় তাতে ওদের ভালো হবে।

যে কোন কারণেই হোক সময়রক্ষকের খুনের ব্যাপারটা ধামা-চাপা পড়ে গেল। দিন দুই পুলিশ একটু নড়াচড়া করেছিল। কিছু খোঁজতালাশী আর জন দশ বারো লোককে জিজ্ঞাসাবাদের পর আর তেমন গা করেনি।

পুলিশপক্ষের মতামতটা জানা যায় মারিয়া করসুনভার কাছ থেকে। মারিয়া করসুনভার অন্য সবার মতো পুলিশের সঙ্গেও খাতির। কথায় কথায় মায়ের কাছে সে পুলিশের মতামত জানিয়ে যায়। বলে:

‘খুনীকে খুঁজে বার করা কি এতই সহজ! সেদিন সকালে অন্তত শ’খানেক লোকের সঙ্গে ইসাইয়ের দেখা হয়েছে, তার মধ্যে কম করে হলেও অন্তত নব্বইজনের হাত নিশপিশ করেছে ওকে দেখে। গত সাত বছর ধরে লোকটা কাউকেই কম জ্বালায়নি!’

খখলের পরিবর্তনটা চোখে পড়ে। মুখখানা রোগা হয়ে গেছে। চোখের পাতা ভারি — বড় বড় চোখ দুটো দেখায় আধ-বোজা। নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত মিহি মিহি রেখা পড়েছে। সাধারণ কথা বড় একটা কয় না; কিন্তু থেকে থেকে তীব্র আনন্দের ঝংকার ওঠে মনের মধ্যে। ও মুখর হয়ে ওঠে তখন। ওর মুখরতায় মূর্ত হয়ে ওঠে আগামী দিনের স্বপ্ন — যে-দিন জয়ী হবে মানুষের বিচার-বুদ্ধি, জয়ী হবে তার মুক্তি-সাধনা। ওর হৃদয়ের আনন্দের ঢেউয়ে নেচে ওঠে ওর শ্রোতারা।

ইসাইয়ের মৃত্যু নিয়ে জল্পনা-কল্পনা থেমে গেছে। একদিন বাঁকা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে আন্দ্রেই:

'মানুষের কানাকড়ি দামও নেই ওদের কাছে, না আমাদের না ওদের যাদের কুত্তার মতো আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেয়। বিশ্বাসী জুডাসের জন্য ওদের মাথাব্যথা নেই, শুধু টাকার চিন্তা...'

পাভেল দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'থাক আন্দ্রেই, এসব কথা আর না।'

মা আস্তে আস্তে বলে, 'ভালোই তো রে, আবর্জনা জমে ছিল, ফুঃ দিতেই উড়ে গেছে।'

খখল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে, 'ঠিক কথাই মা, কিন্তু তবুও মন শান্ত হয় না।'

কথাটা খখল প্রায়ই বলে। যখনই বলে তার কোন বিশেষ অর্থ থাকে, ভয়ানক একটা জ্বালা ও তিক্ততা ফুটে ওঠে...

...শেষ পর্যন্ত পয়লা মে এল।

ভোর বেলা কারখানার বাঁশীটি বেজে উঠল তেমনি কঠোর আদেশের সুরে। সারা রাত চোখের পাতা এক হয়নি মা'র। আওয়াজ শুনে ধড়ফড় করে উঠল। সামোভার ঠিকঠাক করে রাখা ছিল আগের দিন সন্ধ্যায়। তাড়াতাড়ি ওটাতে আগুন ধরিয়ে দিল মা। রোজকার মতো ছেলেদের দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েই কী জানি মনে হল, ফিরে এল। যেন দাঁত-ব্যথা হয়েছে এমনি ভাবে মুখে হাত দিয়ে বসে রইল জানালায়।

ফ্যাকাশে নীল আকাশ — ছোট ছোট গোলাপী সাদা মেঘের টুকরো ছড়িয়ে আছে, — যেন কারখানার বাঁশীর আওয়াজে ভয়-পাওয়া পাখির দল। মায়ের চোখ দুটি মেলা ওই মেঘগুলির ওপর আর কান পাতা আপনার বুকের মধ্যে। মাথা ভারি, শুকনো চোখে নিদ্রাবিহীন রাত্রির জ্বালা। মনের মধ্যে এক বিচিত্র প্রশান্তি। হৃৎপিণ্ডটা সমান তালে টিপ্ টিপ্ করে চলেছে। মনটা ঘরোয়া কথার জাবর কাটছে...

"বড্ড শীগ্গির সামোভারটায় আগুন দিয়ে ফেললাম। জলটা শুষে যাবে ফুটে ফুটে। বেচারারা ভারি ক্লান্ত, ঘুমুক আজ আর দুদণ্ড..."

সূর্যের তরুণ ছটা জানালায় এসে হাসিমুখে উঁকি মারে। মা হাত বাড়িয়ে দেয়। রোদের উষ্ণ স্পর্শ লাগে ত্বকে। আরেক হাত দিয়ে মৃদু মৃদু চাপড়ায় সেই জায়গাটি। মুখে অতি কোমল, মন্থর চিন্তার একটুখানি হাসি। সাবধানে উঠে সামোভারের নলটি সরিয়ে দিল। তারপর হাত মুখ ধুয়ে

বসল উপাসনায়। হাত অনবরত ক্রুশের চিহ্ন করে চলে, ঠোঁট দুখানি নিঃশব্দে নড়ে। মুখে কিসের আলো জ্বলে ওঠে, আর ডান ভুরুখানি মন্থর গতিতে ওঠে নামে...

দ্বিতীয়বার বাঁশী বাজে। প্রথমবারের মতো অত জোরে নয়, জবরদস্ত ভঙ্গিটাও নেই। গাঢ় ভেজা ভেজা শব্দটায় একটু যেন থরথর কম্পন। মায়ের মনে হয় আজ যেন একটু বেশিক্ষণ ধরে বাজছে বাঁশীটা।

ও ঘর থেকে খখলের মোটা স্পষ্ট গলাটা শোনা যায়:

'এই পাভেল, শুনছ!'

মেঝের ওপর খালি পায়ের শব্দ শোনা যায়। ওদের মধ্যে কে যেন একটা বাদশাহী হাই তুলল...

মা ডেকে বলে, 'তোদের চা তৈরী!'

পাভেল উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, 'এই উঠছি, মা।'

'সূর্য উঠছে!' খখল বলে, 'মেঘও আছে দেখছি। আজ মেঘ টেঘের কোন দরকার নেই, বাপু...'

আলুথালু হয়ে রান্নাঘরে ঢোকে আন্দ্রেই। মেজাজটা আজ ওর ভারি প্রসন্ন। বলে, 'সুপ্রভাত, নেন্কো! ঘুমিয়েছিলেন তো?'

ওর কাছে উঠে আসে মা। স্বরটাকে নীচু করে বলে, 'ওর পাশে পাশেই থেক আজ, বাবা!'

'তা আবার বলতে!' ফিস্‌ফিস করে বলে ও, 'ভাববেন না কিচ্ছুটি। যতদিন আমরা এক সঙ্গে আছি, কাছে কাছেই থাকব। নিশ্চিন্ত থাকবেন।'

'কী ফিস্‌ফাস্‌ হচ্ছে দু'জনে!' পাভেল এসে শুধয়।

'কী আবার। এই এমনি রে, পাশা।'

'মা আমাকে আজ ভালো করে মুখ টুখ ধুয়ে যেতে বলছেন। মেয়েগুলো দেখবে তো!' বলতে বলতে সদর দরজার দিকে যায় হাত মুখ ধোবার জন্য।

নীচু স্বরে গেয়ে ওঠে পাভেল:

"মেহনতী জন, জাগো রে ভাই!"

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। হাওয়া উঠে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। টেবিলে খাবার পরিবেশন করতে করতে অবাক হয়ে ভাবে মা, এই তো ছেলে দুটো আছে, প্রাণ ভরে হাসছে, ঠাট্টা-তামাশা করছে। এর পরে যে ওদের অদৃষ্টে কী আছে কে জানে। তবু কেন জানি মায়ের ভেতরটাও আজ বড় শান্ত। শুধু শান্ত নয়, আনন্দে ভরা।

প্রতীক্ষার সময়টাকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে চা খায় ওরা। পাভেল অভ্যাস মতো ধীরে ধীরে চায়ের চিনি নাড়ে, যত্ন করে রুটিতে নুন ছিটোয়। খখল টেবিলের তলায় তার পাটা নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিছুতেই ঠিকভাবে রাখতে পারছে না ওটাকে। চায়ের পেয়ালায় রোদ এসে পড়েছে; তার ছায়া নাচছে দেয়ালে আর ছাদে। তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ও।

বলে, 'আমার যখন বছর দশেক বয়েস, একদিন গেলাসে সূর্যের আলো ধরবার জন্য খেপে উঠেছিলাম। নিলুম একটা গেলাস। দেয়ালে একটা জায়গায় রোদের টুকরো এসে পড়েছিল। পা টিপে টিপে গিয়ে জোরসে গেলাসটা উপুড় করে দিলুম। বাস্, গেলাস ভেঙ্গে হাতটা গেল কেটে; তার ওপর ঠ্যাঙ্গানি। মারটার খেয়ে উঠোনে যেতেই চোখে পড়ল এক জায়গায় একটা ডোবা, তার ওপরে সূর্যের ছায়া পড়েছে। গিয়েই দমাদম লাথি সূর্যের ছায়াটার ওপর। সমস্ত কাদার ছিটে আমার গায়ে। অতএব আরেক প্রস্থ ঠ্যাঙ্গানি... রাগে আকাশের সূর্যটাকে মুখ ভেংচিয়ে চেঁচাতে লাগলুম — ওরে লালমুখো দৈত্য! লেগেছে ভেবেছিস, কচু লেগেছে! তাতে মনটা একটু শান্ত হল।'

পাভেল হেসে বলে, 'লালমুখো কেন বলেছিলে, বল তো।'

'আমাদের রাস্তাটা পেরিয়েই ওধারে একজন কামার থাকত। মস্ত বড় লাল মুখ ছিল তার, আর লাল দাড়ি। বেশ হাসিখুশি দরদভরা মানুষটা। আমার কেন জানি মনে হত সূর্যও অমনি দেখতে...'

এসব বাজে কথা মায়ের আর সয় না। বলে, 'এসব কথা ছেড়ে তোদের আজকের মিছিলের কথা বল তো একটু!'

'ওতো সব ঠিকই হয়ে আছে মা! এখন আলোচনা করতে বসলে সব তালগোল পাকিয়ে যাবে।' খখল বলে কোমলভাবে ধীরে ধীরে, 'আজ যদি আমাদের সত্যি সত্যিই ধরে, নিকলাই ইভানভিচ্ এসে বলে যাবে আপনি কী করবেন।'

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মায়ের। বলে, 'বেশ।'

'চল না, একটু বেড়িয়ে আসি।' পাভেল বলে। স্বরটা কেমন স্বপ্নালু।

'না, এখন বাইরে যেতে হবে না।' আন্দ্রেই বলে। 'কেন মিছিমিছি পুলিশ ব্যাটাদের আগে থাকতেই চটিয়ে রাখবে! তোমায় ভালো করেই চেনে ওরা।'

ছুটতে ছুটতে আসে ফিওদর। মুখ উদ্ভাসিত, গাল দুটো যেন জ্বলন্ত আগুন। ওর আনন্দোদ্দীপ্ত উত্তেজনার ধাক্কায় ওদের মিনিট গোনার ক্লান্তি কেটে গেল। ও বলে:

'জান? আরম্ভ হয়ে গেছে। বেশ সাড়া পড়ে গেছে সবার মধ্যে। সব আসছে বেরিয়ে। ওদের মুখগুলোতে আজ যেন কুড়ুলের ধার। ভেসভ্শিচকভ, ভাসিয়া গুসেভ আর সাময়লভ কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। অনেকে ফিরে গেছে। দেখবে এস। সময়ও হয়েছে। দশটা হল!..'

'চল, যাচ্ছি,' পাভেল বলে দৃঢ় স্বরে।

'দেখবে, টিফিনের পর সারা কারখানার লোক বেরিয়ে আসবে।' বলে ছুটে চলে গেল ফিওদর।

'ছেলেটা যেন হাওয়ার মধ্যে মোমবাতিটার মতো জ্বলছে।' মৃদু কণ্ঠে বলে মা রান্নাঘরে ঢুকল কোট পরার জন্য।

'কী ব্যাপার! আপনি কোথায় চললেন, নেন্‌কো?' আন্দ্রেই জিজ্ঞাসা করে।

'তোদের সঙ্গে।'

আন্দ্রেই গোঁফের ডগা টানে আর পাভেলের দিকে চায়। পাভেল দ্রুত ভঙ্গিতে চুলগুলো ঠিকঠাক করে মায়ের কাছে এসে বলে, 'তোমায় আমি কিচ্ছু বলব না, মা... আমায়ও তুমি কিছু বলো না, কেমন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। ভগবান তোদের সহায় হোন।' অস্ফুটভাবে বলে মা।

২৭

বেরিয়ে আসে মা। ব্যগ্র উত্তেজিত একটা চাপা কোলাহলে আকাশ যেন গম্‌গম্‌ করছে। বাড়ীর দরজায় জানালায় দলে দলে মানুষের উৎসুক চোখ চেয়ে আছে পাভেল আর আন্দ্রেইয়ের দিকে। মায়ের চোখের সামনে ঝাপসা রং-এর সব বিচিত্র প্রবাহ খেলে যেতে লাগল।

লোকেরা ওদের সম্ভাষণ করে। আজকের সম্ভাষণটা যেন একটু বিশেষ ধরনের। কানে আসে শান্ত স্বরে উচ্চারিত মন্তব্য:

'ওই যে নেতারা যাচ্ছে, দেখেছ...'

'অত-শত জানিনে, নেতা আবার কে...'

'খারাপ কিছু তো আর বলিনি!..'

এদিকের একটা উঠোনে মহা-বিরক্ত স্বর শোনা যায়, 'পুলিশ ধরবে নির্ঘাত, এবার আর জান নিয়ে ফিরে আসতে হবে না!..'

'কেন সেবারও তো ধরেছিল!'

একটা জানালা থেকে একজন স্ত্রীলোকের চীৎকার রাস্তায় এসে আছড়ে পড়ে:

'কী করছ, ভেবে-চিন্তে করো! একলাটি নও এখন, মাগ-ছেলে আছে ঘরে!'

পা-কাটা জসিমভ-এর ঘরের পাশ দিয়ে যেতে সে মাথা বাড়িয়ে চেঁচায়, 'এই পাভেল, পাজী, বদমাশ! দেখ না তোর কী হয়! মাথাটি থেঁৎলে দেবে। দেখবি তখন।' পা কাটা গেছে ওর কারখানার কাজে। এখন ভাতা পায় কিছু।

শিউরে উঠে থমকে দাঁড়ায় মা। আগুনের মতো একটা রাগের হল্কা ছড়িয়ে যায় সারা দেহে। লোকটার মোটা ফুলো মুখটার দিকে চেয়ে থাকে। গাল দিতে দিতে মাথাটা ভেতরে ঢুকে যায়।

মা দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যায়। ছেলের কাছে এসে তার পিছু পিছু চলে।

কোন কিছুর দিকেই পাভেল আন্দ্রেইয়ের যেন লক্ষ্য নেই। কোন কথাই ওদের কানে যায় না। শান্ত ধীর স্থির পদক্ষেপে ওরা চলছে সামনের দিকে। পথের মধ্যে দেখা হয় মিরনভ-এর সঙ্গে। মধ্যবয়সী, নম্র মানুষ। সবাই তাকে খাতির করে তার সততার জন্য। পাভেল শুধয়:

'আপনিও কাজে যাননি আজ, দানিলো ইভানভিচ?'

'না, আমার বউ-এর ছেলে হবে। তাছাড়া আজকের মতো দিনে... সবাই কেমন অস্থির...' তারপর স্থির দৃষ্টিতে পাভেল-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে অনুচ্চ স্বরে:

'লোকে বলছে তোমরা নাকি বড় সাহেবকে ঘাঁটাবার জন্য জানালা দরজা ভেঙ্গে হাঙ্গামা করবে বলে মতলব এঁটেছে!'

পাভেল উত্তেজিত হয়ে বলে, 'আমরা তো নেশা করিনি!'

'আমরা শুধু আমাদের পতাকা নিয়ে গান গেয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব,' খখল বলে, 'গান শুনবেন আপনি! আমাদের সব বিশ্বাসের প্রকাশ সে গান!'

চিন্তিতভাবে জবাব দেয় মিরনভ, 'আমি জানি তোমাদের আদর্শের কথা। তোমাদের বই কাগজপত্র পড়েছি। আরে, পেলাগেয়া নিলভনাও এসেছো যে! তুমিও ভিড়ে পড়েছো, বিদ্রোহীদের দলে?' বুদ্ধিদীপ্ত চোখে, হাসি মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে মিরনভ।

'ন্যায় আর ধর্ম যে-দিকে, মরবার আগে সে-রাস্তার ধুলো একটু গায়ে মেখে নিই।'

'দেখ দিকি! ওই যে শুনছিলাম তুমিই নাকি কারখানায় নিষিদ্ধ কাগজ-পত্র চালান করছো। কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়!' বলে মিরনভ।

পাভেল বলে, 'কারা বলে?'

'হুঁ! এই বলে আর কি! আচ্ছা, আসি তাহলে। মর্যাদা দৃঢ়তা বজায় রেখো।'

নিজের সম্বন্ধে কথা চলে শুনে খুশি হয়ে ওঠে মা। নিঃশব্দে হাসে। পাভেল মুচকে হেসে বলে:

'মায়ের কপালেও এবার শ্রীঘর আছে দেখছি।'

সূর্য ওপরে ওঠে। ফুর্‌ফুরে বাসন্তী সরসতার ওপর ঝরে পড়ে তার উষ্ণতা, উড়ন্ত মেঘের দলের ডানা এসেছে ঝিমিয়ে। ধীরে ধীরে আলসে আবেশে ভেসে চলেছে তাদের ফিকে ছায়া — রাস্তা, ঘর-বাড়ী, ছাদের ওপর দিয়ে, মানুষকে আচ্ছন্ন করে। মনে হয় সারা বস্তীটার দেয়াল পাঁচিলের ধুলো-ময়লা উড়িয়ে, মানুষগুলোর মুখের ক্লান্তির ছোপ ধুয়ে মুছে সব বিলকুল সাফ করে দিয়ে গেল। সব কিছু যেন ঝর্‌ঝরে, ঝলমলে হয়ে উঠল। কারখানার যন্ত্র-দানবগুলোর সুদূর গুম্‌রানি ছাপিয়ে উঠল জনতার আওয়াজ।

আবার জানালা থেকে, উঠোন থেকে ছিটকে ছিটকে আসে গালিগালাজ, শাপমন্যি, কখনও গম্ভীর সুচিন্তিত কথা আর উৎসাহের ধ্বনি। ওদের কথা শুনে মায়ের এবার ইচ্ছে হয় প্রতিবাদ করে, বুঝিয়ে দেয়, কৃতজ্ঞতা জানায়, ইচ্ছে করে এই আশ্চর্য দিনটার বিচিত্র ছন্দে নিজেকে মিলিয়ে দেয়।

একটা গলির মোড়ে প্রায় শ'খানেক লোক জমায়েত হয়েছে। ভেসভ্শিচকভের গলা শুনতে পাওয়া গেল তাদের মধ্যে থেকে। অগোছাল এলোমেলো কথা:

'যেমন করে লেবু নিংড়োয় তেমনি করে ওরা আমাদের সব রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে!'

কয়েকটা স্বর একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে, 'ঠিক, ঠিক হ্যায়।'

খখল বলে, 'যাই হোক চেষ্টা করছে ছোকরা। চল, একটু সাহায্য করি!..'

পাভেল বাধা দেবার আগেই ওর দীর্ঘ হালকা দেহটা সুড়সুড় করে ভিড়ের ফাঁকে গলে চলে গেল। তারপর সুরেলা কণ্ঠের আওয়াজ উঠল:

'কমরেড! আপনারা শুনেছেন দুনিয়ায় ইহুদী, জার্মান, ইংরেজ, তাতার এমনি বহু জাতির বাস। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। মাত্র দুটি জাতের মানুষ আছে সারা সংসারে — ধনী আর গরীব। তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, এই দু'জাতও তেমনি মিশ খেতে পারে না। হ্যাঁ ঠিক, আলাদা আলাদা মানুষের পোষাক আলাদা, কথা কয় তারা আলাদা ভাষায়। কিন্তু তাকিয়ে দেখুন একবার, বড়লোক ফরাসী জার্মান ইংরেজরা তাদের দেশের মেহনতী মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহারটা করে! তাহলে বুঝবেন যে আমাদের মেহনতী মানুষদের কাছে সব দেশের বড়লোকই সমান খাঞ্জাখাঁ!'

ভিড়ের মধ্যে হেসে উঠল কে একজন।

'অন্য দিকে ফরাসী বলুন, তাতার আর তুর্কী বলুন, সব মেহনতী মানুষের এই এক অবস্থা, এমনি কুকুরের মতোই বেঁচে থাকে তারা, এই রুশ দেশে আমরা যেমন আছি।'

ভিড় বাড়তে থাকে। দলের পর দল মানুষ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় পেছনে ঘাড় উঁচু করে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে।

আন্দ্রেইয়ের গলা আরো ওপরে ওঠে।

'অন্য দেশের শ্রমিক ভাইয়েরা এই সহজ সত্যটা বুঝেছে। এবং আজ এই পয়লা মে...'

কে চীৎকার করে উঠল, 'পুলিশ... পুলিশ!'

চারজন সওয়ারী পুলিশ ভিড়ের দিকে ছুটে এল চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে আর চীৎকার করতে করতে, 'ভাগো, ভাগো সব!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিরক্ত হয়ে ঘোড়ার জন্য পথ করে দিল লোকে। কয়েকজন গিয়ে উঠল বেড়ার ওপর। একটা জোর চড়া গলা শোনা যায়:

'শালা শুয়োরের পাল ঘোড়ায় চড়ে এসেছে রে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে...'

খখল রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল একা। দুজন সওয়ারী তাড়া করল ওর দিকে। ও একদিকে একটু সরে গেল। সেই মুহূর্তে মা এসে ওকে টেনে নিল।

'তুমি বলেছিলে পাভেল-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে! আর এখন একলা হাঙ্গামা করছ!'

হেসে বলে খখল, 'ঘাট হয়েছে, মা!'

ভেতর থেকে সর্বাঙ্গ ছেয়ে কেমন জানি একটা ভীত ক্লান্তি ঘনিয়ে আসছে মায়ের। মাথাটা ঘুরছে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ বেদনায় মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! অস্থির হয়ে ওঠে মা — কারখানার টিফিনের বাঁশী কখন বা বাজবে!

গির্জার কাছে এসে দেখে, গির্জার আঙ্গিনায় লোকের ভিড়, শ'পাঁচেক তেজী জোয়ান ছোকরা আর ছোট ছেলে জড় হয়েছে। ভিড়টা যেন ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠে সামনে পেছনে। দুলছে। জনতা চঞ্চল হয়ে মাথা তুলে বহু দূরে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে। কিসের যেন অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে তারা। তীব্র উত্তেজনায় সারা বায়ুমণ্ডল কাঁপছে। কেউ কেউ অন্যমনস্ক হয়ে এদিক ওদিক করছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কী করবে ঠাওরাতে পাচ্ছে না; কেউ বা বাহাদুরীর ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েদের চাপা কলকলে পুরুষেরা বিরক্ত হয়ে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মাঝে মাঝে নীচু স্বরে গালিগালাজ ওঠে। পাঁচমিশেলী এই জনতার ভিড় আক্রোশের এক চাপা গর্জনে যেন থম্‌থম্‌ করতে থাকে।

নীচু কাঁপা গলায় একজন স্ত্রীলোক বলে, 'মিতেন্‌কা, নিজের প্রতি দয়া করো!..'

একটা রনরনে জবাব আসে, 'অনেক হয়েছে, থাক!'

সিজভের গলা শোনা যায় — সে স্বর শান্ত, স্থির, প্রত্যয়জনক:

'না, জোয়ানদের আমরা বিপদের মুখে ছেড়ে দেব না। আমাদের চাইতে ওদের অনেক বেশি বুদ্ধি, বেশি হিম্মত। আমাদের সেই জলার

মাশুলের ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল কে? ওরাই। ওরা গেল জেলে, ফল ভোগ করল আর সকলেই!..'

সব কোলাহল ছাপিয়ে বাঁশী বেজে ওঠে। কালো শব্দ। সারা ভিড়টা শিউরে উঠল। যারা বসেছিল তারা উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য সব স্তব্ধ, সতর্ক। কারো কারো মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে।

পাভেলের বলিষ্ঠ, ভরাট কণ্ঠ শোনা যায়, 'কমরেডগণ!'

একটা গরম বাষ্পের ঝাপটা যেন লাগে মায়ের চোখে, শরীরটা হঠাৎ শক্তিতে ভরে উঠল। এক লাফে ছেলের পেছনে দাঁড়ায় মা। চুম্বকের আকর্ষণে লোহার টুকরোর মতো সবাই ফেরে পাভেলের দিকে। মা ওর মুখের দিকে তাকায় — নির্ভীক, গর্বিত প্রদীপ্ত দুই চোখ ছাড়া কিছুই তার চোখে পড়ে না...

'কমরেডগণ। আমরা কে, এই কথা মুক্তকণ্ঠে দুনিয়াকে জানাবার দিন এসেছে আজ। আজ আমাদের ঝাণ্ডা ওড়াচ্ছি। মুক্তির ঝাণ্ডা, ন্যায়ের ঝাণ্ডা!'

একটা দীর্ঘ সাদা দণ্ড আকাশে ঝল্‌কে উঠল। পরক্ষণেই নেমে এল জনতার মধ্যে, দু-ভাগ হয়ে গেল জনতা। কিছুক্ষণ আড়াল হয়ে থাকার পরে সহস্র উন্মুখ চোখের ওপর দিয়ে মেহনতী জনগণের বিরাট লাল পতাকা উড়ল আকাশে বিরাট এক পাখীর ছড়ান ডানার মতো।

পাভেল তার হাত তুলে ধরল। পতাকাটা শিউরে উঠল হাওয়ায়। অনেকগুলি হাত এসে ধরল সাদা দণ্ডটা। তাদের মধ্যে মায়ের হাতও আছে।

পাভেল আওয়াজ তোলে, 'মেহনতী জনগণ জিন্দাবাদ!'

শত সহস্র কণ্ঠে ওঠে তার প্রতিধ্বনি — 'জিন্দাবাদ!'

'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি জিন্দাবাদ! আমাদের পার্টি, কমরেডগণ! যে পার্টি আমাদের মানসিক মাতৃভূমি — সেই পার্টি জিন্দাবাদ!'

জনতা যেন ফুলে ফেঁপে উঠছে। যারা পতাকার মর্ম বোঝে, তারা ঠেলাঠেলি করে এসে পতাকাকে ঘিরে ধরল। মাজিন, সাময়লভ, গুসেভরা এসে দাঁড়াল পাভেলের পাশে। নিকলাই মাথা নীচু করে ঠেলে ঠেলে পথ করে এগিয়ে আসে। একদল উজ্জ্বল-চোখ ছেলের ধাক্কায় মা ছিট্‌কে যায়। চেনে না মা এদের।

'দুনিয়ার শ্রমিক জিন্দাবাদ!' পাভেল ধ্বনি তোলে। সহস্র বলিষ্ঠ নন্দিত কণ্ঠ থেকে প্রাণ-মাতান সাড়া জাগে।

মা, নিকলাই আর কার যেন একটা হাত শক্ত করে ধরে। হাঁটু দুটো থর্ থর্ করে কাঁপছে। অশ্রুতে গলা বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু চোখে জল নেই। কম্পিত ওষ্ঠের ভেতর দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে:

'ওরে আমার সোনার ছেলেরা...'

নিকলাই-এর বসন্তের দাগওয়ালা চওড়া মুখখানায় একগাল হাসি। ঝাণ্ডার দিকে তাকিয়ে কী যেন সে বলে। হাত বাড়িয়ে দেয় ঝাণ্ডার দণ্ডটা ধরবার জন্য। পরক্ষণেই হাতটা জড়িয়ে ধরে মায়ের গলা। হাসিতে উচ্ছ্বসিত মুখে চুমু খায় মাকে তার পর হাসে।

খখলের কোমল সুরেলা গলা জনতার কোলাহল ছাপিয়ে ওঠে: 'কমরেডগণ! আমরা এক নতুন দেবতার নামে লড়াইয়ে নেমেছি। সে দেবতা আমাদের আলোর দেবতা, যুক্তি-বিচার, সত্যের দেবতা। আমাদের আসল লক্ষ্য এখনও বহু দূর। কিন্তু আমাদের কাঁটার মুকুট হাতের কাছে এসে পৌঁছল বলে। সত্যের জয় হবেই, এতে যার বিশ্বাস নেই, সত্যের জন্য জান দেবার যার সাহস নেই, নিজের ওপর যার ভরসা নেই — দুঃখকষ্টের ভয় যে পায় সে তফাৎ যাক। আমাদের জয়লাভে যার বিশ্বাস আছে, যারা আমাদের লক্ষ্য দেখতে পায় তারাই শুধু এগিয়ে আসুক। অন্যেরা আমাদের সঙ্গে এসো না। কষ্টই পাবে তারা শুধু। সার বেঁধে চলো, বন্ধুগণ! পয়লা মে জিন্দাবাদ! স্বাধীন মানুষের উৎসবের দিন জিন্দাবাদ!'

ভিড় জমাট হয়ে ওঠে। পাভেল শক্ত করে ধরে ঝাণ্ডাটাকে হাওয়ায় উড়িয়ে এগিয়ে যায়। সূর্যের আলোয় পতাকা জ্বল জ্বল করে; আলোর উদাত্ত হাসি তাতে...

ফিওদর জোয়ান গলায় গান ধরে:

এই জীর্ণ জগৎ ত্যাগ করি...

আরো বহু কণ্ঠ ওর সঙ্গে যোগ দেয়। গানের গভীর নরম ঢেউ উথলে ওঠে:

তার ভস্ম যত দূরে করি।..

মা ফিওদরের পেছনে পেছনে হাঁটে, সমস্ত মুখ জুড়ে এক প্রদীপ্ত হাসি; ফিওদরের মাথার ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে ঝাণ্ডা আর ছেলের

দিকে তাকিয়ে থাকে। চারদিকে আনন্দ-ঝল্‌মল্‌ মুখ, নানা রঙের চোখ। মিছিলের সামনে দিয়ে চলেছে তার ছেলে আর আন্দ্রেই। গাইছে দুজনে। তাদের সুর ভেসে আসে কানে। আন্দ্রেইয়ের নরম ভেজা কণ্ঠের সঙ্গে মিশে গেছে পাভেলের গভীর মোটা গলা:

মেহনতী জন, জাগো রে ভাই,
সংগ্রামে জাগো, ভুখা সবাই!..

চীৎকার করতে করতে চারদিক থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে লাল ঝান্ডার দিকে, মিশে যায় ভিড়ের সঙ্গে। তাদের চীৎকার গানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। আগে ঘরের কোণায় বসে ওরা যে গান গেয়েছিল গলা চেপে আজ এই পথের বুকে আকাশের তলায় সেই গানের আর বাঁধন নেই। ফুলে ফেঁপে উঠছে গান অসংবৃত বেগে; নির্ভীক প্রতিধ্বনি তুলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে বেজে উঠছে বজ্রকঠিন সাহসিকতা, আগামী দিনের সুদীর্ঘ পথের পারে ডাক দিচ্ছে মানুষকে, সত্যি করে জানিয়ে দিচ্ছে তাদের এই রক্ত-ঝরা দুঃখের পথ। গানের প্রশান্ত শিখায় জ্বলে গেল চলন্ত কালের পেছনে পড়ে থাকা যত কালো কয়লার স্তূপ, মানুষের গতানুগতিক মন; পুড়ে ছাই হয়ে গেল অজানার অভিশপ্ত ভয়...

কে একজন মায়ের পাশে পাশে চলছে — তার ভয়ার্ত মুখে সুখের আভা। চীৎকার করে ডাকছে কাকে:

'ওরে মিতিয়া, কোথায় যাচ্ছিস তুই?' কাঁপছে গলাটা।

চলতে চলতে মা বলে, 'যেতে দিন ওকে। ভয় নেই। প্রথমে আমিও খুব ভয় পেয়েছিলাম। আমার ছেলেও গেছে — ওই দেখছেন? আগে আগে চলেছে নিশান হাতে নিয়ে।'

'ডাকাতের দল, সব যাচ্ছ কোথায়? ওখানে সেপাইরা সব তৈরী রয়েছে।'

সেই লম্বা, রোগা মেয়ে মানুষটি হঠাৎ তার হাড্ডিসার হাত দিয়ে মায়ের হাতখানা শক্ত করে ধরে আবেগে বলে ওঠে:

'লক্ষ্মীটি, শুনুন, ওরা গাইছে। আমার মিতিয়াও গাইছে...'

মা নিম্নকণ্ঠে সাহস দেয়, 'ভয় কী? এযে ধর্মের কাজ... একবার ভেবে দেখুন তো যীশু খৃষ্টই কি থাকতেন মানুষ যদি তাঁর জন্য জান না দিত!'

কী সহজ সত্য! মায়ের নিজের মনেই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই স্ত্রীলোকটি এখনও শক্ত করে তার হাত ধরে আছে — মা তাকিয়ে দেখে

তার দিকে। একটা বিস্ময়ের হাসি খেলে যায় মুখে। আবার বলে, 'যীশু খৃষ্টই কি থাকতেন মানুষ যদি তাঁর জন্য জান না দিত?'

কখন সিজভ্ এসে পাশে দাঁড়ায়। টুপি খুলে গানের সুরে সুরে দুলে দুলে বলে:

'আজ একেবারে খোলাখুলি মিছিল বার করছে, অ্যাঁ? আবার গানও গাইছে। আর কী সে গান! আহা-হা!'

জারের জন্য সৈনিক চাই,
ঘরের ছেলেদের ওগো পাও তাই...

'আজ আর কোনো ভয় ডর নেই। এদিকে আমার ছেলেটা তো মাটির তলায়...'

মায়ের বুক ধড়ফড় করে, পেছনে পড়ে থাকে। ধাক্কায় ধাক্কায় একটা বেড়ার ধারে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল। পাশ দিয়ে চলেছে উত্তাল সাগরের ঢেউ — ঢেউয়ের পর ঢেউ — জনতার ভিড়। অসংখ্য মানুষ। দেখে মায়ের বুক নেচে ওঠে উল্লাসে।

মেহনতী জন, জাগো রে ভাই!..

এ যেন তূর্য-নিনাদ — ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে, প্রাণে প্রাণে লড়াইয়ের শপথ, কারো প্রাণে বা আবছা আনন্দ, নতুন কিছুর প্রতীক্ষা; কারো মনে বা জ্বলন্ত কৌতূহল জ্বালিয়ে দিয়ে, গগনে গগনে বাজে। কোথাও একটুখানি ভীরু আশা, কোথাও-বা বহুকালের সঞ্চিত আক্রোশের বাঁধ-ভাঙ্গা জোয়ার জল।

হাওয়ায় উড়ছে রক্ত-পতাকা। প্রতিটি চোখ সম্মুখের দিকে সেই রক্ত-পতাকায় বাঁধা। কার একটা উল্লাসের চীৎকার শোনা যায়:

'ওই যে যাচ্ছে, ওই ওই! চমৎকার!'

আজ বিপুল কী একটার অনুভূতি জেগেছে বুকে, সাধারণ মোটা কথা দিয়ে তা বোঝান যায় না। তাই অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিতে সুরু করে লোকে। কালো বিদ্বেষ, দাসত্বের অন্ধ বিদ্বেষ, সূর্যের আলোয় ঘুম-ভাঙ্গা অজগরের মতো ফুঁসে ওঠে সে ভাষায়।

বদ্ধ-মুষ্টি আস্ফালন করে একজন কে ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে একটা জানালা থেকে, 'নাস্তিক কোথাকার!'

আর একজনের খ্যানখেনে কণ্ঠস্বর কাঁটার মতো মায়ের কানে বিঁধল:

'শালাদের আস্পর্ধা দেখ না! জারের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে বদমাসেরা!'

বেনো জলের মতো ছুটে চলেছে মানুষ — মেয়ে পুরুষ। কী এক চঞ্চলতা সকলের মুখে। গানের টানে কেবলি ছুটে আসছে মানুষ আর মানুষ, যেন আগ্নেয়-গিরির বুক ফেটে লাভার স্রোত বইছে। ছেলেকে আর দেখা যায় না। আকাশে উড়ছে তার হাতের রক্ত-নিশান। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে মায়ের মনে ছেলের মূর্তি জেগে ওঠে — তার ব্রোঞ্জ রঙের ললাটে আর চোখ দুটিতে বিশ্বাসের অগ্নিশিখা জ্বলছে।

একেবারে পিছিয়ে পড়েছে মা, মিছিলের শেষ প্রান্তে। আশে-পাশে ধীরে-চলার দল চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগচ্ছে — ওরা শুধু দর্শক — নির্বিকার, নিরাবেগ। ঘটনার উপসংহার ওদের জানা। বলাবলি করছে নীচু গলায় দৃঢ়ভাবে:

'একদল সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে ইস্কুলের কাছে, আর একদল কারখানার সামনে।'

'গভর্নর এসেছেন।'

'সত্যি?'

'এই মাত্র এলেন। নিজের চক্ষে দেখে এলাম।'

সানন্দে গালি দিয়ে কে একজন বলে:

'শালারা ভয় খেয়ে গেছে আমাদের দেখে — নইলে কি এত সেপাই-পুলিশ, খোদ গভর্নর অবধি আসে!'

"সোনার ছেলেরা আমার!" মা ভাবে। বুকটা ধড়ফড় করে।

কিন্তু যে-সব কথা কানে আসছে তার মধ্যে প্রাণ বা আবেগ নেই। ঐ লোকগুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালায় মা। লোকগুলোর অলস গতিকে ছাড়িয়ে যেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

হঠাৎ মিছিলটা সামনের দিকে যেন ধাক্কা খেয়ে পেছন দিকে হটতে লাগল — শঙ্কার চাপা গর্জন উঠছে ভিড় থেকে। গানের খেই হারিয়ে যায় — আবার আরো জোরে আরো উদ্দাম হয়ে আকাশকে প্লাবিত করে দেয়— আবার স্তিমিত হয়ে যায়। একে একে গলাগুলো থেমে যায়। কেউ কেউ চেষ্টা করে ধরে রাখতে, আগেকার উচ্চ গ্রামে রাখতে...

মেহনতী জন, জাগো রে ভাই।
সংগ্রামে জাগো, ভুখা সবাই!..

কিন্তু সমবেত কণ্ঠের জোর নেই আর। বিশ্বাসের ভিৎ নড়ে গেছে, স্বরে যেন ভয়।

মা পেছন থেকে কিছুই দেখতে বুঝতে পারছে না। ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। যারা পিছিয়ে আসছে পদে পদে ধাক্কা খায় তাদের সঙ্গে। কেউ ভুরু কোঁচকায়; কারো মাথা নীচু, কারো মুখে অস্বস্তির হাসি। কেউ বিদ্রূপ করে শিস্ দিচ্ছে। মা সকলের মুখে ভাষা খোঁজে চোখভরা মিনতি নিয়ে। ওই যে পাভেলের স্বর শোনা যায়:

'কমরেডগণ, সৈন্যরাও আমাদের মতোই মানুষ। ওরা আমাদের গুলি করবে না। কেন করবে? যে সত্যের ঝান্ডা আমরা হাতে নিয়েছি সে সত্য যে সবার জন্য। আমাদের মতো ওদেরও তা একান্ত দরকার। ওরা এখনও বুঝতে পারেনি। কিন্তু বোঝবার দিন আসছে। সেদিন ওরা খুনে আর ডাকাতদের ঝান্ডা নেবে না, হাত ধরে পাশে এসে দাঁড়াবে ওই মুক্তিপতাকার তলায়। ওদের চোখ যত শীগ্‌গির পারি খুলে দিতে হবে, বোঝাতে হবে সত্যটা। এবং সেজন্যই আমাদের না থেমে এগিয়ে চলতে হবে। আগে, বন্ধুগণ! আগে চল!'

পাভেলের কণ্ঠে দৃঢ়তা। ওর কথাগুলি যেন ঝনঝন করে বেজে ওঠে। কিন্তু তবু জনতা ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। এক এক করে ওরা ফিরে যেতে লাগল বাড়ীতে কিংবা বেড়ায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিছিলের চেহারাটা হয়েছে একটা ফলকের মতো, পুরোভাগে পাভেল — তার হাতে মেহনতী জনগণের রক্ত-পতাকা আকাশের পটে ফুটে উঠেছে। কিংবা মিছিলটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বিরাট-দেহ কালো পাখী। সচকিত হয়ে উড়বার জন্য ডানা দিয়েছে মেলে। পাভেল সেই পাখীর ঠোঁট...

২৮

রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে মা দেখে ময়দানের পথটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে এক ধোঁয়া রংএর পাঁচিল — মানুষের পাঁচিল — মানুষগুলোর যেন মুখ নেই। প্রত্যেকের কাঁধের ওপর জ্বল্‌জ্বল্ করছে

বেয়নেটের তীক্ষ্ণ, হিম হাসি। সেই নির্বাক নিশ্চল পাঁচিলটার হিম চেহারা দেখে শ্রমিকরা ঝিমিয়ে যাচ্ছে — মায়ের বুকের ভেতরটা জমে যেন বরফ হয়ে গেল।

ঝান্ডার কাছে যেখানে চেনা মুখগুলো, ভিড় ঠেলে ঠুলে মা সেই জায়গায় যায়, মিশে যায় অচেনাদের সঙ্গে, যেন তাদের ওপর ভর দিয়ে থাকে। একটা লম্বা-পানা, দাড়ি-গোঁফ কামান, এক-চক্ষু মানুষের কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল মা। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে লোকটা:

'কে গা তুমি?'

মায়ের হাঁটু দুটো কাঁপছে। নিচের ঠোঁটটা অনিচ্ছায় নুয়ে পড়ছে। জবাব দেয়:

'আমি পাভেল ভ্লাসভের মা।'

'তাই নাকি?' জবাব দেয় একচোখা মানুষটা।

ওদিকে পাভেলের বক্তৃতা চলেছে, 'কমরেডগণ, আমাদের সারা জীবন সামনে পড়ে রয়েছে। আর কোন পথ নেই।'

আবহাওয়া থমথমে, প্রতীক্ষায় আন্দোলিত। ওপরে উঠল পতাকা, নিমেষের জন্য যেন কেঁপে উঠল। তারপর মানুষের মাথার ওপর ভেসে উঠে এগিয়ে চলল সৈন্যদের ধূসর পাঁচিলের দিকে। মা শিউরে উঠে চোখ বুজল। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। চারজন মাত্র — পাভেল, আন্দ্রেই, সাময়লভ আর মাজিন — আলাদা হয়ে গেছে ভিড় থেকে।

বাতাসে ভেসে আসে ফিওদর মাজিনের স্বচ্ছ কণ্ঠ:

অসম যুদ্ধের মরণ যজ্ঞে...

কতগুলি গলায় দ্বিতীয় চরণের ধুয়া ওঠে:

হলে বলিদান শহীদ বীর...

গানের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে চারজন।

ফিওদরের সংকল্প-কঠিন কণ্ঠ যেন উজ্জ্বল রঙের ফিতের মতো খুলতে খুলতে চলে, মনুষ্যত্বের শপথকে উদাত্ত রবে ঘোষণা করে:

মুক্তি মন্ত্রে লইয়া দীক্ষা...

সাথীদের সমবেত কণ্ঠে ওঠে:

সব তেয়াগিলে তোমরা বীর...

ওধার থেকে কে যেন ঝাঁজাল স্বরে বলে ওঠে:

'গান গাইছে আবার শালারা। শালা কুত্তার-বাচ্চা, নিজেদের মড়া-কান্না কেঁদে নিচ্ছে শালারা!..'

'মার ওকে!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল।

দুহাতে বুক চেপে ধরে মা। তাকায় চার ধারে। নিশান নিয়ে কয়েকজন লোক এগিয়ে চলেছে — দেখে জনতা যেন এদিক ওদিক দুলছে। ডজন কয়েক চলছে বটে ওদের পিছু পিছু। কিন্তু পায়ে পায়ে একজন করে খসছে, পথটা যেন তেতে উঠেছে, পায়ের তলা জ্বলে যাচ্ছে:

এ স্বেচ্ছাচারের হবে অবসান...

ভবিষ্যদ্বাণী করে ফিওদর। বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জোরাল কোরাস:

বিদ্রোহে জাগবে জনতা!..

কিন্তু গানের সুন্দর ধারার মধ্যে চমকে ওঠে চাপা কথা:

'হুকুম দিচ্ছে...'

সামনে থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হুকুম গর্জে ওঠে:

'বন্দুক তোলো!'

নেমে এল বন্দুকগুলো একটা ঢেউ-খেলান লাইনে। অগ্রগামী পতাকার দিকে তাদের ইস্পাতী চতুর হাসি।

'আগে বাড়ো।'

'কেটে পড়ি,' বলে এক-চক্ষু লোকটা পকেটে হাত গুঁজে এক পাশে সরে যায়।

মা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সৈন্যদের ধূসর ঢেউ দুলিয়ে সারা পথটা আগলে দাঁড়াল। ইস্পাতের দাঁতের মতো ঝলমলে বেয়নেটগুলো বাগিয়ে ধরে তারা এগিয়ে আসতে লাগল — একটা নিষ্ঠুর কঠিনতা ওদের চোখে মুখে। তাড়াতাড়ি ছেলের কাছে এগিয়ে আসে মা। আন্দ্রেই ততক্ষণে পাভেলকে তার দীর্ঘ দেহটা দিয়ে আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাভেল তীক্ষ্ণ স্বরে বলে চীৎকার করে, 'পাশে যাও, কমরেড!'

আন্দ্রেইয়ের মাথাটা উঁচু, হাত দুটো পেছনে। গান গেয়ে চলেছে সে। পাভেল তাকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে আবার চেঁচায়:

'পাশে যাও! তোমার অধিকার নেই! ঝাণ্ডা আগে যাবে!'

'তফাৎ যাও!' তলোয়ার উঁচিয়ে হুকুম দেয় ক্ষুদে অফিসার তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। হাঁটু না বাঁকিয়ে সোজা পা উঁচুতে তুলে মার্চ করে এগিয়ে আসে সে। বুটের তলার কঠিন আঘাত খট্ খট্ করে বাজে মাটির ওপর। চকমকে বুট বেঁধে মায়ের চোখকে।

ওর সামান্য একটু পেছনে থেকে সঙ্গে সঙ্গে ভারি পায়ে চলছে ঢ্যাঙ্গা একটা লোক — কদম-ছাঁট চুল, মোটা এক জোড়া পাকা গোঁফ, লাল-লাইনিং দেওয়া ছাই রং-এর দীর্ঘ কোট, চওড়া পাৎলুন-এর ওপর হলদে ডোরা। খখলের মতো হাঁটে পেছন দিকে হাত রেখে। ওপরে তোলা ঝাঁকড়া ভুরুজোড়ার তলায় চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে পাভেলের দিকে।

মায়ের চোখ দেখে চলেছে অজস্র জিনিস। বুকটা একটা চাপা প্রচণ্ড চিৎকারে প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। দম বন্ধ হয়ে আসে মায়ের। দু' হাতে বুক চেপে ওকে থামায়। পেছনের ধাক্কায় টলে সামনে এগিয়ে চলে কিছু না ভেবে, যেন জ্ঞান-চৈতন্য নেই। বুঝতে পারে পেছনের ভিড়টা হালকা হয়ে আসছে। সামনে থেকে যে হিমেল ঢেউটা এদিক পানে তেড়ে আসছে, তারি তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সব।

লাল ঝাণ্ডা উঁচু রেখে এগিয়ে যাচ্ছে অগ্রগামীর দল। এগিয়ে আসছে ধোঁয়াটে রং-এর মানুষগুলোর নিরেট ঢেউটাও। কাছে, আরো কাছে... মুখগুলো দেখতে পাচ্ছে মা... বিকৃত চাপা মুখ — রাস্তাটার আড়াআড়ি সমস্তটা জুড়ে সারি-বাঁধা হয়ে আছে — রং বেরং-এর চোখগুলি দিয়ে যেন এলোমেলো ফুট্‌কি-কাটা নোংরা সংকীর্ণ একটা লাইন। মানুষগুলোর বুকের দিকে তাগ্ করে ধরা রয়েছে বন্দুকগুলো। সঙ্গীনের নির্মম ইস্পাত দেওয়া ফলাগুলো ঝক্‌মক্ করছে কঠিন দীপ্তিতে। কারো গায়ে ঠেকল না সঙ্গীনগুলো, তবু এক এক করে সরে যায় লোকে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

মা শুনছে পেছনে মানুষের ছটোছুটি, সন্ত্রস্ত কণ্ঠের চীৎকার:

'চলে যাও সব...'

'পালিয়ে এসো ভ্লাসভ!..'

'ফিরে এসো পাভেল!'

ভেসভ্শিচকভ্ বেজার মনে বলে, 'ঝাণ্ডাটা ফেলে দাও, পাভেল। এদিকে দাও, আমি লুকিয়ে রাখছি।'

পতাকার দণ্ডটা এসে ধরল ও। হ্যাঁচকা টানে পতাকাটা পিছনে সরে এল খানিক।

'ছেড়ে দাও!' পাভেল চীৎকার করে।

চম্‌কে উঠে হাত ছেড়ে দেয় নিকলাই, যেন হাতটা ওর পুড়ে গেল। গান থেমে গেল। কতগুলো লোক পাভেলকে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু পাভেল ঠেলে এগিয়ে চলে। হঠাৎ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব—যেন ওপর থেকে ঝরে পড়ে স্তব্ধতার স্বচ্ছ মেঘখানি গোটা ভিড়টাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

মাত্র জন কুড়ি লোক নিশানটাকে ঘিরে আছে; কিন্তু তারা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে। প্রাণের উদ্বেগ মাকে ঠেলে নিয়ে যায় ওদের কাছে। অস্পষ্ট বাসনা কী যেন বলবে ওদের...

'লেফটেনাণ্ট, ওটা নিন!' দীর্ঘকায় বৃদ্ধ লোকটি হুকুম দেয়।

হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় ঝাণ্ডাটা।

ক্ষুদে অফিসার পাভেলের দিকে ছুটে এসে পতাকার দণ্ডটা ধরে চীৎকার করে ওঠে:

'ছেড়ে দাও!'

'খবরদার!' হেঁকে ওঠে পাভেল।

পতাকা আকাশের পটে অগ্নি-শিখার মতো কাঁপতে থাকে দীপ্ত হয়ে। তারপর ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকানি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষুদে অফিসার পেছনে লাফিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। মায়ের পাশ কেটে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে আসে নিকলাই, তার বদ্ধমুষ্টি হাতটা সামনে প্রসারিত।

বৃদ্ধ মাটিতে পা আছড়িয়ে আবার হুকুম দেয়, 'গ্রেপ্তার কর!'

কয়েকজন সৈন্য ছুটে আসে। একজন বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করে। ঝাণ্ডা কেঁপে ওঠে, তারপর পড়ে গিয়ে সৈন্যদের ধূসর ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কার বিষণ্ণ কণ্ঠ শোনা যায়, 'ওঃ!'

মা বুক ফাটা আর্তনাদ করে ওঠে আহত পশুর মতো। সৈন্যদের মধ্য থেকে স্বচ্ছ স্বরে জবাব আসে পাভেলের, 'মাগো, বিদায়...'

বিদ্যুতের মতো মায়ের মনে খেলে গেল:

"ছেলে বেঁচে আছে! বেঁচে আছে! আমায় মনে করেছে!"

'বিদায়, নেন্‌কো আমার!'

পায়ের আঙুলের ডগায় ভর করে দাঁড়িয়ে হাত দুলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে মা। সৈনিকদের মাথার ওপর আন্দ্রেইয়ের গোল মুখটা দেখা যায়। হাসছে আন্দ্রেই মা'র দিকে তাকিয়ে। প্রণাম জানাচ্ছে।

'বাছারে আমার... আন্দ্রিউশা!.. পাশা!..'

সৈনিকদের ভিড় থেকে চীৎকার ওঠে, 'বিদায় কমরেডরা!'

একাধিকবার সাড়া জাগে জীর্ণ কণ্ঠে, জানালা, ছাদ, হেথা হোথা থেকে।

২৯

কে যেন বুকে আঘাত করল মায়ের। অন্ধকার চোখে তাকিয়ে দেখে মা সামনে ক্ষুদে অফিসারের বিকৃত লাল মুখটা।

চীৎকার করে অফিসার, 'ভাগো এখান থেকে!'

একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে নিল লোকটাকে মা। দুটুকরো হয়ে ভাঙ্গা পতাকা-দণ্ডটা পড়ে আছে ওর পায়ের কাছে, এখনও একটায় লাল কাপড়ের একটা টুকরো জড়িয়ে আছে। মা নীচু হয়ে তুলে নেয় ওটা। অফিসার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে পায়ে দলে হাঁকে:

'ভাগো, ভাগো বলছি!'

সৈন্যদের মধ্য থেকে সঙ্গীতের ধ্বনি ওঠে:

মেহনতী জন, জাগো রে ভাই...

চারদিক যেন ঘুরছে, ভাসছে, কাঁপছে। সারা বাতাস গম্‌গম্‌ করছে টেলিগ্রাফের তারের মতো একটা চাপা গুঞ্জনে। অফিসার পিছনে লাফিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে:

'এই, গান থামাও! সার্জেণ্ট-মেজর ক্রাইনভ...'

পতাকা-দণ্ডটা যেখানে ফেলেছিল, টলতে টলতে মা গিয়ে সেটাকে আবার তুলে আনে।

'শয়তানগুলোর মুখ বন্ধ করে দাও!..'

হোঁচট খেয়ে কেঁপে কেঁপে শেষে থেমে যায় গান। কে একজন মায়ের ঘাড় ধরে ওকে ফিরিয়ে পিঠে ধাক্কা মেরে বলে, 'ভাগ্‌ ভাগ্‌, এখান থেকে...'

অফিসার চ্যাঁচায়, 'রাস্তা একদম সাফ্!'

মায়ের কাছ থেকে গোটা দশ পা দূরেই আর একটা জটলা। তারা গর্জন করে, শিস্ দেয়, বিড়বিড় করে আর ধীরে ধীরে পিছু হটতে হটতে আঙিনায় আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে।

একজন অল্পবয়সী লম্বা গোঁফওয়ালা সৈন্য মাকে ফুটপাথে ঠেলে দেয় ধাক্কা দিয়ে:

'হট্ শালী! হট্!'

এক হাতে পতাকা-দন্ডটার ওপর ভর দিয়ে আর এক হাতে দেয়াল বা বেড়া আঁকড়ে ধরে ধরে ধীরে ধীরে হাঁটে মা। হাঁটু দুটোয় যেন বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। ওর সামনে দিয়ে লোকে পিছিয়ে যায়। আশেপাশে পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে সৈন্যরা। হাঁকে, 'ভাগ্ যাও, ভাগ্ যাও...'

এগিয়ে গেল সৈন্যরা। মা থামে। ফিরে দেখে। রাস্তার শেষে শূন্য ময়দানের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে পাতলা একসার সৈন্য। আরও ওদিকে কতগুলি ধূসর মূর্তি টলতে টলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে জনতার দিকে...

মায়ের একবার ইচ্ছে হয় ফিরে যায়। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা দুটো এগিয়ে চলে সামনের দিকে। কাছেই একটা নির্জন সরু গলি। সেখানে গিয়ে ঢোকে।

আবার থামে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কান পেতে শোনে। কোথা থেকে জনতার চাপা কোলাহল ভেসে আসে।

পতাকা-দন্ডের ওপর ভর দিয়ে আর একবার চলতে আরম্ভ করে মা। সারা শরীর ঘামে নেয়ে গেছে, ভুরু কাঁপছে, ঠোঁট নড়ছে, মনের মধ্যে এলোমেলো কথা সব আগুনের ফুলকির মতো ছিটকে ছিটকে ওঠে, আর হাতখানা তার ইসারায় আপনা থেকেই নড়ে। চীৎকার করে কথাগুলোকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার একটা অদম্য বাসনা অগ্নি-শিখার মতো ধক্-ধক্ করে জ্বলতে থাকে মায়ের মনে...

গলিটা হঠাৎ বাঁয়ে মোড় ঘুরে গেছে। মোড়ের ওদিকে আর একটা বড় জটলা। কে একজন জবরদস্ত গলায় বলে, 'পেজোমি করার জন্য সঙ্গীনের ওপর গিয়ে পড়ে না কেউ!'

'বাপ্ রে বাপ্! ওদের কান্ডটা দেখেছ! বেয়নেটগুলো একেবারে ওদের গা ঘেঁষে চলে গেল আর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ওরা! ভয় ডর কিচ্ছু নেই...'

'বুঝলে তো? দেখেছ পাভেল ভ্লাসভকে!..'

'আর ওই খখল?'

'পেছনে হাত দিয়ে হাসছে সর্বক্ষণ! শয়তান...'

সবাইকে ঠেলে একেবারে ভিতরে এসে দাঁড়ায় মা। সসম্মানে সরে দাঁড়ায় লোকে। মা বলে চীৎকার করে:

'প্রিয় বন্ধুরা!'

কে যেন হেসে ওঠে:

'আরে দেখ দেখ, হাতে নিশেনটা রয়েছে হে!'

একটা গম্ভীর গলা ধমকে ওঠে, 'চোপরাও!'

মা দুই হাত ছড়িয়ে দেয়, 'ভগবানের দোহাই, শোন তোমরা! শোন! তোমরা সবাই সাচ্চা মানুষ... আপন জন... আজ যা ঘট্‌ল, একবার নির্ভয়ে সে-দিকে তাকাও দেখি! দুনিয়ার পথে বেরিয়েছে আমাদের ছেলেরা, আমাদেরি বুকের ধনরা বেরিয়েছে—তোমাদের সবার জন্য, তোমাদের শিশুদের জন্য পথে বেরিয়ে এসেছে। সুদিনের আশায় এই ক্রুশখানি নিয়ে বেরিয়েছে তারা। জীবন চায় না তারা। তারা নতুন জীবন চায় —একেবারে আলাদা জীবন—সত্যের জীবন—ন্যায়ের জীবন। সব মানুষের জন্য সুখের জীবন চায় তারা...'

পাঁজরার তলায় হৃৎপিন্ডটা যেন ফেটে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, আগুনের মতো জ্বলছে। মনের গভীরে, অতি গহন গভীরে নতুন নতুন তেজোদ্দীপ্ত কথারা সব জন্ম নিচ্ছে—যা সবাইকে, সব কিছুকে বুকে টেনে নেওয়ার ভাষা — তারা মায়ের জিভের আগল দিলে খুলে, কথার ব্যঞ্জনায় প্রেরণায় সহজের সুর লাগল।

মা দেখে—সবাই নির্বাক হয়ে শুনছে ওর কথা। অনুভব করে, তাকে ঘিরে কী যেন ভাবছে ওরা। অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠছে বুকের মধ্যে—ওদের ডাক দিয়ে ঠেলে দেবে আন্দ্রেই, পাভেলের পেছনে, যাকে ওরা সেপাইদের হাতে তুলে দিয়েছে তাদেরই পথে।

কপাল কুঁচকে, মন দিয়ে শুনছে সবাই। ওদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মা বলে চলে জোর দিয়ে মৃদু স্বরে:

'আমাদেরি সন্তানরা বেরিয়েছে পৃথিবীতে, তারা চায় আনন্দ, ঘরে ঘরে আনন্দ। ওরা যীশু খৃষ্টের নামে, সত্যের নামে পথে নেমেছে; ক্রুদ্ধ মিথ্যাবাদী লোভীরা আমাদের যা দিয়ে বেঁধেছে, চেপে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে লড়ছে ওরা। ওগো ভালো মানুষেরা, মায়ের বুকের কচি ধন ওরা আজ ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে এসেছে ওদের জন্য নয়— সবার জন্য, সারা দুনিয়ার জন্য, সারা দুনিয়ার শ্রমিক ভাইদের জন্য!.. তাদের ছেড়ো না তোমরা, অভিশাপ দিও না, আমাদের ছেলেদের যেতে দিও না একলা পথে! ওদের ওপর বিশ্বাস রেখো — ওরা তোমাদেরই ছেলে... ওদেরই কলজের মধ্যে সত্য জনম নিলো, ওই সত্যের জন্য ওদের জান কবুল।'

হঠাৎ গলা বন্ধ হয়ে গেল। টল্‌তে লাগল মা, অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। কে একজন ধরে ফেলল ওকে। আর একজন অধীর চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে:

'সত্যি কথাই বলেছে, একেবারে ভগবানের সত্য! শোন ভাইয়েরা, ভালো করে শোন!'

দরদ-ভরা আর একটা কণ্ঠ শোনা যায়:

'দেখছ, কী কষ্ট দিচ্ছে নিজেকে!'

ধমক দিয়ে একজন বলল:

'কষ্ট নিজেকে দেবে কি, দিচ্ছে আমাদের; বুঝতে পারছ?'

উচ্চ কাঁপা এক স্বর শোনা যায় ভিড়ের মধ্যে: 'ওরে ভালো মানুষরা! আমার মিতিয়া গো, আমার সোনার ছেলে, মনের মধ্যে একটুকুন ময়লা নেই। কী করেছে ও? চলে গেল সাথীদের পেছন পেছন, ওদের সে কতো না ভালোবাসে... ঠিক কথাই বলছে গো এই মেয়েটা! সত্যি তো, ছেলেগুলোকে কিসের জন্য ছেড়ে দিয়ে যাব? অন্যায়টা কী করল ওরা?'

কথাগুলো শুনে মায়ের সারা শরীর কাঁপে। স্তব্ধ ধারায় চোখের জল বয়।

সিজভ বলে, 'ঘরে চলগো! অনেক ধকল গেল। আর না আজ।'

মুখখানা সিজভের ফ্যাকাশে, এলোমেলো দাড়ি। ও কাঁপছে। হঠাৎ ভুরু কুঁচকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে চায় কঠিন দৃষ্টিতে। স্পষ্ট করে বলে:

'তোমরা তো জান, ভাই সব! আমার ছেলে মাত্‌ভেই কারখানায় কেমন করে ম'ল। ও যদি আজ বেঁচে থাকত, আমিই ওকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতুম। বলতুম — যা ব্যাটা, ওই খাঁটি পথ, ইমানদারীর পথ! চলে যা!'

থেমে গেল সিজভ্‌। সবাই নির্বাক। সবার মুখ আঁধার। মস্ত বড় নতুন একটা কী যেন ওদের শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু এখন আর ভয় নেই ওই নতুনকে।

আবার বলতে আরম্ভ করে সিজভ। হাতটা ওপরে তুলে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে:

'বুড়োটার কথা শোন, ভাই সব! আজ তিপ্পান্ন বছর এই দুনিয়ায় আছি। তার মধ্যে এই কারখানায় কাজ করছি এককুড়ি উনিশ বচ্ছর। আজ আমার ভাই-পোটাকে ধরে নিলে। কী সুন্দর, চালাক বুদ্ধিমান ছেলে! একেবারে ভ্লাসভের পাশে পাশে হাঁটছিল ও, ঝাণ্ডাটার কাছেই। ওদের সঙ্গে ও আগু বেড়ে যাচ্ছিল...'

হাতটা নেড়ে একটু সংকুচিত হয়ে, মায়ের হাত ধরে বলে:

'এই স্ত্রীলোকটি হক্ কথা বলেছে। ছেলেগুলো আমাদের ইমানদারী নিয়ে ন্যায্যভাবে থাকতে চায়। আর আমরা ওদের ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ, পালিয়ে এলুম বইকি! চল, পেলাগেয়া নিলভনা...'

কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়েছে মায়ের। আর একবার সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওরে ভালো মানুষেরা, আপন জন সবাই। দুনিয়াটা ঐ ছেলেদেরই, জীবনটা ওদের!..'

'চল, নিলভনা! লাঠিটা নাও সঙ্গে,' সিজভ ভাঙা ঝাণ্ডাটা তাকে দিল।

সবাই চেয়ে দেখে মাকে বিষণ্ণ চোখে, শ্রদ্ধায়। চলে যায় মা সকলের দরদভরা গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে। সিজভ নিঃশব্দে পথ করে চলে। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায় বাক্যহীন মানুষ। কোন এক অদৃশ্য অচেনা শক্তির টানে সঙ্গে সঙ্গে তাড়াহুড়ো না করে চলে তারা। যেতে যেতে চাপা স্বরে কথা কয়।

বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে মা ওদের দিকে ফিরে ঝাণ্ডাটার ভাঙ্গা টুকরোটার ওপর ভর দিয়ে নুয়ে পড়ে কোমল স্বরে বলে, 'ধন্যবাদ...'

প্রাণের অতল থেকে সেই নতুন ভাবনাটা আবার ভেসে উঠল। বলল আবার:

'মানুষ জান দিয়েছিল বলেই আমরা যীশুকে পেয়েছিলাম। নইলে কোথায় পেতাম তাঁকে...'

নিঃশব্দে মায়ের দিকে তাকায় জনতা।

আরেকবার তাদের নমস্কার জানিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যায় মা। সিজভও যায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে।

জনতা তবু দাঁড়িয়ে থাকে, চাপা স্বরে কথা কয়।

তারপর ধীরে ধীরে চলে যায় তারা।

দ্বিতীয় খণ্ড

একটা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে মায়ের বাকী দিনটা কাটল। দেহে মনে অসীম ক্লান্তি। খানিক আগেই যা ঘটে গেল তার স্মৃতি কুয়াশার জালের মতো চেতনা ছেয়ে রইল। চোখের সামনে একটা ধোঁয়াটে বিন্দুর মতো হয়ে নেচে বেড়াতে লাগল সেই বেঁটে অফিসারটার মূর্তি, আন্দ্রেইয়ের হাসি-ভরা দুই চোখ, পাভেলের ব্রোঞ্জের মতো মুখ।

কাজ নেই, লক্ষ্য নেই—মা এঘর ওঘর করে। একবার জানালায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে; আবার ওঠে, এদিক ওদিক করে; ভুরু তুলে চম্‌কে উঠে চারদিকে তাকায়, ভাবনা-চিন্তাহীনভাবে কী একটা যেন খোঁজে। ঢক ঢক করে জল খায়; না মেটে তেষ্টা, না নেবে বুকের আগুন। দিনটা যেন চিরে একেবারে দু'খানা হয়ে গেছে। প্রথম অর্ধেকটায় একটা অর্থ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় অর্ধেকটায় আর তা নেই; কে যেন নিঃশেষ করে শুষে নিয়ে গেছে। এখন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে চারদিক। আর সেই শূন্যতার মধ্যে হাহাকারের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে এই প্রশ্নটা:

"এরপর কী?.."

করসুনভা আসে। হাত পা ছুঁড়ে ডুকরে কাঁদে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠে, রাগে মাটিতে পা আছড়ায়, কাকে উদ্দেশ করে গাল দেয়; মাকে বোঝায়, আশ্বাস দেয়। কিন্তু মা থাকে অটল পাষাণ-মূর্তিটি হয়ে।

'ওদের ধরে নিয়ে গেল! সারা কারখানার মানুষ খেপে গেছে গো! শুনেছ? একেবারে গোটা কারখানা।' চেঁচিয়ে বলে করসুনভা।

মায়ের মাথাটা নড়ে; ক্ষীণভাবে হয়তো বা একটা 'হুঁ' বেরিয়ে আসে। কিন্তু মনটা থাকে পেছন পানে — আন্দ্রেই আর পাভেলের সঙ্গে যে অতীত ফুরিয়ে গেল, তারই দিকে। মা কাঁদতেও পারে না — কান্না আসে না, হৃৎপিন্ডটা যেন কুঁকড়ে শুকিয়ে গেছে। ঠোঁট মুখ সব শুকনো কাঠ। থরথর্ করে হাত কাঁপে। মেরুদন্ড বেয়ে কনকনে ঠান্ডা কী যেন একটা শিরশিরিয়ে উঠছে।

সন্ধে বেলা পুলিশ এল। মা অবাকও হল না, ভয়ও পেল না। খুশিতে ডগমগ সব হৈহৈ করতে করতে ঢুকল এসে। হলদে-মুখো অফিসারটা দাঁত বের করে হেসে বলে:

'কী গো, কেমন আছ? এই নিয়ে তিনবার দেখা হল, তাই না?'

মা'র শুকনো জিভ্‌টা ঠোঁটের ওপর চলাফেরা করে। কথা কয় না। লোকটা বকর্‌ বকর্‌ করেই চলে। মাষ্টারির সুরে কথা বলে। মা বোঝে লোকটা মজা পেয়েছে খুব। কিন্তু আজ আর বিরক্ত লাগে না। কথাগুলো মার কানে পেঁছয়ও না। কিন্তু লোকটা যখন বলল, "তোমারই তো দোষ! জার আর ঈশ্বরকে যে ভক্তি করতে হয়, ছেলেকে তা শেখাতে পারোনি..." দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে না চেয়ে মা তখন চাপা গলায় জবাব দেয়:

'সে বিচার করবে আমাদের ছেলেরাই। এমন পথে আমরা যে তাদের একলা ফেলে চলে এসেছি, সে অপরাধের ঠিক বিচার ওরাই করবে।'

'কী?' চীৎকার করে ওঠে অফিসার, 'জোরে বল!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলে, 'বলছি যে, ছেলেরাই আমাদের বিচার করবে।'

রাগের ঝোঁকে খরখর করে কী যেন বলল অফিসার। ওর কথা মা'র কানে আসে না।

মারিয়া করসুনভাকে সাক্ষী রাখা হল। মায়ের পাশেই দাঁড়িয়ে রইল সে। একটিবারও তাকাল না তার দিকে। অফিসার নানারকম সওয়াল করে। মাথাটা প্রায় মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে সেলাম করে প্রতিবার তাড়াতাড়ি একইভাবে বলে করসুনভা:

'আমি জানি না, হুজুর! মুখ্যুসুখ্যু মানুষ! ফিরি করে, দুঃখু ধান্দা করে খাই। আমি ওসব জানি না...'

গোঁফে চাড়া দিয়ে হুকুম দেয় হুজুর: 'না জান তো, চোপরাও!'

আবার আভূমি সেলাম করে ও। আর সাহেব পেছন ফিরলেই মুখ ভ্যাংচায়। মায়ের কানে কানে বলে: 'মুখপোড়াটাকে দিলাম ভেংচে।'

মাকে তল্লাশী করতে বলে ওকেই। চোখ মিট্‌মিট্‌ করে অফিসারের দিকে তাকিয়ে ও সভয়ে বলে:

'হুজুর, মা-বাপ। আমি পারব না, আমি জানি না।'

হুংকার দিয়ে মাটিতে লাথি মারে সাহেব। চোখ নামিয়ে নেয় করসুনভা। মাকে নীচু স্বরে বলে:

'তুমি বরং বোতাম টোতামগুলো খুলতে শুরু কর পেলাগেয়া...'

মায়ের জামা কাপড় হাতড়াতে হাতড়াতে মুখ লাল হয়ে ওঠে ওর। চাপা গলায় বলে: 'খেঁকী কুকুর কোথাকার!'

ঘরের কোণায়, যেখানে মায়ের দেহ-তল্লাশী করছিল মারিয়া, সেদিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ওঠে সাহেব: 'এই, কী বলাবলি করছিস ওখানে?'

ভীতস্বরে বলে মারিয়া: 'মেয়েলী কথা সাহেব!'

অবশেষে বিবরণীতে সই করতে হুকুম করে মাকে। অনভ্যস্ত হাতে বড় বড় জ্বলজ্বলে অক্ষরে লিখল মা:

"পেলাগেয়া—শ্রমিক ভ্লাসভের বিধবা-পত্নী।"

মুখ তাচ্ছিল্যভরে বিকৃত করে ঝাঁঝিয়ে ওঠে সাহেব, 'ও আবার কী লিখলে? ওটা কেন?' তারপর, মুচকে হেসে বলে: 'জানোয়ার...'

ওরা চলে গেলে মা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল; হাত দুটোকে বুকের ওপর আড় করে রাখা—পলকহীন চোখ সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভুরু দুটো ওপর দিকে তোলা, ঠোঁট আর চোয়াল এমনি শক্ত করে চাপা যে ব্যথা করতে থাকে। কেরোসিনের ডিবেটার তেল ফুরিয়ে গেছে; সলতেটা চড়্‌চড়্‌ করছে, আলোটা কাঁপছে থর্‌থর্‌ করে। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে মা অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইল। বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনি কালো একটা বিষণ্ণ চিন্তাহীনতা ভরে আছে যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের স্থানটুকুও বুঝি নেই। বহুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে রইল মা। চোখ আর পা টন টন করতে থাকে। মারিয়া জানালায় দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় ডাকে:

'ঘুমিয়েছ, পেলাগেয়া? আহা, বেচারি। কী কষ্ট! যাও, শুয়ে পড়গে!'

কাপড় না ছেড়েই লুটিয়ে পড়ল মা বিছানায়। নিমেষে গভীর ঘুমে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। স্বপ্ন দেখতে লাগল।

জলার পিছনে শহরের রাস্তার ধারে হলদে রং'এর বালির ঢিপিটার পাশ দিয়ে যেন যাচ্ছে মা — সেখানে বালি কাটছে শ্রমিকরা। পাভেল দাঁড়িয়ে আছে তার ওপরে আর গাইছে:

মেহনতী জন, জাগো রে ভাই...

আন্দ্রেইয়ের মতো মিঠে, সুরেলা গলা। নীল আকাশের পটে ওর মূর্তিটা অতি স্পষ্ট। চোখে হাতের আড়াল দিয়ে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মা চলেছে। ছেলের কাছে আসতে লজ্জা করছে। কারণ মা অন্তঃসত্ত্বা।

কোলে আর একটি শিশু। যেতে যেতে একটা মাঠে এসে পড়ল। ছেলের দল বল খেলছে। বলটা লাল রং'এর। কোলের শিশুটি বলটার জন্য হাত বাড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। মা স্তনটা ওর মুখে পুরে দিয়ে ফিরে চলে। কিন্তু বালির ঢিপিটার উপর সৈন্যরা ওর দিকে সঙ্গীন বাগিয়ে দাঁড়িয়ে। মা ছুটতে ছুটতে মাঠের মাঝখানে গির্জেটায় এসে ঢোকে। ধব্‌ধবে শাদা গির্জা—বিরাট উঁচু, যেন মেঘ দিয়ে গড়া, সারা অঙ্গ মেঘের। কাকে যেন কবর দেওয়া হচ্ছে। মস্ত বড় কালো কফিন সেঁটে বন্ধ করা। তবু শাদা পোষাক পরা পুরুত আর ডিকন গির্জা প্রদক্ষিণ করতে করতে গাইছে:

মরণ থেকে যীশুর পুনরুজ্জীবন...

ধূপদানী হাতে ডিকন মায়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানায়। ঝলমলে লাল চুল লোকটির, আর সাময়লভের মতো হাসিখুশি মুখ। গির্জার গম্বুজটার ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে, যেন শুভ্র উত্তরীয় উড়ছে কার। ভেতর থেকে সঙ্গীতের ধ্বনি আসছে:

মরণ থেকে যীশুর পুনরুজ্জীবন...

উপাসনা-ঘরের মাঝামাঝি এসে পুরুত হঠাৎ থেমে গিয়ে চীৎকার করে ওঠে: 'গ্রেপ্তার কর!'

কোথায় চলে গেল তার পুরুতের বেশ! ওপরের ওষ্ঠের ওপর জেগে উঠল পাক-ধরা খাড়া খাড়া গোঁফ। ভয়ে সবাই ছুটে পালাতে লাগল। সেই ডিকনটিও পালায় ধূপদানীটি একদিকে ছুঁড়ে ফেলে। দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল সে। ধরনটা যেন খখলের মতো। মা'র হাত থেকে শিশুটি হঠাৎ পড়ে গেল ছুটন্ত মানুষগুলোর পায়ের কাছে। কিন্তু আশ্চর্য কেউ মাড়াল না তাকে। উলঙ্গ ছোট্ট দেহটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে সবাই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মা নতজানু হয়ে বসে পড়ে সকলকে মিনতি জানায়:

'ফেলে যেও না ওকে! সঙ্গে নিয়ে যাও তোমরা...'

খখল গায়:

মরণ থেকে যীশুর পুনরুজ্জীবন...

সেই হাসি মুখ, সেই হাত পেছনে দিয়ে দাঁড়ানর ভঙ্গি।

কাঠ-বোঝাই এক গাড়ী। নিকলাই চলছে পাশে পাশে। মা শিশুটিকে তুলে গাড়ীর ওপর বসাল। নিকলাই হো হো করে হেসে বলে:

‘এবারে তাহলে একটা কাজের মতো কাজ আমায় দিয়েছে ওরা...’

নোংরা রাস্তা। জানালা থেকে মাথা বাড়িয়ে আছে লোকেরা। কেউ চীৎকার করছে, কেউ শিস দিচ্ছে; কেউ বা হাত নাড়ছে। সুন্দর পরিষ্কার দিন। ঝলমলে রোদ, কোথাও এক ফোঁটা ছায়া নেই।

খখল চেঁচিয়ে ওঠে, ‘গান, নেন্‌কো গান। এই তো জীবন!’

গান গায় খখল। ওর সুরের ঝংকারে সব শব্দ ডুবে যায়। মা ওর পেছন পেছন চলছে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মা একটা অতল অন্ধকার গর্তে। অমনি নিরন্ধ্র শূন্যতা হাহা করে ছুটে এসে ঘিরে ধরল...

ধড়্‌ফড়্‌ করে জেগে উঠল মা। কোন দৈত্যের মস্ত বড় একখানা কঠিন হাত যেন চেপে বসেছে ওর বুকের ওপর; মহা ফুর্তিতে একটু একটু করে মোচড় দিয়ে কলজেটা নিংড়োচ্ছে। ভীষণ জেদের সঙ্গে কারখানার বাঁশীটা শ্রমিকদের ডেকে ডেকে বেজে চলছে। শব্দটা শুনে মনে হল, দ্বিতীয়বারের বাঁশী। ঘরময় বই জামা কাপড় ছড়ান। চারদিক তছনছ। মেঝেতে কাদা-মাখা বুটের দাগ।

মা উঠে ঘর গোছাতে লেগে গেল। না ধুল মুখ, না করল প্রার্থনা। রান্নাঘরে ভাঙ্গা পতাকা-দণ্ডের টুকরোটা পড়ে আছে। লাল কাপড়ের একটা ফালি তখনও লেগে আছে। বিরক্তভাবে মা ওটাকে তুলে স্টোভের নীচে গুঁজে দিতে গেল। কিন্তু আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাপড়ের ফালিটুকু খুলে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল। লাঠিটাকে হাঁটুতে ভেঙ্গে স্টোভের কাছে ফেলে দিল। ঠাণ্ডা জল ঢেলে ঢেলে সব দরজা জানলা ধুয়ে তকতকে করে তুলল, সামোভার জ্বালল। তার পর কাপড়চোপড় ঠিক করে পরে এসে বসল জানালায়:

“এর পর?” প্রশ্নটা আবার নতুন করে মনে পড়ে যায়।

হঠাৎ মনে পড়ে প্রার্থনা তো করা হয়নি। উঠে গিয়ে আইকনের সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বসে পড়ে আবার। বুকের ভেতরটা একেবারে খালি—খাঁ খাঁ করছে চারদিক।

অদ্ভুত নিরালা নিঝুম চারদিক। কাল যারা মুক্ত কণ্ঠে চীৎকার করেছে পথে পথে, আজি যেন তারা ঘরের নিরালায় বসে গতকালের আশ্চর্য দিনটার কথাই ভাবছে।

তার যৌবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে। জমিদার জাউসাইলভদের বাড়ীর পুরোনো বাগানের মধ্যে একটা বড় পুকুর ছিল। কী জলপদ্মই না ফুটে থাকত সেখানে। হেমন্তের এক ধূসর দিনে যাচ্ছিল সে ওধার দিয়ে। পুকুরটার মাঝখানে একটা নৌকো। ছায়া-নিবিড় শান্ত পুকুর, হলদে রং'এর ঝরা-পাতায় ছাওয়া। নৌকোটা স্থির, নিশ্চল, কালো জলের ওপর যেন আঠা দিয়ে সেঁটে-রাখা। কোন মানুষ নেই, দাঁড়-বৈঠে নেই। ঝিমিয়ে-পড়া জলের বুকে, একরাশ মরা পাতার পরিবেশে, একলা নিরালা নাওখানিকে অমন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী একটা নামহীন নিবিড় গভীর ব্যথায় তার হৃদয় হুহু করে উঠেছিল। বহুক্ষণ পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল মা। অবাক হয়ে ভাবছিল, কেই বা আর কেনই বা নাওখানিকে অমন করে মাঝ-পুকুরে ঠেলে দিয়েছে। সে-দিনই সন্ধে বেলায় শুনল জমিদারীর এক কর্মচারীর বৌ ডুবে মরেছে। ছোট্টখাট্ট দেখতে ছিল বৌটি, তুরতুর করে হাঁটত; মাথায় এক রাশ দুরন্ত কালো চুল।

মা হাত দিয়ে মুখ মুছে নিল। গতকালের স্মৃতির মধ্যে চিন্তাগুলি কেঁপে কেঁপে ভাসতে লাগল। তারি আবেশে কতক্ষণ যে মা বসে রইল আনমনে গেলাসের ঠাণ্ডা চায়ের দিকে তাকিয়ে তার ঠিক নেই। ভারি ইচ্ছে হতে লাগল, কোনো সহজ-সরল জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে বসে যদি দুটো কথা কইতে পারত!

যেন ওর এই প্রবল ইচ্ছেরই টানে নিকলাই ইভানভিচ্ এল দুপুরের দিকে। তবু ওকে দেখেই হঠাৎ ভয়ে শিউরে উঠল মা। তার সম্ভাষণের কোনো জবাব না দিয়ে নীচু স্বরে বলল:

'কেন এসেছেন আপনি! ঠিক হয়নি আসা। দেখতে পেলে ধরে নেবে আপনাকেও...'

মায়ের হাতে শক্ত একটা চাপ দিয়ে, চশমাটা ঠিক করে পরে নিল নিকলাই। তারপর মায়ের কাছে মাথা নুইয়ে বলল:

'পাভেল, আন্দ্রেই আর আমার মধ্যে কথা হয়েছে যে ওরা গ্রেপ্তার হবার পরের দিনই আপনাকে শহরে নিয়ে যাব। খানাতল্লাশী টল্লাশী

হয়েছে?' খুব তাড়াতাড়ি বলল কথাগুলো। স্বরটা কোমল আর ব্যগ্রতায় ভরা।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে মা: 'করে আবার নি! কোন রকম লজ্জা-বিবেকের বালাই না রেখে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করেছে।'

নিকলাই কাঁধ-ঝাঁকিয়ে বলে: 'লজ্জা থাকবে কোন দুঃখে?' তারপর বলতে লাগল কেন মায়ের শহরে যাওয়া দরকার।

সব মন দিয়ে শুনে একটুখানি ফিকে হাসি হাসল মা। ভালো করে বুঝল না ওর যুক্তি; কিন্তু গভীর স্নেহ-মিশ্রিত একটা বিশ্বাস মনকে অভিভূত করে দিল। মা অবাক হয়ে যায়, কেমন করে এল এ বিশ্বাস।

'পাশা যদি তাই বলে থাকে, আর আপনার যদি অসুবিধে না হয়...' মা বলে।

'আরে তার জন্য ভাবছেন কেন?' বাধা দিয়ে বলে নিকলাই, 'আমি তো একাই থাকি, কালেভদ্রে কখনও বোনটা আসে দু'চারদিনের জন্য।'

'তাই বলে আপনার ঘাড়ে চেপে বসে বসে খাব না আমি,' মা বলে।

'বেশ তো, কাজ করবেন। খোঁজা যাবেখন।' বলে নিকলাই।

কাজ! মায়ের কাছে কাজ বলতে তার ছেলের কাজ, আন্দ্রেইয়ের কাজ, তাদের সাথীদের কাজ। মা নিকলাই-এর কাছ ঘেঁষে আসে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে:

'সত্যি? সত্যি পাবো?'

'আমার বাড়ীতে আর তেমন কাজ কী? আমি তো বিয়ে থাওয়া করিনি...'

মা একটু মিইয়ে গিয়ে জবাব দেয়, 'না না, আমি সে-কথা বলিনি। সংসারের কাজকর্মের কথা ভাবছিলাম না!'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। নিকলাই তাহলে বুঝতে পারেনি। একটু দুঃখ হয়। নিকলাই-এর ক্ষীণ চোখ দুটি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটু চিন্তাকুলভাবে বলে:

'পাভেলের সঙ্গে যদি দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি পান দেখবেন তো কোথাকার চাষীরা নাকি তাদের জন্য কাগজ বার করতে বলেছিল, তাদের ঠিকানাটা আনতে পারেন কিনা...'

মা খুশি হয়ে ওঠে, 'আমি তো চিনি তাদের! ঠিক খুঁজে বার

করব। তারপর আপনি যেমন বলবেন। আমায় কেউ সন্দেহ করবে না। কেন? কারখানায় বে-আইনী কাগজপত্র নিয়ে যাইনি?'

হঠাৎ অদম্য ইচ্ছে হয়, এক গাছা লাঠি হাতে নিয়ে, মুসাফিরী থলি একটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যায়, বন পেরিয়ে গাঁয়ের পর গাঁ পেরিয়ে যতদূর পথ গেছে, শুধু চলবে আর চলবে। ব্যাকুল ভাবে বলে:

'দিন, দিন আমায়। দেখবেন, ঠিক পারব। যেখানে বলবেন যাব। ঠিক পথ খুঁজে খুঁজে চিনে নেব। শীত-গ্রীষ্ম কোন সময় মুসাফিরের পা থামবে না। যতদিন না কবরে গিয়ে সেঁধুই শুধু চলব আর চলব! আর সেটা তো আমার পক্ষে নেহাৎ খারাপ হবে না?'

মুসাফিরী! গৃহ নেই, আশ্রয় নেই... শুধু পথ! গাঁয়ে গাঁয়ে, দোরে দোরে প্রভু যীশুর নামে ভিক্ষের ঝুলি পেতে শুধু পথ চলা! বুকটা টন্ টন্ করে ভাবতে।

নিকলাই খুব সাবধানে মায়ের হাতখানা নিজের উষ্ণ হাতে বুলিয়ে নিল। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল:

'আচ্ছা, এসব কথা পরে হবে'খন।'

মা বলে উঠল, 'কি বলছেন! আমাদেরই ছেলে ওরা, তাদের কলজের রক্ত যদি ওরা ঢেলে দিতে পারে, যদি অমন করে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারে... হেসে খেলে জান অবধি... তবে আমি তো তাদের মা...'

নিকলাই-এর মুখ সাদা হয়ে যায়। নিবিড় ভাবে তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। অতি শান্ত ভাবে বলে:

'এমন কথা তো কোন দিন শুনিনি!'

'কথা! কথা কোথায়! কথা তো নেই!' গভীর বিষাদে মাথাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে হাত দুটো শিথিল ভঙ্গিতে ছড়িয়ে মা বলে, 'মায়ের বুকটা খুলে দেখাবার মতো কথা যদি থাকত...'

মা উঠে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড একটা শক্তি বুকের ভেতরকার আক্রোশের কথাগুলোকে যেন ঠেলে বার করে দিচ্ছে, অথচ মুখ ফুটে আসছে না। মাথাটা ঘুরে ওঠে।

'তাহলে যে কেঁদে ভাসাবে অনেকেই... কঠিন পাথরও গলে যাবে...'

আর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিকলাইও উঠে পড়ে।

'তাহলে ঠিক রইল! আমার বাড়ী আসছেন?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে মা।

'দেরী করবেন না। যত শীগ্‌গির পারেন চলে আসবেন। নয়তো সত্যি ভাবনায় থাকব,' নিকলাই নরম সুরে বলল।

মা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। ভাবনায় থাকবে? কেন? মা ওর কে? মাথা নুয়ে, মুখে সলজ্জ বিব্রত একটুখানি হাসি নিয়ে ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা... ক্ষীণ-দৃষ্টি, দেহটা ঝুঁকে পড়েছে, নেহাৎ সাধারণ একটা কালো কোট গায়ে। চেহারাটার সঙ্গে ওর পরনের কিছুই যেন খাপ খায় না...

চোখ নীচু করে শুধয়:

'টাকা পয়সা আছে তো?'

'না।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকার থলে বের করে খুলে মা'র দিকে বাড়িয়ে দেয়।

'এই নিন...'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটুখানি হাসে মা। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে:

'সব কিছুই সৃষ্টি-ছাড়া। আপনার কাছে দেখছি টাকা টাকা নয়, খোলামকুচি। কত মানুষ একটা পয়সার জন্য আত্মাটাকেও বিকিয়ে দেয়। আর আপনি? কানাকড়ির দামও দেন না টাকার। অন্যদের খাতিরেই যেন দয়া করে পয়সাটা পকেটে ফেলে রাখেন...'

নিকলাই একটু হেসে বলে:

'বাপ্‌স্‌! টাকা পয়সা? বিচ্ছিরি জিনিস! দেওয়া নেওয়া দুটোই...'

গভীর ভাবে মায়ের হাতটায় চাপ দিয়ে বিদায় নেয় নিকলাই। আর একবার বলে: 'শীগ্‌গির চলে আসবেন কিন্তু।'

তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়া অবধি যায় মা। বিদায় জানিয়ে ভাবে:

"এত ভালো লোক, কিন্তু আমার জন্য ওর মায়া নেই!"

ব্যাপারটা ভালো লাগছে না, অবাক লাগছে, বুঝতে পারে না মা।

২

নিকলাইয়ের সঙ্গে দেখা হবার তিন দিন পর মা রওনা হল শহরে। ঘোড়ার গাড়ীর ওপর ট্রাঙ্ক দুটো চাপান। বস্তির সীমানা পেরিয়ে মাঠের পথে নেমে পেছন ফিরে তাকায় মা। হঠাৎ যেন বুঝতে পারে সত্যি

চিরদিনের মতো বস্তি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বস্তি নয় — বসতি, যেখানে জীবনের সুদীর্ঘ কালো অধ্যায়টা কেটে গেল দুঃখে কষ্টে। নতুন দিনের শুরু হয়েছিল এখানেই। একেবারে নতুন তার স্বাদ। নতুন নতুন আনন্দ বেদনার মধ্য দিয়ে দিনগুলো তর তর্ করে কেটে গেছে।

মাটির বুকে কারখানাটা ছড়িয়ে আছে তার চিমনীগুলো উঁচিয়ে। যেন একটা বিরাট মাকড়সা। তারি গা ঘেঁষে, জলার ধারে ধারে শ্রমিকদের একতলা বাড়ীগুলো—কুঁজো হয়ে, গায়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ধোঁয়ায় কালো তাদের আলো-প্রাণহীন জানালাগুলো করুণ চোখে পরস্পরের দিকে যেন চেয়ে আছে। বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে দেখা যায় গির্জাটা। কারখানার মতোই ওটার গাঢ় লাল রং। কিন্তু তার চুড়ো চিম্‌নীর মতো অতদূর উঠতে পারেনি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা ব্লাউজের কলারটা ঠিক করে নেয়। কলারটা যেন গলায় এঁটে বসেছিল।

ঘোড়ার পিঠে লাগামটা নেড়ে গাড়োয়ান হাঁকে; 'হট্ হট্!' অদ্ভুত মানুষ; ধনুকের মতো বাঁকা পা, মুখ দেখে বয়েস বোঝবার যো নেই; বিরল-কেশ মাথা, দাড়ির অবস্থাও তাই। চুল দাড়ির রং যেন জ্বলে গেছে। নিষ্প্রভ দুই চোখ। এপাশ ওপাশ দুলতে দুলতে চলে, ডাইনে যাওয়া বাঁয়ে যাওয়া, সবই তার কাছে সমান।

নিস্তেজ স্বরে আবার হাঁকে: 'হট্ হট্!' বাঁকা পায়ের কাদা-লাগা ভারি বুটটা মাটিতে ঠোকে... ভঙ্গিটা দেখলে হাসি পায়। চারদিকে তাকায় মা... ধু ধু করছে মাঠ... মায়ের প্রাণটার মতোই শূন্য।

গভীর উষ্ণ বালির ওপর দিয়ে গাড়ীটা চলেছে। ঘোড়ার মাথা নড়ে বেজার ভাবে। বালির সরসর শব্দ। পেছনে পড়ে থাকে সেই ধুলোর জাল, বালির মধ্যে ঘোড়াব ক্ষুরের শব্দ আর পুরানো গাড়ীটার ঝ্যাঁকর ঝ্যাঁকর আওয়াজ...

শহরের এক প্রান্তে নিরালা একটা রাস্তার ধারে নিকলাইয়ের আস্তানা। দোতলা অন্ধকার বাড়ী—কতকালের যে পুরানো তার ঠিক নেই—তারি পাশের অংশ। তিনখানি ঘর। সামনে ছোট্ট একটু বাগান। লাইলাক আর একেসিয়ার ডাল, আর নবীন পপলার গাছের রুপোলী পাতারা ওর ঘর তিনখানির জানালা দিয়ে উঁকি মারে। ভেতরে সব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে; শান্ত পরিবেশ। মেঝের ওপর গাছের পাতার মৌন ছায়ার নাচ,

দেয়াল ঘেঁষে বই-এর তাকের সার। গম্ভীর গম্ভীর কাদের যেন ছবি ঝোলান।

মাকে ছোট্ট ঘরখানিতে নিয়ে এল নিকলাই। একটা জানালা বাগানের দিকে। আর একটার সামনে ছোট্ট একটা ঘাসে-ঢাকা উঠোন। বই-এর আলমারী আর তাকে দেয়াল ঠাসা। নিকলাই জিজ্ঞাসা করল:

'আপনার কষ্ট হবে না তো এখানে?'

মা বলে: 'আমি রান্নাঘরেই বরং থাকব। বেশ সুন্দর পরিষ্কার তক্‌তকে ঘরটা...'

কেন যেন নিকলাই ঘাবড়ে যায়। অপ্রস্তুত হয়ে জড়ানো ভাষায় কোনো মতে মাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত রাজী হয় মা। মুহূর্তে খুশি হয়ে ওঠে নিকলাই।

তিনটি ঘরেরই আবহাওয়া যেন একটু বিশেষ রকম। অতি সহজে নিশ্বাস নেওয়া যায়, খুব ভাল লাগে। কিন্তু আপনা থেকে গলা নেমে যায়। দেয়াল থেকে ওই মুখগুলি তাকিয়ে আছে, কি গভীর একাগ্রতায়। তাদের সমাহিত ভাবনার জগৎটাকে ব্যাহত করতে ইচ্ছে হয় না।

জানালার ওপরকার ফুলের টবগুলির মাটি হাত দিয়ে দেখে মা বলে: 'জল দিতে হয় তো গাছগুলোতে।'

অপরাধীর মতো জবাব দেয় গৃহকর্তা, 'ওঃ ! হাঁ। আমি বড় ভালোবাসি ওগুলোকে, কিন্তু, এই... দেখবার সময় কই...'

মা লক্ষ্য করে, নিজের সুন্দর স্বচ্ছন্দ ঘরখানায়ও নিকলাই-এর কেমন যেন একটা সাবধানী ভাব। কোন কিছুর সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না যেন। ডান হাতের সরু সরু আঙুলগুলো দিয়ে চশমাটা ঠিক করতে করতে প্রত্যেকটি জিনিসের একেবারে কাছে মুখ এনে দেখে। চোখজোড়া কুঁচকে ওঠে, জিনিসটার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়। কখনও বা কোন জিনিস মুখের কাছে ধরে যেন চোখ দিয়ে অনুভব করে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ও-ও যেন নতুন এসেছে এখানে। তাই সবই ওর কাছে নতুন, অচেনা। ওর হাবভাবে সহজ হয়ে ওঠে মা। ওর পেছন পেছন ঘোরে, দেখে নেয় কোথায় কী আছে, জিজ্ঞাসা করে কখন খায়, কখন শোয়, কখন কী করে। নিয়ম মাফিক কিছুই করতে পারে না, অথচ স্বভাবও শোধরাতে পারে না বলে অপরাধীর কুণ্ঠা জেগে থাকে ওর কথায়।

মা গাছগুলিতে জল দেয়; পিয়ানোর ওপর ছড়ান স্বরলিপিগুলি গুছিয়ে রাখে। সামোভারটা দেখে বলে:

'এটা তো মাজতে হয়...'

নিকলাই মলিন পাত্রটার ওপর আঙুল ঘসে ঘসে তারপর আঙুলটা নাকের সামনে তুলে ধরে ভালো করে দেখে। মা হাসে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে সারা দিনটার দিকে ফিরে তাকায় মা। অবাক হয়ে বালিশ থেকে মাথা তুলে চারদিকে চায়। জীবনে এই প্রথম অন্যের বাড়ীতে থাকা। কিন্তু কই, কোনো অস্বস্তি তো লাগছে না! নিকলাইয়ের কথা ভেবে মনটা কেমন সিক্ত হয়ে আসে। ওর জন্য সব কিছু যথাসম্ভব ভালো করে তুলতে হবে, একটু স্নেহ দেখাতে হবে ওকে—যে স্নেহ ওর জীবনে আনবে আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য। নিকলাইয়ের সেই অপ্রস্তুত ভাব, কোন কাজ করতে ওর হাস্যকর অক্ষমতা মা'র মনে লাগে। সাধারণ মামুলী কোনো কিছুর সঙ্গে ওর কোনো মিলই নেই। শিশুর মতো কী পরিষ্কার স্বচ্ছ ওর চোখ। মানুষটার জন্য মায়ের মনটা কেমন করে। তারপর মনে হয় ছেলের কথা। পয়লা মের ঘটনাগুলো ভেসে ওঠে চোখের সামনে। পয়লা মের সব শব্দ যেন নতুন হয়ে উঠেছে, তার নতুনতর অর্থ-গৌরবে। দিনটাও যেমনি মহিমায় সমুজ্জ্বল, সেদিনকার বেদনায়ও তেমনি মহিমা আছে। কারো জবরদস্ত ঘুষি খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়েনি, দুঃখে দুঃখে কলজেটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। ধিকি ধিকি জ্বলছে আক্রোশের আগুন। আর তার তেজে বাঁকা মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে ওঠে।

শহুরে রাত। কত অচেনা শব্দ ভেসে আসে খোলা জানালার পথে, বাগানের গাছের পাতাগুলোতে শিরশিরানি জাগিয়ে — কত দূর দূরান্তর থেকে শ্রান্তিতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে... ঘরের মধ্যে এসে তারা মিলিয়ে যায়। শোনে আর ভাবে মা... "ছেলেরা খোলা দুনিয়ার পথে বেরিয়েছে..."

পরদিন ভোরে উঠে মা সামোভারটা মেজে চক্চকে করল। তারপর চায়ের জল ফুটিয়ে, নিঃশব্দে খাবার টেবিল সাজিয়ে রান্নাঘরে বসে রইল, নিকলাই-এর ঘুম ভাঙেনি তখনও। খানিক পরে একটু কেশে দরজা খুলল নিকলাই। এক হাতে তার চশমা, আর এক হাত গলায়। সম্ভাষণের পর মা সামোভার নিয়ে খাবার ঘরে গেল, নিকলাই গেল হাতমুখ ধুতে। মেজেতে জল পড়ে একাকার। এই সাবান পড়ে, এই দাঁতের বুরুশ পড়ে... নিজের আনাড়ীপনায় নিজেকে ধিক্কার দেয় নিকলাই।

খেতে খেতে মাকে বলে:

'জেলাবোর্ডে ভারি বিশ্রী কাজ আমার — চাষীরা কি ভাবে মরে হেজে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই দেখি আর কি...'

অপরাধীর হাসি হাসে।

'না খেতে পেয়ে লোকে অকালে মরছে। বাচ্চাগুলো আধমরা হয়ে জন্মায়। তারপর মরে শীত আসবার আগেই মাছির মতো। এসব আমরা জানি, কারণ যে কী তাও জানি। ওই সব দেখবার জন্যই মাস মাস মাইনে পাচ্ছি... এ ছাড়া আর কিছু নেই...'

'আপনি ছাত্র?' মা শুধয়।

'না ছাত্র নই, মাষ্টার। আমার বাবা ভিয়াৎকাতে এক কারখানার ম্যানেজার। কিন্তু আমি মাষ্টারী নিলাম। গাঁয়ে বই পত্র দিতাম চাষীদের। সেজন্য দিল জেলে ঠুকে। জেল থেকে বেরিয়ে বই-এর দোকানে কাজ নিলাম। নিজেরই অসাবধানতায় আবার জেলে যেতে হল। সেখান থেকে দিলে আর্খাঙ্গেলস্কে অন্তরীণ করে। কিন্তু সেখানকার প্রদেশপালকে খুশি রাখতে পারলাম না। সুতরাং তখন দিলে শ্বেত সাগরের পারে ছোট্ট একটা গাঁয়ে ছেড়ে। সেখানে পাঁচ বছর ছিলুম।'

অতি শান্ত, নিরুদ্বেগ স্বরে কথাগুলো আলোকোজ্জ্বল ঘরখানার মধ্যে ঝরে ঝরে পড়ে। এমনি-ধারা অনেক কাহিনী শুনেছে মা। কিন্তু আশ্চর্য, সবাই বলে এমনি নিরুত্তপ্তভাবে। এমনি করে বলে যেন কপালের লেখন ছিল তাই ঘটে গেল।

'আজ আমার বোন আসছে,' বলে নিকলাই।

'বিয়ে হয়েছে?'

'বিধবা। স্বামীকে চালান করেছিল সাইবেরিয়ায়। সেখান থেকে সে পালিয়ে আসে। দু'বছর আগে ইউরোপে মারা গেছে যক্ষ্মায়...'

'বোন আপনার চেয়ে ছোট?'

'না, ছ'বছরের বড়। বলতে গেলে ওর দৌলতেই আমার সব। শুনবেন ওর পিয়ানোর হাত। কী চমৎকার যে বাজায়! এটা ওরই পিয়ানো। এখানকার প্রায় সব জিনিসই ওর। শুধু বইগুলো আমার...'

'কোথায় থাকে আপনার বোন?'

'যত্র-তত্র,' হেসে বলে নিকলাই, 'যেখানেই কোন সাহসী লোকের দরকার হয়, সেখানেই ও যায়।'

'সেও কি এই কাজ করে?' মা শুধায়।

'নিশ্চয়,' জবাব দেয় নিকলাই।

খানিক পরেই ও বেরিয়ে গেল অফিসে। মা ভাবতে লাগল — ওদের "কাজের" কথা... আর যারা নিষ্ঠায়, নিঃশব্দে ঐ কাজের মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন — তাদের কথা। পাহাড়ের নৈশ মহিমার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মনে হয় মায়ের তেমনি তুচ্ছ ক্ষুদ্র মনে হল নিজেকে।

কালো-পোষাক পরা, দীঘল চেহারার একটি মেয়ে এল দুপুরের দিকে। মা দোর খুলে দিল। হাতের ছোট হলদে রঙের স্যুটকেসটা মাটিতে ফেলে দিয়ে সে মায়ের হাত জড়িয়ে ধরে বলল:

'আপনি পাভেল মিখাইলভিচের মা, তাই না?'

মেয়েটির পোষাকের জলুস দেখে হকচকিয়ে যায় মা। কোনমতে একটা "হ্যাঁ" বলে ফেলে।

'আপনাকে যেমনটি ভেবেছিলাম, ঠিক মিলে গেছেন। আমার ভাই আমাকে লিখেছিল আপনি এখানে থাকবেন।' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলতে খুলতে বলে, 'পাভেল মিখাইলভিচের সঙ্গে আমার বহুকালের বন্ধুত্ব। তার কাছ থেকেও শুনেছি আপনার কথা।'

গলাটা একটু মোটা, কথা বলে অতি ধীরে ধীরে। কিন্তু চলা-ফেরা, নড়াচড়ায় যেমন ক্ষিপ্র তেমনি জবরদস্ত। বড়ো বড়ো ধূসর চোখদুটি এখনও হাসে স্বচ্ছভাবে, তরুণী মেয়ের মতো, কিন্তু রগে মিহি মিহি রেখা, আর কানের পাশের চুলের মধ্যে রুপোলী ছিটে ঝিকমিক করে। বলল:

'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। এক কাপ কফি খেলে হয়...'

'এই যে এক্ষুনি করে দিচ্ছি।' বলে মা। তারপর আলমারী খুলে কফির সাজসরঞ্জাম গুছোতে গুছোতে শুধয়:

'পাভেল আমার কথা বলেছে?'

'অনেক বলেছে...'

পকেট থেকে একটা চামড়ার সিগারেট-কেস্ বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে জিজ্ঞাসা করে মাকে:

'ছেলের জন্য খুব ভয় পেয়েছেন তো?'

কফিপাত্রের নীচে স্পিরিট-বার্নারের ছোট নীল শিখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খুশির হাসি হাসে মা। খুশিতে ভরে উঠেছে মনটা, এই স্ত্রীলোকটির সামনে এতক্ষণ যতটা আড়ষ্ট লাগছিল তা কেটে গেছে।

মনে মনে ভাবে মা: "ছেলে আমার, তার মায়ের কথা বলেছে বন্ধুকে!" ধীরে ধীরে বলে: 'সহজ তো নয়। আগে হলে খুবই ভাবনা হত, কিন্তু এখন জানি যে ও একা নয়...'

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে মা বলে: 'আপনার নামটা কী?'

'সোফিয়া।'

মা নিরীক্ষণ করে দেখে সোফিয়াকে। যেন দৃপ্ত বিদ্যুল্লতা।

'আসল ব্যাপার হল এই যে, জেলে ওরা যেন বেশি দিন না থাকে,' কফিতে চুমুক দিতে দিতে সোফিয়া বলে নিশ্চয়তার সুরে, 'এখন মামলা টামলাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করলেই বাঁচা যায়! ওদের নির্বাসনে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই পাভেল মিখাইলভিচের পালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে ওকে ভীষণ দরকার।'

কেমন যেন সন্দেহের চোখে মা সোফিয়ার দিকে চায়। পোড়া সিগারেটটা রাখবার জন্য কিছু একটা খুঁজছিল সোফিয়া। না পেয়ে একটা টবের মাটির মধ্যে ওটাকে গুঁজে দিল।

মা'র মুখ থেকে অনিচ্ছায় বেরিয়ে গেল: 'ওতে ফুল নষ্ট হয়।'

'মাপ করবেন,' সোফিয়া বলে, 'নিকলাইও আমাকে এই নিয়ে ধমকায়।' সিগারেটের টুক্‌রোটা তুলে নিয়ে জানালার বাইরে ফেলে দেয়।

মা বড় বিব্রত হয়ে পড়ে। অপরাধীর মতো বলে:

'ছিঃ, কী যে বলি ঠিক নেই। আপনার ওপরও হুকুম চালাচ্ছি।'

কাঁধের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোফিয়া বলে, 'নোংরামি করলে বলবেন বৈকি! একশ' বার বলবেন। কিন্তু কফি হল? ধন্যবাদ। ও কি এক পেয়ালা কেন? আপনি?'

হঠাৎ মাকে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে আনে। গভীর দৃষ্টিতে চোখে চোখে তাকিয়ে বলে:

'লজ্জা করছে আপনার?'

মা একটু হাসে। বলে:

'সিগারেটের ব্যাপার নিয়ে মুখ ফস্‌কে যা বলে ফেলেছি তার পরেও বলতে চান, লজ্জা করবে না?'

তারপর বিস্ময় গোপন করবার কোন চেষ্টা না করে আবার বলে জিজ্ঞাসু গলায়: 'মোটে তো কাল এসেছি, এরই মধ্যে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছি,

যেন আমারি বাড়ী। যা খুশি করছি, যা খুশি বলছি... কোন ভয় ডর নেই...'

'তাই তো হওয়া উচিত!' বলে ওঠে সোফিয়া।

মা বলে চলে: 'আমার মাথা খালি ঘোরে! আমি নিজেকেই যেন চিন্‌তে পারছি না। আগে কাউকে কিছু বলতে হলে, অনেক ভেবে, অনেকবার পিছিয়ে, বিষম খেয়ে তবে বলতে পারতাম। আজকাল কিন্তু মনটা যেন হাঁ করাই আছে। ফস্‌ করে এমনি সব কথা মুখে আসে, যা আগে হয় তো ভাবতেও পারতুম না...'

আর একটা সিগারেট ধরায় সোফিয়া। ওর ধূসর চোখের কোমল আলো মায়ের মুখের ওপর পড়ে।

'বলছেন, ওর পালাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে থাকবে কী করে?' প্রশ্নটা মা'র মনের মধ্যে ওলট-পালট খাচ্ছিল।

আর এক পেয়ালা কফি ঢালতে ঢালতে জবাব দেয় সোফিয়া:

'ও আর কী! কত আছে অমনি। সে কি আর এক আধ জন! তেমনি ভাবেই থাকবে... এই তো একজনকে নিয়ে একটা আস্তানায় দিয়ে এলাম। খুব কাজের লোক। পাঁচ বছর ঠুকেছিল। কিন্তু সাড়ে তিন মাস মাত্র থেকেছিল, তারপরেই উড়ল।'

একমনে তাকিয়ে থাকে মা সোফিয়ার দিকে। তারপর হেসে আস্তে আস্তে বলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে:

'মনে হচ্ছে, পয়লা মে দিনটিতেই আমার কোনো একটা ভাঙ্গন ধরেছে। নিজের কোন হদিশ পাচ্ছি না যেন। মনে হয় একই সঙ্গে দুটো আলাদা আলাদা রাস্তায় চলেছি। কখনও যেন সব কিছু বুঝতে পারছি আবার পরক্ষণেই যেন সব কুয়াসায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই আপনার কথাই ধরুন না কেন — ভদ্রঘরের মেয়ে, অথচ এই কাজ করছেন... পাভেলকে জানেন আপনি, তার প্রশংসা করছেন, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না।'

'সেতো আপনারই প্রাপ্য।' হাসতে হাসতে সোফিয়া বলে।

'আমি আবার কী করলাম। পাভেলকে তো আমি শেখাইনি।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা।

সোফিয়া নিজের প্লেটের মধ্যে পোড়া সিগারেটটা চেপে দেয়। তারপর

মাথাটাকে একটা ঝাঁকানি দিতেই এক রাশ সোনালী চুল এলিয়ে পড়ে পিঠের ওপর।

'এবার এসব জমকালো ধড়াচূড়ো ছাড়তে হবে।' বাইরে যেতে যেতে বলে।

৩

সন্ধ্যা বেলা ফিরে এল নিকলাই। খাবার টেবিলে বসে হাসতে হাসতে গল্প করে সোফিয়া — কয়েদখানা থেকে পলাতক কমরেডকে কী করে লুকিয়ে রেখেছে। সারাক্ষণই ও স্পাই-এর ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল। যাকে দেখে তাকেই মনে হয় স্পাই। আর কী কান্ডটাই করল পলাতক কমরেড্‌টি। মা টের পায় সোফিয়ার কথার সুরে খানিকটা গুমরের ভাব আছে, যেমন কোন মজুর শক্ত কাজ ভালোভাবে শেষ করতে পারলে তার কথায় থাকে।

এবেলা সোফিয়া পরেছে চওড়া ধূসর রং'এর হাল্কা কাপড়। তাইতে যেন আরো লম্বা দেখাচ্ছে, চোখ দুটি হয়েছে গাঢ়তর আর চাল-চলনে এসেছে স্থৈর্য।

খাবার পর নিকলাই বলল বোনকে: 'তোমার জন্য আর একটা কাজ রয়েছে, সোফিয়া। জানো তো, কৃষকদের জন্য একটা সংবাদপত্র বার করব ঠিক করেছি আমরা। কিন্তু এই সব ধরপাকড় হয়ে যাওয়ায় ওখানকার লোকদের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছি। এ-ব্যাপারে আমাদের একমাত্র গতি এখন পেলাগেয়া নিলভনা। উনি সেই লোককে খুঁজে পেতে পারেন যে কাগজ বিলি করবার ভার নেবে। তাই ওঁকে নিয়ে তোমায় একটু গাঁয়ের দিকে যেতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি করো।'

সিগারেট ধরিয়ে জবাব দেয় সোফিয়া: 'যাবো বৈকি। কি বলেন পেলাগেয়া নিলভনা!'

'নিশ্চয়ই...'

'অনেক দূর?'

'তা প্রায় আশি ভার্স্ট হবে...'

'বেশ... একটু বাজানো যাক এখন। আপনার খারাপ লাগবে না তো, পেলাগেয়া নিলভনা?'

'আমার জন্য ভাববেন না। ধরে নিন আমি নেই এখানে।' বলে সোফার

এক কোণে গিয়ে বসল মা। ভাই আর বোন এমন ভাব করে যেন মাকে তারা খেয়ালের মধ্যেই আনছে না, কিন্তু অলক্ষ্যে নিজেদের কথাবার্তার মধ্যে ওকে তারা টেনে আনতে লাগল।

'শোন, নিকলাই। একটা গ্রিগ নিয়ে এলুম এবার... জানলাটা বন্ধ করে দাও দিকি।'

স্বরলিপি খুলে বাঁ হাতে সজোরে টুংটাং করে বাজাতে সুরু করে। তারে তারে সুরের জাদু জাগে। নীচু পর্দায় দীর্ঘশ্বাসের মতো চাপা সুর ঢেউ দিয়ে ওঠে। উদারার পটে ওর ডান হাতের আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে যেন কতগুলি ঝল্‌মলে সোনালী সুরের ঝাঁক ডানা ঝটপটিয়ে কলকলিয়ে উড়ে গেল, আঁধার আকাশে ভয়-পাওয়া পাখীর ঝাঁকের মতো।

মায়ের অনভ্যস্ত কানে সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য ধরা পড়ে না — মনে হয় অর্থহীন কলরব। প্রথমটায় চুপচাপ বসে থাকে মা — সোফার একধারে পা গুটিয়ে বসে নিকলাই, কখনও বা অর্ধমেলা চোখে তাকে দেখে, কখনও বা তাকিয়ে থাকে সোফিয়ার সোনালী-চুলের তাজ-পরা মুখটির কঠিন পার্শ্বদৃশ্যের দিকে। সূর্যের কিরণ পরম অন্তরঙ্গতায় সোফিয়ার মাথা আর কাঁধের ওপর আলো ঢেলে, তারপর পিয়ানোর বুকে ঝরে পড়ে ওর আঙুলগুলোর নীচে থর থর করে ওঠে। সুরের লহর উদ্বেল হয়ে ঘরখানাকে ভরে তোলে। কখন যে তার দোলায় মায়ের বুকও দুলে ওঠে সে জানতেও পারে না।

কেন জানি একটা ব্যথা গুমরে ওঠে — কোন অতীতের আঁধার ঠেলে, বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া অপমানটা নূতন করে কাঁচা হয়ে ওঠে...

স্বামী সেদিন অনেক রাত্তিরে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরল। শুয়ে ছিল ও। হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে ফেলে দিল বিছানা থেকে। তারপর কোঁকে একটা লাথি মেরে বলল: 'বেরিয়ে যা হারামজাদী এখান থেকে। দু-চক্ষের বিষ তুই।'

মার এড়াবার জন্য দু'বছরের ছেলেটাকে তুলে ধরল ও সামনে ঢালের মতো করে। ভয় পেয়ে বাচ্চাটা কেঁদে উঠে ছট্‌ফট্ করতে লাগল ওর হাতের মধ্যে। নগ্ন ও উষ্ণ তার দেহ।

মিখাইল গর্জে উঠল: 'বের হ! বেরিয়ে যা!'

মা ছুটে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে; একটা গরম জামা কাঁধে ফেলে আর কোন মতে সাল দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে, সেই রাতের কাপড়েই খালি

পায়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়; না এক ফোঁটা চোখের জল, না এক টুকরো নালিশ। মে মাসের রাত্তির। হিমেল হাওয়া। হিমে-ভেজা রাস্তার ধুলো পায়ের তলায় আর আঙুলের ফাঁকে চাপ হয়ে সেঁটে গেল। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে ছটফট করতে লাগল কোলের মধ্যে। বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে ভয়ের তাড়নায় রাস্তা বেয়ে ছুটে চলল মা। যেতে যেতে অস্ফুট স্বরে বাচ্চাকে ভোলাতে চেষ্টা করতে লাগল:

'আ-আ-আ!.. আ-আ-আ!..'

ভোর হয়ে এল। লজ্জায় ভয়ে ও মরে যেতে লাগল, পাছে ওই বে-আব্রু অবস্থায় কেউ দেখে ফেলে ওকে। জলাটার ধারে গিয়ে অ্যাসপেন্-গাছগুলোয় গা-ঢাকা দিয়ে ভুঁইয়ের ওপর বসে রইল ও আঁধারের পানে তাকিয়ে বিস্ফারিত চোখে। বসে বসে নিজের জখমী বুক আর কাঁচা-ঘুম-ভাঙা ছেলেটাকে শান্ত করার জন্য গুনগুন করতে লাগল...

'আ-আ-আ... আ-আ আ... আ-আ-আ...'

কতক্ষণ যে অমনি ভাবে বসে রইল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কী একটা কালো পাখী নিঃশব্দে উড়ে গেল কাছ দিয়ে। সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়াল মা। ঠক্‌ঠকিয়ে সারা দেহ শীতে কাঁপছে। বাড়ীর দিকেই পা দুটো চলতে লাগল — সেই নিত্যিকার মার-পিট্ আর অপমানের দিকে...

শেষ কর্ডটা বাজছে। হিম, নির্লিপ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেল সঙ্গীতের রেশ...

সোফিয়া ভাইয়ের দিকে তাকায়। অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করে:

'কেমন লাগল?'

ঘুম ভেঙে যেন জেগে উঠল নিকলাই। বলল:

'চমৎকার! অপূর্ব...'

স্মৃতির রেশ মায়ের বুকে গানের মতো কেঁপে কেঁপে বেজে চলেছে। আর একদিকে ভাবছে:

"দিব্যি তো আপন-জনের মতো মিলে মিশে এক সঙ্গে আছে মানুষ, — মদ গেলে না, গালিগালাজ করে না; অহোরাত্র একটুকরো রুটির জন্য আমাদের আলোহীন জীবনের মানুষগুলোর মতো কামড়া-কামড়ি করে না..."

আর একটা সিগারেট ধরায় সোফিয়া। বড় বেশি ধূমপান করে সোফিয়া — প্রায় থামেই না।

‘বড় ভালোবাসত এটা আমার কস্তিয়া।’ সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আবার বাজনায় হাত দেয়। একটা অনুচ্চ ব্যথার সুর বেজে ওঠে। বলে: ‘কী ভালোই বাসতাম ওকে বাজিয়ে শোনাতে। অদ্ভুত নরম মন ছিল ওর। সব কিছু নাড়া দিত ওর মনকে... ভরাট বুকটা ঠেলে উপ্‌চে উঠত সব সময়ে...’

“ও নিশ্চয়ই ওর স্বামীর কথা ভাবছে,” আপন মনে ভাবে মা, “অথচ কেমন হাসি ফুটেছে মুখে...”

‘ও যখন ছিল, কত সুখই না আমাকে এনে দিয়েছে! কী চমৎকারভাবে বাঁচতে জানত...’ সোফিয়া বলে চলে আর কথার সঙ্গে সঙ্গে আনমনে টুংটাং সুর তোলে।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে নিকলাই বলে, ‘সত্যি। খাঁটি সমঝদার লোক ছিল...’

সদ্য-জ্বালান সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে মায়ের দিকে ফিরে বলে সোফিয়া:

‘যা হট্টগোল শুরু করেছি, আপনি নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছেন?’

মনের বিরক্তি মা গোপন করতে পারে না, বলে:

‘বাজনা টাজনা আমি বুঝিই না। চুপচাপ বসে শুনছি আর নিজের ভাবনা ভাবছি...’

সোফিয়া বলে, ‘দরকার নেই বলবেন না। আমি চাই যে আপনি বুঝুন। সঙ্গীত না বুঝে মেয়েমানুষের উপায় নেই। বিশেষ করে দুঃখের দিনে...’

পিয়ানোর একেবারে মর্মস্থলে এসে আঘাত পড়ে — আচমকা চাবিগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে। যেন হঠাৎ দুঃসংবাদ পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল কেউ। মর্মভেদী কান্নার স্বর। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়-পাওয়া কতক গুলি কচি কচি গলাও কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে উঠল। পরক্ষণেই, বিপুল ক্রোধে যেন গর্জন করে উঠল যন্ত্রটা। ওই শব্দ-তাণ্ডবের তলায় আর সব তলিয়ে গেল। নিশ্চয়ই মস্ত এক দুর্ভাগ্যের কোন একটা কিছু ঘটেছে, কিন্তু সেজন্য দুঃখ হয়নি, জেগে উঠেছে ক্রোধ। এর পরেই শোনা গেল কোন বলিষ্ঠ কণ্ঠের সরল সহজ সুধাবর্ষী সঙ্গীত। সে মনকে গলিয়ে ভুলিয়ে কোথায় জানি টেনে নিয়ে যায়।

মায়ের বড় ইচ্ছে হয় এদের দুটো ভালো কথা বলে। সঙ্গীতের সুরে নেশা লাগছে। মুখে আত্ম-প্রত্যয়ের হাসি ফুটে ওঠে, সে পারবে দরকারী কিছু একটা করতে এই ভাই বোনের জন্য।

চারদিকে চায়। কী করা যায় এখন? চুপচাপ রান্নাঘরে এসে সামোভারটা জ্বালিয়ে দেয়।

এ আর কতটুকু। মন ভরে না। এদের সেবায় বড় কিছু করার জন্য মন উন্মুখ। চা ঢালতে ঢালতে বিব্রত হাসি হেসে কতকটা যেন নিজের মনটাকে উষ্ণ স্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে বলে:

'জীবনের অন্ধকার দিকটার মানুষ আমরা, বোঝাতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি সবই। তাই লজ্জায় মরে যাই। রেগে উঠি নিজেদের চিন্তার ওপর। এক লহমা কি তিষ্ঠুতে দেয়? ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সংসারের মার খাওয়া... ইচ্ছে হয় দু'দণ্ড একটু শান্তিতে থাকি। কিন্তু তার কি আর জো আছে এই মনটার জ্বালায়!'

শুনতে শুনতে বারবার চশমা মোছে নিকলাই। ডাগর ডাগর চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে সোফিয়া। সিগারেটটা নিবে আসে, খেতে ভুলে যায়। ভাইয়ের দিকে অর্ধেক ফিরে পিয়ানোর সামনে সে বসে আছে তখনও; ডান হাতের সরু আঙুলগুলি আলতোভাবে মাঝে মাঝে পিয়ানোর চাবিগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। মায়ের হৃদয়-নিংড়োনো সরল কথাগুলোর সহজ সুরের সঙ্গে মিশে যায় তার হালকা টুংটাং।

'এখন একটু একটু বলতে পারি। নিজের কথাও পারি, অন্যের কথাও। এখন বুঝতে শিখেছি কিনা! তুলনাও করতে পারি। আগে পারতাম না। তুলনা করবার ছিলই বা কী। আমাদের সবই তো সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। কিন্তু এখন দেখছি দুনিয়ায় আর দশজন কেমন ভাবে থাকে। কিসের মধ্যে যে ছিলাম সেই কথাই মনে পড়ে যায়। ভাবতে মন ভারি হয়ে ওঠে!'

স্বর নামিয়ে বলে যায়:

'কে জানে ঠিক বোঝাতে পারছি কিনা। হয়তো বা এমন বলার কোন মানেই নেই। আপনারা তো জানেন...'

গলার স্বরটা যেন কান্নায় থম্‌থম্‌ করে। কিন্তু চোখ ওদের দিকে চাইতে গিয়ে হাসিতে ভরে ওঠে। বলে:

'কিন্তু আপনাদের যে আমার বুকের ভেতরটা খুলে না দেখালেই নয়। আমি যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে চাইছি আপনাদের মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক! কী করে বোঝাব সে কথা!'

কোমল স্বরে নিকলাই বলে: 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি!'

কিছুতেই যেন আজ মন ভরছে না মায়ের। আবার বলতে থাকে। কথাটার একটা নতুন, বিরাট গুরুত্ব আছে তার কাছে। নিজের জীবনের কথা বলে যায় মা... মসীলিপ্ত তিক্ত ইতিহাস... অসীম ধৈর্যে বুক বেঁধে দুঃখ কষ্ট সয়েছে; দিনের পর দিন, অনবরত স্বামীর মার খেয়েছে। তবু আজ এসব কথা বলতে গিয়ে মনে কোন রাগ দুঃখ নেই মায়ের। শুধু ঠোঁটের কোণে একটা অনুতাপের করুণ হাসি। অবাক হয়ে ভেবেছে, কত তুচ্ছ কারণ সেই মারগুলির; কোনমতে যে নিজেকে বাঁচাতেও পারেনি তাতেও বিস্ময় লাগছে এখন।

স্তব্ধ হয়ে শোনে নিকলাই আর সোফিয়া। অভিভূত হয়ে যায়। সামান্য মেয়ে; পশুর বাড়া দাম সে কোন দিন কারো কাছে পায়নি; নম্র শিরে প্রাপ্য বলে সংসারের এই ব্যবহার বহুদিন গ্রহণ করেছে। কিইবা তার জীবনের ইতিহাস। কিন্তু এই সামান্যের মধ্যে এ কী গভীর অর্থ! মনে হল হাজার হাজার মানুষের ভাষা মুখর হয়ে উঠেছে ওর কণ্ঠে। নিতান্ত সাধারণ মামুলী জীবন, কিন্তু এমন সাধারণ মামুলী জীবন তো অসংখ্য লোকদের, তাই ওর ইতিহাস যেন একটা প্রতীক বিশেষ। টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে, হাতের তেলোয় মাথাটা রেখে নিশ্চল হয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে নিকলাই। চেয়ারের পিঠে দেহ এলিয়ে বসে আছে সোফিয়া। থেকে থেকে দেহটা তার কেঁপে উঠছে, মাথাটা নেতিবাচকভাবে নড়ছে। মুখখানা যেন আরো রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। সিগারেট খাবার কথা মনে নেই।

চোখ নীচু করে শান্ত স্বরে বলে সোফিয়া:

'ওঃ, সেই সেবারে যখন অন্তরীণ ছিলাম একটা ছোট্ট শহরে, মনে হত আমার মতো দুর্ভাগা আর বুঝি কেউ নেই। না ছিল কোন কাজকর্ম, না ছিল নিজের কথা ছাড়া আর ভাববার মতো কিছু। তাই নিজের কথাই ষোল কাহন করতুম। বাবাকে ভীষণ ভালোবাসতুম, অথচ তাঁর সঙ্গেই হল ঝগড়া। অপমান করে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে। তারপর গেলুম জেলে, এক ঘনিষ্ঠ কমরেড বিশ্বাসঘাতকতা করল। স্বামীও ধরা পড়ল।

আবার জেল আর নির্বাসন। তারপর স্বামী মারা গেল। মনে হল আমার মতো অমন দুঃখী বুঝি দুনিয়ায় নেই। কিন্তু এখন তো দেখছি, আপনি একটা মাসে যা সয়েছেন, আমি সারা জীবনে তো তার দশ ভাগের এক ভাগও সইনি... বছরের পর বছর, তিলে তিলে জ্বলা, সে কি সহজ কথা? এত সইবার শক্তি মানুষ পায় কোথায় বলুন তো!'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে মা: 'অভ্যেস হয়ে যায়।'

চিন্তিত মুখে নিকলাই বলে: 'ভাবতাম জীবনকে জানি। কিন্তু পুঁথি পড়ে নয়, আমার খণ্ডিত অভিজ্ঞতার সমষ্টি থেকে নয়, চোখের সামনে জলজ্যান্ত এমনি একখানি জীবন যখন দেখা যায়... তখন বাসরে!.. ছোট ছোট খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আরো ভয়ানক... দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, ওরা জমা হয়েই চলে...'

কথার পিঠে কথা জড়ো হয়; এই অন্ধকার জীবনের পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় মা, অতীতের আবছায়া থেকে টেনে তোলে যৌবনের রুদ্ধশ্বাস দিনগুলি, প্রতিদিনকার নানা লাঞ্ছনা আর অপমান। অবশেষে এক সময় চমক ভাঙে তার। বলে:

'দেখছেন! আমিও যেমন! বক্ বক্ করেই চলেছি। এখন যে শোবার সময়। এসব কথার কি আর শেষ আছে!'

নিঃশব্দে বিদায় নিল ওরা। নমস্কার করতে গিয়ে নিকলাই-এর মাথাটা রোজকার চাইতে আজ যেন আরো একটু বেশি নুইয়ে পড়ে; করমর্দন করতে গিয়ে হাতের স্পর্শ আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। সোফিয়া সঙ্গে সঙ্গে দোর পর্যন্ত এগিয়ে আসে। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেয়। আবেগে ভরে ওঠে তার গলা, ধূসর চোখ দুটো মেলে মায়ের মুখখানার দিকে গভীর দরদে তাকিয়ে থাকে। মা নিজের দু'হাতের মধ্যে সোফিয়ার হাতখানি চেপে ধরে বলে:

'ধন্যবাদ!..'

৪

কয়েক দিন পরের কথা। সোফিয়া আর মা নিকলাই-এর সামনে এসে দাঁড়ায়; শহুরে বস্তির মেয়েদের মতো সাদামাটা সাজ। পরনে জীর্ণ সুতীর পোষাক, কাঁধে থলি আর হাতে লাঠি। এই বেশে সোফিয়াকে

অনেকটা খাটো দেখাচ্ছে, পান্ডুর মুখখানা দেখাচ্ছে আরো গম্ভীর।

বোনের হাতে গভীর ভাবে চাপ দিয়ে বিদায় জানাল নিকলাই। মা আবার দেখল, ভাইবোনের সম্পর্কটা কী অনাড়ম্বর, সহজ। উচ্ছ্বাস নেই, চুমু খাওয়া নেই — তবু হৃদয়ে হৃদয়ে কত অনভিব্যক্ত গভীরতা আর পরস্পরের প্রতি যত্নবোধ। আগে মা যেখানে থাকত সেখানে আদর ছিল, উচ্ছ্বাস ছিল, গদগদ মধু-ঢালা কথা ছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ততখানিই ছিল ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো হিংসা-দ্বেষ।

নীরবে পাশাপাশি পথ চলে সোফিয়া আর মা। শহরের বাইরে এসে পড়ে। মাঠের মধ্য দিয়ে চওড়া এবড়ো-খেবড়ো পথ। দু'ধারে বুড়ো বার্চগাছের সারি।

চলতে চলতে মা শুধয়:

'পারবেন হাঁটতে অতটা?'

'কী ভাবছেন? কত রাস্তা ভাঙলুম সারা জীবন... ও আমার খুব অভ্যেস আছে!' সোফিয়া জবাব দেয়।

সোফিয়া খুশিতে তরল হয়ে ওঠে। বিপ্লবী জীবনের কাহিনী বলে হাল্কা সুর লাগিয়ে, যেন ছোট বেলাকার দুষ্টুমির কথা বলছে। বারেবারে কত নতুন নামই না নিতে হয়েছে। শুধু কি তাই! পরিচয়-পত্র অবধি জাল করতে হয়েছে। রকম বেরকমের বহুরূপী সেজে টিকটিকিদের চোখে ধুলো দিয়ে রাশি রাশি নিষিদ্ধ বই সব এ শহর থেকে ও শহরে পাচার করেছে; নির্বাসিত কমরেডদের পালাবার পথ করে দিয়েছে, সঙ্গে করে অন্য মুলুকে নিয়ে পেঁছে দিয়েছে। সেবারে নিজের বাসায় বসাল এক গুপ্ত ছাপাখানা। পুলিশ তো গন্ধ পেয়েই তল্লাশী করতে হানা দিল। ওদের আসার এক মুহূর্ত আগে খবর পেয়ে বাড়ীর ঝির সাজ করল। তারপর অতিথিদের চোখের সামনে টিন হাতে বেরিয়ে পড়ল সে। শীতের দিন। কনকনে ঠান্ডা। পাতলা একটা জামা গায়ে, মাথায় সুতী-রুমাল বাঁধা। সেই অবস্থায় সে এক শহর পাড়ি দিল। আর একবার ভিন শহরে গেছে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, দেখে দরজায় পুলিশ। খানাতল্লাশী হচ্ছে। ফেরার উপায় নেই। কী করে? গট গট্ করে গিয়ে নীচের তলার আর এক

ফ্ল্যাটের ঘণ্টা বাজাল। সব অচেনা মুখ। স্যুটকেস হাতে ঢুকে খুলে বলল ইতিবৃত্ত। প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল:

'এখন আমি আপনাদের হাতে। ধরিয়ে দিতে চান দিন। কিন্তু জানি অমন কাজ আপনারা করবেন না!'

সে কী ভয় ওদের। সারা রাত্তির দু'চোখের পাতা এক করল না কেউ। শুধু ঐ এলো, আর ঐ এলো। ঐ বুঝি দরজায় পুলিশের ঘা পড়ল। কিন্তু ধরিয়ে দেয়নি তারা। পরদিন ওর এই ব্যাপার নিয়ে সে কী হাসির ধুম! আর একবার যে টিকটিকি পেছু নিয়েছিল, সন্ন্যাসিনী সেজে এক গাড়ীতে তারই পাশে বসে সফর করল ও। নিজের বুদ্ধি নিয়ে কী গুমর লোকটার। ভারি নাকি চালাকী করে, বুদ্ধি খাটিয়ে মেয়েটাকে ধাওয়া করেছে। চাঁদ এই গাড়ীতেই যাচ্ছেন, তাতে আর ভুল্‌ভ্রান্তি নেই। সেকেণ্ড ক্লাসে। প্রত্যেক স্টেশনে নেমে নেমে খোঁজে। তারপর ফিরে এসে সন্ন্যাসিনীকে বলে:

'না, দেখতে পেলুম না। নিশ্চয় ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়েছে। ওদের কি আর এক দণ্ড স্বস্তি আছে? আমাদেরই মতো হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করতে হয়।'

মা হাসে; গল্প শুনতে শুনতে ওর দিকে তাকিয়ে চোখ দুটি স্নেহ-সিক্ত হয়ে ওঠে। সুঠাম পা দু'খানির হাল্কা ছন্দে দীঘল তনু দেহখানি কী সুন্দর চলেছে। ওর চলনে বলনে, ওর সতেজ কণ্ঠ-স্বরে, -- স্বরটা যদিও একটু মোটা, ওর ঋজু দেহটির অঙ্গ ছেয়ে কি যেন এক আত্মিক শুচিতা আর সানন্দ দুঃসাহসিকতা। অদ্ভুত তারুণ্য ওর দৃষ্টিতে। যে দিকেই তাকায় দু'হাতে তারুণ্যের খুশি লুটে নেয়।

'দেখুন তো! কী সুন্দর পাইন গাছটা!' কোন্ একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সোফিয়া। মা থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখে — কোথায় সুন্দর গাছ! অন্যগুলোর চেয়ে লম্বাও নয় ঝাঁকড়াও নয়।

'হাঁ, ভালো গাছটা!' মুচকি হেসে বলে মা আর তাকিয়ে দেখে মেয়েটির রগের ওপর পাকা চুল বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

'লার্ক! লার্ক!' ধূসর চোখ দুটিতে কোমলতা উছলে ওঠে। স্বচ্ছ আকাশে অশরীরী সেই সঙ্গীত শোনার জন্য ওর দেহ যেন মাটি ছেড়ে ওঠে। কখনও বা চলতে চলতে দেহলতা হেলিয়ে বুনো ফুল একটা কুড়িয়ে নেয়। পাপড়িগুলি ওর হাতের মধ্যে থিরথিরিয়ে কাঁপে। ও গুন্

গুন্ করে সুন্দর ভাবে গান গায় আর সরু সরু চঞ্চল আঙুলগুলি আদর করে বুলিয়ে দেয় তাদের উপর।

এই সবের জন্য মায়ের মনটাও বাঁধা পড়ে যায় এই ধূসর চোখ মেয়েটির সঙ্গে। পাশে চলতে চলতে একান্ত কাছে সরে আসে মা, চেষ্টা করে এক কদমে চলে। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন রুক্ষ হয়ে ওঠে ওর কথাগুলো। বড় বাজে মায়ের মনে। ভাবনা হয়, মিখাইলো ওকে পছন্দ করবে না...

কিন্তু পরক্ষণেই আবার যে সৌফিয়া সেই সোফিয়া। সেই সহজ অন্তরঙ্গ কথা। মা হেসে ওর মুখের দিকে চায়। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। বলে:

'কত তরুণ যে আপনি!'

'সে কী! বত্রিশ বছর বয়স হলো জানেন?' চেঁচিয়ে ওঠে সোফিয়া।

মা হেসে বলে, 'বয়সের কথা বলছি না। চেহারার দিক থেকে আর একটু বেশি বললেও আপত্তি করতাম না। কিন্তু যতই আপনার কথা শুনি, আপনার চোখের দিকে চাই, ততই অবাক হয়ে যাই আমি। ঠিক যেন কুমারী! জীবনে আপনার কত না বিপদ, কত না দুঃখ সইতে হয়, অথচ প্রাণখানাকে হাসি দিয়ে মুড়ে রেখেছেন।'

'দুঃখ কষ্ট! টেরই পাই না ওসব। বরং এর চেয়ে ভালো জীবনের কথা ভাবতে পারি না... দুর্ ছাই! এবারে কিন্তু নাম ধরে ডাকব। পেলাগেয়া নামটা আপনাকে ঠিক মানায় না। আপনাকে ডাকব নিলভনা বলে।'

কী যেন ভাবতে ভাবতে জবাব দেয় মা, 'বেশ তো, যা ভালো লাগে, তাই বলবেন। আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আপনাকে, আপনার কথা শুনি আর ভাবি। আপনি মানুষের মন কেড়ে নেবার জাদু জানেন। বড় ভালো লাগে আমার দেখে। আপনার কাছে মন আপনিই খুলে যায়! লজ্জা ভয় থাকে না! কী মনে হয় আমার জানেন? জয় আপনাদের হবেই। অকল্যাণের বিরুদ্ধে লড়ছেন আপনারা; চরম জয় আপনাদেরই হবে।'

'হবেই তো! আমরা যে মেহনতী জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি।' বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চস্বরে বলে ওঠে সোফিয়া। 'কী শক্তি লুকিয়ে আছে ওদের মধ্যে! ওরা সব পারে। ওদের সঙ্গে হাত মিললেই অসাধ্য সাধন করা যায়। শুধু মনটার বিকাশের সম্ভাবনা পায় না ওরা, সেটা জাগিয়ে দিতে হবে...'

সোফিয়ার কথা শুনে মায়ের মনে এক বিচিত্র অনুভূতি জাগে। সোফিয়ার জন্য বড় দুঃখ হয় মায়ের, তবে সেই দুঃখের মধ্যে জ্বালা নেই, তিক্ততা নেই। মায়ের ইচ্ছে হয়, সোফিয়া অন্য কথা বলুক, আরো সহজ কথা।

'এত মেহনত যে করছেন তার কী পুরস্কার পাবেন, বলুন তো!' বিষণ্ণ মৃদু স্বরে শুধল মা।

'পুরস্কার। সে তো পেয়ে গেছি!' জবাব দেয় সোফিয়া; মায়ের মনে হয়, সোফিয়ার কথায় যেন একটা গর্ব ফুটে উঠেছে, 'জীবনের একটা পথ খুঁজে পেয়েছি, সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে আমরা বাঁচতে শিখেছি, জীবনকে উপভোগ করতে শিখেছি। এর বড়ো আর কী পুরস্কার আছে?'

ওর দিকে একপলক তাকিয়েই মা'র মাথাটা নুয়ে আসে। আবার ভাবনা হয়, মিখাইলোর ভালো লাগবে না ওকে...

খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে ওরা। চলার মধ্যে ত্বরা আনলেও তাড়া নেই। মিঠে হাওয়ায় বুক ভরে উঠছে। মায়ের মনে হয় যেন তীর্থ করতে চলেছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। দূর গাঁয়ে ছিল এক আশ্রম। ছুটি-ছাটার দিনে সেখানকার গির্জায় যেত উপাসনা করতে। সেখানে ছিল একটি আইকন, আশ্চর্য সব কাহিনী প্রচলিত ছিল সেই আইকনটি সম্পর্কে। কী আনন্দ যে হত যাবার সময়। সেদিনের সেই আনন্দ আজ আবার যেন ফিরে এসেছে।

কখনও নতুন নতুন গান গায় সোফিয়া নীচু গলায় মিঠে সুরে; খোলা আকাশের গান বা প্রেমের গান। নয়তো বা কবিতা আবৃত্তি করে; মাঠ-প্রান্তর-বন-অরণ্যের কবিতা, ভল্‌গা নদীর কবিতা। তন্ময় হয়ে যায় মা, হাসে, ছন্দের সুরে ডুবে গিয়ে তালে তালে অজান্তে শুধু মাথাটি দোলে। সমস্ত অন্তরলোক ছেয়ে কী উষ্ণতা, কী প্রশান্তি! কী গভীরতার সুর! যেন এক পুরোনো ছোট বাগানে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা।

৫

তৃতীয় দিনে ওরা পেঁছোল এসে গন্তব্যস্থানে। মাঠে কাজ করছিল একজন কৃষক। আলকাতরার কারখানার রাস্তাটা মা তাকে ডেকে শুধিয়ে নিল। খাড়া নেমে গেছে একটা বুনো পথ। গাছের মোটা মোটা শেকড়গুলো সিঁড়ির মতো হয়ে আছে। পথের শেষে একটি গোলাকার

খোলা জায়গা — কয়লার গঁড়ো, কাঠের টুকরো ছড়ান আর আলকাতরা ঢালা।

অস্বস্তি-ভরা দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে মা বলে:

'এই যে এসে গেছি আমরা!'

একধারে ডালপালা দিয়ে তৈরি একটা চালাঘর। মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার ওপরে খানকয় তক্তা ফেলে তৈরী হয়েছে টেবিল। খেতে বসেছে রীবিন, ইয়েফিম আর দুটি ছোকরা। রীবিন-এর সারা গা কালো। জামাটার বুক আগাগোড়া খোলা। রীবিনই প্রথম দেখতে পেল ওদের। চোখে হাতের আড়াল করে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

দূর থেকেই বলে উঠল মা: 'শুভদিন, মিখাইলো ভাই!'

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রীবিন। কাছে এসে চিনতে পেরে একটু হেসে থমকে দাঁড়ায়। কালো হাতটা দিয়ে দাড়িতে বুলিয়ে দেয়।

কাছে এসে মা বলে:

'এই তীর্থে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম পথেই তো পড়বে, তোমার সঙ্গে দেখাটা করে যাই। এই আমার বন্ধু আন্না...'

চট করে এমন বুদ্ধিমানের মতো কথা বলতে পেরেছে বলে মা'র বুকখানা ফুলে ওঠে, আড়চোখে তাকায় সোফিয়ার থমথমে মুখের দিকে।

রীবিন শুকনো হাসি হেসে মায়ের সঙ্গে করমর্দন করে আর সোফিয়ার দিকে নমস্কার করে বলে:

'মিথ্যে কথা। এটা শহর নয়। সব আমাদেরই লোক গো, মিথ্যে কথার দরকার নেই...'

ইয়েফিম টেবিলে বসে। তীর্থযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে গুন গুন করে কী জানি বলল বন্ধুদের। তার পর ওরা কাছে আসতেই নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। ছোকরা দুজন যেমন ছিল তেমনিই বসে রইল, যেন দেখতেই পায়নি অতিথিদের।

রীবিন বলে মায়ের কাঁধে আলতো একটু চাপড় মেরে:

'দিব্যি সন্নেসী হয়ে আছি আমরা। কালেভদ্রেও কেউ আসে না এখানে। মালিকও নেই, তার বউ হাসপাতালে। আমিই একরকম হর্তাকর্তা এখন। বসো বসো। ক্ষিদে-টিদে নিশ্চয়ই পেয়েছে? যা'তো রে ইয়েফিম, দুধ নিয়ে আয়!'

ইয়েফিম আস্তে আস্তে চলে যায় চালার দিকে। অতিথিরা পিঠ থেকে ঝোলা-ঝুলি নামায়। ছোকরাদের মধ্যে একজন উঠে সাহায্য করে ওদের। রোগা লম্বা চেহারা। আর একজন তার চওড়া কাঁধ লোমশ বপুটি নিয়ে বসেই থাকে কনুই দুটি টেবিলে ঠেকিয়ে। চিন্তিত ভাবে ওদের নিরীক্ষণ করে মাথা চুলকোয় আর গুন্‌গুনিয়ে কী একটা সুর ভাঁজে।

আলকাতরার কড়া ঝাঁঝ আর পচা পাতার গন্ধে মিলে বাতাস যেন গুলিয়ে উঠেছে। মাথা ঘোরে।

লম্বা ছেলেটিকে দেখিয়ে রীবিন বলে, 'ওর নাম হচ্ছে ইয়াকভ। আর ঐ যে বসে আছে ওর নাম ইগনাত। তারপর, তোমার ছেলের খবর কী?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দেয় মা, 'সে তো জেলে।'

'আবার!' চীৎকার করে ওঠে রীবিন, 'জেলটা দেখছি ওর ভারি মিঠে লেগে গেছে...'

ইগনাতের গান থেমে যায়। মায়ের হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে ইয়াকভ বলে, 'বোসো...'

'সে কি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন বসুন। রীবিন বলে সোফিয়াকে। সোফিয়া নীরবে একটা গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে নিবিষ্ট চিত্তে রীবিনকে নিরীক্ষণ করে।

রীবিন মায়ের মুখোমুখি বসে। শুধয়:

'কবে ধরা পড়ল? কী যে কপাল নিয়ে এসেছিলে, নিলভনা!'

'তাতে আর কী হয়েছে।' জবাব দেয় মা।

'গা-সওয়া হয়ে গেছে, কী বল!'

'তা নয়। কিন্তু দেখছি, তা ছাড়া তো উপায় নেই।'

'হুঁ। বলো দেখি এবারে! শুনি...'

এক মগ দুধ নিয়ে আসে ইয়েফিম। টেবিলের ওপর থেকে একটা পেয়ালা নিয়ে, একটু ধুয়ে দুধ ঢেলে এগিয়ে দেয় সোফিয়াকে। কান থাকে মায়ের দিকে। অতি সন্তর্পণে কাজ করে যেন এতটুকু শব্দ না হয়। মা কাহিনী শেষ করে। কারো মুখে কথা নেই। কেউ কারো দিকে তাকায় না। ইগনাত তেমনি ভাবে বসে বসে আঙুলের ডগা দিয়ে টেবিলের উপর হিজিবিজি এঁকে চলে। রীবিনের কাঁধে হাত রেখে তার পেছনে দাঁড়িয়ে ইয়েফিম। ইয়াকভ একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হাত দ্বটো আড় করে ব্বকের ওপর রাখা; মাথাটা নীচু। সোফিয়া বসে বসে ভুর্ নামিয়ে সকলের ম্বখ নিরীক্ষণ করে...

ক্ষ্বব্ধ স্বরে বিষণ্ণ ভাবে রীবিন বলে টেনে টেনে:

'হ্বঁ... হ্বঁ... একেবারে খোলাখ্বলি!..'

তিক্ত হাসি হেসে ইয়েফিম বলে, 'আমরা যদি এত খোলাখ্বলি এ রকম একটা ব্যাপার করি তাহলে ম্বজিকরা তো আমাদের মেরে শেষই করে ফেলবে।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ইগনাত বলে, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি ভাবছি বরং কারখানায় কাজ নিয়ে চলে যাব। অনেক ভালো জায়গা সেটা...'

রীবিন জিজ্ঞাসা করে: 'তাহলে বিচার হবে পাভেলের? কী সাজা হবে শ্বনেছ?'

শান্তভাবে জবাব দেয় মা, 'হয় ঘানি টানা, নয় সাইবেরিয়া — চিরজীবনের মতো নির্বাসন।'

তিনজনের চোখ একসঙ্গে মায়ের ম্বখের ওপর পড়ে। রীবিন মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে:

'পাভেল কি জানত এ-কাজের পরিণাম কী?'

'জানত বৈকি!' জোরের সঙ্গে বলে সোফিয়া।

সবাই স্তব্ধ... নিথর... সমস্ত চিন্তা যেন জমাট বেঁধে গেছে একই ভাবনায়।

তারপর আবার বলে চলে রীবিন; চোখে ম্বখে গাম্ভীর্যে ভরা এক কঠোর মর্যাদার অভিব্যক্তি।

'আমিও তো তাই মনে করি, জেনে শ্বনেই সে গেছে। অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার ছেলে নয়। ছ্যাবলামি করে না সে। ও মান্বষই আলাদা। শ্বনছিস্ রে, ছোঁড়ারা? জেনে শ্বনেই গেছে যে হয় বেয়নেটের খোঁচা দেবে, নয় দেবে ঠেলে সাইবেরিয়ায়। তব্ব এগিয়ে গেল। ওর মা পথ আগলে শ্বয়ে পড়লেও তাকে ডিঙিয়ে চলে যেত ও! তাই না গো, নিলভনা?'

'তা যেত।' চমকে উঠে মা বলে। ব্বক ভেঙে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। চারদিকে চায়। সোফিয়া ওর হাতের ওপর আস্তে আস্তে হাত ব্বলোয় আর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভুর্ কুঁচকে চায় রীবিনের দিকে।

কালো চোখ দ্বটি দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলে রীবিন, 'মান্বষের মতো মান্বষ একটা।' আবার সবাই চুপ করে থাকে। সূর্যকিরণের সর্ব সর্ব ফালিগ্বলো সিল্কের ফিতের মতো বায়্বমন্ডলে দোলে। কোথায়

যেন একটা কাক ডেকে উঠল। পয়লা মের স্মৃতি গাকে বিচলিত করে তোলে। পাভেল আন্দ্রেইয়ের জন্য মন আকুল হয়ে ওঠে। ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটুকুতে খালি আল্‌কাতরার টিন আর গাছের উপড়োনো গুঁড়ি পড়ে আছে চারদিকে। ওক্‌ আর বার্চগাছের ঘন বেষ্টনী, ডালগুলো নিশ্চল — ঘন উষ্ণ ছায়া পড়েছে মাটির ওপরে।

হঠাৎ ইয়াকভ লাফিয়ে এক ধারে সরে যায়। মাথাটাকে ঝাঁকানি দিয়ে শুকনো গলায় উচ্চস্বরে বলে:

'এমন সব মানুষের বিরুদ্ধে ঠেলে দেবে নাকি আমাদের?'

'তবে? কোথায় আছ হে সোনার চাঁদ! আমাদের শিল আমাদের নোড়া দিয়েই আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙে ওরা। ওই হল ওদের কায়দা।' বেজার মুখে বলে রীবিন।

'কী হল তাতে! তবুও সৈন্যদলে যাবই।' জেদের সুরে বিষণ্ণ ভাবে বলে ইয়েফিম।

ইগনাত চটে ওঠে, 'কে তোকে আটকাচ্ছে। যা না তুই।'

তারপর ইয়েফিমের চোখে চোখ রেখে হেসে বলে, 'কিন্তু দেখিস, গুলিটুলি যদি করিস আমায় কখনও, হাত পা খোঁড়া করে ছেড়ে দিসনে। মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিস।'

ইয়েফিম তীক্ষ্ন ভাবে জবাব দেয়, 'মেলাই বকবক শুনেছি। আর নয়।'

তাদের দেখে শান্ত ভাবে হাত তুলে রীবিন বলে, 'থামরে বাপু তোরা।' তারপর মায়ের দিকে দেখিয়ে বলে, 'দেখছিস ওঁকে! এঁর ছেলে বোধ হয় সাবাড়...'

মায়ের বুক মোচড় দিয়ে ওঠে। মৃদু স্বরে বলে, 'ওসব কেন বলছ!'

গম্ভীর ভাবে জবাব দেয় রীবিন, 'বলতে হয় বৈকি। যাতে অমনি অমনি তোমার চুলে অমন পাক না ধরে। দেখরে ছোঁড়ারা, দেখ... ছেলেকে মারলেও মাকে মারতে পারেনি। হাঁগা, এনেছ কাগজপত্র?'

মা তাকায় রীবিনের দিকে। একটু থেমে বলে, 'এনেছি...'

টেবিলে একটা কিল মেরে বলে ওঠে রীবিন, 'দেখি! তোমায় দেখেই বুঝেছি। নইলে এখানে কী করতে আর আসা। দেখলি তো তোরা? ছেলেকে নিয়ে গেছে, মা এসে তার ঠাঁই নিয়েছে, কেমন!'

বদ্ধ মুষ্টি আস্ফালন করে রাগে। অশ্লীল গাল দেয়।

ওর চীৎকারে ভয় পেয়ে যায় মা। ওর মুখের দিকে গভীর ভাবে চায়।

চেহারাটা খুব বদলে গেছে। অনেকটা রোগা হয়ে গেছে। উস্কখুস্ক দাড়ি; তার নীচে অনুভব করা যায় চোয়ালের হাড়গুলো। চোখের নীলাভ সাদা মণির ওপর ভেসে আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল শিরা — যেন কত কাল ঘুমোয়নি। নাকটা শিকারী বাজের ঠোঁটের মতো। জামার কলারটা এককালে বোধহয় লাল ছিল। এখন আলকাতরা লেগে লেগে সে রং ঢেকে গেছে। বোতাম খোলা জামাটার, গলার শুষ্ক হাড়গুলো বেরিয়ে আছে হাঁ করে। বুকে একরাশ মোটা মোটা কালো লোমের জঙ্গল। সমস্ত চেহারাটায় একটা অদ্ভুত বিষণ্ন গাম্ভীর্য। দেখলে কেমন যেন লাগে। লাল ভাঁটার মতো চোখ দুটো রাগে ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে। কালো মুখখানাও তার আঁচে জ্বলছে। সোফিয়া চুপচাপ্‌, ফ্যাকাশে মুখে বসে বসে মানুষগুলোকে দেখছে একদৃষ্টে। ইগনাত মাথা ঝাঁকায় চোখ কুঁচকে। ইয়াকভ চালাঘরটার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিগুলো থেকে রাগের মাথায় খুঁটে খুঁটে ছাল তুলতে থাকে। ইয়েফিম মায়ের পেছন দিকে টেবিলটার ধারে ধারে পায়চারি করে। রীবিন আবার বলতে আরম্ভ করে:

‘এই তো সেদিন জেলার কর্তা আমায় ডেকে বললে — পাজী! নচ্ছার! কী বলেছিস তুই পাদ্রী সাহেবকে? আমি বললাম — গালমন্দ করেন কেন; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গতর খাটিয়ে খাই। কারো পাকা ধানে মইও দিতে যাই না। ওরে বাবা! তারপর — কী?.. চেঁচিয়ে উঠে কর্তা মারল এক রদ্দা আমার মুখে। তারপর তিন দিন আমায় আটকে রেখে দিলে জেলে। শালারা আমাদের মতো ছোটলোকের সঙ্গে এমনি ব্যাভার করে! শালা বুড়ো শয়তান! রোস না, তোকে দেখাব। ছাড়ব ভেবেছিস! আমি না পারি আর কেউ এর শোধ তুলবে। তোকে না পারলে তোর ছেলেপিলেদের সিধে করবে! শালারা! শালাদের হাত নয়তো লোহার থাবা। আর তাই দিয়ে আমাদের বুকগুলোকে চষে চষে তার মধ্যে ঘেন্নার বীজ বুনে দিয়েছে। শয়তান! ওদের ওপর মায়াদয়া! এক বিন্দুও না...’

ভেতরে রাগ যেন টগবগ করে ফুটছে। লাল টক্‌টক করছে। গলার স্বরে মা ভয় পেয়ে যায়।

রীবিন বলে চলে, একটু শান্ত আগের থেকে, ‘আসলে কী ব্যাপার হয়েছিল জান? একদিন দেখি সাধারণ সভার পর পাদ্রী সাহেব কৃষকদের সঙ্গে বসে বলছে, আমরা চাষাভুষোরা যেন সব ভেড়ার পাল, ওনাদের রাখাল না হলে আমাদের চলে না। পিত্তি জ্বলে গেল। হেসে একটু

ঠাট্টা করে বললাম — শেয়ালকে পশু পাখিদের সর্দার করে দাও — পাখপাখালি আর উড়বে না, উড়বে শুধু তাদের পালকগুলো। আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে এক লম্বা বক্তৃতা শুনিয়ে দিলে — মানুষকে তো ধৈর্য ধরতেই হবে। ভগবানের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা কর, তিনি যেন ধৈর্যশক্তি যোগান। আমি বললাম — তা গরীবেরা ধন্না দিতে কি আর কসুর করে। কিন্তু গরীবের কথা শোনবার সময় কই দেবতার! পাদ্রী সাহেব আমাকে শুধোলে — তা কি প্রার্থনা কর শুনি! আমি বললাম — করি; আমরা মুখ্যু গরীবরা আর কী বলব, ঠাকুর। বলি: "দেবতা! পাথর খেয়ে ক্ষিদেটাকে চাপান দিয়ে যেন ভদ্দরলোকদের জন্য খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলতে পারি, ঠাকুর।" শেষ করতে দিলে না ব্যাটা আমায়।' হঠাৎ সোফিয়ার দিকে ফিরে রীবিন জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি ভদ্দরলোক?'

হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠে তাড়াতাড়ি সোফিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

তিক্ত হাসি হেসে বলে রীবিন, 'কেন? আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। সুতীর রুমাল মাথায় বেঁধেছেন — ভাবছেন ওই দিয়ে ভদ্দরলোকের পাপ ঢাকা পড়বে। আমরা মানুষকে যে কোনো সাজেই চিনতে পারি। টেবিলের ওপর কি একটু পড়ে গিয়েছিল, তাতে আপনার কনুইটা গিয়ে লাগতেই অমন মুখ ভ্যাঙচালেন কেন শুনি? তাছাড়া মেহনতী মানুষের পিঠের শিরদাঁড়া অমন সোজা নয়!'

তার ঠাট্টা আর কথায় পাছে সোফিয়ার মনে লাগে সেই জন্য মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে:

'আমার বন্ধু মানুষ গো, আমার বন্ধু। অমন মানুষ হয় না। আমাদের লড়াইয়ে খেটে খেটে মানুষটার চুল পেকে গেল। অমন করে বোলো না তুমি...'

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে রীবিনের।

'কেন? কি বলেছি? কড়া কথা বলেছি নাকি কিছু?'

তাকে দেখে শুকনো ভাবে সোফিয়া বলে, 'আমাকে কিছু বলতে চাইছিলেন বোধ হয়?'

'আমি? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো সেদিন ইয়াকভের খুড়তুত ভাই এসেছে। যক্ষ্মা হয়েছে ছেলেটার। ডাকব তাকে?'

'তা, ডাকুন!' সোফিয়া বলে।

রীবিন চোখ কুঁচকে সোফিয়াকে একবার দেখে নিল। তারপর ইয়েফিমের দিকে ফিরে গলা নাবিয়ে বলল:

'যা তো, বলে আয় ওকে, সন্ধ্যা বেলায় যেন আসে।'

ইয়েফিম কোন দিকে চাইল না, কারো সঙ্গে একটি কথা কইল না। টুপীটা মাথায় চড়িয়ে সটান বনের পথে উধাও হয়ে গেল। রীবিন সেই দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চাপা গলায় বলল:

'ভারি মুশকিলে পড়েছে ছোঁড়া। ওর আর ইয়াকভের ডাক পড়েছে... সেপাই হতে হবে। তা ইয়াকভ সোজা বলে দিয়েছে — নেহি যায়েঙ্গে। ইয়েফিমেরও ইচ্ছে নেই, কিন্তু যাবে... ও ভাবছে, সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে আন্দোলন চালাবে। কিন্তু বাপু হে, মাথা ঠুকে ঠুকে কি আর পাথরের দেয়াল ভাঙা যায়... বেয়নেট হাতে ওরা মার্চ করবে। ভারি ফ্যাসাদে পড়েছে ছোঁড়া। আর এই হতভাগা ইগনাত ওই কথা নিয়ে দিন রাত্তির ওর পেছনে লেগে আছে। কেনরে বাপু?'

গোমড়া মুখে, রীবিনের দিকে না তাকিয়ে ইগনাত বলে, 'দরকারটা কী শুনি! দেখনা দু'দিনে কেমন গরুমারা ওস্তাদ হয় ও। দু'হাতে মানুষ মারবে...'

চিন্তিত ভাবে বলে রীবিন, 'ওসব আমি বিশ্বাস করি না। অবশ্যি না গেলেই ভালো করত। লুকিয়ে থাকলে এত বড় দেশটায় কে বা কার খোঁজ রাখে। কোনমতে একটা জাল পাসপোর্ট জোগাড় করা। তারপর এ গাঁয় সে গাঁয় ঘুরে বেড়াও...'

লাঠিটা পায়ে ঠুকতে ঠুকতে ইগনাত বলে, 'আমি তো তাই করব। ভিড়েছি যখন একবার, থামা টামা বুঝিনে। কদম কদম বাড়ায়ে যা...'

কথাবার্তা থেমে যায়। বোলতা আর মৌমাছিরা দলে দলে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়ায়। তাদের গুঞ্জনে আকাশ ভরে ওঠে। নিস্তব্ধতা তাতে আরো বেশি করে মনের ওপরে চেপে বসে। পাখিরা কলকলিয়ে ওঠে। মাঠের ওপার থেকে ভেসে আসে কী এক গানের সুর। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রীবিন বলে:

'বেলা হল... তোমরাও একটু গা গতর এলিয়ে নাও। চালার মধ্যে কাঠ পাতা আছে। যা তো রে ইয়াকভ, শুকনো পাতা কিছু নিয়ে আয় কুড়িয়ে... বই কী এনেছ, দাও তো মা...'

মা আর সোফিয়া তাদের ঝোলাঝুলি খুলতে বসে। বইগুলির ওপর ঝুঁকে পড়ে রীবিন। খুশিতে বলে:

'করেছ কী! এযে পাহাড় নিয়ে এসেছ! অনেক দিন থেকেই তাহলে এসব কম্ম হচ্ছে, অ্যাঁ! কী নাম আপনার?' শুধয় সোফিয়াকে।

জবাব দেয় সোফিয়া, 'নাম আন্না ইভানোভনা। তা বছর বারো ধরে করছি... কেন বলুন তো?'

'নাঃ, অমনি। শ্রীঘর দর্শন হয়েছে তাহলে!'

'হুঁ।'

মা একটু তিরস্কারের সুরে বলে, 'দেখছ তো? তুমি তো ওকে কড়া কড়া কথা বলছিলে...'

চুপ করে থেকে একটা বইয়ের বান্ডিল তুলে নেয় রীবিন। তারপর দাঁত বের করে হেসে বলে:

'রাগ টাগ করবেন না। বড়লোক, ছোটলোক, তেলে আর জলে — বুঝলেন কি না! মিশ খায় না।'

সোফিয়া মৃদু হেসে আপত্তি তোলে, 'আমি বড়লোক টড়লোক নই। আমি স্রেফ মানুষ।'

'তা হবে।' রীবিন বলে। 'শুনেছি কুকুররা নাকি আগে নেকড়ে ছিল। যাই, এগুলোকে চাপাচুপি দিয়ে রেখে আসি।'

ইগনাত আর ইয়াকভ হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।

'দাও না দেখি একটু,' ইগনাত বলে।

'সবই কি এক রকম নাকি?' সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করে রীবিন।

'না কয়েক রকম আছে, খবরের কাগজও আছে...'

'সত্যি?'

ইয়াকভ, ইগনাত আর রীবিন চালার দিকে তাড়াতাড়ি গেল।

মা চিন্তিত ভাবে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর চুপি চুপি বলে, 'মানুষটা আগুন হয়ে রয়েছে।'

সোফিয়া মৃদু স্বরে বলে, 'সত্যি আগুন। অমন একখানা মুখ কখনও দেখিনি আমি। যেন শহীদ। চলুন আমরাও যাই ভেতরে। ওদের দেখব আমি...'

'লোকটার কথাবার্তা অমনি, মাজাঘষা নেই। দুঃখিত হবেন না আপনি।' মা কোমল ভাবে বলে।

সোফিয়া মুচকে হাসে।

'সত্যি কী ভালো মানুষ আপনি, নিলভনা...'

দরজার কাছে এসে দেখে, হাঁটুর ওপর খোলা কাগজের ওপর ঝুঁকে আছে ইগনাত; চকিতে একবার শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে কোঁকড়া চুলে আঙ্গুল গুঁজে আবার মাথা নুইয়ে দিল সে। চালের ফাঁকে যে রোদের ফালিটুকু এসেছে, তাতে একটা কাগজ তুলে ধরে বিড়বিড় করে পড়ছে রীবিন। আর ইয়াকভ-ও খাটের ওপর বুক চেপে পড়ছে।

মা এক কোণে গিয়ে চুপচাপ বসে পড়ে। তার কাঁধ জড়িয়ে সোফিয়া নিরীক্ষণ করে মানুষগুলোকে।

চোখ না তুলেই আস্তে আস্তে ইয়াকভ বলে, 'আমাদের, চাষাভুষোদের, এরা গাল দিয়েছে, দেখেছ?' রীবিন ফিরে ওর দিকে চেয়ে হেসে বলে:

'ভালোবেসে দিচ্ছে যে।'

গভীর একটা নিশ্বাস টেনে মাথা তোলে ইগনাত। চোখ বুজে বলে:

'কী লিখেছে, দেখ — "কিষানেরা আর মানুষ নেই"।' সরল মুখখানা আঁধার হয়ে ওঠে, যেন আঘাত পেয়েছে। বলে:

'এসো না, আমার গায়ের চামড়াটায় সেঁধোও না দেখি একবার! দেখি কোথায় থাকে ভদ্দরলোকী পালিশ!'

মা বলে সোফিয়াকে, 'বড্ড ক্লান্ত লাগছে। উঃ, কী কড়া গন্ধ। মাথা ঘুরছে। একটু শোব আমি। আপনি?'

'নাঃ, আমি ঠিক আছি।'

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে মা, ঝিমোয়। সোফিয়া বসে থাকে পাশে। তাকিয়ে থাকে বইয়ে-ডোবা মানুষগুলোর দিকে; আর মাঝে মাঝে হাত নেড়ে মায়ের মুখের কাছ থেকে মৌমাছি আর বোলতা তাড়ায়। আধ-বোজা চোখ দিয়ে দেখে মা; বড় ভালো লাগে এই যত্নটুকু।

রীবিন কাছে এসে মোটা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে:

'ঘুমিয়েছে?'

'হাঁ।'

মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে রীবিন। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে কোমল স্বরে:

'এই রাস্তায় এসে ছেলের কাজ মা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, এই বোধ হয় প্রথম।'

সোফিয়া বলে, 'চুপ, ঘুম ভেঙে যাবে। চলুন, বাইরে যাই।'

'হাঁ, কাজে যেতে হবে যে! আপনার সঙ্গে কথাও আছে। নাঃ, এখন না, সেই সন্ধে বেলা, তখন হবে। চলরে তোরা...'

চলে গেল তিনজনে। সোফিয়া রয়ে গেল চালার কাছে।

আরামের নিশ্বাস ফেলে মা: "বাঁচলাম, ওদের ভাব হয়ে গেছে..."

বুনো গাছপালা আর আলকাতরার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঘুমিয়ে পড়ে শান্তভাবে।

৬

দিনের শেষে কাজ সেরে ঘরে ফেরে ওরা ছুটির আনন্দে।

ওদের কোলাহলে ঘুম ভেঙে যায় মায়ের। হাই তুলতে তুলতে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে সে। সস্নেহ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকিয়ে বলে:

'এই দেখ দিকিন। তোমরা গেলে খাটতে, আর আমি আমিরী চালে শুয়ে শুয়ে ঘুমুলাম!'

'যাক্ মাপ করা গেল।' সে উপচে পড়া তেজ আর নেই রীবিনের। ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ছে উত্তেজনা। তাই এখন শান্ত অনেকটা।

ইগনাতের দিকে ফিরে বলে, 'ওরে চা-টা দিবি আজ? এখানে সব পালা করে কাজ করি আমরা। আজ খাওয়ার ব্যবস্থা করার পালা ইগনাতের।'

আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠকুটো কুড়োতে কুড়োতে কান খাড়া করে ইগনাত বলে:

'আজকে কারো সঙ্গে পালা বদলালে হয়।'

সোফিয়ার পাশে জায়গা করে নিতে নিতে বলে ইয়েফিম:

'উঃ, আজকে অতিথিদের দেখে সবাইয়ের খুব কৌতূহল হয়েছে।'

ইয়াকভ বলে, 'আমি তোকে সাহায্য করব, ইগনাত।' তারপর চালাঘরটার মধ্যে গিয়ে একটা রুটি এনে কেটে কেটে রাখে টেবিলের ওপর।

ইয়েফিম বলে, 'শোন, ওই যে কে কাশছে...'

কান খাড়া করে শোনে রীবিন। মাথা নেড়ে বলে:

'হাঁ, আসছে...'

তারপর সোফিয়াকে বোঝায়:

'এখন এক সাক্ষী আসছেন। বুঝলেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকত, লোকটাকে শহরে শহরে ঘোরাতাম, ওর কথা শোনাতাম সব্বাইকে। একই কথা বলে ও, কিন্তু তা শোনা দরকার সব্বায়ের...'

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। চারদিক নিঝুম হয়ে ওঠে। ওদের গলার স্বর একটু কোমল হয়ে এল। মা আর সোফিয়া পুরুষদের দেখল, ওরা সবাই হাঁটছে ধীরে সুস্থে, ভারি চালে, কেমন একটা অদ্ভুত সাবধানতা নিয়ে। ওরাও দৃষ্টি রেখেছে অতিথিদের ওপর।

বনের মধ্য থেকে লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে একটি মানুষ। দীর্ঘ দেহ নুইয়ে পড়েছে। কর্কশ হাঁপানীর শব্দ উঠছে সাঁই সাঁই করে।

'এসেছি হে!' বলতে বলতেই বেদম কাশি ওঠে।

পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলা একটা জীর্ণ কোট গায়ে; দুমড়োন গোল টুপীটার নীচ দিয়ে পিঙ্গল সোজাসোজা চুলগুলো ন্যালন্যাল করে ঝুলছে। হাড়-বের-করা, হলদে মুখখানায় সোনালী দাড়ির গোছা। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করা। কালো কোটরের মধ্যে বসে-যাওয়া চোখ দুটো জ্বলছে যেন জ্বরের তাড়সে।

রীবিন পরিচয় করিয়ে দেবার পর সোফিয়াকে বলে লোকটা:

'শুনলাম বইপত্তর এনেছেন!'

'তা এনেছি কিছু।'

'ধন্যবাদ... এখানকার সব মানুষের হয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। ওরা এখনও বোঝে না সত্যি... আমি তো বুঝেছি... তাই ওদের হয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

আরো জোরে হাঁপাতে থাকে। মুঠো মুঠো বাতাস ছিনিয়ে নিয়ে যেন গিলতে চায় লোভীর মতো। দুর্বল অস্থিসার আঙুলগুলো বুকের ওপর নাড়াতে নাড়াতে জামার বোতাম লাগাতে চেষ্টা করে।

সোফিয়া বলে, 'এত রাত্তিরে এই জঙ্গলের মধ্যে থাকা তো আপনার পক্ষে ভালো নয়। গাছ-পাতারা যে বাতাস ভারি আর স্যাঁৎসেঁতে করে!'

অতি কষ্টে এক ঢোঁক নিশ্বাস নিয়ে জবাব দেয় সে:

'আমার আর ভালো কীইবা আছে! মরতে পারলেই বাঁচি...'

সে কী গলার স্বর! আর ওই মূর্তি... করুণা হয়, কিন্তু ব্যর্থ করুণা। ব্যর্থতায় নিষ্ফলতায় সেই করুণা তীব্র তিক্ততায় পরিণত হয়ে

ওঠে শুধু। পা দু'খানি ভাঁজ করে অতি সন্তর্পণে একটা পিপের ওপর চড়ে বসে সে, ভয় বুঝি পা দুটো ভেঙে যাবে। ধীরে ধীরে কপালের ঘাম মোছে। মাথার চুল শুকনো, মড়ার মতো চুল।

আগুন জ্বালায় ইয়েফিম। দপ্ করে জ্বলে ওঠে একবার। চারদিকে সব কিছু যেন চম্‌কে থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে। ভীত, ঝলসে-যাওয়া ছায়ারা বনের দিকে ছুটে পালায়। ইগনাতের ফোলা ফোলা গাল-ওয়ালা গোল মুখটা আগুনের ওপর উঁকি মারে। আগুনটা নিবে যায়। ধোঁয়ার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে বাতাসে। আবার স্তব্ধতা আর অন্ধকার জমাট বেঁধে ওঠে। হাঁপানী রোগীর হাঁপ-ধরা কথাগুলি শোনার জন্য যেন কান পেতে সর্বাঙ্গ মেলে আছে।

'এখনও দশের সেবায় লাগতে পারি অপরাধের সাক্ষী হিসেবে... আমায় দেখে নিন... সবে আঠাশ বছর বয়েস আমার। আর মরতে বসেছি! মাত্র দশ বছর আগে — হেসে খেলে পাঁচমণি বোঝা এই কাঁধে বয়েছি। ভেবেছিলাম লোহার শরীর আমার। সত্তরটা বছর তো অনায়াসে বাঁচবই। কিন্তু কোথায় গেল সেই সত্তর বছর! দশ বছরের মধ্যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছি। মালিকেরা চল্লিশটা বছর চুরি করে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার জীবন থেকে... চল্লিশটা বছর...'

রীবিন চাপা স্বরে বলে, 'এই যে ওর গাওনা।'

আবার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে, এবার একটু বেশি জোরে। ছায়ারা আবার ছুটে পালায় বনের দিকে, আবার নাচতে নাচতে ফিরে আসে নিঃশব্দে এক উন্মত্ত শত্রুতার নৃত্যে। ভিজে কাঠ ফটাস্ ফটাস্ করে ফাটে আর শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে। হঠাৎ উষ্ণ হাওয়ার ছোঁয়ায় মাতন লাগে পাতার দলে। লাল হলদে শিখার দল পরম উল্লাসে পরস্পরের অঙ্গে জড়িয়ে এলিয়ে খেলায় মাতে; চারদিকে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে উঠে যায় উর্ধ্বাকাশে। জ্বলন্ত পাতা উড়ে যায়; নৈশ আকাশে তারারা মৃদু হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকে পৃথিবীর বুকের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গদের।

'আমার গাওনা নয় হে, শুধু আমার একার গাওনা নয়। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের বুকের ফরিয়াদ। বোকাগুলো জানে না মানুষের পক্ষে তাদের দুর্ভাগা জীবন একটা ভাল শিক্ষাস্বরূপ। কত মানুষ কাজের চাকায় পিষে নুলো হয়ে, উপোস করে বোবার মতো মুখটি বুজে মরছে...' আবার কাশি আসে। কাশতে কাশতে দেহটা কুঁকড়ে যায়।

ইয়াকভ টেবিলে ক্‌ভাসের বালতি রেখে পেঁয়াজের কুচো ছড়িয়ে তাকে বলে, 'এসো সাভেলি, দুধ এনেছি...'

মাথা নাড়ে সাভেলি। ইয়াকভ এসে বগল ধরে তুলে ওকে টেবিলের কাছে নিয়ে যায়।

সোফিয়া রীবিনকে তিরস্কারের সুরে চুপি চুপি বলে, 'একে এখানে ডেকে এনেছেন কেন? যে কোন সময় ও তো টপ্‌ করে মরে যেতে পারে...'

'জানি,' স্বীকার করে রীবিন, 'কিন্তু যতক্ষণ পারে বলে নিক ওর কথা। জীবনটা তো ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ফুঁকে দিলে; এখন না হয় মানুষের জন্য সহ্য করুক একটু। ক্ষতি নেই তাতে।'

'আপনার যেন ফুর্তি লাগছে ওকে দেখে!' বলে উঠে সোফিয়া।

রীবিন ওর দিকে তাকিয়ে হাঁড়ি মুখে জবাব দেয়:

'ফুর্তি লাগে ভদ্দরলোকেদের। যীশুকে ক্রুশে লট্‌কে তার কাৎরানি শুনে ওদেরই ভালো লাগে। কিন্তু ওকে দেখেই আমাদের চোখ খুলবে। আপনাদেরও খুলুক একটু...'

মা ভীত হয়ে একটা ভুরু তোলে। বলে:

'হয়েছে গো, হয়েছে! থামো এবার!..'

টেবিলে বসে সাভেলি আবার বলতে থাকে:

'খাটিয়ে খাটিয়ে কেন ওরা মানুষকে এমন করে জবাই করে? কেন মানুষের জীবন লুঠ করে? নেফেদভ্‌ কারখানায় জীবনটা হারিয়েছি আমি। সেখানকার মালিকটির কীর্তি জানেন? নিজের এক পোষা বাইজীকে হাত মুখ ধোবার জন্য সোনার গামলা আর রাত্তির বেলা পেচ্ছাব করবার জন্য সোনার ডাবর গড়িয়ে দিলে। সেই ডাবরে আমার শক্তি, আমার জীবন। আমায় ঘানিগাছে পেষাই করে সেই রক্তে বেশ্যা মাগীর ফুর্তির ভেট এলো। আমারই রক্ত দিয়ে কি না ওদের সোনার ডাবর কেনা!..'

ইয়েফিম তীক্ষ্ণভাবে হেসে বলে, 'মানুষ নাকি ভগবানের ধাঁচে গড়া! অথচ দেখ সেই মানুষকে লাগায় কোন শয়তানিতে!'

টেবিলে কিল মেরে রীবিন চীৎকার করে, 'চুপ করে থেকো না!'

'সহ্য করে যেও না!' ইয়াকভ বলে আস্তে আস্তে।

তিক্ত হাসি হাসে ইগনাত।

মা লক্ষ্য করে, রীবিন যখন কথা বলে ইয়াকভরা নির্নিমেষে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে; ক্ষুধার্ত প্রাণীর তৃপ্তিহীনতা নিয়ে শোনে তার

কথা। সাভেলির কথা শুনে অদ্ভুত একটা তিক্ত হাসিতে ওদের মুখ বাঁকা হয়ে ওঠে। রোগী মানুষটার জন্য ওদের এতটুকু করুণা দেখা যায় না।

সোফিয়ার দিকে একটু ঝুঁকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করে মা:

'ও যা বলছে, সত্যি?'

'সত্যি, একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি,' সোফিয়া বলে গলা তুলে, 'এই উপহারটা নিয়ে কাগজে অবধি লিখেছে। মস্কোয় ঘটেছে...'

চাপা স্বরে রীবিন বলে, 'ডাকাত ব্যাটার কোনো শাস্তি হয়নি। মানুষের হাটের মধ্যে ওকে টেনে এনে টুকরো টুকরো করে কেটে তারপর ওর পচা মাংস কুত্তাকে খাওয়ালে তবে ওর উপযুক্ত হত। দিন আসবে হে, দিন আসবে। মানুষ যে-দিন উঠে দাঁড়াবে সে-দিন দেখবে শাস্তি কাকে বলে। বহু রক্ত ঢেলে এ পাপের পেরাচিত্তির করতে হবে বাছাধনদের। ওদের রক্তের মালিক তো জনগণ, তাদেরই রক্ত সেটা? আমাদের শিরা থেকেই ওরা সেটা শুষে নিয়েছে।'

রোগীটি বলে, 'ঠান্ডা পড়ে গেছে।'

ইয়াকভ ওকে ধরে আগুনের কাছে নিয়ে যায়।

গনগন করে আগুন জ্বলছে। তার চারদিকে মুখ-চোখহীন ছায়ার দল... অগ্নি-শিখাদের মাতামাতি দেখে অবাক হয়ে যেন কাঁপছে। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে সাভেলি হাড্ডিসার স্বচ্ছ হাতখানা বাড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছে। রীবিন ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সোফিয়াকে বলে:

'বই পড়ার চেয়ে এই মানুষটাকে দেখলে সবকিছু অনেক তীক্ষ্ণভাবে বুঝতে পারবে। কাজ করতে করতে কলে কাটা পড়ে মানুষ — "ব্যাটার নিজের দোষ" বলে খালাস পান কত্তারা। কিন্তু যখন রক্ত শুষে ছিবড়ে বানিয়ে জ্যান্ত মানুষটাকে ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তখন? তখন কার চোখে ধুলো দেবে? অ্যাঁ? সোজাসুজি খুন — সেটা বরং বুঝতে পারি। কিন্তু স্রেফ মজা দেখবার জন্য তিল তিল করে জবাই করা—উঃ! কেন অমন অত্যাচার করে ওরা মানুষের ওপর? কেন আমাদের অমন করে পিষে মারে? করে মজা দেখবার জন্য, নিজেদের ফুর্তির জন্য; আমাদের রক্তের কিম্মতে দুনিয়াটাকে ষোল আনা ভোগ করবার জন্য, — গাড়ী, বাড়ী, সোনার বাসন, রুপোর ছুরি, রেসের ঘোড়া, মেয়েমানুষ, বাচ্চাদের জন্য দামী দামী খেলনা মানুষের রক্ত দিয়ে কেনার জন্য। শালারা তোমরা খাটো, আরো কষে খাটো। খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মর। আমি

মুনাফা লুটি। আর লুটের কড়ি দিয়ে মেয়েমানুষকে মোতার জন্য সোনার ডাবর গড়িয়ে দি।'

মা নিরীক্ষণ করে দেখে, শোনে। যে পথে পাভেল গেছে, গেছে তার সাথীরা, রাতের আঁধারে সেই পথখানি আবার চোখের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

রাতের খাবার পর আগুনের চারদিকে এসে বসে সব। লক্ লক্ জিহ্বা দিয়ে ইন্ধনকে লেহন করছে বৈশ্বানর। সামনে আলো; পেছনে আঁধার-যবনিকা বনবনানী আকাশকে রেখেছে আড়াল করে। বিস্ফারিত দুই চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে সাভেলি, অনর্গল চলেছে কাশি। কাশির ঝোঁকে থরথর করে কাঁপছে ও—যেন ব্যাধি-ক্ষয়িত দেহখানা থেকে অবশিষ্ট প্রাণটুকু বেরিয়ে আসার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। আগুনের লাল আভা খেলা করছে ওর মুখে; তবু নিষ্প্রাণ ত্বকে জীবনের রং ধরছে না। শুধু চোখে ওর নির্বাণোন্মুখ আগুনের জ্বালা।

ইয়াকভ সাভেলির ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বলে:

'ভেতরে চল বরং এখন?'

কষ্টের সঙ্গে জবাব দেয় সাভেলি:

'কেন? না, যাবো না। মানুষের মধ্যে আর কদিনই বা থাকব!..'

চারদিকে তাকায়। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কেমন একটা অবসন্ন হাসি হেসে আবার বলে চলে:

'তোমাদের কাছে থাকতে আমার বড় ভালো লাগে। তোমাদের দেখে দেখে কী মনে হয় জানো? হয়ত তোমরা দুশমনদের অত্যাচারের শোধ নিতে পারবে! পরের লোভকে চরিতার্থ করবার জন্য যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, খুন হয়েছে — তাদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে পারবে তোমরা...'

ওর কথার জবাব দেয় না কেউ। ধীরে ধীরে ওর ঘুমন্ত মাথাটা ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপর। রীবিন ওর দিকে তাকিয়ে মৃদুভাবে বলে:

'এসে এসে বসে থাকে এখানে। আর ওই একই কথা... মানুষ কী করে মানুষকে বিদ্রূপ করেছে। তাতেই ওর সমস্ত প্রাণ যেন নিবদ্ধ। সংসারের আর কোন ছবি ও দেখেনি, যেন অন্ধ হয়ে গেছে।'

মা চিন্তিত ভাবে বলে, 'দেখার আর আছেই বা কী। লাখো মানুষ মুখে রক্ত উঠে মরছে রোজ। আর সেই মেহনতের কড়ি দিয়ে ছিনিমিনি খেলছে মালিকরা। আর নতুন কী আছে দেখার?'

'ওর কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। একবার শুনলে এমনিতেই তো কলজের মধ্যে পাকা হয়ে গেঁথে যায়। তার ওপর রোজ রোজ!..' ইগনাত বলে।

রীবিন বেজার মুখে বলে, 'কিন্তু কথাটায় আমাদের সমস্ত জীবনটা ধরা পড়ে... আমি তো দশবার ওর মুখে ওই এক কথা শুনেছি — কিন্তু তবু এক এক সময় দ্বিধা হয়। একটুও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে মানুষ এত খারাপ, এত পাগল... বড়লোক, গরীব, সব্বায়ের জন্য কষ্ট হয় তখন... বড়লোকরাও কি ধোঁকা কম খেয়েছে? অন্ধ সবাই — কেউ অন্ধ ক্ষিধের তাড়সে, আর কেউ সোনার জলুসে। এই যা তফাৎ। ইচ্ছে হয় বলে উঠি, এসো ভাইসব, একটা ঝাঁকানি দাও নিজেদের, নিজেদেরও দয়া মায়া না করে ভেবে দেখো সাচ্চা মন নিয়ে।'

একটু নড়ে চড়ে চোখ খোলে সাভেলি। মাটিতে শুয়ে পড়ে। ইয়াকভ নিঃশব্দে উঠে গিয়ে চালা থেকে একটা ভেড়ার চামড়া এনে ভাইয়ের গায়ে চাপা দিয়ে দেয়। তারপর আবার এসে বসে সোফিয়ার পাশে।

অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে মানুষগুলি। আগুনের চঞ্চল আলো নাচছে ওদের আঁধার মূর্তিগুলোর ওপর। ওদের কথাবার্তার সুর জ্বলন্ত আগুনের মন্থর শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে গম্ভীর ভাবে মিশে যায়।

সোফিয়া শোনায় দেশ-বিদেশের কাহিনী — বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে সংগ্রামের ইতিহাস। জার্মানীর বিদ্রোহী কিষান... নির্যাতিত আইরিশ... ফরাসী দেশের সংগ্রামী শ্রমিকদের একের পর এক লড়াইয়ের মহান কীর্তি... এমনি আরো কত কী। লোভী দানবের কুক্ষিগত দুনিয়ার ভিৎ বারে বারে কেঁপে উঠেছে... জাতির পর জাতি রক্তপ্লাবিত হয়ে রণক্লান্ত মিছিল করে চলে শ্রোতাদের মুগ্ধ চোখের সামনে দিয়ে। মুক্তি-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হয়েছে কত সত্যান্বেষী বীর... অমর মানুষের অমর কাহিনী বলে যায় সোফিয়া আঁধার ঝরানো রাতের মখমলের মতো কোমল কালোয় ঢাকা এই অরণ্য-প্রাঙ্গণে বসে। চারদিক গাছে ঘেরা; সামনে অগ্নিকুণ্ড, পেছনে বিস্মিত শত্রুর মতো ছায়াগুলো।

ধীরে ধীরে বলে যায় সোফিয়া। ওর মন্থর চাপা কণ্ঠ যেন অতীত থেকে ভেসে আসে। আশায় বিশ্বাসে মানুষগুলোর বুক ভরে ওঠে... নিঃশব্দে বসে শোনে ওরা ওদের ভাইদের কাহিনী। মেয়েটির ক্ষীণ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে আজ যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে

দুনিয়ার মানুষদের এই পবিত্র উদ্দেশ্য — মুক্তির জন্য অনন্ত সংগ্রাম। আজ নিজেদের বুকের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের প্রতিধ্বনি খুঁজে পায় ওরা সুদূর অতীতের বুকে... এক অন্ধকার রক্তাক্ত যবনিকা আড়াল করে রেখেছে সেই কালকে। যাদের কথা শোনেনি কোনও দিন সেই সাত সমুদ্র তের নদী পারের অচিন দেশের অচিন মানুষের বুকেও যেন ওই একই ভাষা। প্রাণে প্রাণে মনে মনে বিশাল দুনিয়ার সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে রাখিবন্ধন হয়ে যায়। দুনিয়াতে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে বলে তারাও শপথ নিয়েছিল বহু আগে। তাদের এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয়ে উঠেছিল অসংখ্য যন্ত্রণায়। নতুন, উজ্জ্বল, আনন্দময় জীবনের জন্য তারা অঝোরে ঝরিয়েছিল বুকের লোহু। সমস্ত মানুষদের সঙ্গে এক নিবিড় আত্মিক বন্ধনের বোধ জেগে ওঠে রীবিনদের মনে। সবকিছু বোঝার, সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্দাম, উদ্বেলিত এক নতুন প্রাণ জন্ম নেয় মাটির বুকে।

বিশ্বাস-দৃঢ় স্বরে বলে সোফিয়া, 'একদিন আসবেই, যেদিন সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এক হয়ে মাথা তুলে দৃঢ়ভাবে বলবে, "ব্যস্ আর নয় — আর নয় এ জীবন!" সে-দিন কেটে যাবে সেই সব লোভীদের তৈরি শক্তির মায়া জাল — যারা শুধু লোভের বলে দুনিয়াকে দাবিয়ে রেখেছিল পায়ের তলায়। ওদের পায়ের তলা থেকে হটে যাবে সেই দুনিয়া — আঁকড়ে ধরার মতোও কিছু থাকবে না আর...'

'তা হবেই,' মাথা নীচু করে রীবিন বলে, 'যদি নিজের প্রতি কোনো দয়া মায়া না কর, তাহলে সব কিছু পাবে!'

মা ভুরু তুলে শোনে — মুখে খুশির বিস্ময়। এ যেন সেই সোফিয়া নয় — সেই তীব্র, চঞ্চল, উচ্ছল সব কিছু যেন গল্প বলার এই ব্যগ্র সুষম সুরের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে গেছে। রাত্রির শান্তিটুকু, অগ্নিশিখার এই নাচন, আর সোফিয়ার মুখখানা — সবই বড় ভালো লাগে মায়ের, কিন্তু সব থেকে ভালো লাগে সাধারণ এই মানুষগুলোর সংযত গভীর আগ্রহ। পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ, স্থির হয়ে বসে আছে ওরা — এতটুকুও নড়ছে না — যে শান্ত ধারায় কাহিনীটি ক্রমশ উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে পাছে তাতে ক্ষণিকের জন্যও ছেদ পড়ে; যে উজ্জ্বল সূক্ষ্ম তন্তুতে বিশ্বের সঙ্গে ওদের রাখিবন্ধন হচ্ছে পাছে তা ছিঁড়ে যায়। শুধু মাঝে মাঝে অতি সন্তর্পণে কেউ একখানা কাঠ ফেলে দেয় আগুনে; ধোঁয়া বা

ফুলকি উঠলে হাত দিয়ে হাওয়া করে সোফিয়া আর মায়ের দিক থেকে সরিয়ে দেয়।

একবার ইয়াকভ উঠে চুপি চুপি বলে:

'একটুখানি থামুন...' বলেই ছুটে চালার মধ্যে চলে গেল। একটা গায়ের ঢাকা নিয়ে এসে ইগনাত আর ও দুজনে মিলে অতিথিদের গায়ে পায়ে জড়িয়ে দিল।

যে-দিন জয় হবে, সে-দিনের ছবি আবার আঁকে, শ্রোতাদের আত্ম-বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করে, লোভীর খেয়াল মেটাবার জন্য নিষ্ফল শ্রমে তিলে-তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে দুনিয়া-জোড়া যে মেহনতী মানুষ, তাদের সঙ্গে একাত্ম-বোধ জাগিয়ে দিয়ে বলে যায় সোফিয়া ওর কাহিনী। সে কথায় মা উত্তেজিত হয় না, কিন্তু একটা বড় অনুভূতি তার মন আচ্ছন্ন করে; শ্রমের শেকলে-বাঁধা মানুষের জীবনে সত্যের আগ্রহ, সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধি দান করবে বলে সর্বস্ব পণ করেছে যারা, শুনতে শুনতে তাদের ওপর শ্রদ্ধায় মা'র মন ভরে ওঠে।

চোখ বন্ধ করে মনে মনে প্রার্থনা করে:

"ভগবান ওদের সহায় হোন।"

ফর্সা হয়ে আসে। সোফিয়া থামে ক্লান্ত হয়ে। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে চারধারের চিন্তা-গভীর প্রসন্ন মুখগুলির দিকে চেয়ে দেখে।

মা বলে, 'যাবার সময় হল।'

'তাই তো।' ক্লান্ত সোফিয়া বলে।

একজন জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

রীবিন বলে, 'দুঃখ হচ্ছে চলে যাচ্ছেন।' ওর কথা বলার সুর অস্বাভাবিক নরম শোনায়। 'বড় ভাল করে কথা বলেন আপনি। সব মানুষকে এক প্রাণের মধ্যে ঢেলে দেওয়া — সত্যি এ যে কত বড় কাজ! যখন বুঝতে পারি, আমি যা চাইছি লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ তাই চাইছে, তখন হৃদয় কোমল হয়ে ওঠে। কোমলতায় আবার প্রচণ্ড শক্তি আছে।'

মুচকে হেসে ইয়েফিম বলে, 'তুমি যার প্রতি কোমল হবে সে কিন্তু তোমাকে উল্টে আঘাত করবে।' তারপর লাফিয়ে উঠে বলে, 'মিখাইলো-কাকা, ওঁরা চট্‌পট্‌ চলে যান কেউ দেখবার আগে! বইগুলো বিলি করলেই

তো কর্তারা শিং নাড়া দেবেন, কে আনল এ সব? কোত্থেকে কে বলে বসবে — সেই যে মুসাফিররা এসেছিল...'

রীবিন বাধা দিয়ে বলে, 'ধন্যবাদ মা! এত কষ্ট করে এসেছ এখানে। তোমার দিকে তাকালেই আমার পাভেলকে মনে পড়ে। খুব ভালো পথ নিয়েছ মা, তুমি।'

ওর মুখে আসে কোমল উদার একটা হাসি। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা, কিন্তু ওর মাত্র একটা সার্ট গায়ে, বুকটা বড় খোলা। মা ওর বিরাট দেহখানার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বলে:

'কিছু একটা গায়ে চাপালে তো পারো, যা ঠাণ্ডা!'

রীবিন বলে, 'ভেতরটা যে জ্বলছে।'

আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে ছেলেরা। সাভেলি ভেড়ার চামড়ার ঢাকা গায়ে দিয়ে তখনও মাটিতে শুয়ে। আকাশ ফিকে হয়ে আসে; ছায়ারা মিলিয়ে যায়; অরুণ আলোর আশায় পাতায় পাতায় শিহরণ জাগে।

রীবিন হাত বাড়িয়ে দেয় সোফিয়ার দিকে, 'তাহলে বিদায়! শহরে গেলে আপনাকে খুঁজে পাব কেমন করে?'

মা বলে, 'আমায় খুঁজো, তাহলেই হবে।'

এক এক করে সোফিয়ার কাছে এসে ছেলেরা একটু অপ্রস্তুত অথচ নম্রভাবে করমর্দন করে বিদায় নেয়। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্পষ্ট প্রকাশ পায় এক গভীর তৃপ্তিবোধ—কৃতজ্ঞতা আর বন্ধুত্বের অনুভূতিতে পূর্ণ। এই নতুন অনুভূতিটা ওদের কেমন যেন বিব্রত করে তোলে। নিদ্রাহীন শুষ্ক চোখে সোফিয়ার মুখের দিকে চেয়ে মৌন হাসি হাসে। এক পা থেকে অন্য পায়ের ভর দেয়।

ইয়াকভ শুধয়, 'যাবার আগে একটু দুধ খেয়ে যাবেন না?'

'আছে তো?' ইয়েফিম জিজ্ঞাসা করে।

অপ্রস্তুত হয়ে চুলগুলি ঠিক করতে করতে ইগনাত বলে:

'নেই, পড়ে গেছে...'

তিন জনে মুচকি হাসে।

মা বোঝে, মুখে ওরা দুধের কথা বলছে বটে, কিন্তু প্রাণ ওদের অতিথিদের কল্যাণ কামনায় আকুল হয়ে উঠেছে। সোফিয়ার বুক দুলে ওঠে। এত বিব্রত আর নম্র বোধ করে যে শুধু বলতে পারে:

'ধন্যবাদ, কমরেড্!'

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তিন জনে। এ কথা যেন কোমল হাতে দোলা দেয় ওদের।

হঠাৎ শোনা গেল সাভেলির চাপা কাশির শব্দ। আগুন নিভে এসেছে। কয়লাগুলো ছাই হয়ে গেছে।

চাপা স্বরে কিষানেরা বলে:

'বিদায়।'

সেই বেদনার বাণী বহুক্ষণ ধরে কানের মধ্যে বাজতে থাকে।

তখনও ভোর হয়নি। আবছা আলোয় অলস পায়ে ওরা বনপথে এগিয়ে চলে। সোফিয়ার পেছন পেছন যেতে যেতে মা বলে:

'কী চমৎকার সব! যেন স্বপ্ন দেখলাম। ওরে, মানুষ সত্যকে জানতে চায়। সত্যিই চায়! ঠিক যেমন বড় দিন কিম্বা ঈষ্টারের সকালে প্রার্থনার আগে গির্জায় হয়, পাদ্রী তখনও এসে পৌঁছননি, চারদিকে নিঝুম ছমছমে অন্ধকার, আস্তে আস্তে লোকজন হতে শুরু করে... এখানে আইকনের সামনে একটি প্রদীপ জ্বালা হয়, ওখানে আরেকটি, আর একটু একটু করে দেবালয়ের আঁধার যায় কেটে।'

'সত্যিই তাই।' সানন্দে সায় দেয় সোফিয়া, 'শুধু এখানে দেবালয় বলতে সারা পৃথিবী।'

'সারা পৃথিবী!' চিন্তান্বিত ভাবে মাথা নেড়ে পুনরাবৃত্তি করে মা। 'এত ভালো এসব যে বিশ্বাস করা কঠিন... কিন্তু আপনার কথাগুলি ভারি সুন্দর মা, ভারি মিষ্টি। এদিকে আমার কি ভয়ই হয়েছিল! আপনাকে বুঝি ওদের ভালো লাগবে না...'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল সোফিয়া। তারপর অতি ধীরে ভারি সুরে বলল:

'ওদের মধ্যে থাকলে মানুষ সরল হয়ে যায়...'

কথা কইতে কইতে পথ চলে ওরা। রীবিনের, হাঁপানী রোগীটির কথা। তারপর সেই ছেলে তিনটি, তাদের নীরব মনোযোগ, একটু অপ্রস্তুতভাব আর ছোটখাট কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের সকৃতজ্ঞ বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি। বন ছেড়ে মাঠে এসে পড়ে ওরা। সূর্য ততক্ষণে পূব-দিগন্তে দেখা দিচ্ছে। তখনও চোখের আড়াল হয়ে তার স্বচ্ছ গোলাপী ছটা আকাশ জুড়ে ডানা মেলে। ঘাসের শীষে শিশির-বিন্দু উচ্ছ্বসিত বসন্ত-দিনের রং বেরং-এর আলোয়

ঝলমল করে। পাখিদের ঘুম ভাঙে, প্রভাতী আকাশে তাদের গানে গানে খুশির ঢেউ। মোটা মোটা দাঁড়কাকের দল চঞ্চল হয়ে চীৎকার করে তাদের ভারি ডানা ঝাপটে উড়ে চলেছে। কোথা থেকে ভেসে আসছে বাজ পাখির আকুল শিস। টিলার ওপর থেকে রাতের ছায়া মিলিয়ে গিয়ে দূর দূরান্তরের দ্বার খুলে যায় সবিতার আবাহনের জন্য।

'এক এক সময় কি হয় জানেন?' ভাবতে ভাবতে আরম্ভ করে মা, 'একজন হয়তো অনেকক্ষণ ধরে মেলাই বক্‌বক্‌ করে যাচ্ছে, কিছুতেই ধরতে পারা যাচ্ছে না কি বলতে চায় সে। কিন্তু হঠাৎ একটা অতি সহজ কথায় সবকিছু বেবাক্‌ সাফ হয়ে যায়। সেই যক্ষ্মা রোগীটির কথাই দেখুন না। কারখানায়, শুধু কারখানায়ই বা কেন — সর্বত্রই মজুরদের কেমন শুষে খাচ্ছে তা তো জানতে বাকী নেই! শুনেছি, নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু রোজ রোজ দেখে দেখে কেমন যেন অভ্যেস হয়ে যায়, মনে আর লাগে না। অথচ ও মানুষটা যা বললে সেটা এত দুঃসহ, গ্লানিকর। হে যীশু, এ কী বিচার তোমার? মালিকেরা মজা লুঠবে আর তারি জন্য মানুষকে তার জান-প্রাণ দিয়ে দিতে হবে? এ কি ন্যায় হতে পারে?'

ওই লোকটির ব্যাপারটা জুড়ে থাকে মায়ের সারা চিন্তা। তার ঝাপসা আলোয় মনে জ্বলে ওঠে আরও এমনি কত ঘটনার ইতিহাস যেগুলো ইতিমধ্যে মা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

'সবকিছু ওদের এত প্রচুর যে গুলিয়ে ওঠে! জেলার এক হাকিমের কথা জানি, — তার ঘোড়াটাকেও সবার সেলাম ঠুকতে হত। না হলেই হাতকড়ি! বলতে পারেন তার দরকারটা কী? এর কি কোন মাথামুণ্ডু আছে?'

সোফিয়া আস্তে আস্তে একটা গান ধরে, প্রভাতের মতো উচ্ছল একটা গান...

৭

অদ্ভুত শান্ত ভাবে গড়িয়ে চলে মায়ের জীবন। নিজেই অবাক হয়ে যায় মাঝে মাঝে। ছেলে জেলে — জানে কড়া সাজা হবে। তবু কেন জানি এসব কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায় আন্দ্রেই, ফিওদর এবং আরো অনেককে। যারা এ পথে গেছে তাদের সবারই মধ্যে ছড়িয়ে আছে পাভেল। একটি বিস্তৃত সাধারণ মূর্তি মা'র চোখে ভেসে ওঠে। নিজের

অজান্তে অনিচ্ছায়, পাভেলের ভাবনা তাতে প্রসারিত হয়, একদিকে সরে যায়। এই ভাবনা পাতলা রশ্মির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আলোকিত করে সব কিছুকে একটি নকশায় গেঁথে নেবার চেষ্টায়। ফলে তার মন কোনো একটা কিছুতে, বিশেষত ছেলের জন্য ব্যাকুলতা আর ভয়ে নিবদ্ধ হতে পারে না।

ক'দিন পরে কোথায় চলে গেল সোফিয়া। দিন পাঁচেক পরে ফিরে এল অত্যন্ত খোশ মেজাজে। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা থেকেই আবার চলে গেল। ফিরে এল দু'সপ্তাহ পরে। ও যেন জীবনের মধ্যে দিয়ে বড় বড় বৃত্তাকারে ছুটে চলে, মাঝে মাঝে ভাইয়ের কাছে ফিরে আসে তার ঘরখানিকে প্রাণ দিয়ে গান দিয়ে ভরে দেবার জন্য।

সঙ্গীত এখন ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে মায়ের। শুনতে শুনতে মনে হয় বুকের তটে উষ্ণ খুশির ঢেউ ভাঙছে। হৃৎপিন্ডটার ছটফটানি শান্ত হয়ে আসে। প্রচুর জল পেলে গভীর মাটির তলাকার বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, তেমনি সঙ্গীতের স্পর্শে মায়ের মনের ভাবনারাও অনায়াসে অঙ্কুরিত হয়ে অবিলম্বে ডাল-পালা মেলে ভাষার ফুলে ফুটে ওঠে।

ভারি এলোমেলো স্বভাবের মেয়ে সোফিয়া। যেমন তেমন করে চারধারে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখে, যেখানে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলে। সেটা সইতে পারে না মা। আর তার চাইতেও অসুবিধে হয় ওর অতি প্রখর কথাবার্তায়। ভাইয়ের একেবারে বিপরীত। নিকলাই শান্ত সংযত — ওর কথাবার্তায় সর্বদা একটা নরম গাম্ভীর্য থাকে। সোফিয়ার যেন এখনও বয়ঃসন্ধির কাল কাটেনি। মানুষের কাছে নিজেকে বড় বেশি দেখাতে চায়, অথচ ওর কাছে মানুষ শুধু কৌতুকের বস্তু। শ্রমের মর্যাদা নিয়ে প্রচুর হাঁকডাক করে — কিন্তু ওদিকে এলোমেলো স্বভাবের জন্য মায়ের কাজ বাড়ায়। স্বাধীনতার বড় বড় বুলি কপচায়, কিন্তু সদা অসহনশীলতা আর তর্কের জন্য ও যে মানুষের পক্ষে রীতিমত জুলুম হয়ে দাঁড়ায়, তা মা ভাল করেই দেখতে পায়। মানুষটা আগাগোড়াই যেন এক রাশ পরস্পরবিরোধিতা দিয়ে তৈরী। বড় সাবধানে চলতে হয় মাকে। নিকলাইয়ের প্রতি গাঢ় অবিচলিত স্নেহ মায়ের। কিন্তু তা নেই এ মেয়ের জন্য।

দিনের পর দিন — একেবারে ঠাস-বুনট করা একঘেয়ে মাপা মাপা জীবন নিকলাইয়ের। সকাল আটটায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ

থেকে খবর পড়ে শোনায় মাকে। শুনতে শুনতে আশ্চর্য স্পষ্টভাবে মা দেখতে পায় — জীবনের ভারি কলটা কী নির্মমভাবে মানুষকে পিষে গুঁড়িয়ে টাকা তৈরী করে। আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে কোথায় যেন এ ছেলের মিল আছে। মানুষের ওপর কোন বিদ্বেষ নেই আন্দ্রেইয়ের। নিকলাইয়েরও নেই। মনে করে জীবনের খারাপ অবস্থার জন্য সবাই দোষী, কিন্তু নতুন জীবনের স্বপ্নের ওপর আন্দ্রেইয়ের মতো সাগ্রহ আস্থা নেই নিকলাইয়ের। অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে মাপা মাপা কথা বলে — কড়া নিরপেক্ষ জজের মতো। এমন কি ভয়ঙ্কর কিছুর বিষয়ে বললেও একটা অনুতাপের শান্ত হাসি তার ঠোঁটে লেগে থাকে, কিন্তু চোখ দুটোর মধ্যে ঠাণ্ডা কঠোর দীপ্তি। সে দেখে মা বোঝে নিকলাই কাউকে কিছুই ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করতে পারেও না। বোঝে সেই কঠোরতার জন্য কষ্ট হয় নিকলাইয়ের। তাই মায়া হয় মায়ের। আর প্রতিদিন তার প্রতি স্নেহ বেড়ে ওঠে।

ন'টার সময় ও কাজে চলে যায়। তারপর ঘরদোর সাফ করে মা রান্না করে। সব কাজ হয়ে গেলে নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার জামা কাপড় পরে নিজের ঘরে এসে বসে বই হাতে নিয়ে। ছবি দেখে। পড়তে শিখেছে বটে, কিন্তু তাতে বড় একাগ্রতা লাগে। একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, খেই হারিয়ে যায়। তার চেয়ে বরং ছবি দেখা ভালো। ছবি দেখে ছেলেমানুষদের মতোই খুশি হয়ে ওঠে মা। একটা বিচিত্র নতুন জগতের দ্বার খুলে যায় ওর চোখের সামনে। বুঝতে পারে এ জগৎটাকে; তাকে ধরবার ছোঁবার মতো করে পায়। বিরাট বিরাট শহর, জাঁকাল ইমারত, জাহাজ, কল, স্তম্ভ, মূর্তি, মানুষের তৈরী কী অনন্ত সম্পদ! তার সঙ্গে আছে প্রকৃতির অজস্র আশ্চর্য সৃষ্টিসম্ভার। জীবন ওর চোখের সামনে দিগ্-দিগন্ত জুড়ে দল মেলছে। দিনে দিনে অপরূপ ঐশ্বর্য, অজ্ঞাত জীবন খোলে চোখের সামনে আর সেই ধনসম্ভার, অসংখ্য রূপে নতুন-জাগা পিয়াসী হৃদয়ের তৃষ্ণা বাড়িয়ে তোলে। মায়ের সবচেয়ে ভালো লাগে জীবচিত্রাবলির বিভিন্ন খণ্ডগুলো দেখতে। সেটা বিদেশী ভাষায় ছাপা হলেও পৃথিবীর রূপ, ধন আর তার বিরাটত্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল পরিচয় দেয়।

নিকলাইকে মা বলে, 'মস্ত বড় এই পৃথিবীটা!'

ও সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয় পোকা-মাকড়, বিশেষ করে প্রজাপতির ছবি দেখে। অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বলে:

'অদ্ভুত সুন্দর! তাই না নিকলাই ইভানভিচ্? আমাদের চারদিকেই এ-সব সৌন্দর্য কত না আছে। অথচ দেখতে পাইনে। চোখে ঠুলি বাঁধা আমাদের। ঘানিগাছে ঘুরছি যেন ঠুলি পরে। জানবার দেখবার সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই। সত্যি যদি সবাই জানতাম এ দুনিয়াটা কত সুন্দর, কত আশ্চর্য জিনিস আছে এতে, তবে কত আনন্দই না পেতে পারতাম। সমস্তই সকলের জন্য, প্রত্যেকটি বস্তু সকলের জন্য, তাই না?'

হেসে বলে নিকলাই, 'নিশ্চয়ই।' সে আরো ছবির বই নিয়ে আসে।

সন্ধ্যা বেলাটা প্রায়ই লোকজন আসে নিকলাইয়ের কাছে। সেই সুন্দরপানা ভদ্দরলোক — আলেক্সেই ভাসিলিয়েভিচ্, ফ্যাকাশে মুখ, কালো কুচ্‌কুচে দাড়ি, রাশভারী স্বল্পভাষী মানুষ। আর আসে রমান পেত্রভিচ্ — মাথাটা গোল, মুখময় মেচেতার দাগ, সব কিছুতে ওর আফ্‌সোস—আর তাই প্রকাশ করতে গিয়ে সর্বক্ষণ ঠোঁট দিয়ে চ্চ্ চ্চ্ শব্দ করে; ইভান দানিলভিচ্ — ছোট্টখাট্ট রোগা ছট্‌ফটে মানুষ, ছুঁচলো দাড়ি, তীক্ষ্ন গলায় সোরগোল তুলে কথা বলে। আর ইয়েগরের অহর্নিশ ঠাট্টা তামাশা লেগেই আছে। সবার পেছনে লাগে—নিজেকেও বাদ দেয় না। তার রোগটা ক্রমশ আরো প্রবল হয়ে উঠছে, কিন্তু তাই নিয়েও হাসে। এ ছাড়া নানান সুদূর জায়গা থেকে নানান ধরনের লোক আসে। অনেকক্ষণ চাপা স্বরে নিকলাই আলাপ করে তাদের সঙ্গে, বিষয়টা এক, মেহনতী মানুষদের কথা। তুমুল তর্ক, হাত পা ছোঁড়া, সঙ্গে সঙ্গে গেলাস গেলাস চা খাওয়া চলে। গোলমালের মধ্যে বসে মাঝে মাঝে নিকলাই ইস্তাহার লেখে, পড়ে শোনায়। অন্যরা সঙ্গে সঙ্গেই তা লিখে নেয় ছাপার অক্ষরের মতন করে। খসড়ার ছেঁড়া টুক্‌রোগুলো সাবধানে কুড়িয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে মা।

শ্রমিকদের অদৃষ্ট, ওদের অবস্থা, কী করে ওদের মধ্যে বেশি তাড়াতাড়ি আর ভালো করে সত্যের বীজ বোনা যায়, ওদের প্রাণ জাগিয়ে তোলা যায়, এই সব সম্বন্ধে কী আগ্রহ আর ব্যগ্রতা নিয়ে যে কথা বলে ওরা চা ঢালতে ঢালতে, অবাক হয়ে শোনে মা। প্রায়ই রেগে ওঠে সবাই, পরস্পর মিটিয়ে না নিয়ে একজন অপরজনের ওপর দোষ চাপায়, অপমানিত বোধ করে আর ফের তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু করে দেয়।

মা বোঝে, শ্রমিকদের সম্বন্ধে ওদের চাইতে ও অনেক বেশি জানে। মনে হয়, কি বিরাট কাজ যে ওরা হাতে নিয়েছে সে ধারণাও ওর কাছে

অনেক বেশি স্পষ্ট। তাই অনুকম্পা হয় মা'র, একটু দুঃখও হয়। শিশুরা যখন সংসার-নাট্যে বর-বউ'এর সম্পর্কের যে কী কষ্ট তা না বুঝে বর-বউ খেলে তখন বড়রা যেমন প্রশ্রয় আর দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে ওদের সে-খেলা দেখে অনেকটা সেই দৃষ্টিতেই মা এই ছেলেদের দিকে তাকায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাভেল আর আন্দ্রেইয়ের কথাবার্তার সঙ্গে ওদের কথাবার্তা তুলনা করে দেখে কোথায় যেন এদের তফাৎ আছে। প্রথমটা সেই তফাৎটা ঠিক ধরতে পারে না মা। কখনও কখনও মনে হয় এরা বড্ড বেশি চ্যাঁচায়। কই পাভেলরা যখন বস্তির সেই ঘরে বসে কথা কইত এত চ্যাঁচাত না তো! ভাবে:

"এরা বোধ হয় বেশি জানে, তাই এত চ্যাঁচায়..."

এদের কথাবার্তা শুনে একটা কথা প্রায়ই মায়ের মনে আসে। এরা ইচ্ছে করে একে অন্যকে খোঁচায়, কথায় কথায় নিজেদের বিক্রম ফলাতে চায়। প্রত্যেকেই যেন কমরেডদের কাছে প্রমাণ করতে চায়, অন্যদের তুলনায় সে-ই সত্যকে সবচেয়ে বেশি বুঝেছে, সত্যের মূল্য তারই কাছে সবচেয়ে বেশি। একথার উত্তরে অন্যরাও পাল্লা দিয়ে চোটপাট করে, তারাও তীব্র তীক্ষ্ণ যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, সত্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটাই ঘনিষ্ঠতর। দেখেশুনে মায়ের মনে হয়, এরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করে, কী করে একজন আর-একজনের মাথায় চেপে বসবে। কেমন একটা উদ্বিগ্ন বিষণ্ণতায় মনটা ছেয়ে যায় মায়ের। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকবার সময় ওর ভুরুটা কাঁপতে থাকে, চোখ দুটোতে মিনতি ঝরে পড়ে, আর মনে মনে ভাবে:

"পাশার আর তার কমরেডদের কথা ওরা বোধ হয় ভুলে গেছে..."

ওদের সব বাক্-বিতণ্ডা অবশ্য বোঝে না মা, কিন্তু একাগ্র মনে শোনে। ওদের কথার পেছনে ঠিক কী ভাবটা আছে সেটা খুঁজতে চেষ্টা করে। উপলব্ধি করে যে, ভালো সম্পর্কে ধারণার মধ্যে শ্রমিকদের বস্তিতে আর এখানে পার্থক্য আছে। বস্তির আলোচনা শুনে মনে হত, ভালোকে ওরা অখণ্ডভাবে, সামগ্রিক অর্থেই ধরতে পেরেছে। কিন্তু এখানে এই সামগ্রিকতাটুকু নেই—সব কিছু ভাঙা, টুক্‌রো টুক্‌রো। সেখানে ছিল গভীর সজোর অনুভূতি, এখানে ধারাল তীক্ষ্ণ ভাবনার ক্ষেত্র। এখানে এরা বেশি ভাঙার কথা কয়—সেখানে ছিল নূতন-সৃষ্টির স্বপ্ন। তাই আন্দ্রেই আর পাভেলের কথা বেশি লাগত মনে, ও বেশি বুঝত সেগুলো...

মা লক্ষ্য করে, শ্রমিক কেউ এলে নিকলাই কেমন যেন অন্যরকম হয়ে ওঠে, মুখে মিষ্টি একটা ভাব ফোটায়, খুব সহজ হতে চায়। কথাও বলে অন্যরকম, হয়ত আরো অমার্জিতভাবে, নয়ত বেশি এলোমেলো করে। মা ভাবে, ও চেষ্টা করে যাতে ওকে বুঝতে পারে।

কিন্তু তাতে শান্তি হয় না মায়ের। শ্রমিক যারা আসে, নিকলাইয়ের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে তারাও যেন কী রকম আড়ষ্ট হয়ে থাকে। মায়ের মতো সাধারণ একজন মেয়ের সঙ্গে ওরা যেমন সহজ হয়ে দিল খুলে কথা কয় তেমন ভাবে কথা বলতে পারে না। একদিন নিকলাই বাইরে গেলে সেই ফাঁকে মা এক ছোকরাকে বলে দেয়:

'এত ভয় কিসের বল তো! তোমাকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন গুরু-মশায়ের কাছে ছোকরা-পোড়ো পড়া বলছো।'

দাঁত বের করে হেসে বলে ছেলেটি:

'জলের বাইরে থাকলে চিংড়িমাছও যে লাল হয়ে ওঠে গো... উনি তো আর আমাদের মতো নন...'

সাশাও আসে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু থাকে না বেশিক্ষণ। মুখে হাসি টাসি নেই। গম্ভীর ভাবে কথা বলে। যাবার সময় রোজ শুধয়:

'পাভেল মিখাইলভিচ্ কেমন আছেন?'

'ভগবানকে ধন্যবাদ, হেসে খেলে দিব্যি আছে...'

'আমার নমস্কার দেবেন তাঁকে।' বলেই চলে যায়।

মাঝে মাঝে মা নালিশ করে বলে সাশাকে, কতদিন হল আটকে রেখে দিয়েছে ছেলেটাকে — বিচার টিচারের বালাই নেই। সাশার কপাল কুঁচকে যায়, চুপ করে হাতের আঙুলগুলো মোচড়ায়।

মা বলতে চায়:

"লক্ষ্মী মেয়ে আমার, আমি জানিরে বাছা, তুই ভালোবাসিস্ ওকে..."

কিন্তু সাহস হয় না। সাশার গম্ভীর মুখ, চাপা ঠোঁট দেখে এগুতে পারে না। আবার কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা কয়ও না ও। সব মিলে মানুষকে যেন দূরে সরিয়ে রাখে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা ওর বাড়ানো হাতখানায় নীরবে একটু চাপ দেয়। ভাবে:

"আহা বেচারী..."

নাতাশা এল একদিন। মাকে দেখে ভারি খুশি হয়ে ওঠে। চুমু খেয়ে হঠাৎ বলতে সুরু করে আস্তে আস্তে:

'মা মারা গেছেন আমার, বেচারী মা!..'

মাথাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে বলে:

'বড় দুঃখ হয়, পঞ্চাশ বছরও তো হয়নি। কত বছর বেঁচে থাকতে পারতেন আরো। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখলে মনে হয়, যে-ভাবে থাকতেন, তার চেয়ে মরণ ভালোই হয়েছে — মুক্তি পেয়েছেন। চিরটা কাল একা একা কাটল। আপনার জন বলতে কেউ নেই আশেপাশে। বেচারাকে কোন কিছুতে কারো দরকার হল না কোন দিন। সারাটা জীবন বাবার জুলুমে আর মাথা তুলতে পারলেন না। এর নাম কি বেঁচে থাকা? মানুষ আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকে, কিন্তু লাঞ্ছনা ছাড়া আশা করার মতো মায়ের আমার আর কিছুই ছিল না...'

একটু ভেবে মা বলে, 'ঠিকই বলেছেন নাতাশা। আশায় আশায়ই তো বেঁচে থাকে মানুষ। সেই আশাই যদি না রইল, তাহলে জীবন আর কী হল!' নাতাশার হাতে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করে মা, 'একলা পড়ে গেলেন এখন!'

'একদম।' হাল্কা ভাবে জবাব দেয় নাতাশা।

একটু থেমে হেসে মা বলে:

'কিচ্ছু ভাবনা নেই। ভাল লোক কখনও একলা থাকে না। মানুষ আপনি এসে তার কাছে ধরা দেয়।'

৮

জেলার শহরে কাপড়-কলের এক স্কুলে মাষ্টারী নিল নাতাশা। মা ওকে জোগাতে লাগল যত বেআইনী বই, পুস্তিকা আর খবরের কাগজ।

এই হল এখন ওর কাজ। মাসের মধ্যে বার কয় বেশ বদলে, কখনও সন্ন্যাসিনী, কখনও লেস আর কাটা কাপড়ের ফিরিওয়ালী, কখনও সংগতিপন্ন নাগরিকা বা মুসাফির সেজে, ঝোলা কাঁধে নয়তো স্যুটকেস হাতে, প্রদেশটা চক্কর দিয়ে আসে। ট্রেনে, জাহাজে, হোটেলে, সরাইখানায় যেখানেই যাক, সেই শান্ত শিষ্ট সহজ সরল মানুষটি। অচেনা লোকদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে আগে গিয়ে আলাপ করে। অত্যন্ত মিশুক স্বভাব, মুখে বহু অভিজ্ঞতাপ্রসূত একটা আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ। লোকদের মন নির্ভয়ে সহজেই কাছে আসে।

মানুষজনের সঙ্গে কথা কইতে, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতে ওর খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে সেই সব লোকদের দেখে তার হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হয়ে ওঠে যাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জেগে উঠেছে, যারা দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মনের ভেতরে ইতিমধ্যে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তার উত্তর খুঁজছে একাগ্রচিত্তে। পেট ভরে খেতে পাওয়ার জন্য সংগ্রামে মানুষের ব্যস্তসমস্ত উদ্বিগ্ন জীবন ক্রমশ বিস্তারিত বিচিত্র রূপে উদ্ঘাটিত হতে লাগল ওর সামনে। সর্বত্র পরিষ্কারভাবে দেখতে লাগল মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা, লুঠ করা, লাভের জন্য তার যা-কিছু সম্ভব শুষে নেওয়া, তার রক্ত পান করার রূঢ় অনাবৃত নির্লজ্জ লিপ্সা। মা দেখে সংসারে কিছুর অভাব নেই, তবু দুনিয়ার অজস্র ধনসম্ভারের সামনে জনগণ অর্ধাশনে অনশনে, ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটায়। শহরের গির্জায় গির্জায় কী অঢেল ঐশ্বর্য! সোনা রূপো দু'হাতে ছড়ান—তার এক কণারও দরকার নেই ভগবানের, অথচ সেই গির্জারই দরজায় অর্ধ-উলঙ্গ ভিখারীর দল অবহেলায় ছুঁড়ে-দেওয়া ছিটে-ফোঁটার জন্য শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। আগেও এই দেখেছে — ধনী গির্জা ও পুরোহিতদের সোনার সুতোয় বোনা পরিচ্ছদের চোখ-ঝলসান আড়ম্বর আর সেই সঙ্গে গরিব জনগণের কুটির আর তাদের ছেঁড়া কাপড়। আগে সেটা ওর স্বাভাবিক বলেই মনে হত, কিন্তু এখন যেন আর সহ্য হয় না। মনে হয় দরিদ্রের এত বড় অপমান আর নেই। সে জানে, গির্জার দরকার তো দীন-দুঃখীরই বেশি।

ছবি দেখে, বই পড়ে জেনেছে, কথায় কথায় শুনেছে ও, যীশু খৃষ্ট দীন-দুঃখীরই বন্ধু, অতি সাধারণ বেশেই তিনি সেজেছেন। কিন্তু গির্জায় গির্জায় সেই খৃষ্টেরই মূর্তি সোনা-জহরৎ, সিল্কসাটিনে মোড়া। শান্তির আশায় ভিক্ষুকের দল সেই দেবতার দুয়ারে যখন এসে দাঁড়ায়, সেই সিল্ক ঘৃণাভরে খসখস করে। আপনা থেকেই রীবিনের কথা মনে পড়ে:

"দেবতার নামেও ব্যাটারা আমাদের ঠকিয়েছে।"

টেরও পেল না মা, সে প্রার্থনা আগের চেয়ে কম করতে শুরু করল। কিন্তু বেশি করে ভাবতে সুরু করল যীশুর কথা আর যারা তাঁর নাম উল্লেখ না করেও, তাঁকে যেন একেবারে না জেনেও,—মা'র মনে হল—

তাঁরই আদর্শ মতো জীবন কাটায়, তাঁরই মতো দুনিয়াকে দীনের দুনিয়া বলে জ্ঞান করে দুনিয়ার ঐশ্বর্য সবার মধ্যে সমানভাবে বিলি করতে চায়—তাদের কথা। সেই ভাবনাটা বড় হতে হতে যা-কিছু সে দেখেছে শুনেছে সেসব কিছু ছেয়ে গিয়ে ওর প্রাণের আরাধনা হয়ে তার স্থির জ্যোতিতে আঁধার পৃথিবীকে, সমগ্র জীবনকে, সব মানুষকে উদ্ভাসিত করে তুলল। মনে হতে লাগল যাঁকে সে সর্বদা অস্পষ্ট ভাবে ভালোবেসে এসেছে এক জটিল অনুভূতি দিয়ে — ভয়ে ভরসায়, আশায় আনন্দে মিশিয়ে — সেই যীশু খৃষ্ট আজ তার আরো নিকট হয়েছেন, অন্য রকম হয়ে উঠেছেন — আরো উচ্চ, আরো দৃশ্য, তাঁর মুখ আরো নন্দিত, যেন সত্যিই পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন তিনি। মানুষের এই দুর্ভাগা বন্ধুর কথা যারা নীতিবাগীশের মতো আওড়ায়নি অথচ তাঁরই নামে নিজেদের উষ্ণ রক্ত অঢেলে দান করেছে তাদেরই রক্তে স্নান করে যেন পুনরুত্থান হয়েছে তাঁর। প্রত্যেকবার নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, আর কাজ সমাপ্ত করার উত্তেজনায় আনন্দে উচ্ছল হয়ে নিকলাইয়ের কাছে ফিরে আসে মা।

নিকলাইকে বলে, 'ভারি ভালো লাগে ঘুরে বেড়াতে। কত কিছু চোখে পড়ে!—জীবনটা কী করে গড়ে ওঠে তা বোঝা যায়। ঠেলা দিয়ে জীবনের একেবারে প্রত্যন্তদেশে সরিয়ে দেয় সাধারণ মানুষকে। সে অপমানিত হয়ে নড়াচড়া করছে ওখানে। আপনা থেকেই ভাবনা জাগে, কিসের জন্য সেটা? কেন অমন দূর্ দূর্ করে ওদের? চারদিকে এত অঢেল খাবার, অথচ ওরা ক্ষিদেয় জ্বলছে কেন? চারদিকে এত বুদ্ধির দীপ্তি, তবে কেন ওরা মূর্খ? কেন ওরা অন্ধকারে থাকে? যে দয়ালু ভগবানের কাছে ধনী-দরিদ্রের তফাৎ নেই — সবাই তাঁর প্রিয় সন্তান — কোথায় তিনি? জানেন, ওরা আজকাল আস্তে আস্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে নিজেদের অবস্থার জন্য। অনুভব করছে, নিজেদের কথা ভেবে না দেখলে অন্যায় গলা টিপে শেষ করবে তাদের!'

আরো ঘন ঘন প্রবল ইচ্ছে হয় নিজের ভাষায় মানুষগুলোকে জীবনের অবিচারের বিষয়ে শোনায়। মাঝে মাঝে এই বাসনা দমিয়ে রাখা কঠিন হয়...

মা ছবিতে মনোযোগ দিয়েছে দেখলেই নিকলাই হেসে মাকে আশ্চর্য

সব কথা শোনাতে শুরু করে। মানুষের দুঃসাহসিকতায় অবাক হয়ে মা সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করে:

'সত্যি বলছেন? সত্যি হবে?'

তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতায় স্থির অবিচল বিশ্বাস নিয়ে চশমা-পরা দয়ালু চোখ দুটো তার মুখে স্থাপন করে নিকলাই বলে ভবিষ্যতের সেই রূপকথা:

'মানুষের ইচ্ছার সীমা নেই, তার শক্তি অফুরন্ত। তবু পৃথিবী আত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ হচ্ছে বড় আস্তে আস্তে, কারণ আজ প্রত্যেক মানুষ অধীনতা থেকে মুক্তি পাবার অভিপ্রায়ে জ্ঞান নয়, টাকা জমাতে বাধ্য হয়। মানুষ যখন লোভ থেকে মুক্ত হবে, জবরদস্তির এই মেহনত তাকে যখন আর করতে হবে না...'

মা তার কথা খুব কমই বুঝতে পারে। কিন্তু যে শান্ত বিশ্বাস নিকলাইকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে, সেই বিশ্বাসখানিকে ও আরো বেশি চিনে নিতে পারে। নিকলাই বলে:

'পৃথিবীর মুশ্‌কিল এই যে, মুক্ত লোক খুব কমই আছে!'

সেটা মা বোঝে। লোভ-দ্বেষমুক্ত মানুষ দেখেছে ও। বোঝে অমনি মানুষ বেশি থাকলে জীবনের অন্ধকার ভয়ংকর চেহারাটা হত আরো সহজ সরল, আরো প্রসন্ন দয়ালু।

বিমর্ষভাবে নিকলাই বলে, 'কী করবে, অবস্থাই নিষ্ঠুর করে তোলে মানুষকে।'

খখলের কথা মনে পড়ে মায়ের। সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে ও।

৯

কাজ থেকে রোজ ঠিক সময়েই ফেরে নিকলাই। একদিন কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেল। এসে কাপড় জামা না ছেড়েই উত্তেজিত ভাবে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলল:

'একজন কমরেড্ জেল থেকে পালিয়েছে শুনলাম। কিন্তু সে যে কে তা এখনও শুনিনি...'

মা'র পা দুটো টলে। তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসে পড়ে চুপি চুপি বলে:

'পাভেল নয়তো?'

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে নিকলাই বলে, 'আশ্চর্য কি! কিন্তু কী করে ওকে গোপন রাখতে সাহায্য করি, কোথায় পাব ওকে খুঁজে? এতক্ষণ তো ওজন্যই টহল দিলাম রাস্তায়। যদি দেখতে পাই। অবশ্যি জানি এ সব পাগলামি... কিন্তু করতে হবে তো কিছু। আমি আবার যাচ্ছি...'

মা চীৎকার করে ওঠে, 'আমিও যাচ্ছি!'

'আপনি ইয়েগরের ওখানে যান, দেখুন সে যদি কিছু জানে,' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে বলে নিকলাই।

মা বুক-ভরা আশা নিয়ে তৎক্ষণাৎ রুমালটা মাথায় বেঁধে ছুটে বেরিয়ে গেল নিকলাইয়ের পেছন পেছন। চোখের সামনে বিচিত্র কুয়াশা, বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে। অজানা এক সম্ভাবনার দিকে ছুটে চলেছে মা মাথা নীচু করে। বিদ্যুৎ চমকের মত আশার ঝলক খেলে যায়: "যদি ও সত্যি থাকে ওখানে!"

গরম পড়ে গেছে। ক্লান্তিতে হাঁপাতে লাগল মা। ইয়েগরের বাড়ীর সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পা আর চলে না। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েই অস্ফুট চীৎকার করে উঠে চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্তের জন্য। মনে হল যেন পকেটে হাত দিয়ে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে নিকলাই ভেসভ্‌শিচকভ্‌। চোখ তুলে আর একবার তাকিয়ে দেখে কেউ নেই...

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবে — চোখের ভুল। কান পেতে রাখে। উঠোনে কার যেন ভারি পায়ের মন্থর শব্দ। সিঁড়ির মোড়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে — পরিচিত সেই বসন্তের দাগওয়ালা মুখখানা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'নিকলাই! নিকলাই!' ডাকতে ডাকতে নীচে আসে মা। আশাভঙ্গে কলজেটা যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যেতে লাগল।

হাত নেড়ে নীচুস্বরে বলে নিকলাই, 'এসো না, যাও যাও!'

ছুটে ওপরে এসে ইয়েগরের ঘরে ঢোকে মা। সোফার ওপরে শুয়ে ছিল ইয়েগর। হাঁপাতে হাঁপাতে মা চুপি চুপি বলে:

'নিকলাই পালিয়ে এসেছে... জেল থেকে!..'

বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলে কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করে ইয়েগর, 'কোন নিকলাই? ওখানে তো দু'জন আছে...'

'ভেসভ্‌শিচকভ্‌... এই যে এসে গেছে!..'

'বাঃ বাঃ! খাসা!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই নিকলাই এসে ঘরে ঢোকে। ছিটকিনি দিয়ে দরজা বন্ধ করে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসে আর চুলে হাত বুলোয়। ইয়েগর কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঠে মাথা নেড়ে ওকে অভ্যর্থনা করে:

'আরে! এস! এস!'

কিনলাই একগাল হেসে মায়ের কাছে এসে হাতখানি ধরে বলে:

'ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! নইলে গিয়ে আবার জেলখানার অতিথি হতে হত। কাউকে চিনি না শহরে। ভাবছিলাম কি করি, বস্তির বাড়ীতে ফিরে গেলে তো সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে যাবে। বোকার মত পালিয়ে এসে কাজটা ভালো করিনি ভাবতে ভাবতে আসছি, হঠাৎ দেখি নিলভনা দৌড়াচ্ছে। ব্যস, অমনি পেছু ধরলাম...'

'কিন্তু বেরুলে কি করে, বলো দেখি!' মা শুধল।

নিকলাই এসে বসে সোফার একেবারে প্রান্তে। বড় অস্বস্তি লাগে ওর। সসঙ্কোচে কাঁধ নেড়ে বলে:

'জুটে গেল মৌকা। এই বাইরে একটু বেরিয়েছিলাম। দেখি কী, সাধারণ কয়েদীরা জমাদারকে ঠ্যাঙানি দিচ্ছে। ব্যাটা নাকি টিকটিকি, চব্বিশ ঘণ্টা সকলের পেছনে লেগে থাকে, এক লহমার জন্য কাউকে শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেয় না। তাই কয়েদীরা হাড়ে হাড়ে চটে ছিল। বাস, বাগে পেয়ে গেল, আর যায় কোথায়! চার দিকে সব ছত্রখান, জমাদারেরা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে সিটি বাজিয়ে বাজিয়ে। — সে এক কাণ্ড। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি সদর দরজাখানা খোলা, — ওধারে দেখা যাচ্ছে ময়দান, শহরটা। এক পা এক পা করে এগুলাম... যেন স্বপ্ন দেখছি—খানিকটা দূরে চলে এলাম অমনি করে। তখন হুঁশ হল। কোথায় যাই? পেছনে মুখ ফিরালাম, দেখি জেলের দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে...'

'হুঁ!' ইয়েগর বলে, 'তা মশায় ফিরে গিয়ে সবিনয়ে কড়া নাড়লেন না কেন? বলতেন, মাপ করুন, একটু অন্যমনস্ক ছিলুম...'

নিকলাই মুচকে হাসে, 'তা বৈকি! তবে কমরেড্‌দের কাউকে কিছু না বলে তো পালিয়ে আসাটা ভাল হয়নি... তা কী আর করি তখন? দেখি ছোট্ট একটা বাচ্চা কার বুঝি মরেছে। তাকে নিয়ে চলেছে কবরখানায়। মাথাটি হেঁট করে ভিড়ে গেলাম সেই দলে; কারু দিকে আর তাকান টাকান নেই। কিছুক্ষণ বসে রইলাম গিয়ে সেই কবরখানায়—ঠাণ্ডা হাওয়ায় মগজটা একটু ঠাণ্ডা হল। হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল...'

‘মাত্র একটা?’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়েগর বলে, ‘তোমার মগজখানায় তার জন্য জায়গার কমতি হওয়ার তো কথা নয়...’

হাল্কা করে ভেসভ্‌শিচকভ্‌ হাসে মাথা নেড়ে নেড়ে।

‘এখন আর আগের মতো ফাঁকা নেই হে মগজটা আমার! তুমি যে দেখছি এখনও ভুগছো...’

‘যার যেমন সাধ্যি!’ ভেজাভাবে কাশতে কাশতে বলে ইয়েগর। ‘তারপর বল!’

‘হাঁটতে হাঁটতে জেলার যাদুঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘুরছি আর ভাবছি—যাই কোথায় এখন! নিজের ওপর এমন কি চটেই গেলাম। এদিকে ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আবার বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ঘুরছি, দেখি পুলিশ সবাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে—ভাবছি আমার মুখ নিয়ে শীগ্‌গিরই ভগবানের বিচারে পড়ব!.. হঠাৎ দেখি নিলভনা আমারি দিকে আসছে। একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর আর কি—এসে গেলাম পেছন পেছন। বাস্‌। আমার কথাটি ফুরুল!’

মা অপরাধীর সুরে বলে, ‘দেখতে তো পাইনি তোমায়!’ নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকে ভেসভ্‌শিচকভ্‌কে। একটু যেন হালকা হয়ে গেছে।

মাথা চুলকে বলে নিকলাই, ‘কমরেড্‌রা নিশ্চয় ভেবে অস্থির হচ্ছে...’

‘হুজুরদের কথা ভাবছ না? তারাও তো ভেবে অস্থির হচ্ছেন!’ ইয়েগর বলে। মুখটা খুলে ঠোঁট দুটোকে নাড়তে থাকে, যেন হাওয়া চিবিয়ে খাচ্ছে। আবার বলে, ‘ঠাট্টা ইয়ার্কি রাখো। তোমার ব্যবস্থা তো করতে হবে একটা! চাট্টিখানি কথা নয়। যদিও খুব ভালো লাগছে। আমি যদি উঠতে পারতাম...’ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল ওর। হাত দু’খানা দিয়ে ক্ষীণ ভঙ্গিতে বুকটা রগড়াতে থাকে।

নিকলাই মাথা নিচু করে বলে, ‘ভারি রোগা দেখাচ্ছে তোমায় ইয়েগর ইভানভিচ!’ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অস্থিরভাবে ছোট্ট ঘিঞ্জি ঘরখানার চারদিকে চায়।

‘ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার!’ ইয়েগর বলে, ‘আর বাড়াবাড়ি না করে এখন ছেলের কথা শুধোন তো মা।’

ভেসভশিচকভ্‌ এক গাল হাসে:

‘দিব্যি আছে পাভেল। স্বাস্থ্য ভালো। জেলখানায় ওই তো আমাদের

সর্দার। কর্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথাটথা তো ও-ই বলে, সাধারণত হুকুম টুকুম যা দেবার তাও ওই দেয়। সব্বাই পাভেল বলতে অজ্ঞান...'

ভ্লাসভা ভেসভ্‌শ্চিকভের কথা শুনে মাথা নাড়ে আর আড়চোখে ইয়েগরের ফোলা, নীলচে মুখখানার দিকে তাকায়। স্থির নিশ্চল, ভাবলেশহীন মুখটা কী রকম অদ্ভুত চ্যাপটা লাগে। শুধু চোখ দুটি তার মধ্যে খুশিতে ঝলমল করছে।

হঠাৎ বলে ওঠে নিকলাই, 'কিছু খাবার টাবার আছে হে? সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে।'

ইয়েগর বলে, 'দেখুন মা, ওই তাকটার ওপর রুটি আছে খানিকটা। তারপর একবার বেরতে হবে, বারান্দার বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজাটায় ঠোকা দিলেই একজন মেয়েমানুষ দরজা খুলে দেবে। তাকে বলুন খাবার মতো যা আছে সব নিয়ে যেন আসে এখানে।'

'সব? সব কেন?' বাধা দিয়ে বলে নিকলাই।

'ভয় নেই হে! সব মানে যৎকিঞ্চিত...'

মা বেরিয়ে গেল। নির্দিষ্ট দরজায় ধাক্কা দিয়ে ওদিককার নিস্তব্ধতায় কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিষণ্ণচিত্তে ভাবতে লাগল ইয়েগরের কথা।

"মরে যাচ্ছে ও..."

ঘরের মধ্য থেকে কে যেন শুধয়, 'কে ওখানে?'

মা অনুচ্চস্বরে জবাব দেয়, 'আমি ইয়েগর ইভানভিচের কাছ থেকে আসছি। আপনাকে ডাকছেন একবার তিনি...'

'এই এলাম বলে,' দরজা না খুলেই জবাব দেয় মেয়েলোকটি। কয়েক মুহূর্ত যায়, আবার ধাক্কা দেয় মা... এবারে ঝপ করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে চশমা পরা এক দীর্ঘাঙ্গিনী। ব্লাউজের ধামসানো হাতাটা ঠিক করতে করতে কঠোর গলায় বলে:

'কি চাই?'

'ইয়েগর ইভানভিচ্ আমায় পাঠিয়েছেন...'

'চলুন! আমি কিন্তু চিনি আপনাকে!' নীচুস্বরে বলে ওঠে স্ত্রীলোকটি, 'নমস্কার! বড্ড অন্ধকার এখানে...'

নিরীক্ষণ করে দেখে মা। মনে পড়ল, নিকলাইয়ের ওখানেই দেখেছে বার কয়। মনে মনে ভাবে: "সব আমাদেরই লোক দেখছি!"

মা'র গায়ের ওপর এসে পড়ে মেয়েটি মাকে বাধ্য করে এগিয়ে যেতে আর নিজে পেছু পেছু যায়। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করে:

'ওঁর শরীর কি বেশি খারাপ হলো?'

'হ্যাঁ, শুয়ে আছেন। খাবার নিয়ে আসতে বলেছেন।'

'সেটা বাড়তি জিনিস...'

ইয়েগরের ঘরে এসে ঢোকে ওরা। হিক্কা উঠছে ইয়েগরের। বলে:

'পিতৃলোকে চল্‌লাম আমি... লুদমিলা ভাসিলিয়েভ্‌না! জেল থেকে পালিয়ে এসেছে এই লোকটা! আগে ওকে খাওয়াবেন, তারপর একটু ঢাকা চাপা দিয়ে রাখবেন। সে ব্যবস্থা করুন।'

মাথা নাড়ে স্ত্রীলোকটি। তারপর রোগীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কঠোর স্বরে বলে:

'আপনার উচিত ছিল আপনার কাছে লোকটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ডাকা, ইয়েগর! তার ওপর করেছেন কী? দু'বার ওষুধ খাননি, তাইতো এরকম। আচ্ছা, কমরেড, চলুন আমার সঙ্গে। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে আসবে।'

'সত্যি সত্যি আমায় হাসপাতালে পাঠাতে চান!'

'হ্যাঁ, আমিও থাকব আপনার সঙ্গে!'

'সেখানেও? হে ভগবান!'

'থামুন তো...'

কথা বলতে বলতে স্ত্রীলোকটি ইয়েগরের বুকে কম্বলখানা ঠিক করে দেয়। নিকলাইকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে একদৃষ্টিতে। তারপর ওষুধের শিশি চোখ দিয়ে মেপে দেখে কতটা বাকী আছে। গলাটা ওর মসৃণ মোলায়েম; চলে সহজে। ফ্যাকাশে মুখ, ঘন কালো ভুরু-জোড়া নাকের ওপর এসে প্রায় মিশে গেছে। মায়ের ভালো লাগেনি ওর মুখখানা — বড় উদ্ধত যেন। ওর চোখ কখনও হাসে না, একটুখানি ঝিলমিল করেও ওঠে না; আর কথা তো বলে না, যেন হুকুম করে।

'আমরা আসি এখন,' সে বলে। 'এই যাব আর আসব। দেখুন এই ওষুধটা এক বড় চামচ ওকে দেবেন তো। আর দেখবেন, কথা যেন না বলে...'

নিকলাইকে নিয়ে চলে গেল স্ত্রীলোকটি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ইয়েগর:

'আশ্চর্য মেয়ে! সত্যি সত্যি চমৎকার মেয়ে... আপনার ওর সঙ্গেই এসে থাকা ভালো, মা। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও...'

'চুপ কর তো, আর কথা নয়, এই ধর, ওষুধটা খেয়ে নাও!' মা নরম সুরে বলে।

ওষুধটা খেয়ে নিয়ে এক চোখ কুঁচকে ইয়েগর আবার বলতে আরম্ভ করে:

'চুপ করে থাকলেই কি আর আমার মরণ ঠেকান যাবে!'

আর একটা চোখ দিয়ে মাকে দেখে। ধীরে ধীরে একটু হাসি ফুটে ওঠে, ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে যায়। মায়ের মাথাটা ঝুঁকে পড়ে, গভীর করুণা তীব্র ব্যথা হয়ে ওর চোখ দেয় ভিজিয়ে।

ইয়েগর বলে, 'তাতে কী হয়েছে, এ তো প্রকৃতির বিধান... বেঁচে থাকার সুখের জন্য মরতে তো হবেই...'

মা হাতটা ওর মাথায় রেখে কোমল স্বরে বলে:

'একটু চুপ করে থাকো, আচ্ছা?..'

চোখ বুজে পড়ে থেকে যেন বুকের ঘড়ঘড়ানি শোনে ইয়েগর। তারপর জেদ করে বলে চলে:

'চুপ করাটা হল অনর্থক; মা! চুপ করে থেকে কী লাভ হবে? মৃত্যু-যন্ত্রণার আরো কয়েকটা মুহূর্তমাত্র বাড়বে, অথচ ভালো লোকের সঙ্গে কথা বলার আনন্দটা হারাব। ইহলোকে যেমন ভালো লোক আছে, তেমন লোক পরলোকে আছে বলে তো মনে হয় না...'

ব্যস্ত হয়ে ওঠে মা, ওকে থামাতে চেষ্টা করে:

'লক্ষ্মীটি চুপ করো, নইলে ঐ মহিলা এসে যদি দেখে তুমি কথা বলছ তাহলে ওর কাছে আমায় বকুনি খেতে হবে...'

'মহিলা টহিলা নয় ও। কে জানো? এক বিপ্লবী মেয়ে। কমরেড। চমৎকার মানুষ। তা খাবে বৈকি বকুনি! ও সব্বাইকে বকে...'

প্রতিবেশিনীটির কাহিনী বলতে আরম্ভ করে ইয়েগর। ওর ঠোঁট নড়ে আস্তে আস্তে বহুকষ্টে, কিন্তু চোখে হাসি খেলে। মা দেখে ও ইচ্ছে করেই খোঁচা দেয় তাকে। ওর নীলচে, ঘর্মাক্ত মুখের দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে মা ভাবে, মরে যাবে...

লুদ্‌মিলা ফিরে এল। ঘরের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে:

'সেই লোকটির আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা চলবে না। যত শীগ্‌গির হয় এখান থেকে সরে পড়া দরকার। ভোল বদলাতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে কিছু জামা কাপড় নিয়ে আসুন। দুঃখের বিষয় সোফিয়া নেই এসময়। লোককে লুকিয়ে রাখা হল তারই পেশা।'

চাদরটা কাঁধে জড়াতে জড়াতে মা বলে, 'কাল আসছে সে।'

কোনও কাজের ভার দিলেই কাজটা একেবারে কি করে তাড়াতাড়ি এবং নিখুঁত করে করবে কেবল সেই ভাবনা মায়ের। আর কোন কথা তখন মাথায় থাকে না। এবারও ভুরু দুটো নামিয়ে পুরোপুরি কাজের লোকের মতো শুধয়:

'কী রকম বেশ চাই, বলুন?'

'সে যে রকমই হক, রাতেই তো যাবে...'

'রাতেই তো অসুবিধা বেশি। রাস্তায় লোকজন কম থাকে। পুলিশের নজর থাকে বেশি। আর ও আবার খুব একটা কিছু চতুর নয়।'

ইয়েগর ধরা গলায় হাসে।

মা শুধয়, 'হাসপাতালে আসব তোমায় দেখতে?'

কাশতে কাশতে মাথা নাড়ে ইয়েগর। কালো চোখ দুটি মায়ের মুখে নিবদ্ধ করে লুদ্‌মিলা জিজ্ঞাসা করে:

'আমার সঙ্গে পালা করে একটু দেখাশোনা করবেন ওকে? করবেন?! বেশ! আচ্ছা, এখন তাহলে চট্ করে আসুন...'

হাত ধরে দরজার দিকে নিয়ে যায় মাকে। হাতে সস্নেহ আদেশের ইঙ্গিত। বারান্দায় এসে চুপি চুপি বলে লুদ্‌মিলা:

'এমনিভাবে আপনাকে তাড়াচ্ছি বলে রাগ করবেন না তো? কি করব কথা বললে যে ওর খারাপ হয়... এখনও যে আশা ছাড়তে পারিনি...'

হাত দুটো সজোরে চেপে ধরে। আঙুলগুলো মুচড়ে যায়। চোখের পাতা ক্লান্ত ভঙ্গিতে নেমে আসে...

এই কৈফিয়তে বিব্রত বোধ করে মা। বিড়বিড় করে বলে:

'না, না। ছিঃ তা কেন হবে। ঠিকই তো!'

'আচ্ছা তাহলে একটু ভালো করে দেখেশুনে যাবেন, টিকটিকি তো রয়েছে সর্বত্র।' নীচু স্বরে বলে লুদমিলা। তার পর হাত দুটো তুলে রগটা ঘষতে থাকে। ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে, কোমল হয়ে ওঠে মুখখানা।

'আমি জানি!..' একটু গর্বের সুরেই মা বলে।

গেট থেকে বেরিয়ে, একটু থেমে গায়ের চাদরটা ঠিক করে নেয় মা, অলক্ষ্যে চারদিকে তাকিয়ে দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে এখন প্রায় নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে মা, কে টিকটিকি। চলনে বলনে সহজ হতে গিয়ে ওরা বাড়াবাড়ি করে, মুখের অবসন্ন একঘেয়ে ভাবটা আর এ সবের পিছনে উদ্বিগ্ন অপ্রীতিকর তীক্ষ্ণ চোখের সতর্ক অপরাধীর মতো ঝিলিক মা ভালো করেই জানে।

আজ কিন্তু কোন পরিচিত মুখ দেখতে পেল না মা, তাই তেমন তাড়াতাড়ি না করে চলে রাস্তা দিয়ে। একটা গাড়ীওয়ালাকে ডেকে চড়ে বসল, বাজারে যাবে। প্রায় প্রতি মাসেই জামা-কাপড় ছেঁড়ার অপরাধে, কল্পিত মাতাল স্বামীকে গাল দিতে দিতে বিস্তর দর কষাকষি করে কিনল নিকলাইয়ের পোষাক। ওর মাতাল স্বামীর কাহিনীতে অবশ্য দোকানীর কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না, কিন্তু মা নিজে খুশি হয় মনে মনে। পথে তার খেয়াল হয়েছিল, পুলিশ নিশ্চয় বুঝবে নিকলাইয়ের পোষাক বদলাবার দরকার হবে, তাই বাজারে চর পাঠাবে। তেমনি সহজ সাবধানতার সঙ্গে ইয়েগরের বাসায় ফিরে আসে মা। তারপর নিকলাইকে সঙ্গে করে সহরতলীতে পেঁৗছে দিতে যায়। রাস্তার দু' পাশ ধরে চলে দু' জন। লম্বা পীতবর্ণের কোটটায় নিকলাইয়ের পা আটকে যায়, মাথার টুপীটা বার বার নেমে আসে নাকের ওপর। মাথা নীচু করে ভারি পায়ে চলে সে। দেখে মা'র বেশ মজা লাগে, সেই সঙ্গে ভালোও লাগে। একটা ফাঁকা রাস্তায় দেখা হয় সাশার সঙ্গে। ভেসভ্শিচকভের দিকে একটু মাথা হেলিয়ে বিদায় জানিয়ে বাড়ী ফিরে আসে মা।

বিষণ্ণচিত্তে ভাবে: "পাভেল এখনও জেলে... আন্দ্রেইও..."

১০

মাকে দেখে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে নিকলাই:

'জানেন তো, ইয়েগরের অবস্থা খুব খারাপ। ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। লুদ্‌মিলা এসেছিল, আপনাকে যেতে বলে গেছে...'

'হাসপাতালে?'

বিব্রতভাবে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে মাকে কোট গায়ে দিতে সাহায্য করে নিকলাই; তারপর মায়ের হাতে নিজের শুক্‌নো উষ্ণ হাতের চাপ

দিয়ে কম্পিত স্বরে বলে, 'এই পুঁটলিটা নিয়ে যাবেন। ভেসভ্শিচকভের ঠিক বন্দোবস্ত করা হয়েছে তো?'

'হাঁ, হয়েছে।'

'আমিও যাব ইয়েগরের কাছে...'

শ্রান্তিতে মাথা ঘুরছে মায়ের। নিকলাইয়ের ব্যস্ত উদ্বিগ্নতা সাংঘাতিক কিছুর আশঙ্কায় তার মনটাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। মাথায় একটা চিন্তা ভারি হাতুড়ির মতো ধাক্কা দেয়: "মরে যাচ্ছে..."

কিন্তু গিয়ে দেখে, ছোট্ট ঝলমলে পরিষ্কার একখানা ঘরে, ফর্সা ধবধবে বালিশের স্তূপে বসে হো হো করে হাসছে ইয়েগর। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে সে বলছে ডাক্তারকে:

'রোগীর চিকিৎসা করা একরকম সংস্কার করার কাজ আর কি...'

ডাক্তার উৎকণ্ঠিত হয়ে তীক্ষ্ন স্বরে বলে উঠে, 'ইয়ারকি থামাও ইয়েগর!'

'আর আমি, বিপ্লবী, সংস্কার টংস্কারকে ঘেন্না করি...'

ইয়েগরের হাতখানা তার হাঁটুর ওপর সাবধানে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায় ডাক্তার। তার পর ওর মুখের ফোলাটা পরীক্ষা করতে করতে চিন্তিত ভাবে দাড়িতে চিমটি কাটে।

ডাক্তারটি মা'র চেনা; নিকলাইয়ের অন্যতম বিশেষ বন্ধু। নাম ইভান দানিলভিচ্। মা ইয়েগরের কাছে এগিয়ে আসে, ইয়েগর জিভ্ ভেংচে অভ্যর্থনা করে। ডাক্তার ফিরে তাকায়।

'আরে! নিলভনা যে! খবর কী? হাতে কী ওটা?'

'বই বোধ হয়।'

ছোট্ট ডাক্তারটি বলে দেয়, 'উ'হু! পড়া টড়া মোটেই চলবে না।'

'ও আমায় গরু বানাতে চায়!' মাকে নালিশ করে ইয়েগর।

বুকের মধ্যে কফের ঘড়ঘড়ানি ওঠে; দম বন্ধ হয়ে হেঁচকি তোলার মতো করে হাঁপাতে থাকে ইয়েগর। বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখখানা একেবারে নেয়ে ওঠে। অবাধ্য ভারি হাতটা ধীরে ধীরে তুলে মুখ মোছে। ফোলা ফোলা গালের অদ্ভুত নিষ্প্রাণতা বিকৃত করে দেয় তার চওড়া দয়ার্দ্র মুখখানিকে, মুখের রেখা হারিয়ে যায় মড়ার মতো মুখোশের তলায়। ফোলা ফোলা মাংসের মধ্যে ডোবা চোখ দুটি শুধু স্বচ্ছ উদার হাসিতে জেগে থাকে।

‘ওহে ধন্বন্তরি, শুনছ! বড় ক্লান্ত লাগছে, আর পারছি না, একটু শুই?..’

‘না শোবে না।’ কাটা জবাব দেয় ডাক্তার।

‘বেশ, তুমি চলে গেলেই আমি শোব...’

‘খবরদার মা, ওকে একটুও শুতে দেবেন না। বালিশগুলো ঠিক করে দিন তো একটু। আর দেখুন ওর সঙ্গে কথা বলবেন না; খুব খারাপ হবে তাহলে...’

মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ছোট ছোট দ্রুত পা ফেলে ডাক্তার বেরিয়ে গেল। ইয়েগর মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে চোখ বুজে স্থির হয়ে রইল। আঙুলগুলো শুধু আস্তে আস্তে নাড়ে। ছোট্ট ঘরখানির সাদা দেয়ালগুলো থেকে উঠছে শুকনো হিমেল নিশ্বাস, নিষ্প্রভ বিষণ্ণতা। ঘরের মধ্যে বড় বড় জানালা। তার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় একটা লাইম গাছের কোঁকড়ান মাথা — ধূলি-ধূসর ঘন-শ্যামল পাতার ফাঁকে ফাঁকে হলুদ রঙের ছোপ ফেলেছে আসন্ন হেমন্তের ঠাণ্ডা পরশ।

চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে আছে ইয়েগর, বলে চলেছে, ‘ধীরে ধীরে মরণ এগিয়ে আসছে — নেহাৎ অনিচ্ছায়। বোধ হয় একটু মায়া আছে আমার উপর — এত শক্ত ছোকরা ছিলাম...’

মা আস্তে আস্তে ওর হাতে হাত বুলতে বুলতে মিনতি করে:

‘ছিঃ কথা বল না, ইয়েগর ইভানভিচ্। একটু চুপ কর।’

‘দাঁড়াও... চুপ করব বৈকি...’

হাঁপাতে লাগল পরিশ্রমে। দম বন্ধ হয়ে আসে। দুবলতায় মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ থেকে দম নিয়ে বলে:

‘আপনি আমাদের সঙ্গে, এটা যে কী চমৎকার। আপনার মুখখানা দেখতে বড় ভালো লাগে। এক এক সময় ভাবি আপনার কথা — কি হবে আপনার? সবার মতো যে আপনাকেও জেলে পচতে হবে। সেটা ভাবতে বড় খারাপ লাগে। আচ্ছা, জেলে যেতে ভয় নেই আপনার?’

‘না।’ সহজে জবাব দেয় মা।

‘ভয় আপনার করবে না, সে আমি জানি। তবুও জেল, সে নরকের বাড়া। আমার এ হাল কী করে হল! ওই জেলে গিয়েই তো। শুনবেন সত্যি কথা? সত্যি মরতে আমি চাই না...’

“না না, ষাট্! এখন মরবার কি হয়েছে!” বলতে যায় মা। কিন্তু

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখের কথা মুখেই থেকে যায়।

'এখনও আমি কাজ করতে পারতাম... কিন্তু কাজ যখন করা যায় না, বেঁচে থাকার তখন কোন মানে হয় না আর — বেঁচে থাকাটা তখন হল বোকামি...'

"কথাটা সত্যি, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা নেই," আপনা থেকেই মনে পড়ে সেই আন্দ্রেই-এর কথা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা। যেন ঝড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে সারাটা দিন। ক্লান্তিতে দেহ আর বইছে না। ক্ষিদেও পেয়েছে। রোগীর একটানা শ্লেষ্মাজড়িত চাপা স্বরের কথাগুলো যেন নিঃসহায় ভাবে দেয়ালে ভর দিয়ে সমস্ত ঘরের বাতাসকে ভারি করে তুলছে। জানালার ওদিকে লাইম গাছগুলোর মাথা দেখায় নীচু মেঘের মতো। এমনি বিষণ্ণ কালো, দেখলে অবাক হতে হয়। চারদিক আশ্চর্য শান্ত, স্তব্ধ, কালো সন্ধ্যাখানি রাত্রির প্রতীক্ষায় থম্‌থমে।

'বড় খারাপ লাগছে!' বলে ইয়েগর। চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়ে থাকে।

'ঘুমোও একটু, হয়তো একটু ভালো লাগবে,' মা বলে।

কান পেতে শোনে নিশ্বাস পড়ছে কিনা। চারদিকে তাকায়, তারপর স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে কয়েক মুহূর্ত শীতল বেদনায় মুহ্যমান হয়ে। ধীরে ধীরে তন্দ্রা আসে।

হঠাৎ দরজার কাছে একটা চাপা শব্দ শুনে ধড়্‌ফড়্‌ করে জেগে ওঠে মা। ইয়েগর তাকিয়ে আছে। নীচু স্বরে বলে মা:

'ছিঃ ছিঃ, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ক্ষমা করো।'

'তুমিও আমায় ক্ষমা করো...' ইয়েগরের স্বরও মায়ের মতোই কোমল।

খোলা জানালার মধ্যে দিয়ে গোধূলী ঘরটির পানে চেয়ে থাকে। একটা ঝাপসা ঠান্ডা মুখচোখের ওপর চেপে বসে। ঘরের মধ্যে সবকিছু অদ্ভুত নিস্তেজ হয়ে এসেছে, কালো ছায়ায় কালো হয়ে আছে রোগীর মুখ।

খস্‌খস্‌ শব্দ... লুদ্‌মিলার গলা শোনা যায়:

'অন্ধকারে বসে দিব্যি গুজ্‌গুজ করছ দু'জনে... সুইচ্‌টা আবার কোথায়?'

হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ সাদা আলোয় ঘরটা ভরে যায়। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবসনা লুদ্‌মিলার ঋজু, দীর্ঘ মূর্তি।

ইয়েগরের সর্বাঙ্গে একটা তীব্র শিহরণ খেলে গেল। হাতটা তুলে আনল বুকের ওপর।

'কি হল?' বলে চীৎকার করে ছুটে এল লুদ্‌মিলা।

মায়ের মুখের ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে ইয়েগরের দৃষ্টি। অদ্ভুত বড় আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখ দুটি।

মুখটা মস্ত বড় একটা হাঁ হয়ে গেল। মাথাটা খাড়া হয়ে উঠল। হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল। সাবধানে হাত ধরে মা রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে ইয়েগর বলে উঠল:

'আর পারি না... চল্লাম!..'

দেহটা নরমভাবে একটু শিউরে উঠল, কাঁধের ওপর মাথাটা পড়ল এলিয়ে। ঝোলান বাতিটার আলো নিষ্প্রাণ হিম ঔদাস্যে ঠিকরে পড়ল ওর বিস্ফারিত চোখের ওপর।

মা চুপি চুপি বলে, 'লক্ষ্মীটি!'

লুদ্‌মিলা আস্তে আস্তে সরে যায় বিছানার কাছ থেকে; জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে কোথায় জানি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর মায়ের সম্পূর্ণ অচেনা, একটা অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে বলে ওঠে:

'মরে গেছে...'

ঝুঁকে পড়ে কনুই দুটো রাখে জানালার তাকে, পরক্ষণেই হঠাৎ যেন মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে এমনি ভাবে হাঁটু গেড়ে দুই হাতে মুখ চেপে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

মা ইয়েগরের ভারি হাত দু'খানা ওর বুকের ওপর তুলে দিল; অদ্ভুত ভারি মাথাটা বালিশের ওপর ঠিক করে রাখল। তারপর চোখ মুছতে মুছতে লুদ্‌মিলার কাছে এসে আস্তে আস্তে ওর ঘন চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরে তাকায় লুদমিলা। তার নিরুজ্জ্বল চোখ দুটি বেদনা-বিস্ফারিত হয়ে উঠল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা ঠোঁটে ফিসফিস করে বলতে লাগল:

'এক সঙ্গে জেল খেটেছি... নির্বাসনে থেকেছি... মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠত, গা ঘিনঘিন করত... অনেকে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছে...'

শুকনো ফোঁপানিতে গলা আটকে যায়। জোর করে সেটা চেপে রেখে মায়ের খুব কাছে মুখ নিয়ে আসে ও। গভীর ব্যথায় মুখখানা কোমল

হয়ে উঠেছে। সেই কোমলতায় বয়সের অনেকগুলো অংক মুছে গিয়ে অনেক কচি দেখায় লুদ্‌মিলাকে।

'কিন্তু কী হাসিখুশিই ছিল সর্বদা...' চোখে জল নেই, শুকনো ফোঁপানিতে দেহ আলোড়িত, 'যত কষ্টই হোক ভেতরে, সে-সব চেপে রেখে হাসি-ঠাট্টায় সর্বদা আসর জমিয়ে রাখত... দুর্বলচিত্ত লোকেদের সাহস দিতে চেষ্টা করত। কত দরদ, সহানুভূতি, মায়ামমতা যে ছিল ওর... ওখানে সাইবেরিয়ায় অধিকাংশ মানুষ খারাপ হয়ে যায় কাজকর্ম না থাকার জন্যে। লোকের মন্দ দিকটা তখন বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ও জানত কি করে মানুষকে মানুষ রাখতে হয়!.. যদি জানতেন, কী কমরেড ছিল! ব্যক্তিগত জীবনে কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল! কিন্তু ওর মুখ থেকে এতটুকু নালিশ কেউ কোনও দিন শোনেনি। কোন দিন না! আমিই ছিলাম ওর বড় বন্ধু। ওর কাছে আমি খুব ঋণী। ওর বিরাট মনের দৌলতের যতখানি পারে ও আমায় দিয়ে গেছে। আমাকে সব কিছু দিয়েছে কিন্তু একলা পড়ে ক্লান্ত হয়ে এতটুকু কিছু আমার কাছে চায়নি, না আদর, না মনোযোগ...'

ইয়েগরের কাছে গিয়ে নীচু হয়ে ওর হাতে চুমু খেতে খেতে অনুচ্চ শোকাকুল কণ্ঠে বলে:

'কমরেড, বন্ধু, আমার একান্ত আপনার জন! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আমার অন্তরের ধন্যবাদ নাও, বিদায়! যাও তুমি, যত দিন বেঁচে আছি আমি তোমারই মতো কাজ করে যাব — এমনি অনলস, এমনি অটুট বিশ্বাসে!.. বিদায়!'

চাপা কান্নায় ওর সারা দেহ তোলপাড় হতে থাকে; ইয়েগরের পায়ের ওপর মাথা রেখে ফোঁপায় লুদ্‌মিলা। মায়ের চোখে নীরব অশ্রুর বন্যা। চাপতে চেষ্টা করে মা; সান্ত্বনা দিতে চায় লুদ্‌মিলাকে — যে সান্ত্বনায় বুকে বল আসবে, দেহে শক্তি আসবে। বলতে চায় ইয়েগরের কথা, ভালোবাসা আর বিষাদে ভরা সে কথা। বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ইয়েগরের দিকে চায় — আধখোলা চোখ, যেন ঝিমিয়ে পড়েছে; নীল ঠোঁট দুটিতে মৃদু হাসি লেগে আছে। চারধারে শান্ত স্তব্ধতা, একঘেয়ে ঔজ্জ্বল্য...

ইভান দানিলভিচ্‌ আসে তার অভ্যস্ত দ্রুত ছোট ছোট পা ফেলে। ঘরের মাঝখান পর্যন্ত এসেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু'হাত দ্রুত পকেটে ঢুকিয়ে ভীত উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে:

'কখন হল?..'

উত্তর নেই। কপাল ঘষে সে টলতে টলতে এগিয়ে যায় ইয়েগরের কাছে। করমর্দন করে সরে আসে এক ধারে।

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হার্টের অবস্থা যা ছিল... তাতে অন্ততঃ মাসছয়েক আগেই এ হবার সম্ভাবনা ছিল...'

হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ, এখানে বেমানান ভাবে উচ্চ, কণ্টকৃত শান্ত গলাটা ভেঙে গেল। মৃতের বিছানার পাশে মানুষ দুটির দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে থাকে; দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি পাকাতে থাকে ইভান দানিলভিচ্।

মৃদু স্বরে বলে, 'আরেকজন চলে গেল।'

লুদ্‌মিলা উঠে গিয়ে জানালা খুলে দেয়। একান্ত কাছাকাছি হয়ে তিনটি মানুষ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তামসী শারদ-রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার তরুশিরের ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশকে গভীর করে দিয়ে তারারা আলো জেবলে বসে আছে...

মায়ের হাত ধরে, নিঃশব্দে তার কাঁধে মাথা রাখে লুদ্‌মিলা। ডাক্তার মাথা নীচু করে চশমা-জোড়া ঘষে। বাইরের প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে দিয়ে ভেসে আসে শহরের অবসাদগ্রস্ত নৈশ কোলাহল। হিমেল হাওয়া ওদের চুল উড়িয়ে মুখে হাত বুলিয়ে দেয়। চমকে ওঠে লুদ্‌মিলা, গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে। হাসপাতালের বারান্দায় ভীতচকিত ধ্বনি, কাদের যেন দ্রুত পায়ের আওয়াজ, চাপা বিষণ্ণ স্বর, গোঙানি। ওরা তিনজন নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উৎসারিত রাত্রির দিকে তাকিয়ে।

মা'র মনে হয়, ও থাকাতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে। আস্তে আস্তে টেনে নিজের হাতটা মুক্ত করে চলে যায় দরজার দিকে। মৃতের প্রতি মাথাটা একবার নত করে।

'যাচ্ছেন?' মুখ না ফিরিয়ে নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার।

'হ্যাঁ...'

রাস্তায় চলতে চলতে লুদমিলার শুষ্ক অশ্রুজলের কথা মনে পড়াতে ভাবে মা:

"কাঁদতেও জানে না মেয়েটা..."

মনে পড়ে যায় ইয়েগরের শেষ কথাকটি। চোখের সামনে ভাসে ওর

জীবন্ত চোখ দুটো, ওর সেই গল্প-বলা, ঠাট্টা তামাশা। "ভালো মানুষের জীবনই দুর্বহ, মরণ নির্ভার। আমার মরণ কেমন হবে কে জানে?.." মনে মনে ভাবে মা।

মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে অত্যুজ্জ্বল সাদা সেই ঘরখানা... জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে লুদ্‌মিলা আর ডাক্তার... তাদের পেছনে ইয়েগরের প্রাণহীন দুই চোখ... মানুষের জন্য বিশাল করুণায় হঠাৎ মায়ের বুক কানায় কানায় ভরে ওঠে। পাঁজরভাঙা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে আসে; কোন এক নামগোত্রহীন আবেগ ওকে যেন তাড়িয়ে ঠেলে নিয়ে যায়।

মাথা নুইয়ে মা এক বিষণ্ণ কিন্তু সজীব শক্তির কাছে নতিস্বীকার করে। নরম ভাবে সে শক্তি ঠেলা দেয় মাকে।

১১

পরের দিন মায়ের সারাটা বেলা গেল ইয়েগরের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে। সন্ধে বেলা সোফিয়া, নিকলাই আর মা চা নিয়ে বসেছে। এল সাশা। কিসের জন্য কে জানে সে আজ ভীষণ উত্তেজিত। টগ্‌বগ্‌ করছে খুশিতে। গাল দু'খানি লাল টুক্‌টুকে, চোখ দুটিতে যেন খুশির ফুলঝুরি ঝরছে। মায়ের মনে হয় ওর মনে বুঝি কোন্‌ আনন্দোজ্জ্বল আশার জেল্লা লেগেছে। এখানে এই শোকের পরিবেশের সঙ্গে ওর আজকের এই ভাবটা একেবারে বেখাপ্পা, সবাইকে অপ্রস্তুত করে তোলে। অন্ধকার আকাশে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির মতো চোখে ধাঁধা লাগায়। চিন্তিত ভাবে নিকলাই বলে টেবিলে টোকা মারতে মারতে:

'আপনি যেন আজ আর আপনাতে নেই, সাশা!'

'তাই নাকি? হয়ত ঠিকই বলেছেন,' বলেই খুশির হাসি হাসে সাশা।

মা ওর দিকে তাকায়। নীরব তিরস্কার তার চোখে। সোফিয়া ওকে মনে করিয়ে দেবার সুরে বলে:

'আমরা ইয়েগর ইভানভিচের কথা বলছি, বুঝলেন!..'

সাশা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে, 'কি আশ্চর্য মানুষ ছিল ইয়েগর! হাসি-ঠাট্টা ছাড়া এক মুহূর্তও দেখিনি মানুষটাকে। কাজ করতে জানত! লোকটা ছিল বিপ্লবের শিল্পী। বিপ্লবী চিন্তাধারার অত বড় স্রষ্টা আর

কোথায় পাওয়া যাবে! কী সহজ করে, অথচ কী জোরাল ভাষায় মানুষের অন্যায়, অত্যাচার, মিথ্যের কাহিনী বলে যেত।'

শান্তভাবে বলে সাশা; ওর চোখে একটা ভাবনামেশান হাসি। কিন্তু সে হাসিতে ওর আনন্দের আগুন নেবেনি; সবাই স্পষ্টভাবে দেখেছে সে আগুনকে, কিন্তু বোঝেনি কেউই।

সাশা যে-আনন্দ নিয়ে এসেছে সেই অনুভূতিটাকে বন্ধু-শোকের বদলে স্থান দিতে রাজী নয় ওরা। শোক করার অধিকারটা যে ওদের আছে সেটা দেখাবার জন্য, সাশাকেও তাদের মতো বোধ করাবার জন্য তারা চেষ্টা করতে লাগল নিজেদের অজ্ঞাতসারেই।

'আর সেই লোকটাই চলে গেল...' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাশার দিকে তাকিয়ে একটু যেন জেদের সঙ্গে বলে সোফিয়া।

সাশা সকলের দিকে তাকায় সপ্রশ্ন ত্বরিত দৃষ্টিতে। ভুরু দুটো কুঁচকে যায়। নিঃশব্দে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে মন্থর ভঙ্গিতে চুল ঠিক করতে করতে। তারপর আবার সকলের দিকে উদ্ধত চোখে তাকিয়ে জোর গলায় বলে:

'চলে গেছে! কী বলছেন মারা গেছে, তার মানে? কী মারা গেছে? ইয়েগরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, কমরেডের প্রতি আমার ভালোবাসা, তার চিন্তাধারার বিষয়ে স্মৃতি, তার কাজ — সব কি চলে গেল? আমার মনে ও যে অনুভূতি জাগিয়েছিল, ওকে যে-রকম সাহসী সৎ লোক হিসেবে আমি জানতুম, সে সবই কি ফুরিয়ে গেল? আমি জানি আমার কাছে ওর মৃত্যু নেই। আমার মনে হয়, আমরা বড্ড তাড়াতাড়ি মানুষের বিষয়ে বলে ফেলি — মরে গেছে। "নীরব হয়েছে সে, কিন্তু যে কথা সে রেখে গেছে তা অমর হয়ে থাকবে যারা বেঁচে রইল তাদের বুকে।"'

গভীর উত্তেজনায় আবার এসে বসে টেবিলে। টেবিলের ওপর কনুই ভর দিয়ে বলে যায় সে আরো শান্ত, আরো গভীরভাবে। আবিষ্ট আচ্ছন্ন চোখ, হাসে ওদের দিকে চেয়ে।

'হয় তো বাজে কথা বলছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যাঁরা খাঁটি, সাচ্চা মানুষ, মৃত্যু নেই তাঁদের। না, মৃত্যু নেই। অমর তাঁরা, যাঁদের দক্ষিণ হস্তের উদার দানে আমার এই আশ্চর্য জীবনখানি পেয়েছি। এই জীবনের সহস্র বৈচিত্র্যে, অদ্ভুত জটিলতায়, আমার হৃদয়ের প্রিয় সব চিন্তাধারণার বিকাশে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। হয়ত নিজেদের অনুভূতি

প্রকাশ করার বেলায় আমরা খুবই কৃপণ হয়ে নিজেদের চিন্তাতেই ডুবে থাকি। ঐতেই বিকৃতি দেখা দেয়। আমরা সবকিছুর মূল্যবিচার করি, অনুভব করি না...'

'আপনার ভালো কিছু ঘটেছে?' সোফিয়া হেসে বলে।

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে সাশা বলে, 'অত্যন্ত ভাল বলেই তো আমার মনে হয়। সারা রাত বসে ভেসভ্শিচকভের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আগে দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না লোকটাকে। মনে হত, যেমনি জঙ্গলী, তেমনি আকাট মূর্খ। অবশ্য সে রকম লোকই ও ছিল। ওর ভেতরে ছিল সবার প্রতি একটা অন্ধ বিরক্তি, নিজেকে সর্বদা সব কিছুর একেবারে মাঝখানটায় দাঁড় করাত আর সর্বক্ষণ আমি! আমি! আমি করত!'

সাশা আবার হাসিতে উজ্জ্বল দুই চোখ তুলে তাকায় সবাইয়ের দিকে।

'কিন্তু এখন সে সবাইকে ডাকে কমরেড্ বলে। আর কী সেই ডাক! লাজুক লাজুক, অত্যন্ত নরম, প্রীতিতে ভরা! বলে বোঝাতে পারব না। আশ্চর্য সহজ, অকপট হয়ে উঠেছে। কাজের কী আগ্রহ! ও নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। ভালোয় মন্দয় নিজেকে চিনেছে আজ স্পষ্ট করে। সব থেকে বড় কথা কী জানেন — খাঁটি বন্ধুভাব জেগেছে ওর মধ্যে...'

সাশার কথা শুনে বড় ভালো লাগে মায়ের। কঠোর প্রকৃতির মেয়েটি কেমন কোমল হয়ে উঠেছে, কী আনন্দ তার চোখে মুখে! তবু মনের গোপনে একটা খোঁচাও বাজে: "পাভেলের কথা বলছে না কেন?"

'এখন কমরেডদের নিয়ে ওর সারাক্ষণ ভাবনা। জানেন আমায় কী বোঝাচ্ছে? বের করে আনতেই হবে ওদের। পালানো আর কি! বলে সেটা তো খুবই সহজ...'

সোফিয়া মাথা তুলে সাগ্রহে বলে:

'আপনার কী মত, সাশা? সেটাই ভালো!'

মায়ের হাতে চায়ের বাটিটা কেঁপে ওঠে। সাশা ভুরু কুঁচকে ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে — স্বরটা গম্ভীর, কিন্তু মুখে সুখের স্মিত হাসি:

'ওর কথা যদি সত্যি হয় — তাহলে চেষ্টা করে দেখতে হয়! আমাদের কর্তব্য সেটা!..'

হঠাৎ ওর মুখটা লাল হয়ে ওঠে; কিছু না বলে চেয়ারে বসে পড়ে ধপ্ করে।

মা'র মুখটা স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে ওঠে। সোফিয়াও মৃদু মৃদু হাসে। আর নিকলাইও ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে থাকে। তখন সাশা মাথা তোলে, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দীপ্ত চোখের কঠোর দৃষ্টি সবাই-এর ওপর। বলে:

'বুঝেছি, আপনারা সবাই কেন হাসছেন... ভাবছেন নিজের স্বার্থেই বলছি?' ওর গলার স্বর শুকনো, আহত।

সোফিয়া উঠে ওর কাছে যায়। একটু কৌতুকের সুরে বলে, 'কেন সাশা?' মায়ের মনে হয় প্রশ্নটা নিরর্থক, সাশা আঘাত পেয়েছে সোফিয়ার কথাতেই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভুরু তুলে নীরব তিরস্কারে সোফিয়ার দিকে তাকায়।

সাশা বলে ওঠে, 'বেশ তো, আপনারা যদি তাই ভেবে থাকেন, তবে আমি এর সমাধানে যোগ দেব না...'

শান্তভাবে নিকলাই বলে, 'ব্যস্, সাশা, ব্যস্! আর নয়।'

মা-ও ওর কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলয়। সাশা মায়ের হাতখানা ধরে টকটকে লাল মুখখানা তার দিকে তুলে সলজ্জভাবে দেখে। সস্নেহে হাসে মা। কথা জোগায় না মুখে; বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে। সোফিয়া পাশের চেয়ারে এসে বসে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে, সকৌতুকে হেসে ওর চোখে চোখ রেখে বলে:

'অদ্ভুত মেয়ে তো আপনি।'

'হ্যাঁ, বোধ হয় বোকামি করেছি...'

'আপনি কী করে ভাবতে পারলেন...' সোফিয়া শুরু করে, কিন্তু নিকলাই বাধা দেয় তার কথায়। কাজের কথা বলার মতো করে গম্ভীর সুরে বলে:

'সত্যি, জেল থেকে পালানো সম্ভব হলে তা নিয়ে আর দু'মত হতে পারে না। তবে তার আগে জানা দরকার জেলের কমরেডদের মত কী এ বিষয়ে। তাঁরা চান কি না...'

সাশার মাথাটা ঝুঁকে পড়ে।

সোফিয়া একটা সিগারেট ধরায়। ভাই'এর দিকে তাকিয়ে দেশলাই'এর কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় এক কোণে।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তারা চাইবে না, এ কি হতে পারে? কিন্তু ভাবছি, পারবে কি? আমার তো বিশ্বাস নেই...'

আকুল ব্যগ্রতায় তাকিয়ে থাকে মা — ওরা বলুক আর একবার পালানো সম্ভব। কিন্তু ওপক্ষ চুপ। কারো মুখে কথা নেই।

সোফিয়া বলে, 'ভেসভ্শিচকভের সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।'

সাশা অনুচ্চ স্বরে বলে, 'কাল বলব, কখন কোথায় দেখা হবে।'

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সোফিয়া। জিজ্ঞাসা করে, 'ও কী করবে?'

'নতুন ছাপাখানাটায় টাইপ বসাবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে ওকে। ততদিন বনরক্ষকের ওখানেই থাকবে।'

সাশার মুখে আবার কাঠিন্য ফিরে এসেছে, গলাটা নীরস, ভুরু কোঁচকান। মা চায়ের পেয়ালা ধুচ্ছিল, নিকলাই উঠে তার কাছে গিয়ে বলে:

'পরশু যখন পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, ওকে একটা চিরকুট দিয়ে আসবেন। বুঝতে পারছেন তো? আমাদের জানা দরকার...'

'বুঝেছি, বুঝেছি! নিশ্চয় দিয়ে আসব চিঠি...'

'আচ্ছা, আমি আসি তাহলে।' বলে সাশা তাড়াতাড়ি সকলের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে; কাঠের মতো সোজা দেহ, পা ফেলে অদ্ভুত দৃঢ় কঠিন ভাবে।

ও চলে গেলে সোফিয়া মায়ের কাঁধ ধরে দোল দিতে দিতে একটু হেসে শুধয়:

'আচ্ছা, নিলভনা, এ মেয়েকে ভালোবাসতে পারতেন?'

'ভগবান! একটি দিনের মতো অন্তত যদি ওদের দু'টিকে এক করে দেখতে পারতাম!' প্রায় জল এসে যায় মা'র চোখে।

নিকলাই আস্তে আস্তে বলে, 'অল্প সুখই সবার পক্ষে ভালো। কিন্তু অল্প সুখে কেউই সন্তুষ্ট হয় না, এদিকে বেশি হলেই আবার সেটা সস্তা হয়ে যায়...'

সোফিয়া পিয়ানোয় গিয়ে বাজাতে আরম্ভ করে বিষণ্ণ একটা সুর।

১২

পরদিন ভোর বেলা হাসপাতালের গেটে জন ত্রিশচল্লিশ স্ত্রীপুরুষ এসে দাঁড়াল। তাদের কমরেডের শবাধার কখন আসবে বাইরে, তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে তারা। তাদের চার পাশে সাবধানে ঘুরে বেড়ায় টিকটিকিরা, লোকের কথাবার্তা, চালচলন, মুখগুলোকে তারা

মনের মধ্যে গেঁথে নেয়। রাস্তার ওধারে কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে একদল পুলিশ। পুলিশের মুখের বাঁকা হাসি, তাকত দেখাবার আগ্রহ আর টিকটিকিদের বেয়াড়াপনায় সবাই তেতে আছে। কেউ কেউ হাসি-তামাশা করে রাগ চাপে; কেউ বা মাটি থেকে চোখই তোলে না, চেষ্টা করে অপমানজনক কিছু না দেখতে। আবার কেউ বা রাগটা দাবিয়ে না রেখে কর্তাদের মশা মারতে কামান দাগা দেখে বাঁকা বাঁকা টিপ্পনী কাটে—শুধু মুখের কথাই যাদের অস্ত্র তাদেরও এত ভয়? ঝরা-পাতা বিছানো, গোলগোল পাথর-বসানো রাস্তা, — হেমন্তের ফিকে নীল আকাশ থেকে অঝোর ধারে আলো ঝরে তার বুকে। হাওয়ায় পাতা উড়ে পায়ে পায়ে পড়ে।

মা-ও আছে এই ভিড়ের মধ্যে। চেনা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে সে ভাবে:

"তোমাদের তো লোকজন কম আর মজুর তো নেই..."

গেট খুলে যায়। শবাধারের ঢাকনি এগিয়ে আসে। লাল সিল্কের ফিতেসহ ফুলের মালায় সাজান। লোকে একসঙ্গে টুপি তুলে ধরে। মনে হল, এক ঝাঁক কালো পাখি যেন হঠাৎ আকাশে ডানা মেলে দিল। ঢ্যাঙ্গা একজন পুলিশ অফিসার — তার লাল মুখে ইয়া মোটা এক জোড়া কালো গোঁফ — ছুটে এসে ঢুকল ভিড়ের মধ্যে, অভদ্রভাবে দুই হাতে মানুষ ঠেলতে ঠেলতে পেছনে এল সৈন্যের দল। তাদের পায়ে ভারি বুট, পায়ের দাপটে মাটি কাঁপতে লাগল।

রুক্ষ মোটা গলায় হাঁকে পুলিশ অফিসার:

'সব রিবন খুলে ফেলুন!'

উত্তেজিত হয়ে জনতা ওর চারদিকে ঘনভাবে ঘিরে আসে। ঠেলাঠেলি করে হাত নেড়ে কী যেন বলে। ফ্যাকাশে উদ্বিগ্ন মুখগুলো মায়ের চোখের সামনে ছুটোছুটি করে। ওদের ঠোঁট কাঁপছে; এক মহিলার গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। অপমানে কাঁদছে সে...

তরুণ কণ্ঠে কে যেন গর্জন করে ওঠে:

'জুলুমবাজী চলবে না!' হাঁকটা মিলিয়ে গেল হট্টগোলে।

মায়ের বুক বেদনার্ত হয়ে ওঠে। দীনহীন বেশে ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন যুবক। তাকে বিরক্তির স্বরে বলে:

'এ কি? মানুষটা মরে গেছে, তাকে একটু ইচ্ছেমত সাজিয়ে নিয়ে যাব, তাও পারব না?'

ক্রমেই আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠে। জনতার মাথার ওপর দিয়ে দুলছে শবাধারটার ঢাকনি। রিবনগুলি হাওয়ায় উড়ে উড়ে লোকের মাথায় মুখে পড়ে; একটা ভীরু খস্‌খসানি আওয়াজ ওঠে তা থেকে।

মা ভয় পেয়ে যায়, এখনি বুঝি মারামারি লাগবে। এদিক ওদিক তাড়াতাড়ি অনুচ্চ স্বরে বলতে থাকে:

'থাক্, থাক্! এ রকম যদি হয় তাহলে নিক না রিবন! দিচ্ছি খুলে সব...'

সব কোলাহল চাপিয়ে কার তীক্ষ্ণ জোরালো স্বর শোনা যায়:

'শেষ যাত্রায় আমাদের কমরেডকে নিয়ে যাবো, বাধা দিতে পারবে না। তোমাদের জুলুমে প্রাণ দিয়েছে...'

উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরল কে:

অসম যুদ্ধের মরণ যজ্ঞে...

'সরিয়ে ফেলুন রিবন, সরান জলদি! ইয়াকভ্‌লেভ! কেটে ফেল সব রিবন!'

খাপ থেকে তলোয়ার বের করার শব্দ শোনা যায়। মা চোখ বোজে, এই বুঝি চেঁচিয়ে উঠবে লোকে। কিন্তু তারা নিরুপায় ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো গোঁ গোঁ করে শুধু; একটা চাপা প্রতিবাদের গুঞ্জন ওঠে। তারপর নীরবে, মাথা নীচু করে জনতা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। পায়ের খসখসানি বাজতে থাকে রাস্তায়।

সামনে মাথার ওপরে ভাসে লাঞ্ছিত শবাধারের ঢাকনিটা মাড়ানো ফুলের মালায় সেজে। এদিক ওদিক পেছনে ঘোড়সওয়ার পুলিশ। মা ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছে; শবাধারটা আর দেখা যায় না মানুষের ঘন ভিড়ে। কখন যে এত মানুষ জুটল কে জানে, সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে। জনতার পেছনেও ধূসর বেশে পুলিশ চলেছে — তলোয়ারের বাঁটে হাত দিয়ে। পদাতিক পুলিশও চলেছে। চারদিকে মায়ের চেনা টিকটিকিদের তীক্ষ্ণ চোখ।

দুটি সুন্দর কণ্ঠ বিষণ্ণভাবে গান গেয়ে ওঠে:

বিদায় কমরেড, বিদায়! তোমায় বিদায়...

কে একজন চীৎকার করে ওঠে, 'না, গান নয় আজ। আজ নীরবে মার্চ করে যাব।'

সেই চীৎকারে একটা কঠোর আদেশের সুর ছিল। বিষণ্ণ গান থেমে যায়, কথাবার্তা নীচু পর্দায় নেমে যায়; রাস্তার বুকে শুধু মানুষের পায়ের সমান তালের চাপা শব্দ বাজে। মাটির বুক থেকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে ওঠে সে শব্দ, জনতার মাথার ওপর দিয়ে স্বচ্ছ আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ যেন দূরের ঝড়ের প্রথম মেঘ-গর্জনের প্রতিধ্বনি। ঠান্ডা কন্‌কনে হাওয়া। ক্রমেই তার বেগ বেড়ে ওঠে। ধুলো বালি, রাস্তার আবর্জনা উড়িয়ে এনে ছুঁড়ে ফেলে ওদের মুখে। চুল, জামা কাপড় উড়িয়ে ছিঁড়ে কোথায় নিয়ে যায়। চোখ অন্ধ; বুকে লাগছে বাতাসের মার, পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঘূর্ণি...

নিঃশব্দ মিছিল, পুরোহিত নেই, শোকের গাথা নেই... শুধু চিন্তাকুল মুখ আর কুঞ্চিত কপাল। একটা শঙ্কিত অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলে মাকে, ধীরে ধীরে সারা মন ছেয়ে ফেলে বিষণ্ণ কথাগুলো:

"সত্যের জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায় এমন মানুষ অনেক নেই..."

নত মস্তকে হেঁটে চলে মা। মনে হয়, এ তো ইয়েগরের শবযাত্রা নয় — অন্য কিছুর, যা একান্ত প্রিয় এবং একান্ত প্রয়োজন। বড় বিশ্রী লাগে। নিজেকে বড় অপ্রস্তুত, বেমানান বলে মনে হয়। ইয়েগরের শেষকৃত্য করতে যারা চলেছে কোথাও যেন এদের সঙ্গে ওর মিল নেই। এই কথাটাই একটা শঙ্কিত চেহারা নিয়ে অভিভূত করে ফেলে মাকে। মনে মনে ভাবে:

"অবশ্য ইয়েগর ছিল নাস্তিক, এরাও তো তাই..."

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিন্তাটাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় না মা, তাই শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ইচ্ছে হয় একটা বিষম বোঝা যেন বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

"ভগবান! ভগবান! আমাকেও কি এমনি করে..."

গোরস্থানে এসে পেঁাছে যায় মিছিল। কবরের ফাঁকে ফাঁকে এঁকেবেঁকে সরু পথ বেয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পেঁাছয়। নীচু নীচু সাদা ক্রুশ চারদিকে। একটা খোঁড়া কবরের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। সকলেই চুপ। মৃতের রাজ্যে জীবিত মানুষের এই কঠিন নীরবতা যেন সাঙ্ঘাতিক কিসের প্রতীক্ষায় থমথম করছে — মায়ের বুক চমকে ওঠে; হৃৎপিন্ডটার ধুক্‌ধুকানি যেন থেমে যেতে চায়। পাগল বাতাস হেঁকে হেঁকে যায় কফিনের ছেঁড়া ফুলগুলিকে নাড়া দিয়ে। সমাধির ফাঁকে ফাঁকে ওঠে তার দীর্ঘশ্বাস...

পুলিশের দল তাদের সর্দারের দিকে তাকিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবরের মাথার দিকে গিয়ে দাঁড়ায় এক দীর্ঘদেহ লম্বাচুলওলা

যুবক — ফ্যাকাশে মুখে কালো-চওড়া এক জোড়া ভুরু। মাথায় টুপি নেই। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল পুলিশের সর্দারের ভাঙা গলা:

'মশায়েরা...'

কালো ভুরুওয়ালা যুবকটি উচ্চ জোরালো গলায় শুরু করে:

'কমরেডগণ!'

সর্দার চেঁচিয়ে ওঠে, 'খবরদার! বক্তৃতা করা চলবে না এখানে...'

যুবকটি শান্তভাবে বলে, 'বেশি নয়, সামান্য দুটি কথা বলব মাত্র। কমরেডগণ! আজ আমাদের শপথ নেবার দিন। আমাদের গুরুর, বন্ধুর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে বলি, তাঁর শিক্ষা আমরা কোনোদিন ভুলব না। যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা আমাদের মাতৃভূমির সর্ব অকল্যাণের উৎস, আমরণ সেই অত্যাচারী রাক্ষুসে শক্তির কবর খোঁড়াই হবে আমাদের দিবা-রাত্রির, স্বপ্নজাগরণের একমাত্র ব্রত।'

অফিসার চীৎকার করে ওঠে, 'গ্রেপ্তার করো!' কিন্তু তার চীৎকার জনতার কোলাহলে ডুবে যায়।

'রাজতন্ত্র মুর্দাবাদ!'

ভিড় ঠেলে বক্তার দিকে পুলিশ ছুটে আসে। কিন্তু ওর চারদিকে লোকে এসে ঘিরে ওকে আড়াল করে দাঁড়াল। এক হাত নেড়ে কম্বুকণ্ঠে সে ধ্বনি তুলল:

'স্বাধীনতা জিন্দাবাদ!'

ঠেলায় ঠেলায় একধারে ছিটকে পড়ে মা। একটা ক্রুশ হেলান দিয়ে ভয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে কখন এসে ঘা পড়ে মাথার ওপর। চারপাশের প্রচণ্ড চীৎকারে কান যেন ফেটে যায়। পায়ের তলা থেকে সরে যায় মাটি; হাওয়ার ঝাপটায় আর ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। ঘন ঘন শোনা যায় পুলিশের ভয়-জাগানো সিটি আর কর্কশ গলার হুকুম, তার সঙ্গে স্ত্রীলোকদের উন্মত্ত চীৎকার, শুকনো মাটির ওপর ভারি বুটের আওয়াজ; কবরখানার বেড়া ভেঙে যাওয়ার শব্দ। এমনি করে অনেকটা সময় কাটে। চোখ বন্ধ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আর সাহস হয় না মা'র।

চোখ খুলে একবার তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠে ছুটে যায় মা হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে। অদূরে কবরের ফাঁকে ফাঁকে চলে যাওয়া একটা সরু রাস্তার ওপর সেই লম্বা-চুল যুবকটিকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ওকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য চারদিক থেকে জনতা হামলা করছে। পুলিশ তাদের মেরে

ঠেঙিয়ে পিছু হঠাবার চেষ্টা করছে। খোলা তলোয়ারগুলি কঠিন, হিম শুভ্র জেল্লা তুলে শূন্যে চমকে চমকে উঠছে। এই মাথার ওপর, তার পর নেমে আসছে জনতার মধ্যে। ও পক্ষ থেকেও লাঠি, ছড়ি, ভাঙা রেলিং ঘূর্ণি পাকাচ্ছে। প্রলয়-তাণ্ডবে মেতে উঠেছে লোকে। সবের ওপর দিয়ে দেখা যায় সেই যুবকের পাণ্ডুর মুখখানি, খ্যাপা মানুষের পাগলামির তুফান-কলরোল ছাপিয়ে ওর বলিষ্ঠ কণ্ঠ বেজে উঠে:

'বন্ধুগণ! শক্তি ক্ষয় করছেন কেন?..'

হাতের লাঠি ফেলে লোকে একের পর এক ছুটে সরে যায় এদিক ওদিক। মা ঠেলাঠেলি করে শুধু এগিয়ে চলে সামনের দিকে—যেন কোন এক অদম্য শক্তি তাকে নিয়ে আসে। দেখে নিকলাই প্রাণপণ চেষ্টায় ক্রোধে মত্ত জনতাকে পাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

'কি করছেন?' তিরস্কার করে ও, 'পাগল হলেন সব? শান্ত হন!..'

মায়ের যেন মনে হয় নিকলাইয়ের একটা হাত লাল।

'পালান, পালান, নিকলাই ইভানভিচ্!' চীৎকার করতে করতে ওর দিকে ছুটে আসে মা।

'কোথায় যাচ্ছেন? মার খাবেন যে...'

কার যেন হাত পড়ে মায়ের কাঁধে। তাকিয়ে দেখে, সোফিয়া। টুপি নেই মাথায়; আলুথালু চুল, একটি তরুণের হাতটা ধরে সাহায্য করছে। নেহাৎ কচি ছেলে, মুখের রক্ত মুছতে মুছতে বলে:

'কিছু লাগেনি আমার — ছেড়ে দিন...' তার ঠোঁট দুটো থরথর্ করে কাঁপতে থাকে।

'এই যে ওকে বাড়ী নিয়ে যান। এই রুমালটা, কাটা-টা বেঁধে দিন...' ক্ষিপ্র নির্দেশ দিয়ে ছেলেটির হাত মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছোটে সোফিয়া। যেতে যেতে বলে:

'শীগ্গির যান এখান থেকে, নয় তো ধরা পড়বেন...'

জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে চতুর্দিকে পালায়। তাদের পেছনে পুলিশ কবরখানায় ঘুরে বেড়ায় খোলা তলোয়ার দুলিয়ে। গাল দেয়; গায়ে বিরাট বিরাট ঝোলা ওভারকোট, চলতে গিয়ে পা আটকে যায়। নেকড়ের মতো তাদের দিকে তাকায় ছেলেটি। রুমালে ওর মুখটা মুছিয়ে দিয়ে মা চুপি চুপি তাড়া দেয়:

'চল শীগ্গির, চল।'

সে বিড়বিড় করে বলে, 'দাঁড়ান। আমার জন্য ভাববেন না। কিছু

লাগেনি আমার।' বলতে বলতে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে খানিকটা। 'তলোয়ারের বাঁট দিয়ে ঠুকেছে... আমিও ছাড়িনি—এমনি লাঠির বাড়ি মেরেছি! বাছাধন চেঁচিয়ে অস্থির!..' বলে রক্তে-ভেজা মুঠিটা শূন্যে নেড়ে চীৎকার করে ওঠে:

'অপেক্ষা কোরো একটু, দেখিয়ে দেব তোমাদের! কড়ে আঙুলটিও না তুলে থেঁৎলে মাটির সঙ্গে পিষে দেব একেবারে। একবার উঠে দাঁড়াই, শ্রমিকরা একবার সব একজোট হয়ে নিক!'

মা ওকে টেনে নিয়ে কবরখানার ছোট দরজাটার দিকে যায়। মনে হয়, বেড়ার ওধারে খোলা ময়দানটায় ওঁৎ পেতে আছে পুলিশেরা। এখান থেকে বেরুলেই অমনি ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, ওদের মারতে শুরু করবে। কিন্তু গেটে পৌঁছে ওধারে উঁকি মেরে দেখে—হেমন্ত-গোধূলির ধূসর পর্দায় ঢাকা খোলা মাঠ বুক পেতে আছে। নিস্তব্ধ নির্জন শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বুকে শান্তি আসে।

'চলুন মুখটা বেঁধে দিই!' মা বলে।

'না না দরকার নেই। লজ্জার কিছুতো করিনি। সামনাসামনি লড়েছি! সেও মেরেছে, আমিও মেরেছি। ব্যস্...'

তাড়াতাড়ি ছেলেটির ক্ষতটা বেঁধে দেয় মা। রক্ত দেখে মনটা করুণায় ভরে যায়। ভেজা উষ্ণতা স্পর্শ করতেই সারাটা দেহ শিউরে ওঠে আতঙ্কে। নিঃশব্দে শীগ্‌গির ছেলেটিকে টেনে নিয়ে মাঠের পথে নেমে পড়ে মা। মুখ থেকে পট্টিটা ফাঁক করে একটু ঠাট্টার সুরে শুধয় ছেলেটি:

'আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কম্‌রেড্? আমি নিজেই যেতে পারব!..'

কিন্তু মায়ের হাতের মুঠিতে ওর হাত কাঁপে থর্‌থর্ করে, পা দুটো টলে। ক্ষীণ দুর্বল স্বরে ও কথা কয়ে চলে। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে শুধয়:

'আপনি কে? আমি একজন টিনমিস্ত্রী। আমার নাম ইভান। আমরা তিনজন ছিলাম ইয়েগর ইভানভিচের পাঠচক্রে — তিনজন টিনমিস্ত্রী... সবশুদ্ধ অবশ্য ছিল এগার জন। আমরা সবাই ওঁকে খুব ভালোবাসতাম। ভগবান শান্তি দিন ওঁকে! অবশ্যি ভগবান টগবান বিশ্বাস করি না আমি...'

একটা রাস্তায় পড়ে মা একটা গাড়ী ডাকে। ইভানকে গাড়ীতে বসিয়ে চুপি চুপি বলে দেয়, এখন যেন আর কথা টথা না বলে। তার পর রুমাল দিয়ে আবার ভালো করে মুখটা বেঁধে দেয়।

হাত তুলে বাঁধনটা আল্‌গা করতে চায় ইভান। কিন্তু দুর্বল হাতখানা এলিয়ে পড়ে যায় কোলের ওপর। তবুও বাঁধনের মধ্য দিয়েই বক্‌ বক্‌ করে চলে:

'সাতজন্মে ভুলব না এসব আঘাতের কথা, আমার বাছাধনরা... উনি আসার আগে — একজন ছাত্র ছিল, নাম ছিল তিতোভিচ্‌... সে আমাদের পড়াত রাজনৈতিক অর্থনীতি... কিন্তু একদিন ওকে ধরে নিয়ে গেল...'

মা ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়। হঠাৎ কেমন নেতিয়ে পড়ে ইভান। কথা কয় না। ভয়ে বুক শুকিয়ে যায় মা'র। আড়চোখে চারদিকে চায় — কোন্‌ আনাচেকানাচে পুলিশ ঘাপ্‌টি মেরে আছে, কে জানে? এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইভানের ব্যাণ্ডেজ করা মাথা দেখলে আর রক্ষে নেই; ছিনিয়ে নিয়ে খুন করে ফেলবে ছেলেটাকে।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে গাড়োয়ান। দিলখোলা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'খুব গিলেছে বুঝি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলে, 'ওকে কি আর গেলা বলে!'

'তোমার ছেলে?'

'হ্যাঁ। মুচির কাজ করে ও, আর আমি করি রান্নার কাজ।'

'আ হাঃ হাঃ, ভারি কষ্ট তো!'

ঘোড়াটাকে চাবুক কসিয়ে আবার এদিকে ফিরে একটু নিচু স্বরে বলে:

'আজ জানো, কবরখানায় কী মারামারি হয়ে গেল!.. শুনলাম কর্তাদের সঙ্গে যাদের আদায় কাঁচকলায় সেই রকম এক রাজনৈতিক দলের একজনকে নাকি কবর দিতে এসেছিল তার বন্ধুবান্ধব। ওখানে রব উঠল, কর্তারা নিপাত যাক্‌! কর্তারা লোকের সর্বনাশ করে কিনা... তারপর পুলিশ এসে সব ঠ্যাঙ্গাতে শুরু করে। শুনলাম ঠ্যাঙ্গাতে ঠ্যাঙ্গাতে নাকি মেরেই ফেলেছে কটাকে। তা তেনারাও গুঁতুনি কম খাননি...' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথাটা নেড়ে নেড়ে অদ্ভুত গলায় বলে, 'মরা মানুষগুলোকে অবধি একটু শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেয় না!'

পাথরে পাথরে গাড়ী সশব্দে ঝাঁকানি খায়, ইভানের মাথাটা নড়ে ওঠে মায়ের বুকের মধ্যে। কোচ্‌বাক্‌সে আধ-ফেরা হয়ে বসে আপন মনে বক্‌ বক্‌ করে চলে কোচ্‌ম্যান্‌:

'চারদিকে অশান্তি। ভুঁই ফুঁড়ে যত ঝামেলা উঠছে। এই তো কাল রাত্তিরেই — পুলিশ এল আমাদেরই পাড়ায় এক বাড়ীতে। সারা রাত্তির

ধরে বাড়ীটা ওলটপালট্ তছনছ করে ছাড়ল। তারপর একজন কামারকে ধরে নিয়ে চলে গেল। লোকে বলছে কী জানো? মাঝরাত্তিরে নাকি ওকে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে মারবে। আ হাঃ হাঃ! অথচ ভালো লোক ছিল গো...'

'নাম কী লোকটার?' মা শুধোয়।

'কার? সেই কামারের? সাভেল। ডাক-নাম ইয়েভ্চেংকো। অল্পবয়সী কিন্তু বুঝত প্রচুর। তা দেখছি তো বুঝলেই ফ্যাসাদ। প্রায়ই আসত আমাদের কাছে; বলত, কিসের মধ্যে আছ তোমরা গাড়োয়ানেরা, দেখতে পাও না? তা আমরা আর কী বলব! সত্যি কুকুরও তো থাকে না এমনি করে।'

'এই থামো, থামো!' মা বলে।

গাড়ীর ঝাঁকানিতে ইভান জেগে ককিয়ে ওঠে।

কোচ্ম্যান বলে, 'যাও না, খুব ভদ্কা খাওগে যাও! মজাটা টের পাও এখন...'

বহু কষ্টে পা ফেলে টলতে টলতে চলে ইভান, বলে:

'কিচ্ছু দরকার নেই... নিজেই পারব...'

১৩

সোফিয়া আগেই বাড়ী পৌঁছে গেছে। দাঁতের ফাঁকে সিগারেট চেপে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

ইভানকে সোফায় শুইয়ে দেওয়া হল। নিপুণ হাতে ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখ কুঁচকে সোফিয়া বলে:

'ইভান দানিলভিচ্, এই যে নিয়ে এসেছেন! খুব ক্লান্ত হয়েছেন, নিলভনা, না? ভয় পেয়েছিলেন নিশ্চয়! এখন বিশ্রাম করুন। নিলভনাকে একটু পোর্ট ঢেলে দাওতো, নিকলাই।'

ঘটনাটার জেরটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি মা। হাঁপাচ্ছে, বুকে কেমন একটা ব্যথা। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। বিড়বিড় করে বলে:

'আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না...'

অথচ মনে তীব্র ইচ্ছে, কেউ মনোযোগ দিক ওর দিকে, ওকে যত্ন করুক।

পাশের ঘর থেকে আসে নিকলাই — একটা হাত বাঁধা। সঙ্গে ডাক্তার ইভান দানিলভিচ্। আলুথালু পোষাক, এলোমেলো চুল, সমস্ত আকৃতিতে

যেন একটা সজারুর কাঁটার মতো তীক্ষ্ণতা। তাড়াতাড়ি ইভানের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ওকে দেখতে আরম্ভ করে।

'জল চাই। অনেকখানি, বেশি করে এনো। আর খানিকটা তুলো আর পরিষ্কার কাপড়।'

মা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই নিকলাই এসে হাত ধরে ওকে খাবার ঘরে নিয়ে যায়। সস্নেহে বলে:

'আপনাকে বলা হয়নি। বলা হয়েছে সোফিয়াকে। খুব ঘাবড়ে গেছেন, না মা?'

ওর দরদভরা চোখজোড়া দৃষ্টির সামনে মা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে:

'উঃ কী সাংঘাতিক! মানুষকে মারলে! ধরে ধরে কেটে ফেললে!..'

পোর্টের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে নিকলাই বলে, 'আমি দেখেছি। দু'দিকেরই মাথা কিছু গরম হয়ে গিয়েছিল। তবু শান্ত হন আপনি। কার্টেনি কাউকে, তলোয়ারের ভোঁতা দিকটা দিয়ে বাড়ি মেরেছে। একজনই মাত্র খুব গভীর ভাবে জখম হয়েছে। ঠিক আমার চোখের সামনে হল ব্যাপারটা। আমিই তাকে ভিড় থেকে টেনে বের করলাম...'

ঘরখানার আলোয়, উষ্ণতায়, নিকলাইয়ের গলার স্বরে আর মুখের ভাবে মা প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে:

'আপনাকেও মেরেছে?'

'ওরা ঠিক মারেনি। মনে হয়, আমার নিজের দোষেই হাতটা কিসের সঙ্গে ঘষটে খানিক চামড়া উঠে গেছে। চাটা খেয়ে নিন তো! বাইরে বড় ঠান্ডা অথচ গরম কাপড়টাপড় তো পরেননি দেখছি...'

হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিতে গিয়ে নজর পড়ে হাতের আঙুলে শুক্‌নো রক্তের দাগ। হাতটা পড়ে যায় কোলের ওপর — জামাটাও ভিজে। চোখ বিস্ফারিত করে ভুরু তুলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মা। মাথাটা ঘুরে ওঠে, বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে।

"পাভেল — পাভেলকেও হয়তো — অমনি!.."

ডাক্তার এসে ঘরে ঢোকে। শুধু একটা গরম গেঞ্জি পরা, আস্তিন গোটান। নিকলাইয়ের মৌন প্রশ্নের জবাব দেয় ডাক্তার:

'মুখের চোটটা তেমন সাংঘাতিক নয়, কিন্তু মাথার খুলিটা জখম

হয়েছে — খুব বেশি নয় অবশ্যি। শক্ত আছে ছোকরা। কিন্তু রক্ত পড়েছে মেলাই। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব?'

'কেন? থাক না এখানে!' নিকলাই বলে ওঠে।

'তা থাকতে পারে, আজ আর কাল। কিন্তু তারপরে হাসপাতালে থাকলেই সুবিধা হবে। বাড়ী-বাড়ী যাবার আমার সময় নেই। কবরখানার ঘটনাটা সম্পর্কে একটা ইস্তাহার লিখবে তো?'

'তা তো লিখবই।' জবাব দেয় নিকলাই।

মা নিঃশব্দে উঠে রান্নাঘরের দিকে যায়। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে মাকে থামিয়ে দিয়ে বলে ও, 'উঠছেন কেন? আজ সোফিয়াই সব করে নেবে।'

নিকলাইয়ের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে মা, অদ্ভুত ভাবে হেসে বলে:

'আমি যে রক্তে একদম ভিজে গেছি...'

কী আশ্চর্য ঠাণ্ডা এই মানুষগুলি! এক সাংঘাতিক ব্যাপারটা কত সহজে এরা সামলে নিলে! নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে অবাক হয়ে ভাবে মা। এ চিন্তায় যত ভয় সব চলে গিয়ে সাহস ফিরে আসে। আহত ছেলেটি যেখানে শুয়েছিল সেই ঘরে এসে দেখে মা, সোফিয়া ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলছে:

'ছিঃ! ওসব বলতে নেই কমরেড্!'

'না, না, আপনাদের অসুবিধা হবে!' ক্ষীণ প্রতিবাদ আসে।

'কথা বলে না। এখন আপনার উচিত চুপ করে থাকা...'

সোফিয়ার কাঁধে হাত রেখে পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় মা। তার পর ইভানের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলতে থাকে গাড়ীতে ও কেমন প্রলাপ বকেছিল আর ওর অসাবধান কথায় সে কত ভয় পেয়েছিল। ইভান শোনে, চোখ দুটো অসহ্য তাপে জ্বলছে, ঠোঁট চেপে বিব্রত হয়ে বলে ওঠে:

'উঃ আমি কী বোকা!'

কম্বলটা ঠিক করে দিতে দিতে সোফিয়া বলে, 'আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি। আপনি ঘুমুন তো।'

খাবার ঘরে এসে বসে সবাই, আজকের ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা চলে অনেকক্ষণ। সেই উত্তেজনা আর নেই — এ যেন অনেক দিন আগের ঘটনা, তারা ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখে প্রত্যয়ের চোখে, আসছে কালের কাজের রীতি আলোচনা করে। ওদের চোখে মুখে ক্লান্তির ছায়া; কিন্তু

চিন্তা সতেজ, নিজেদের কাজের কথা বলতে বলতে নিজেদের প্রতি অসন্তোষটা চেপে রাখে না। ডাক্তার অস্থির ভাবে উস্‌খুস্‌ করে চেয়ারে বসে। উঁচু তীক্ষ্ন গলাটাকে যথাসাধ্য ভারি করে নিয়ে বলে ডাক্তার:

'আজকাল আর শুধু প্রচারে কাজ হয় না। তরুণ শ্রমিকরা ঠিকই বলে, আমাদের আন্দোলন বাড়ানো দরকার। ঠিকই বলেছে ওরা...'

ডাক্তারেরই সুরে বেজার মুখে জবাব দেয় নিকলাই:

'সব দিক থেকে খালি নালিশই শুনছি, যথেষ্ট বইপত্র নেই। এদিকে এখনও একটা ভালো ছাপাখানা দাঁড় করিয়ে উঠতে পারিনি। লুদ্‌মিলা খেটে খেটে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাকে সাহায্য করা দরকার। অসুখে পড়বে বেচারী...'

'ভেসভ্‌শ্চিকভের খবর কি?' জিজ্ঞাসা করে সোফিয়া।

'তার পক্ষে শহরে থাকা সম্ভব নয়। নতুন ছাপাখানা চালু হলেই তো তার কাজ। কিন্তু তার জন্য আর একজন লোকের দরকার...'

ধীরে ধীরে মা বলে, 'আমায় দিয়ে চলবে না?'

তিনজনেই ওর দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর সোফিয়া বলে ওঠে:

'বেশ কথা!'

কিন্তু নিকলাই বলে শুকনো গলায়, 'তা তো হবে না। ভারি কষ্ট হবে যে আপনার! থাকতে হবে শহরের বাইরে, পাভেলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ তো চলবে না! আর সব মিলিয়ে দেখতে গেলে...'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিবাদ করে:

'পাভেলের পক্ষে তাতে সাংঘাতিক কিছু একটা এসে যাবে না। আর আমার বেলায় সত্যি কথা বলতে কি, ওই দেখাটা শুধু মনে বিঁধবে। কোনো বিষয়ে কথা বলা চলবে না। নিজের ছেলে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। দু'টো কথা কইতে পারি না, শকুনিগুলো সব হাঁ করে থাকে, কখন কোন বাড়তি কথা বলে ফেলি...'

পরপর ক'দিনের ঘটনায় মায়ের মন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই শহরের এই বিষম ডামাডোল থেকে দূরে বাস করার সম্ভাবনাটুকু সে লোভীর মতো আঁকড়ে ধরেছে।

কিন্তু নিকলাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ডাক্তারের দিকে ফিরে বলে, 'কী ভাবছ হে, ইভান?'

টেবিলের উপর মাথা নুইয়ে বসে ছিল ডাক্তার। মাথাটা তুলে হাঁড়ি মুখে জবাব দেয়:

'ভাবছি কী জান? খুব কম লোক আমরা। আরো উদ্যোগ করে কাজ করতে হবে... পাভেল আর আন্দ্রেইকে বোঝাতে হবে, যে করেই হোক ওদের পালানো দরকার। ওখানে মিছেমিছি বসে থাকা উচিত নয় — কাজের দিক থেকে ওদের দুজনকেই অত্যন্ত দরকার...'

মায়ের দিকে উঁকি মেরে ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ে নিকলাই দ্বিধায়। মা বোঝে, ছেলের কথা ওর সামনে আলোচনা করতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে। উঠে চলে আসে নিজের ঘরে। লোকে তার আবেদনের প্রতি এত উদাসীন দেখে বুকে একটা ম্লান বেদনা জেগেছে মায়ের। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না চোখে। ওঘর থেকে ওদের কথাবার্তার কোমল গুন্‌গুনুনি ভেসে আসে। হঠাৎ কেমন একটা ভয় পেয়ে বসে ওকে।

আজকের দিনটা যেন মস্ত বড় একটা দুঃস্বপ্ন। ভাবলে কষ্ট হয়। ক্লিষ্ট অনুভূতিটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পাভেলের কথা ভাবতে শুরু করে মা। ইচ্ছে হয় ও মুক্তি পায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হয়, বোঝে চারদিকের অবস্থা যা তীব্র হয়ে উঠছে, তাতে একটা বড় রকম সংঘর্ষ অনিবার্য। মানুষদের মূক সহ্যশক্তি মিলিয়ে যাচ্ছে, দিনে দিনে তার জায়গা নিচ্ছে অসন্তোষ আর বিরক্তি, অধীর প্রতীক্ষা। চারদিকেই মা শুনতে পায় ধারাল ঝাঁঝাল কথা, চারদিকে কিসের যেন উত্তেজনা... একটা ইস্তাহার বের হলে তা নিয়ে দোকানে-বাজারে, কুলি-মজুর, ঝি-চাকর সবার মধ্যেই জোর আলোচনা আর তর্ক চলে। কেউ গ্রেপ্তার হলে, কেন হল তার কারণ নিয়ে সভয় বিমূঢ় বিতর্কের জের ওঠে, সময় সময় তার মধ্যে অজ্ঞাত সহানুভূতিও থাকে। সাধারণ মানুষেরাও আজকাল বেশি ঘন ঘন বলে সমাজতন্ত্রীদের বিষয়ে কিম্বা বিদ্রোহ, রাজনীতি ইত্যাদির কথা। আগে এসব কথা শুনলে মা ভয়ে মরে যেত। ঠাট্টার সুরে কথাগুলো বলে কেউ কেউ, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের আড়ালে বেশ বোঝা যায় তাদের কৌতূহল। অন্যেরা বলে চটে উঠে — তাদের রাগের পেছনে থাকে ভয়; তারপর অনেকে এসব কথা উচ্চারণ করে চিন্তান্বিত স্বরে, তাদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা সংশয়-মেশান শাসানি। ধীরে ধীরে ওদের স্রোতহীন জীবনের কালো জলের বুকে অসন্তোষের ঢেউ ছড়াতে থাকে। ঘুমন্ত চিন্তা জেগে উঠতে থাকে, প্রাত্যহিক জীবনের অর্থের প্রতি

স্বাভাবিক শান্ত মনোভাবকে নাড়া দিতে সুরু করে। এ সব অন্যদের চেয়ে বেশি পরিষ্কার করে দেখতে পায় মা, কারণ জীবনের সুখহীন মুখটা তার কাছে খুবই বেশি চেনা। তাই এই মুখে চিন্তার আর বিরক্তির বলিরেখা দেখে আনন্দ আর ভয় হয় মায়ের। ও খুসি হয় কারণ মনে করে, এ তার ছেলের কীর্তি, অথচ ভয় পায় এ জেনে যে, জেল থেকে বেরিয়ে এসে পাভেল সবার আগে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। প্রাণ দেবে।

এক একবার ছেলেকে ওর মস্ত বড় মনে হয়; সে রূপকথার নায়কের মূর্তি নেয়। লোকের মুখে শোনা যত ভালো সৎ কথা, সমস্ত উজ্জ্বল, বীরোচিত গুণ সব যেন স্থান পায় তার মধ্যে। মায়ের বুক গর্বে, বাৎসল্যে উছলে ওঠে। মৃদু আনন্দে পুত্র-চিন্তা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়:

"সব ঠিক হয়ে যাবে। সব!"

মাতৃসুলভ বাৎসল্যে পূর্ণ হয়ে যায় মন। বুকের ভেতরটা কুঁকড়ে যায় একটা বেদনায়। তারপর মায়ের ভাবনার শিখায় ছাই হয়ে পুড়ে যায় মানুষের জন্য ভাবনা আর সেই ছাইয়ের মধ্যে একটা ব্যথা ছটফট করে:

"মারা যাবে... পাভেল শেষ হয়ে যাবে..."

১৪

দুপুরবেলায় জেল আফিসে মুখোমুখি বসে পাভেল আর মা। হাতের মধ্যে আঙুলের ফাঁকে দুমড়োন চিরকুটটা। চোখের ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চেয়ে আছে ছেলের দাড়ি ঢাকা মুখ। কখন চিঠিটা দেবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

ধীরে ভাবে বলে পাভেল, 'আমি ভালোই আছি, বাকিরাও তাই। তুমি কেমন আছ?'

কলের পুতুলের মতো বলে যায় মা। 'সবাই ভালো। ইয়েগর ইভানভিচ মারা গেছে।'

'অ্যাঁ?' চীৎকার করে ওঠে পাভেল। ধীরে ধীরে মাথাটা ঝুঁকে পড়ে।

'কবরখানায় একটা হাঙ্গামা হয় পুলিশের সঙ্গে। এক জনকে ধরে নিয়ে গেছে।' সরল মনে বলে মা। সহকারী জেল-সুপার আগুন হয়ে লাফিয়ে ওঠে:

'খবরদার! জানেন না জেলে এসব কথা বলা নিষেধ? রাজনীতি আলোচনা চলবে না!..'

উঠে দাঁড়ায় মা। কিছু যেন বোঝেনি এমনভাবে অপরাধীর মতো বলে:

'না, দেখুন, আমি রাজনীতির কথা বলিনি। একটা হাঙ্গামা হয়েছিল, শুধু সেই খবরটা দিচ্ছিলাম। হাঙ্গামা তো সত্যিই হয়েছিল, এক জনের মাথা অবধি ফেটে গেছে...'

'ও একই কথা। ব্যস্ একদম চুপ্। মানে নিজেদের কথা বা বাড়ীঘরের কথা ছাড়া আর কিচ্ছু বলা চলবে না।'

কথার খেই হারিয়ে ফেলে অফিসার। নিজের ডেস্কে গিয়ে বসে কতগুলি কাগজপত্র ওল্টাতে থাকে। ক্লান্ত ভাবে যোগ করে:

'এসবের জন্য আমাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হয় যে...'

তাকে একবার দেখে নিয়ে চট করে পাভেলের হাতে চিরকুটটা গুঁজে দেয় মা। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

'কী বিষয়ে যে কথা বলব সেটা বুঝি না...'

পাভেল মুচকে হাসে:

'আমিও বুঝি না...'

বিরক্ত হয়ে অফিসার বলে, 'তবে এখানে আসা কেন? যত ঝামেলা...'

একটু চুপ করে মা জিজ্ঞাসা করে, 'মামলা হবে শীগ্গিরই না?'

'হাঁ, ক'দিন আগে সরকারী উকিল এসেছিল। বলছিল শীগ্গিরই...'

এমনি সাধারণ এদিক সেদিকের কথা চলে। মা দেখে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আদর মাখা চোখে পাভেল তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক তেমনি আছে পাভেল, তেমনি শান্ত, ঠান্ডা মেজাজ। এতটুকু বদ্লায়নি, শুধু এক মুখ দাড়ি হয়েছে, আর হাতটা বড় সাদা। ওই দাড়ির জন্য বয়সটা অনেক বেশি দেখায়। মা'র ইচ্ছে করে নিকলাইয়ের কথা বলে ওকে, শুনে হয়ত খুশি হবে পাভেল। এতক্ষণ যে সুরে নিরর্থক বাজে কথা হচ্ছিল ঠিক সেই সুরেই বলে:

'তোর ধর্মছেলেকে দেখলাম...'

পাভেল নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় মায়ের দিকে। মা নিজের গালে টোকা মারতে থাকে — নিকলাইয়ের মুখে বসন্তের দাগ আছে তারই ইসারা...

'বেশ ভালোই আছে খোকা। একটা কাজ পাবে শীগ্গিরই।'

পাভেল বোঝে। মাথা নাড়ে, হাসি মুখে বলে:

'বাঃ বেশ!'

পাভেলের আনন্দ দেখে নিজের ওপর খুসি হয়ে ওঠে মা।

গভীর আবেগে মায়ের হাতখানি চেপে ধরে বিদায় নেয় পাভেল।

'ধন্যবাদ মা!'

হৃদয়ের নিবিড় অন্তরঙ্গতার সানন্দ অনুভূতিতে মায়ের যেন নেশা লাগে। প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায় না — ছেলের হাতখানি নিঃশব্দে চেপে ধরে।

বাড়ী ফিরে দেখে সাশা এসে বসে আছে। পাভেলের সঙ্গে মায়ের দেখা করার দিনটিতে ও আসে। পাভেলের কথা কখনও জিজ্ঞাসা করে না। মা যদি নিজের থেকে তার কথা না বলে, তবে স্থির দৃষ্টিতে শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের ভাষায় সব খবর পড়ে নেয়। কিন্তু আজ ওর মুখে উদ্বেগ।

'কেমন আছে ও?'

'বেশ ভালোই আছে।'

'কাগজটা দিয়েছিলেন?'

'দিয়েছি বৈকি! খুব চালাকি করেছি...'

'পড়েছে?'

'ওখানে দাঁড়িয়ে কেমন করে পড়বে?'

'তা বটে। আমার খেয়াল ছিল না।' ধীরে ধীরে বলে সাশা। 'আরেক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে দেখছি। আপনার কী মনে হয়, রাজী হবে?'

ভুরু কুঁচকে স্থির দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সাশা।

মা যেন আপন মনেই বলে, 'কে জানে! কিন্তু রাজী না হবার কী আছে? বিপদ-আপদ তো নেই এতে!'

সাশা মাথা নাড়ে। তারপর শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করে:

'ইভানকে কী খেতে দেওয়া হয় জানেন? ওর খিদে পেয়েছে।'

'সব খেতে পারে। দাঁড়ান...'

রান্নাঘরে যায় মা। সাশা ধীরে ধীরে সঙ্গে সঙ্গে যায়।

'আপনাকে সাহায্য করব?'

'না, ধন্যবাদ, আমিই করে নিচ্ছি।'

মা স্টোভের কাছে ঝুঁকে একটা বাটি তুলে আনে। সাশা চুপি চুপি বলে:

'দাঁড়ান একটু...'

মুখখানা ওর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখ দুটো যেন তীব্র ব্যথায় বিস্ফারিত; ঠোঁট কাঁপছে। চাপা স্বরে তাড়াতাড়ি আবেগের সঙ্গে বলে মায়ের কানে কানে:

'আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? ও কিছুতেই রাজী হবে না। আমি বলছিলাম কী, আপনি ওকে বোঝান। ওকে আমাদের এখানে বড় দরকার। কাজের জন্যই দরকার। বলুন ওকে। এটুকুও বলবেন যে, ওর শরীরের জন্য বড় ভাবছি আমি। দেখতে পাচ্ছেন তো, মামলার তারিখই পড়েনি এখনও...'

বলতে ওর বড় কষ্ট হচ্ছে, বেশ বোঝা যায়। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে ঠোঁট কামড়ে। গলার স্বর রুদ্ধ, ক্লান্তিতে চোখের পাতা দুটো ঝিমিয়ে আছে। মুঠো-করা হাতের হাড়গুলি মটমট করে ওঠে, মা শুনতে পায়।

তার আগ্রহে প্রথমটায় হক্‌চকিয়ে গেলেও বুঝতে পারে মা। উত্তেজিত হয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, ব্যথায় বুক টন্‌ টন্‌ করে। অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে:

'মা আমার! ও কি নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা শোনে রে?'

নিবিড় নিঃশব্দ আলিঙ্গনে স্তব্ধ হয়ে থাকে দু'জনে। তারপর আস্তে আস্তে মায়ের হাতখানা সরিয়ে দেয় সাশা। ওর সারা শরীর থর্‌ থর্‌ করে কাঁপে। বলে:

'ঠিক বলেছেন। কোন মানে হয় না। এ সব বাজে কথা, স্নায়বিক ব্যাপার আর কি...'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে ও। অত্যন্ত সহজভাবে বলে:

'বেশ। চলুন রোগীকে খাওয়াইগে...'

ইভানের পাশে গিয়ে বসে সস্নেহে সযত্নে জিজ্ঞাসা করে:

'মাথার ব্যথাটা বেড়েছে?'

'বেশি নেই। কিন্তু বড় দুর্বল। আর সব যেন বড় ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ঠেকছে।' সঙ্কুচিত হয়ে কম্বলটা থুতনির নীচ পর্যন্ত টেনে দেয় ইভান; চোখ দুটো কোঁচকায় যেন হঠাৎ তীব্র আলোটা চোখে লেগেছে। সাশা

লক্ষ্য করে, ওর সামনে খেতে যেন লজ্জা করছে ইভান। উঠে বাইরে চলে গেল ও।

ইভান উঠে বসে মিটমিট করে তাকিয়ে থাকে ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে।

'কী — সুন্দর...'

ঝল্‌মলে নীল দুটি চোখ ওর। ঘন-সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট মুক্তোর মত দাঁত। গলার স্বর সবে মোটা হতে শুরু করেছে।

চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞাসা করে মা, 'আপনার বয়স কত?'

'সতেরো...'

'মা বাবা কোথায়?'

'গাঁয়ে। আমি দশ বছর বয়স থেকেই তো এখানে। ইস্কুলের পড়া শেষ হতেই এসেছিলাম শহরে। আপনার নাম কী, কমরেড্?'

কমরেড্ বলে ডাকলে মায়ের ভারি মজা লাগে, ভালও লাগে। হেসে জিজ্ঞাসা করে:

'কেন বলুন তো?'

বিব্রত হয় ইভান। একটু চুপ করে থেকে বলে:

'কেন জানেন? আমাদের পাঠচক্রের একজন ছাত্র — মানে আমাদের পড়ে শোনাত সে — পাভেল ভ্লাসভের মায়ের কথা বলেছিল আমাদের কাছে। পাভেল হল এক শ্রমিক... সেই পয়লা মে'র মিছিল? মনে আছে?'

মা মাথা নেড়ে কান খাড়া করে।

'পাভেলই প্রথম আমাদের পার্টির ঝাণ্ডা তুলে ধরেছিল সকলের সামনে, জানেন?' গর্বিত ভাবে বলে ইভান। ওর গর্বের প্রতিধ্বনি বাজে মায়ের অন্তরেও।

'আমি ওখানটায় ছিলাম না তখন। আমাদের এলাকায়ও মিছিল বার করবার কথা ছিল কিনা! পারিনি অবশ্যি, ভেস্তে গেল সব। আমরা মাত্র ক'জনই ছিলাম। সে যাই হোক গে, দেখুন না, আসছে বছর কী কাণ্ডটা করি!'

উত্তেজিত হয়ে ওঠে ইভান। ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে হাঁপাতে থাকে।

'হ্যাঁ, পাভেল ভ্লাসভের মায়ের কথা বলছিলাম না!' চামচটা দুলিয়ে

বলে চলে ইভান, 'তারপর থেকে তিনিও পার্টির একজন কর্মী। লোকে বলে, নাকি আশ্চর্য মানুষ।'

হাসিতে মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ছেলেটির মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে মন্দ লাগছে না। আবার লজ্জাও করছে। ইচ্ছে হয় নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে। মনে মনে ঠাট্টা করে বলে: "ভীমরতি ধরেছে আর কি!.."

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ছেলেটির মুখের কাছে মুখ এনে বলে, 'খান খান, আর একটু খান। চট্‌পট্‌ ভালো হয়ে উঠুন — ভালো না হলে কাজ করবেন কি করে?'

দরজাটা খুলে যায়। হেমন্তের এক ঝট্‌কা ভেজা ঠান্ডা এসে ঘরে ঢোকে। দরজায় দাঁড়িয়ে সোফিয়া, ঠান্ডায় গাল দুটো লাল, খুশিতে ঝলমল করছে।

'বাপরে বাপ্‌, যেমন করে টিক্‌টিকি লেগেছে পেছনে, যেন কোটিপতির মেয়ের পেছনে হবু-বর লেগেছে। আর টেকা গেল না এখানে দেখছি... কেমন বোধ হচ্ছে ইভান? ভালো লাগছে একটু? পাভেলের কোনো খবর আছে নাকি, নিলভনা? সাশা আছে এখানে?'

মা আর ইভানের ওপর ধূসর চোখে আদরের দৃষ্টি বুলিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সোফিয়া। সঙ্গে সঙ্গে চলে ওর প্রশ্নের ঝড়, উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই। মা মনে মনে হাসে, ভাবে:

'আমিও তাহলে একজন ভালো লোক হয়ে দাঁড়াচ্ছি...'

আর একবার ইভানের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে:

'শীগ্গির ভাল হয়ে উঠুন বাবা।'

খাবার ঘরে গিয়ে দেখে মা, সোফিয়া সাশাকে বলছে:

'এরই মধ্যে তিনশো কপি তৈরী করে ফেলেছে, বুঝলে? এমনি করে তো খুন করবে ও নিজেকে! এই বীরত্ব! সাশা! এমন সব মানুষের বন্ধু হওয়া, তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করতে পাওয়া মস্ত সৌভাগ্যের কথা...'

'সত্যি।' সাশা বলে চুপি চুপি।

সন্ধে বেলা চায়ের টেবিলে সোফিয়া মাকে বলে:

'আরেকবার গাঁয়ে যেতে হচ্ছে আপনাকে, নিলভনা।'

'বেশ তো! কবে?'

'দিন তিনেকের মধ্যে। পারবেন?'

'কেন পারবো না?'

এবারে ডাকগাড়ীতে যাবেন বরং। অন্য রাস্তায় যেতে হবে, নিকল্‌স্কয়ে ভোলস্ত-এর রাস্তা ধরে...' উপদেশ দেয় নিকলাই।

তারপর মুখ গোমড়া করে ভুরু কোঁচকায় নিকলাই। স্বভাব-শান্ত সংযত মানুষ। কিন্তু আজকের এ মুখ যেন অদ্ভুত বিশ্রীভাবে বদলে দিয়েছে ওকে।

মা উত্তর দেয়, 'ও তো বড্ড ঘুরপথ হবে! তা ছাড়া গাড়ীতে গেলে টাকা তো কম লাগবে না...'

'আসলে আপনি যান আমার ইচ্ছেয় নয়।' নিকলাই বলে, 'ওখানকার অবস্থা ভালো নয়, ধরপাকড় হয়েছে। এক জন মাষ্টারকে ধরেছে শুনেছি। সাবধান হওয়া দরকার। অপেক্ষা করলেই ভালো হত...'

সোফিয়া টেবিলে আঙুল ঠুকে বলে:

'কিন্তু কাগজপত্র পাঠান বন্ধ হলে তো চলবে না। ওটা তো বজায় রাখতেই হবে!' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার যেতে ভয় করছে নাকি, নিলভনা?'

মা আহত হয়।

'ভয় পেতে দেখেছেন কখনও? প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম, তখনই ভয় করল না, আর এখন... হঠাৎ...' কথাটা শেষ না করেই মাথা নীচু করে মা। ভয়ের কথা, বা আপনি পারবেন তো? কষ্ট হবে না তো? এই সব কথা জিজ্ঞাসা করলেই মায়ের মনে হয় ওরা যেন দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ওকে, পর পর মনে করছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে:

'কেন? ভয় পাবার কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? কৈ নিজেদের মধ্যে তো ও কথা তোলেন না?'

নিকলাই তাড়াতাড়ি চশমাটা খুলে আবার পরে। বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। সবাইকে বিব্রত ভাবে চুপ করে থাকতে দেখে ঘাব্‌ড়ে যায় মা। অপরাধী মনে হয় নিজেকে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। কি যেন বলতে চায়। কিন্তু সোফিয়া তার হাত স্পর্শ করে আস্তে আস্তে বলে:

'ক্ষমা করুন, আর কখনও বলব না।'

মায়ের মুখে হাসি ফোটে। অল্পক্ষণের মধ্যেই যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে তিনজনে।

ভোর বেলা রওনা হয়ে গেল মা। হেমন্তের বৃষ্টিভেজা রাস্তা দিয়ে ঝ্যাঁকর ঝ্যাঁকর করতে করতে গাড়ীটা চলেছে। ভেজা বাতাস; কাদা ছিটকে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। কোচ্‌বাক্স থেকে একপাশ ফিরে কোচ্‌ম্যান্ চিন্তান্বিত ভাবে নাকী সুরে নালিশ করে:

'ওটাকে, মানে ভাইটাকে গো, বললাম — চল বাপু ভাগে চালাই। তাই ভাগ করতে শুরু করেছি...'

বাঁ দিকের ঘোড়াটার পিঠে হঠাৎ সপাং করে চাবুক কষিয়ে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা:

'শালা, ডাইনীর বাচ্চা, চল্ চল্...'

হেমন্তের সুপুষ্ট কাকগুলি ব্যস্তভাবে রিক্ত খেতের আলে আলে ঘুরে বেড়ায়। পাগলা হাওয়ার ঠান্ডা ঝাপ্‌টার আগে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় তারা, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে উল্টে উল্টে পড়ে; পালকগুলো আলুথালু হয়ে যায়। অলসভাবে ডানা ঝট্‌পটিয়ে অন্য জায়গায় সরে যায়।

কোচ্‌ম্যান বলে যায়, 'তারপর করল কী জান? আমায় কলাটি দেখালে! হাত ঠেকাবার মতো কুটোটি অবধি রইল না...'

শোনে মা... কিন্তু যেন স্বপ্নের ঘোর লেগে আছে তার চেতনায়। গত কয়েক বছরের ঘটনা নদীর স্রোতের মতো বয়ে যায় স্মরণের কূল ছাপিয়ে। প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে মা জড়িয়ে আছে সক্রিয় ভাবে। আগে সে ছিল আরেক রকম। কোথায় কোন অজানা দূরে জীবনের সৌধ-রচনা হয়েছিল। কে করেছিল, কেনই বা করেছিল মা জানে না তা। কিন্তু আজ মায়ের দৃষ্টির সামনে জীবনের অভ্যুদয় হচ্ছে — তার আপন হাতের অবদানে। ভারি তৃপ্তি লাগে, আবার অবিশ্বাসও আসে নিজের ওপর; বিস্ময় আর এক প্রশান্ত ব্যথা এক সঙ্গে ঢেউ খেলে যায় বুকের মধ্যে...

ধীর মন্থর গতিতে পট বদলায়। ধূসর মেঘের দল পরস্পরকে ধাওয়া করে ছাড়িয়ে গিয়ে ছুটে চলেছে আকাশে। পথের দুধারের ভেজা গাছেরা শাখা নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে মাকে; মাঠ মিলিয়ে যায়, দেখা দেয় নীচু নীচু ঢিবির সারি; আবার কখন তারাও মিলিয়ে যায় কোন দিগন্তে।

কোচুয়ানের নাকী সুর, ঘোড়ার গলার ঘণ্টার রিনিঠিনি, বাতাসের শিস আর খসখসানি সব এক হয়ে মিশে কলস্বনা নদীর মতো অন্তহীন প্রবাহে বয়ে যায় মাঠের বুকের ওপর দিয়ে...

কোচ্‌বাক্সে বসে হেলে দুলে কোচুয়ান টেনে টেনে বলে, 'বড়লোকের স্বর্গেও যথেষ্ট ঠাঁই নেই। সেই জন্যই ও ব্যাটা আমায় শুষছে অমন করে। কর্তারা সব ওর দোস্ত কিনা...'

ঘাঁটিতে এসে ঘোড়া খুলে দিয়ে মাকে বলে নিরাশ ভাবে:

'গোটা পাঁচেক কোপেক দাও গো, মদ টানি।'

কোপেক ক'টা বাজিয়ে নিয়ে সেই একই সুরে বলে:

'তিনটে দিয়ে ভদ্‌কা খাব, আব দুটো দিয়ে খাব রুটি...'

বিকেল বেলা নিকল্‌স্কয়ে বলে একটা বড় গ্রামে পেঁছুল মা। ক্লান্তিতে ঠাণ্ডায় দেহ অবসন্ন। স্টেশনে গিয়ে চায়ের খোঁজ করল। জানালার ধারে বেঞ্চির তলায় ভারি স্যুটকেসটা ঠেলে দিয়ে বসল। জানালা দিয়ে দেখা যায় ছোট একটা ময়দান, পা-মাড়ানো হলদে ঘাসে ঢাকা। আর দেখা যায় ঘন ধূসর রঙের জেলার প্রশাসন-দপ্তরের ছাদ-বসে-যাওয়া বাড়ীটা। বারান্দায় বসে পাইপ টানছে সার্টগায়ে দাড়িওলা এক টেকো চাষী। একটা শুয়োর ঘাসের গোড়া খুঁড়ছে আর বিরক্তির সঙ্গে কান নেড়ে মাটির মধ্যে নাক গুঁজে মাথা নাড়ছে।

স্তরে স্তরে পুঞ্জিত কালো মেঘের চাপ। চারদিক নিঃশব্দ আঁধার, বিরস জীবন যেন গা ঢাকা দিয়ে কিসের প্রতীক্ষায় আছে।

হঠাৎ একজন পুলিশ সারজেণ্ট ঘোড়া হাঁকিয়ে এল। আফিস্‌ বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় চাবুক আছড়ে লোকটাকে গাল দিতে শুরু করল। ওর চীৎকার জানলায় লেগে ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল, কিন্তু কথাগুলো শোনা গেল না। চাষী উঠে দূরে আঙুল দিয়ে কি দেখাল। একলাফে মাটিতে নেমে পড়ে একটু টলমল করল সারজেণ্ট, তারপর চাষীর হাতে ঘোড়ার লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে রেলিং ধরে ধরে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল...

আবার সব নিস্তব্ধ। ঘোড়াটা বার দুই নরম মাটিতে পা ঠুকল। একটি ফুটফুটে কিশোরী একটা টাল খাওয়া কিনারার ট্রেতে করে বাসন নিয়ে ঘরে ঢুকল। মুখখানা গোল, স্নিগ্ধ চোখ, সোনালী চুল ছোট করে বেণী বাঁধা। চলতে চলতে সসম্ভ্রমে মাথা নাড়ে মেয়েটি।

'শুভ-সন্ধ্যা,' বলে সস্নেহে স্বাগত করে মা।

'শুভ-সন্ধ্যা।'

টেবিল সাজাতে সাজাতে হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে মেয়েটি: 'জানেন, একটা ডাকাত ধরা পড়েছে?'

'কে?'

'জানিনে...'

'কী করেছিল?'

'জানিনে,' মেয়েটি বলে। 'ওরা সব বলছিল যে ডাকাত ধরা পড়েছে। পুলিশ-সাহেবকে খবর দিতে গেছে পাহারাওলা।'

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। ময়দানে কৃষকদের ভিড় জমছে। কেউ আসছে ধীরে সুস্থে সাড়ম্বরে, আবার অন্যেরা তাড়াতাড়ি আসতে আসতে পোষাক আঁটছে। বারান্দার সামনেই ভিড়টা জমছে। সবাই বাঁ দিকে তাকিয়ে কী জানি দেখে।

মেয়েটিও জানালা দিয়ে একবার তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, দরজাটায় দড়াম করে ধাক্কা দিয়ে। মা চম্‌কে উঠে, স্যুটকেসটা আর একটু ভেতর দিকে ঠেলে দেয়। তারপর শালটাকে মাথার ওপর তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে আসে। কেন জানি অদম্য ইচ্ছে হয় আরো শীগ্‌গির আসে, ছুটে। কিন্তু দমন করে ইচ্ছাটাকে...

বারান্দায় এসে দাঁড়ায় মা। হাড়-জমানো ঠাণ্ডা বুকে চোখে ঝট্‌কা মারে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পা যেন জমে যায় — ময়দানের ওপারে ও কে? পিছমোড়া করে বাঁধা রীবিনকে নিয়ে আসছে, দু'ধারে দু'জন পুলিশ; মাটিতে তালে তালে লাঠি ঠুকছে। জনতা নিঃশব্দে আফিস্ বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মা একেবারে বিহ্বল হয়ে গেল। ঘটনাস্থলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কী যেন বলছে রীবিন, ওর গলাটা শোনা যায় বটে, কিন্তু কথাগুলি কোন প্রতিধ্বনি জাগায় না মায়ের প্রাণের কম্পমান শূন্যতার আঁধারে।

লম্বা একটা নিশ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলে নেয় মা। বারান্দার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল এক চাষী — নীল চোখ, চওড়া দাড়ি — মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল স্থির দৃষ্টিতে। মা একটু কেশে ভয়ে অবশ হাতখানা গলায় বুলোয়।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করে মা — অতি কষ্টে গলার স্বর বেরোয়।

'এই যে দেখুন!' বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে। আর একজন চাষী এসে দাঁড়ায় মায়ের পাশে।

ভিড় নিঃশব্দে বাড়ে। পুলিশ রীবিনকে নিয়ে এসে জমায়েৎ জনতার সামনে দাঁড়ায়। হঠাৎ রীবিনের গলার মোটা আওয়াজ তাদের মাথার ওপর দিয়ে শূন্যে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল:

'বিশ্বাসী ভাইসব! জানো তোমরা, সেই ইস্তাহারের কথা যার মধ্যে আমাদের চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে সব সত্য কথা লেখা আছে? সেই সত্য কথার কিম্মত দিচ্ছি আমি। এই শর্মাই তা বিলিয়েছে।'

জনতা রীবিনের কাছে সরে আসে। ধীর শান্ত স্বর। মা বুকে বল পায়।

নীল-চোখওলাকে একটা ধাক্কা দিয়ে একটি লোক বলে, 'হেই শুনছিস?' নীল-চোখ জবাব দেয় না। মাথা তুলে আর একবার মা'র দিকে চায়। দ্বিতীয় চাষীও মা'র দিকে চায়। প্রথম লোকটির চাইতে বয়স ওর কম; কালো পাতলা দাড়ি, মেচেতা-পড়া রোগা মুখ। দু'জনেই সরে যায় বারান্দা থেকে।

অজান্তেই মা ভাবে, ওরা ভয় পেয়েছে।

আরও সতর্ক হয় মা। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল মিখাইল ইভানভিচ্‌কে — তার ক্ষত বিক্ষত কালো মুখ, আর চোখের চঞ্চল দীপ্তি। ইচ্ছে হয়, সেও দেখুক ওকে, তাই পায়ের আঙুলে ভর করে গলা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাক্যহীন জনতা তাকিয়ে আছে গম্ভীর, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। শুধু ভিড়ের পেছন দিকটায় কিছু চাপা স্বরের কথাবার্তা শোনা যায়।

আবার শক্ত মোটা কণ্ঠ তোলে রীবিন:

'চাষী ভাইরা, যে ইস্তাহারের কথা বললাম, তাতে যা লেখা আছে বিশ্বাস করো। হয়ত আমায় জান দিয়ে তার মাশুল শুধতে হবে। কোথা থেকে ওগুলো আমি পেয়েছি সে কথা বার করবার জন্য ওরা আমার ওপর অকথ্য জুলুম করেছে, মারপিট করেছে, আবারও করবে। মারুক, সব কিছু সহ্য করব আমি। কারণ বইয়ের প্রতিটি অক্ষর সত্য। প্রতিটি অক্ষর। নিত্যিকার রুটির চাইতে সত্যের কিম্মত বেশি, বুঝেছ?'

বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক চাষী — সে বলে ওঠে, 'ওসব কথা বলছে কেন ও?'

'এখন কিছুই এসে যাবে না!' নীল-চোখ বলে, 'যা হবার তা হবে। একবার বই দুবার তো মরবে না...'

গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। একটি কথা নেই মুখে। একটা অদৃশ্য গুরুভার যেন তাদের ওপর চেপে বসেছে।

পুলিশ সারজেণ্ট টলতে টলতে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। নেশা-জড়ান স্বরে চীৎকার করে উঠে:

'কে কথা কয় ওখানে?'

হঠাৎ তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে এসে রীবিনের চুল মুঠো করে ধরে পাগলের মতো মাথাটাকে ঝাঁকাতে লাগল।

'তুই? তুই? কুত্তীর-বাচ্চা তুই?' চেঁচায় সারজেণ্ট।

জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে; অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে। মা অসহ্য যাতনায় মাথা নীচু করে নেয়। আবার রীবিনের কণ্ঠ বেজে ওঠে:

'ভাইসব, দেখ...'

কানের ওপর এক ঘুষি মেরে সারজেণ্ট চেঁচিয়ে উঠে, 'চোপরাও শালা!' রীবিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেয়, পা টলে ওঠে ওর।

'দেখ সব, আমাদের হাত পা বেঁধে রেখে যা-ইচ্ছে-তাই জুলুম চালায় ওরা...'

'সেপাই! নিয়ে যাও ওকে। এই ভাগো সব হিঁয়াসে!' একটুকরো মাংসের সামনে কুকুর যেমন পাগল হয়ে লাফ দেয় সেইভাবে লাফাতে লাফাতে সারজেণ্ট রীবিনের বুকে মুখে পেটে কিল-চড়-ঘুষি মারতে লাগল।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার আর মারবে না!'

সমর্থন শোনা যায়, 'অমন করে মারছ কেন শুনি?'

নীল-চোখ মাথা নেড়ে সঙ্গীকে বলে, 'চলছে, যাই এখান থেকে।' ধীরে ধীরে দুজনে আফিস বারান্দার দিকে যায়। মা কোমল দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বস্তির একটা নিশ্বাস পড়ে। সারজেণ্ট ছুটে বারান্দায় উঠে ঘুষি পাকিয়ে পাগলের মতো হাঁকে:

'নিয়ে আয়, শালাকে এখানে নিয়ে আয়...'

ভিড়ের মধ্য থেকে শক্ত গলায় কে গর্জন করে ওঠে:

'খবরদার!' মা বোঝে, নীল-চোখের গলা। 'ভাইসব! ঠেকাও ওদের। ভেতরে নিয়ে যেতে দিও না! তাহলে ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেলবে মানুষটাকে। তারপর আমাদের ওপর দোষ চাপিয়ে খালাস হবে যে আমরাই মেরেছি। ভেতরে যেতে দিও না!'

মিখাইলোর গলা গর্জন করে, 'চাষী ভাইরা, চোখ খুলে দেখ, কী আমাদের জীবন। বুঝতে পারছ না, কেমন করে ওরা আমাদের সব ঠকিয়ে, লুটে নিয়ে, রক্ত শুষে ফোঁপরা করে ছেড়ে দিচ্ছে! দুনিয়ার যা কিছু সব তোমাদেরই দৌলতে — দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি তোমরা — কিন্তু কতটুকু হক আছে তোমাদের? হ্যাঁ আছে — না খেয়ে তিলে তিলে পেট শুকিয়ে মরার হক্ আছে!..'

চারদিকে এলোমেলো চীৎকার ওঠে চাষীদের মধ্য থেকে:

'একদম সাচ্চা কথা বলছে হে মানুষটা!'

'ডাকো পুলিশ-সাহেবকে, ডাকো! কোথায় সে?..'

'সারজেণ্ট-সাহেব নিজেই ডাকতে গেছে...'

'ওই যে মাতাল!..'

'ওঃ কত্তাদের ডাকা আমাদের কাজ নয়...'

গোলমাল বেড়ে ওঠে।

'বল হে বল! শালারা কেমন মারে দেখি একবার...'

'হাতটা খুলে দাও না ওর!'

'দেখো বাবা, ও পাপ আমাদের যেন না লাগে...'

'বড্ড লাগছে দড়িটায়!' রীবিন বলে। স্বর ওর স্থির শান্ত জোরালো, সব কোলাহল ছাপিয়ে ওঠে। 'ভয় নেই, চাষী ভাই! পালাব না আমি। কোথায় পালাব? সত্যের হাত থেকে নিস্তার পাব না — সে যে আছে আমার ভেতরে...'

কয়েকজন সসম্মানে ভিড় থেকে আলাদা হয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে টিপ্পনী কাটে। কিন্তু দলে দলে মানুষ পাগলের মতো ছুটে আসে জীর্ণ জামাকাপড় গায়ে আঁটতে আঁটতে। রীবিনকে ঘিরে ফুলে ফেঁপে ওঠে তাদের কালো ভিড়। মানুষের অরণ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রীবিন, অরণ্য-মন্দিরের মতো। শূন্যে হাত নেড়ে চীৎকার করে বলে সে:

'ধন্যবাদ। ভাইসব, ধন্যবাদ। এমনি করে আমরাই যদি না হাতের বাঁধন খুলে দি, কে দেবে আর?'

দাড়ি মুছে, আর একবার হাত তুলে ধরে — রক্তাক্ত লাল হাত।

'এই দেখ রক্ত! আমার রক্ত! সত্যের জন্য রক্ত ঝরেছে।'

মা বারান্দা থেকে নেমে আসে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মিখাইলোকে দেখা যায় না। তাই আবার সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে একটা জ্বালা আর আবছা একটা অচেনা সুখ উঁকি মারে।

'ভাইসব, চোখ খোলা রেখো। হদিস্ রেখো। কাগজ আসবে। পড়ো, ভালো করে পড়ো। পাদ্রী সাহেব আর কত্তারা যখন সত্যের প্রচারকদের কাফের, বিদ্রোহী বলবে তখন বিশ্বাস করো না ওদের। সত্য চুপিসারে দুনিয়ায় ফিরছে মানুষের বুকে ঠাঁই খুঁজে খুঁজে। কত্তারা তাকে আগুন আর তলোয়ারের মতো ভয় করে। সত্যকে হাত পেতে নেবার হিম্মৎ নেই তাদের — খুন হয়ে যাবে যে, পুড়ে মরবে। সত্য ওদের দুষমন, কিন্তু তোমার আমার মতো মানুষের সে দোস্ত। সেই জন্যই তো সত্য অমন চুপিসারে চলে!..'

ভিড়ের মধ্যে আবার কোলাহল ওঠে।

'শোন, আমার সাচ্চা ভাইরা শোন!..'

'দোস্ত বুঝবে কিন্তু ঠ্যালাটা...'

'কে তোমায় ধরিয়ে দিয়েছে হে?'

'পাদ্রী!' একজন পুলিশ বলে।

দু'জন চাষী গাল দিয়ে ওঠে।

কে একজন সাবধান করে চেঁচায়, 'ভাইসব, হুঁশিয়ার!'

১৬

পুলিশ-সাহেব আসছে। লম্বা, ভারি গড়নের মানুষ; গোল মুখ, টুপিটা একধারে তেরচা করে পরা। গোঁফের একটা ডগা ওপর দিকে তোলা, আর একটা নীচের দিকে। তাই মুখটাকে দেখায় বাঁকা, বিকৃত, তার ওপরে কেমন একটা ফিকে মরা হাসি। বাঁ হাতে একটা তলোয়ার, ডান হাতখানা শূন্যে নড়ছে। কঠিন ভারি পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, সবাই শুনতে পাচ্ছে। লোকে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে দেয়। সকলের মুখের ওপর উৎকণ্ঠার কালো ছায়া জমে। কোলাহলটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে যেন মাটির গভীরে ডুবে যায়। চোখ জ্বালা করে মায়ের, কপালের চামড়া কেঁপে ওঠে। জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে আবার চায় মন। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অপেক্ষায়।

রীবিনের সামনে এসে থামে সাহেব। ওকে আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে বলে, 'ব্যাপার কি? হাত বাঁধা নেই কেন? সিপাই! বাঁধো!'

বাজখাঁই গলাটা ঝম্ ঝম্ করে বাজে, কিন্তু নিরস।

একজন সেপাই জবাব দেয়, 'হুজুর মালিক! হাত বাঁধাই ছিল। লোকেরা সব খুলে দিয়েছে!'

'মানে? কী বলছ? লোকেরা মানে কারা?'

অর্ধ-বৃত্তাকারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। সাহেব তাকিয়ে দেখে।

'কে সে, তোর ওই লোক?' বলে সাহেব — ওঠা পড়া নেই, সেই একটানা নির্জীব কণ্ঠ। তলোয়ারের হাতল দিয়ে এক গুঁতো মারে নীল-চোখকে:

'হুঁ! চুমাকভ্? লোকেরা মানে তুই? আর কে? তুই মিশিন?'

ডান হাত দিয়ে খপ্ করে একজনের দাড়ির মুঠো ধরে চ্যাঁচায়:

'ভাগো সব এখান থেকে, শালা বেজন্মারা! নইলে হাড়মাস আলাদা করে ছাড়ব!'

মুখে রাগের কোন চিহ্ন নেই; বলার ভঙ্গিও ঠাণ্ডা। অভ্যাসমতই লম্বা লম্বা হাত দু'টো এলোপাতাড়ি মেরে চলেছে মানুষগুলোকে। মুখ ফিরিয়ে, মাথা নীচু করে সরে যায় লোকে সাহেবের সামনে থেকে।

সেপাইদের বলে, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বাঁধ জলদি!'

অশ্লীল গালি-গালাজ উগরে রীবিনের দিকে তাকায়।

'এই শালা, হাত পেছনে!' চীৎকার করে ওঠে সাহেব।

'নাই বাঁধলে, সাহেব! আমি পালাবও না, নড়বও না।'

এক পা এগিয়ে এসে সাহেব বলে, 'কী বলছ?'

'কী বলছি? জানোয়ার! অনেক মানুষ ঠেঙ্গিয়েছ। ব্যস্, আর না। তোদের দিন ঘনিয়ে আসছে, ভাবছিস কী...'

পুলিশ-সাহেব তাকিয়ে থাকে রীবিনের দিকে। ওর গোঁফের ডগা কাঁপতে থাকে। এক পা পিছিয়ে গিয়ে টানা টানা উন্মত্ত ভাবে বলে ওঠে:

'কী বললি রে কুত্তীর বাচ্চা, কী বললি?'

বলেই মস্ত বড় এক রদ্দা কসিয়ে দিল রীবিনের মুখে।

'কিন্তু রদ্দা মেরে সত্যকে মারা যায় না, বুঝলি?' রীবিন চীৎকার করে ওর সামনে এগিয়ে এসে, 'আমাকে মারবার কোন অধিকার নেই তোর, কুত্তা কোথাকার!'

'কী? আমার অধিকার নেই?' টানা এক চীৎকার করে ওঠে সাহেব।

আবার ঘুষি ওঠায় রীবিনের মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু রীবিন একটু নিচু হয়ে পড়ে। ঘুষিটা ফসকে যায়। টলে উঠে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে

নেয় সাহেব। ভিড়ের মধ্যে কে একজন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। রীবিনের ক্রুদ্ধ স্বর আবার ভেসে ওঠে:

'শোন, শয়তান! ফের গায়ে হাত উঠিয়েছিস তো!'

সাহেব চারদিকে চায়। আরো কাছে চেপে এসেছে জনতার ব্যূহ। তার চেহারাটা ঝড়ের রক্ত-চক্ষু আকাশের মতো।

সাহেব ডাকে, 'নিকিতা! এই নিকিতা!'

ভেড়ার চামড়ার জামা গায়ে এক বেঁটে চওড়াকাঁধ চাষী বেরিয়ে আসে ভিড়ের মধ্য থেকে। মস্ত বড় আলুথালু মাথাটা নুয়ে আছে।

'দে তো ওর কাণে এক ঘা কষিয়ে!' গোঁফ চুমরে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে পুলিশ-সাহেব।

এগিয়ে এসে রীবিনের সামনে দাঁড়ায় লোকটা। রীবিন একেবারে নির্ভুল তাক্ করে কথার বোমা ছুঁড়ে মারে ওর মুখে:

'দেখো, দেখো, ভাইসব। আমাদেরই শিলনোড়া দিয়েই আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙে পাষণ্ডেরা। দেখে রাখো, তারপর ভেবে দেখো।'

ধীরে ধীরে হাত উঠিয়ে রীবিনের মাথায় মৃদু একটা আঘাত করে লোকটা।

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে পুলিশকর্তা, 'ও কী রকম হল রে, কুত্তীর বাচ্চা?'

ভিড়ের মধ্য থেকে কার অনুচ্চ হাঁক শোনা যায়, 'এই নিকিতা, ধম্ম ভুলিসনি যেন!'

নিকিতার ঘাড়ে ধাক্কা মেরে চীৎকার করে সাহেব, 'মার বলছি, মার!'

কিন্তু মাথা নীচু করে এক ধারে সরে যায় নিকিতা। বেজার স্বরে বলে:

'ঢের করেছি, আর না...'

'কী?'

সাহেবের মুখের ওপর দিয়ে একটা চমক খেলে যায়। মাটিতে পা ঠুকে গাল দিতে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রীবিনের ওপর। দমাস করে একটা ঘুষির আওয়াজ শোনা যায়, টলে ওঠে রীবিন হাতটা দুলিয়ে। আরেকটা ঘুষি এসে একেবারে শুইয়ে ফেলে তাকে। পুলিশ-সাহেবের এলোপাতাড়ি লাথি এসে পড়ে ওর মাথায়, বুকে, পিঠে, পাঁজরে — সর্বত্র।

জনতার মধ্যে ক্রোধের গুঞ্জন ওঠে। কালো মেঘের মতো তারা এগোয়।

সেটা লক্ষ্য করে সাহেব। লাফ দিয়ে পেছনে সরে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে।

'য়্যা? বিদ্রোহ? হুঁ, আচ্ছা...'

ওর স্বর কেঁপে ওঠে। মুখে কথা সরে না। গলা যেন ভেঙে যায়। হঠাৎ সমস্ত শক্তি উবে যায়। মাথাটা কাঁধের ওপর নুয়ে পড়ে, ফাঁকা চোখে চতুর্দিকে চায়। পা দিয়ে আঁচ করে করে পেছনে সরতে থাকে। কর্কশ ধরা গলায় ব্যস্ত হয়ে চীৎকার করে বলে:

'যা, নিয়ে যা ওকে। আমি চলে যাচ্ছি! জানিসনে বেজন্মারা যে ও একটা রাজনৈতিক গুন্ডা! জানিসনে তোরা ও জারের বিরুদ্ধে মানুষ খ্যাপাচ্ছে? আর তোরা এসেছিস ওর পক্ষ নিতে? তোরাও বিদ্রোহী তাহলে, অ্যাঁ...'

মা ভয়ে করুণায় স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। পলক অবধি পড়ে না; চিন্তাও করতে পারছে না, কিছু করবার শক্তিও নেই। জনতার উন্মত্ত ক্লিষ্ট ক্রুদ্ধ চীৎকার, পুলিশ-সাহেবের ভাঙা গলার খন্‌খনে আওয়াজ, তার সঙ্গে কার যেন ফিস্‌ফিস্‌ মিশে মায়ের কানে ক্রুদ্ধ ভীমরুলের ভন্‌ভনানির মতো বেজে উঠে।

'যদি দোষী হয়ে থাকে — আদালতে পাঠাও!..'

'হুজুর মালিক, ক্ষমা করুন ওকে...'

'বিনা আইনে, এরকম অত্যাচার চলবে না...'

'কী করছ, ভায়া। তাহলে সবাই তো এমনি মারবে। তখন কী হবে...'

দু'দল হয়ে যায় জনতা। একদল পুলিশ-সাহেবকে ঘিরে রীবিনের জন্য কাকুতি মিনতি করে। আরেকটা ছোট দল রীবিনকে ঘিরে আঁধার মুখে গজরায়। কয়েকজন রীবিনকে মাটি থেকে তোলে। পুলিশ আসে ওর হাত বাঁধতে। লোকে চীৎকার করে ওঠে:

'দাঁড়া পাজীরা! অত তাড়াহুড়ো কিসের!'

মুখ, দাড়ি থেকে কাদা রক্ত মুছে চারদিকে চায় মিখাইলো। মায়ের দিকে চোখ পড়ে। মা চমকে উঠে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে। অনিচ্ছায় হাত নাড়ে। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নেয় রীবিন। কয়েক মিনিট পর আবার মায়ের মুখের উপর ওর দৃষ্টি ফিরে আসে। মায়ের মনে হয়, ও যেন সোজা হয়ে মাথা টান করে রয়েছে। ওর রক্তাক্ত গাল দুটো থির্‌থিরিয়ে কাঁপছে...

"চিনেছে আমায়। সত্যি চিনতে পেরেছে?.." মা ভাবে।

মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ জানায় মা। কী এক বিপুল ব্যথিত আনন্দে মা'র সারা সত্তা শিহরিত। পরের মুহূর্তেই খেয়াল হয় নীল-চোখ চাষীটিও রীবিনের পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মা'র খেয়াল হয়... ভাবে: "কী করছি? আমিও তো ধরা পড়ব!"

রীবিনকে কী জানি বলে চাষীটি। রীবিন মাথা নেড়ে উত্তর দেয়:

'হোক না!' গলা কাঁপছে, কিন্তু স্পষ্ট পরিষ্কার স্বর, ভয়লেশহীন। 'আমি তো একা নই দুনিয়ায়। সারা দুনিয়ার সত্যকে পাকড়ে নিয়ে জেলে পুরতে তো আর পারবে না। যেখানে যেখানে গেছি, সেখানেই আমাকে মনে রাখবে। আমাদের নীড় ভেঙে ফেলে তো ফেলুক, আমাদের কেউ নেই ওখানে...'

মা চট করে বুঝে ফেলে তাকে লক্ষ্য করেই বলছে রীবিন।

'কিন্তু দিন আসবে হে! সেদিন আগল ভেঙে মুক্ত আকাশে ডানা মেলবে ঈগল পাখি। সোজা হয়ে দাঁড়াবে মানুষ!'

একজন স্ত্রীলোক এক বালতি জল এনে মিখাইলোর মুখ ধুইয়ে দিতে লাগল, আহা উহু করতে করতে। মিখাইলোর কথার সঙ্গে তার গলার তীক্ষ্ন স্বর মিলে যায়, মা একটা কথাও বুঝতে পারে না। পুলিশ-সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে একদল লোক এল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল:

'একটা গাড়ী নিয়ে এসো, কয়েদীকে নিয়ে যাবার জন্য। কার পালা আজ?'

এবার পুলিশ-সাহেব কথা কইল। এ যেন একেবারে নূতন স্বর — আহত:

'আমি তোকে ধরে মারতে পারি, কিন্তু আমার গায়ে হাত তোলার হিম্মত আছে তোর রে কুত্তা?'

'তাই নাকি?' রীবিন চীৎকার করে বলে। 'নিজেকে কী ভাব শুনি? বিধাতাপুরুষ?'

একটা চাপা হৈচৈ ফেটে পড়ে। রীবিনের চীৎকার ডুবে যায়।

'কার সঙ্গে তর্ক করছ, ভাই? উনি যে কর্তাদের একজন!..'

'হুজুর! ওর মাথার ঠিক নেই। ওর ওপর রাগ-মন্যি করবেন না...'

'চোপরাও বেয়াকুফ!'

'তোমাকে এখন শহরে নিয়ে যাবে ভাই...'

'সেখানে আইন আছে।'

জনতার চীৎকার নরম হয়ে এসেছে; এখন যেন সন্ধির পথ খোঁজে। একটা করুণ আশাহীন আকুতির স্বর। অস্ফুট গুঞ্জনের তলায় ডুবে যায় সব। পুলিশেরা রীবিনকে হাত ধরে তুলে দপ্তর বাড়ীর বারান্দায় নিয়ে যায়। দরজা দিয়ে মিলিয়ে যায়। ধীরে ধীরে চাষীরা চলে যায়। মা লক্ষ্য করে নীল-চোখো লোকটা আসছে তার দিকে তাকাতে তাকাতে। পা দুটো যেন ভেঙে পড়ছে। নৈরাশ্যে কলজেটা অবধি শুকিয়ে যায়। গা গুলিয়ে ওঠে।

মা মনে মনে ভাবে: "না না, আমি যাব না, যাব না এখান থেকে।"

রেলিংটা শক্ত করে ধরে প্রতীক্ষা করে।

দপ্তর বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুলিশ-সাহেব হাত নেড়ে নেড়ে বলে — আবার ঝিমিয়ে পড়েছে স্বর, সেই বর্ণহীন, নিষ্প্রাণ।

'কুত্তীর বাচ্চা কহীঁকা! বেয়াকুফ! তোদের এর মধ্যে মাথা গলান কেনরে? এসব সরকারী ব্যাপার। পাজী, নচ্ছারের দল! জানিস্! ইচ্ছে হলে তোদের ধরে কালাপানি ঠুকতে পারতাম! মরতিস্ ঘানি টেনে। কোথায় পায়ে লুটিয়ে মাথা কুটবি, না যত সব ইয়ে...'

জন কুড়ি চাষী খালি মাথায় দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। আশমানে মেঘ জমেছে, জমিনেও মেঘের আঁধার। নীল-চোখ মানুষটা বারান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'দেখলেন তো সব কাণ্ড...' বলে মাকে।

'দেখলাম তো।' মা নীচু স্বরে বলে।

মায়ের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে শুধয় মানুষটা:

'তা এখানে কী কত্তে এসেছেন?'

'আমি চাষী-মেয়েদের কাছ থেকে লেস, কাপড় কিনি।'

নীল-চোখ আস্তে আস্তে দাড়িতে হাত বুলায়। তারপর দপ্তর বাড়ির দিকে তাকিয়ে বিরস স্বরে বলে:

'হেথা তো আমাদের মেয়েরা ওসব করে না...'

মা ওপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ওকে দেখে। কোন ফিকিরে যে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে, সেই হদিসে আছে মা। সুন্দর দেখতে মানুষটা; চিন্তাশীল মুখ, চোখ দুটো বিষাদ-ভরা। দীর্ঘ দেহ, চওড়া কাঁধ; গায়ের

সারা জামাটায় তালি; ধব্‌ধবে সুতী-কাপড়ের সার্ট আর বাদামী রঙের ঘরে-বোনা কাপড়ের পাৎলুন পরা। জুতো জোড়া শত-ছিন্ন...

কেন জানি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মা। হঠাৎ অস্পষ্ট একটা ভাবনার পূর্বাভাস পেয়ে অনিচ্ছায় জিজ্ঞাসা করে:

'রাতে আমায় একটু থাকতে দেবে গা?'

বলে ফেলেই ভেতরটা ওর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মানুষটার দিকে। মনের মধ্যে কাঁটার মতো এক ভাবনা যেন বিঁধতে লাগল:

"সর্বনাশ হয়ে যাবে আমারই জন্য নিকলাই ইভানভিচের। পাভেলকেও দেখতে পাব না — কতদিন কে জানে। কত মার না জানি মারবে!"

চাষীটি মাটির দিকে তাকিয়ে বুকে কোটের প্রান্ত দুটো টেনে আঁটতে আঁটতে আস্তে আস্তে জবাব দিল:

'রাত্তিরে থাকবার জায়গা? আলবৎ! তবে কিনা গরীবের কুঁড়ে...'

'আমি আর কোন্ রাজপ্রাসাদে থাকি?' মা বলে।

'বেশ, তাহলে আর কি!' মাথা তুলে মাকে নিরীক্ষণ করে চাষীটি।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। সাঁঝের আলোআঁধারিতে ওর মুখটা ফ্যাকাশে দেখায়, চোখ জ্বলে একটা হিম-জ্বালায়। মা যেন পাহাড় থেকে নামতে নামতে নীচু স্বরে বলে:

'চল তাহলে। আমার বাক্সটা একটু নিয়ে যাবে...'

'নেব বৈকি।'

কোটটা আবার বন্ধ করে কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বলে:

'এই যে গাড়ী আসছে...'

জেলার আফিসের বারান্দায় রীবিনের মূর্তি দেখা যায়। ওর মাথা, মুখ ধূসর একটা কিছু দিয়ে জড়ান, হাত আবার বাঁধা।

হিম-প্রদোষের বায়ুমণ্ডলে রীবিনের স্বর ধ্বনিত হয়, 'বিদায় বন্ধুগণ! সত্যকে তালাশ করো! যত্ন করে রেখো! খাঁটি কথা যে নিয়ে আসবে তাকে বিশ্বাস করো। সব ঢালি দিয়েও সত্যকে রেখো, ভাইসব!..'

পুলিশ-সাহেব চেঁচিয়ে ওঠে, 'চোপরাও কুত্তা কোথাকার! এই সিপাহী, উল্লু কহীকা, লাগাও চাবুক ঘোড়াকে!'

'নিজেদের পানে একবার চাও তো! কী আছে খোয়াবার?'

গাড়ী চলতে আরম্ভ করে। দুইদিকে দুই সেপাই, মাঝখানে রীবিন।

সেখানে থেকেই চাপা গলায় চেঁচিয়ে বলে:

'কেন উপোস করে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে মরবে! বাঁধন খসাও, দোস্ত সব! রুটি পাবে, রুটির সঙ্গে পাবে সত্য। এই হলো কথা। আচ্ছা বিদায়, বিদায়, ভাই!..'

চকার ঘর্ঘর, ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর পুলিশ-সাহেবের চীৎকারে ডুবে যায় ওর কণ্ঠ!

মাথা নেড়ে চাষীটি বলে, 'ব্যস্‌, শেষ।' তারপর মায়ের দিকে ফিরে নীচু স্বরে বলে, 'একটু দাঁড়ান, এখানেই থাকবেন কিন্তু, আমি এলাম বলে...'

মা ঘরের মধ্যে গিয়ে সামোভারের সামনের চেয়ারটায় বসে। এক টুক্‌রো রুটি হাতে তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। কিছু খেতে পারল না। আবার ঠেলে বমি আসে ভেতর থেকে। বিশ্রী গরম লাগছে, রক্ত শুকিয়ে কলজেটা যেন খালি হয়ে গেছে; মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে নীল-চোখ লোকটার চেহারা ভাসছে... অদ্ভুত মুখ! ওটা গড়তে গিয়ে কী যেন একটা বাকী থেকে গেছে। দেখলেই সন্দেহে ভরে যায় মনটা। ধরিয়ে দেয় যদি! না, ভাববে না ও কথা মা! কিন্তু মনের মধ্যে কথাটা উঁকি মারছে কখন থেকে। শুধু উঁকি মারছে না — বুকের ওপর নিশ্চল হয়ে বসে আছে চেপে।

দুর্বল অলস চিন্তা জাগে: "আমায় লক্ষ্য করেছে লোকটা! ঠিক বুঝতে পেরেছে..."

কিন্তু আর বেশিদূর এগোয় না চিন্তাটা। দেহ অবসন্ন, বমি বমি করতে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত আগে প্রচণ্ড কোলাহল। তারপর এই নম্র নিস্তব্ধতা। সারা শরীরটা যেন ভয় আর অত্যাচারের আশংকায় থম্‌থম্‌ করছে। একাকীত্বের অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে, ছাই-এর মতো ধূসর কোমল। প্রদোষের ছায়ায় চিত্ত ভরিয়ে দেয়।

মেয়েটি আবার দেখা দেয় এসে দোর-গোড়ায়।

'ডিম-ভাজা এনে দি?' শুধয়।

'না গো না। একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না। যা চ্যাঁচামেচি, বাবা! আমায় ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল।'

মেয়েটি টেবিলের কাছে এসে চাপা উত্তেজিত গলায় বলে:

'বাপ্‌রে বাপ্‌ কী মারটাই পুলিশ-সাহেব মারল! আমি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম! সব ক'টা দাঁত ভেঙে গেছে। নিজের চোখে দেখলাম, রক্ত ফেলল মুখ থেকে! কী ঘন রক্ত আর কী গাঢ় লাল রং... চোখ দুটো ফুলে গেছে ওই এতখানি হয়ে। আলকাতরার কারখানায় কাজ করে লোকটা। ছোট সাহেবটার কান্ড জানেন? কী গেলাই গিলেছে! ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে এখন মাতাল হয়ে। তবু আরো মদ চাইছে। বলে কী জানেন? মস্ত নাকি একটা দল আছে সেই ওদের। ওই দাড়ি-ওয়ালাটা নাকি দলের চাঁই। তিনটেকে নাকি ধরেছিল, একটা পালিয়ে যায়। একজন ইস্কুলমাষ্টারও নাকি ওদের দলে আছে, সেও নাকি ধরা পড়েছে। ওরা ভগবান-টগবানে বিশ্বাস করে না। অন্যদেরও বিধর্মী বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। য়্যাঁ, সে কী কথা গো! আমাদের চাষীদের মধ্যে কারো কারো ভারি দুঃখু হয়েছে ওর জন্য। আবার কেউ কেউ বলছে কী জানেন? পাজীটাকে সাবড়ে দিল না কেন একেবারে? জানেন, আমাদের চাষীদের মধ্যে অনেকেই এত কুচুটে।'

হড়বড়িয়ে কত কী যে আবোল-তাবোল বকে চলেছে মেয়েটি। নিবিষ্টচিত্তে শোনে মা, মনটার উদ্বেগ চেপে দিতে, বিষণ্ণ প্রতীক্ষাটা চূর্ণ করে দিতে চায়। অমন একজন শ্রোতা পেয়ে যেন মহা খুশি মেয়েটি। ক্রমশ উত্তেজিত ভাবে অত্যন্ত চাপা গলায় অনর্গল বকে চলে ও:

'আমার বাবা বলে কী জানেন? ফসল হয়নি তো, তাই এমন ধারা সব হচ্ছে। দু দুটো বছর ফসল হয়নি। ঐ জন্যই নাকি আমাদের চাষীরা এমন কুচুটে হচ্ছে। গাঁয়ের সভা-সমিতিতে গিয়ে ওরা চেঁচামেচি মারামারি করে। এই ধরুন না ভাসুকভের কথা। দেনা শোধ করতে পারেনি বলে ওর সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল; হঠাৎ করলে কী, গাঁয়ের মোড়লকে মুখের ওপর এমনি এক চড় কষাল! বলল কিনা, এই আমার দেনা শোধ করলাম...'

বাইরে ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। মা টেবিলটায় হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সোজা হয়ে...

নীল-চোখ চাষী এসে ঢোকে টুপি না খুলেই, মাকে বলে:

'কই গো তোমার বাক্স-প্যাঁটরা কই?'

অনায়াসে উঠিয়ে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিল বাক্সটা।

'খালি! মার্কা! একে আমার বাড়ীটা দেখিয়ে দাও তো!'

বলেই বেরিয়ে গেল। পেছনে তাকাল না।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, 'আজ রাত্তিরে থাকবেন এখানে?'

'হুঁ, লেস কিনতে এসেছি। লেস কেনা-বেচাই করি কিনা...'

মেয়েটি বলে, 'কিন্তু লেস তৈরী তো হয় না এখানে! তিনকভো আর দারয়িনো-য় হয়।'

মা বলে, 'কাল যাব ওখানে...'

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে তিনটি কোপেক বকশিস্ দেয় মা। মেয়েটি ভারি খুশি হয়ে ওঠে। দুজনে বাইরে আসে। মেয়েটি খালি পায়েই ভেজা মাটির ওপর দিয়ে তরতর করে চলে।

'যদি বলেন তো কাল দারয়িনোয় গিয়ে সবাইকে এখানে লেস নিয়ে আসতে বলে দি। আপনাকে আর যাবার কষ্ট করতে হবে না। নেহাৎ কম দূর নয় কিন্তু। বারো ভার্স্ট...'

মা ওর পাশে চলতে চলতে বলে, 'না গো, বাছা, অত হাঙ্গামা করতে হবে না তোমায়।' ঠান্ডা হাওয়ায় অনেকটা আরাম বোধ করে মা। অস্পষ্ট একটা সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে রূপ নেয় ওর মনে। ধীরে ধীরে আরো বড় হয়ে উঠে কি একটা এনে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। তবু অস্পষ্টই থেকে যায়। মা অস্থির হয়ে ওঠে, কী করলে নিরবয়ব সেই ছায়া রূপ ধরবে। অধ্যবসায়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে নিজেকে:

"কী করা যায় এখন? আচ্ছা... সব যদি খুলে বলি..."

চারদিকে কনকনে ঠান্ডা, অন্ধকার আর ভেজা ভেজা। কুঁড়ে ঘরগুলোর জানালা লালচে আলোয় রাঙ্গা দেখাচ্ছে। চারদিক স্তব্ধ, মাঝে মাঝে একটু আধটু চীৎকার আর গরু ভেড়ার ডাক শোনা যায়। আঁধার গ্রামখানা যেন কী এক ক্লিষ্ট ধ্যানে মগ্ন...

'এই যে এসে গেছি। কিন্তু থাকতে আপনার খুব কষ্ট হবে। বড্ড গরীব কিনা ওরা...'

হাতড়ে হাতড়ে দরজাটা খোলে। তারপর ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে সাহস করে চীৎকার করে ডাকে:

'তাতিয়ানা-মাসী!'

তারপর দৌড়ে পালিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে ভেসে আসে:

'চল্লাম!..'

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়ে মা। চোখে হাতের আড়াল দিয়ে ভালো করে দেখে ঘরখানা। ছোট্ট একটুখানি ঘর, কিন্তু পরিষ্কার। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। সেটা প্রথম দৃষ্টিতে মা'র চোখে পড়ে। তরুণী একটি মেয়ে স্টোভের পিছন থেকে উঁকি মারল। তার পর নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে চলে গেল। সামনের কোণে টেবিলের উপর একটা বাতি জ্বলছে।

বাড়ীর কর্তা টেবিলে বসে টেবিলের কিনারার ওপর টোকা মারছিল। মা আসতে তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চায়। কয়েক মুহূর্ত পরে মাকে ডেকে এনে ঘরে বসায়। তারপর সেই স্ত্রীলোকটিকে বলে:

'দৌড়ে যাও তো পিওতরের কাছে, তাতিয়ানা। খুব তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু।'

মায়ের দিকে না তাকিয়েই স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। মা গৃহকর্তার সামনে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে। তাকায় চারদিকে। স্যুটকেসটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ঘরখানা নিঝুম। মাঝে মাঝে শুধু বাতিটা থেকে ফর্‌ফর্‌ শব্দ ওঠে। মায়ের চোখের সামনে লোকটার বিরক্ত উদ্বিগ্ন মুখখানা দুলতে থাকে। অস্পষ্ট একটা বিরক্তি ঠেলে উঠতে থাকে মনের মধ্যে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে মা, 'আমার স্যুটকেস কোথায়?' এত উচ্চ স্বরে বলে যে নিজের গলা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

কাঁধ নাচিয়ে কী ভাবতে ভাবতে চাষীটি বলে:

'হারাবে না গো...'

তারপর গলা নামিয়ে বলে চলে:

'মেয়েটাকে শোনাবার জন্য ইচ্ছে করেই তখন বলেছিলাম — ওটা খালি। বাপ্‌স্‌! খালি!! পাঁচমণী পাথর!'

মা বলে, 'তাহলে?'

উঠে মায়ের কাছে এসে মুখ নিচু করে চাপা স্বরে সে শুধয়:

'ও মানুষটা বুঝি আপনার চেনা?'

চমকে উঠল মা, কিন্তু বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দেয়:

'হ্যাঁ!'

ছোট কথাটি। কিন্তু যেন এক ঝলক আলো। সব পরিষ্কার হয়ে

গেল। বুকের তলা থেকে সব কিছু একেবারে আলোয় আলো হয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মা বেঞ্চিতে গুছিয়ে বসল...

এক গাল হাসল চাষীটি।

'হোথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ইসারা করে জানি বললেন সে মানুষটাকে। সেও ঠারেঠুরে আপনাকে জবাব দিল। তখনই তো তার কানে কানে শুধালাম: ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে — চেন তুমি?'

ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে মা, 'তা কী বলল সে?'

'বলল যে, কত লোকই তো আছে আমাদের...'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চায় লোকটি, তার পর হাসতে হাসতে আবার বলতে আরম্ভ করে:

'কী জবরদস্ত মানুষ রে বাবা!.. কী বুকের পাটা! সোজাসুজি বলে দিল — আমিই করেছি! কী মারটাই খেল—কিন্তু ওর কথা ও বলবেই...'

ওর গলা শুনে, মুখ আর সরল চোখ দুটি দেখে মা ক্রমশ আশ্বস্থ হয়। ওর স্বরটায় তেমন জোর নেই। সংশয়ের দোলায় যেন দুলছে। মুখখানাকে ওর অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল। ধীরে ধীরে মা'র সব ভয় ডর কেটে যায়। রীবিনের জন্য বুকটা টন্‌টন্‌ করতে থাকে। আর নিজেকে সামলাতে পারে না। তিক্তরাগের জ্বালায় হঠাৎ বলে ওঠে:

'পাষণ্ড, জানোয়ার সব!'

রাগে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

চাষীটি সরে যায়। বিষণ্ণভাবে শুধু মাথা নাড়তে থাকে।

'কর্তারা সাচ্চা বন্ধুদের গুছিয়ে নিয়েছে, তা ঠিক...'

হঠাৎ আবার মায়ের দিকে ফিরে শান্তভাবে বলে সে:

'খবরের কাগজ আছে আপনার স্যুটকেস্'এ — কেমন ঠিক বলেছি কিনা বলুন!'

মা চোখ মুছে, সরল ভাবে বলে, 'আছেই তো! ওর কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

ভুরু কুঁচকে চাষীটি মুঠো করে নিজের দাড়ি ধরে একপাশে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে:

'আমরাও সেই কাগজ দেখেছিলাম, বইপত্তরও পেয়েছিলাম। ওই লোকটাকে চিনি, — দেখেছিলাম আর কি!'

থেমে সেকেন্ড খানেক কী যেন ভাবে। তারপর শুধয়:

'এটা নিয়ে — মানে স্যুটকেসটা নিয়ে কী করবেন ঠিক করেছেন এখন?'

তাকে দেখে নিয়ে যেন হুমকি দিয়েই বলে মা:

'কেন? তোমাদের কাছে রেখে যাব।'

চাষীটি প্রতিবাদ করে না, অবাক হয়েছে বলেও মনে হয় না। শুধু মায়ের কথাটাই সংক্ষিপ্ত ভাবে পুনরাবৃত্তি করে:

'আমাদের কাছে...'

সমর্থন-সূচক মাথা নেড়ে দাড়িতে বিলি কেটে টেবিলে বসে সে।

রীবিনের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার নিজের চোখে দেখেছে সেই ছবিটাই মা'র মনের মধ্যে ওলটপালট্ খেতে লাগল। একটি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারল না। সব ভাবনা ছাপিয়ে ডুবিয়ে কেবল রীবিনের সেই মূর্তিখানা জেগে রইল। মানুষের জন্য অসীম বেদনায় অপমানে মা'র সমস্ত অনুভূতি জর্জরিত। স্যুটকেসটার কথা বা অন্য কোন কিছু ভাবতে পারছে না আর। অঝোরে চোখের জল ঝরছে। মুখটা বেজার, স্বর অবিচলিত। বলে:

'মানুষকে ওরা এমনি করে শোষে, জুলুম করে, কাদায় ফেলে পা দিয়ে দলে! সর্বনাশ হোক্, জাহান্নমে যাক ওরা!'

'ভারি জোর, অনেক বেশি জোর যে ওদের!' চাষীটি বলে।

বিরক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে মা, 'কিন্তু জোরটা তারা পায় কোথা থেকে শুনি! সে তো আমাদের এই সাধারণ মানুষদের কাছ থেকেই পায়! সবই তো আমাদের কাছ থেকেই নিয়েছে ওরা।'

চাষীটির মুখ উজ্জ্বল, কিন্তু কী যেন এক রহস্যে ভরা। মা চটে যায় দেখে।

'হুঁ,' চিন্তিত ভাবে টেনে টেনে বলে লোকটি, 'চাকা...'

হঠাৎ চকিত হয়ে দরজার দিকে কান পাতে। নীচু স্বরে বলে:

'আসছে...'

'কারা?'

'আমাদের লোক... মনে হচ্ছে...'

আর একজন চাষীকে নিয়ে ওর বৌ ঘরে ঢুকল। টুপীটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে গৃহ-কর্তার সামনে এল লোকটা।

জিজ্ঞাসা করে, 'তারপর?'

গৃহ-কর্তা সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ে।

স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে বৌ বলল, 'স্তেপান, ইনি, মানে আমাদের অতিথি, কিছু খাবেন টাবেন না?'

মা বলে, 'না বাছা, আজ আর খাব না কিছু।'

দ্বিতীয় চাষী মায়ের সামনে এসে ভাঙা গলায় তাড়াতাড়ি করে বলে:

'আমার নাম পিওত্‌র ইয়েগরভ রিয়াবিনিন্‌। সকলে ডাকে "সূঁই" বলে। তোমাদের কাজকর্ম একটু আধটু বুঝি। লিখতে পড়তেও জানি একটু। খুব একটা ভেবড়ে যাওয়ার ছেলে নই...'

মায়ের বাড়ান হাতখানা শক্ত করে ধরে গৃহ কর্তার দিকে ফিরে বলে:

'দেখেছ তো, স্তেপান! ভারভারা নিকলায়েভ্‌না মানুষ তো মন্দ নয়, মনটা নরম সরম আছে। কিন্তু বলে কী জান? এসব নাকি বাজে কাজ, হুজুগে চ্যাংড়ারা আর ছাত্তররা তাদের সব বোকামির জন্য নাকি মানুষগুলোর মগজ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আজ স্বচক্ষে তুমি আমি দেখলাম, ধরেছে তো এক চাষার ব্যাটাকে — ষোল আনার ওপর আঠার আনা চাষা, ভালো মানুষ বেচারা। তারপর এখন এই মাঝবয়সী মেয়ে-মানুষটি... চেহারায় তো ভদ্দরলোক-টোক মালুম হয় না... হাঁগা! কিছু মনে করবেন না, তা আপনার বাপ দাদা কী ছিল?'

কথাগুলো ওর দ্রুত, স্পষ্ট। দম না নিয়ে এক নিশ্বাসে বলে যায়। দাড়ির গোছা স্নায়বিক ভাবে কাঁপে; দৃষ্টি দিয়ে মায়ের মুখ আর সর্বাঙ্গ তালাস করে। শতচ্ছিন্ন কাপড় পরনে; মাথার চুলে জটা বেঁধেছে — যেন এই মাত্র যুদ্ধ জিতে, শত্তুর নিপাত করে খুশিতে উত্তেজিত হয়ে ফিরে এল। ওর তেজ দেখে মায়ের বড় ভালো লাগল। আরো ভালো লাগল যে ওর কথার মার-প্যাঁচ নেই, মনের কথা সহজ কথায় সরল করে বলে ফেলে। হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে ওর কথার জবাব দেয় মা। আর একবার সজোরে মায়ের হাত-ঝাঁকানি দিয়ে সে শুক্‌নো খন্‌খনে স্বরে হাসতে থাকে। বলে:

'এ তো সোজা কথা, স্তেপান, চমৎকার কাজ! আমি বলিনি, আমাদের সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকেই আসছে সব। সেই ভদ্দর মহিলা! সে তো সত্যি কথা শোনাবে না তোমাদের! তাতে তার বিপদ আছে যে। ছেদ্দা ভক্তি আমি তেনাকে — করি বৈকি! বেশ ভালো লোকটি, আবার আমাদের সাহায্য করতে চায়, অবশ্যি খুব বেশি একটা কিছু নয়। একটু আধটু,

নিজের ক্ষতি যাতে না হয়। আর আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা, ক্ষতি কষ্ট তারা জানে না; ভয় ডর নেই, সোজা এগুতে চায়। বুঝলে তো তফাৎটা! সারা জীবন তারা লোকসানের কড়িই গোনে; সর্বত্র শুধু ক্ষতি। যাবার ঠাঁই, দুটো কথা কওয়ার ঠাঁই নেই। যেখান দিয়েই যাক, খালি একটা কথাই শোনে — এই থামো! কোথাও পা বাড়াতে পারে না...'

'ঠিক বলেছ,' মাথা নেড়ে বলে ওঠে স্তেপান আর কথার পিঠেই বলে: 'স্যুটকেসটার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ইনি।'

মায়ের দিকে সেয়ানা চোখ ঠেরে বলে পিওতর:

'ভাববেন না গো, মা! সব ঠিক হয়ে যাবে! আপনার প্যাঁট্‌রাটা আমার বাড়ীতে আছে। আমায় ও যখন বললে এসে আপনার কথা — সেই একই দলের মানুষ বুঝি রে, ওই যে ধরা পড়েছে ও লোকটাকে চেনেন চেনেন লাগছে, আমি তখন বললাম, দেখো স্তেপান! এসব ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ঠিক না। তা আপনিও তো গন্ধ পেয়েছেন আমাদের — সেই যখন আপনার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ভালো মানুষ দেখলেই চেনা যায়। সে তো আর এমন শ'হাজার নেই। স্যুটকেস্‌টার জন্য ভাবনা করবেন না...'

মায়ের পাশেই বসে পড়ে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে চলে:

'ওগুলো যদি বিলুতে টিলুতে চান, তবে আমরা ব্যবস্থা করব খুশি হয়ে। বইপত্তরগুলো আমাদের দরকার...'

স্তেপান বলে, 'আমাদের কাছেই রেখে যেতে চাইছেন সব।'

'তোফা! তোফা, মা! সব ঠিক সামলে রেখে দেব!..'

হাসতে হাসতে লাফিয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করে দেয়। খুসি হয়ে বলে:

'এত ভাগ্যি! তবু অবাক হবারও কিছু নেই। দড়ি একখানে ছেঁড়ে তো আর একখানে জোড়ে। বেশ, বেশ, মা! বড় ভালো খবরের কাগজখানা। অনেক উপকারে আসে। মানুষের চোখের ঠুলি খসিয়ে ছাড়ে। ভদ্দরলোকেদের এসব ভালো লাগে না। এখান থেকে মাইল কয় দূরে এক ভদ্দর মহিলার কাছে ছুতোরের কাজ করি আমি। বেশ মানুষ। মাঝে মধ্যে তাঁর বইটইগুলো পড়তে দেন। এক এক সময় পড়তে পড়তে এমনি জিনিস মেলে যে সত্যি চোখ খুলে যায়। সত্যি আমরা ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু একদিন আমাদের কাগজখানা নিয়ে গিয়েছিলাম। কী বলব

মহিলাটি নিজেকে অপমানিত বলে মনে করলেন। বললেন—ওরে পিওতর, ওসব পড়িস্ টড়িসনি যেন। যত সব আজেবাজে মাথা মুণ্ডু লিখেছে বাউণ্ডুলে ইস্কুলের ছোঁড়ারা। বিপদে পড়বি শেষটায়। জেল টেল হবে; দেবে ঠেলে সাইবেরিয়ায়...'

হঠাৎ খানিক চুপ করে থেকে আবার শুধয়:

'ওই লোকটা — ওই যাকে ধরল গো আজ, আপনার কেউ হয় বুঝি?'

'না, আপনার লোক নয়।'

পিওতর নিঃশব্দে হাসে আর মাথা নাড়ে। কী একটা নিয়ে যেন বড্ড খুশি হয়ে উঠেছে ও। পর মুহূর্তেই কিন্তু মায়ের মনে হয় রীবিনের বিষয়ে আপনার লোক নয় বলা চলবে না, তাতে যেন নিজেরই অপমান হয়। বলে:

'ও আমার আত্মীয় নয়। তবে অনেক দিন থেকেই জানি। ঠিক বড় ভাইয়ের মতো দেখি!'

ঠিক মত কথা খুঁজে পায় না মা। আবার নীচু স্বরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। ক্লিষ্ট স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে কিসের সম্ভাবনায় যেন থম্‌কে আছে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে পিওতর, যেন শুনছে কিছু। টেবিলে কনুই ভর দিয়ে বসে স্তেপান চিন্তান্বিত ভাবে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে যাচ্ছে টেবিলটার ওপর। স্টোভের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর বৌ একদৃষ্টে মায়ের দিকে চেয়ে। সেই দৃষ্টি অনুভব করে মাও মাঝে মাঝে তার দিকে চায়। বাদামী ধাঁচের রোদে-পোড়া মুখখানা বৌ-এর, বাঁশির মতো নাক, কাটা-কোঁদা থুতনি। ফিকে সবুজ তীক্ষ্ন অভিনিবিষ্ট দুই চোখ।

নরম সুরে পিওতর বলে, 'তাহলে আপনার বন্ধু! একটা চরিত্র আছে মানুষটার... ওর দাম যে কত তা বেশ দেখিয়ে দিয়েছে! একটা মানুষের মতো মানুষ! কী তাতিয়ানা? তুমি না বলেছিলে...'

তাকে বাধা দিয়ে শুধয় তাতিয়ানা, 'বিয়ে-থাওয়া করেছে?' বলেই তার ছোট মুখখানার পাতলা ঠোঁট দু'খানি শক্তভাবে চাপে।

মা বিষণ্নভাবে বলে, 'করেছিল, বৌ মরে গেছে।'

'হুঁ, ঐ জন্যই অত কেরামতি।' গভীর ভরা গলায় বলে তাতিয়ানা। 'বৌ থাকলে আর ওসব চলে না। তখন ভয় ডর আসে...'

পিওতর বলে ওঠে, 'কী বললে? আমি? আমি বিয়ে করিনি বুঝি?'

ওর চোখের দিকে না তাকিয়ে ঠোঁট বিদ্রূপে বাঁকিয়ে বলে তাতিয়ানা, 'ওরে বাস্‌রে! কী করছ শুনি? শুধু তো কথার আণ্ডিল। আর মাঝে মধ্যে একখানা বই পড়ো। ঘরের মধ্যে বসে স্তেপানের সঙ্গে তোমার গুজ্‌গুজ্‌ — এতে লোকের কোন হিতটা হয় শুনি?'

ওর বিদ্রূপে আহত হয় পিওতর। শান্তভাবে বলে, 'অনেক লোক আমার কথা শোনে ভাই। অমন করে বলো না।'

স্তেপান নীরবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে।

তাতিয়ানা শুধয়, 'চাষীরা বিয়ে করে কেন বল তো? কাজ করার জন্যই তো ঘরে বৌ আনা। কিন্তু কিসের কাজ?'

স্তেপান চাপা স্বরে বলে, 'তোমার বুঝি কাজের অভাব?'

'কী মানেটা আছে সেই কাজের? খেটে খেটে হাড় কালি, তাও আধপেটার বেশি খাওয়া জুটবে না। তবু দিনমান ঐ জোয়ালেই জুতে থাক — পেটের শত্তুরগুলোর দিকেও তাকাবার ফুরসুৎ নেই।'

মায়ের পাশে বসে নির্বিকারভাবে বলতে থাকে; তার স্বরে না আছে নালিশ, না দুঃখ...

'দুটো বাচ্চা হয়েছিল এই পোড়া পেটে। একটার বয়স যখন বছর দুই — ফুটন্ত জলে পুড়ে সেটা গেল। আর একটা হয়েছিল মরা ছেলে। কেন? ওই শাপ-লাগা কাজের জন্য! কী সুখটা জুটল আমার ভাগ্যে শুনি! ঐ জন্যই তো বলছি চাষাভুষোর বিয়ে-থাওয়া কত্তে নেই। মিথ্যে পায়ের বেড়ী। নইলে তো একটু হাত পা খোলা হয়ে এই মানুষের মতো সোজাসুজি বাঁচার লড়াইয়ে নামতে পারে। ঠিক বলিনি গো, মা?'

'ঠিক বলেছ,' মা বলে। 'খাঁটি কথাই বলেছ মা লক্ষ্মী। নইলে জীবনটা জিতে নিতে পারবে না...'

'আপনার সোয়ামী আছে তো?'

'সে ওপারে। একটা ছেলে আছে...'

'আপনার কাছে থাকে না?'

'এখন জেলে।' মা বলে।

টের পায় মা, ছেলের কথায় নিজের কলজের ঘাটা কাঁচা হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে শান্ত পুত্র-গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে।

'এই নিয়ে দু'বার জেল খাটা হল ছেলের — কারণ দেবতার সত্যকে

বুঝে মানুষের বুকে বিছিয়ে দিয়েছে... ওই হল তার অপরাধ। কাঁচা বয়েস গো, আর কী সুন্দর, চালাক চতুর সোনার ছেলে আমার। ওই তো বার করেছে ওই কাগজ। ওর মাথারই কাজ। মিখাইলো ইভানভিচের বয়স তো তার ডবল। কিন্তু আমার ছেলেই তো বুঝিয়ে শুনিয়ে এই পথে টেনে আনল তাকে। আর কি, মামলা হবে — দেবে ঠেলে সাইবেরিয়ায়। কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে এসে আবার কাজে লেগে যাবে...'

বলতে বলতে আরো ফুলে ওঠে মায়ের বুক। মাতৃগর্বে মানসলোকে পুগ্র হয়ে ওঠে এক বীরপুরুষ। অন্তরের প্রেরণা চায় ভাষা। গলা আটকে যায়। তা ছাড়া অমানুষিকতার যে বিকট কালো রূপটা আজ চোখের সামনে দেখেছে মা — সেই ভয়ংকরের, নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার ছবি এখনও মাথার মধ্যে কাঁপছে — সেই কালোর সঙ্গে ভারসাম্য রাখবার জন্য উজ্জ্বল যুক্তিসঙ্গত একটা কিছুর প্রয়োজন ছিল মায়ের। যা কিছুকে পবিত্র বলে, খাঁটি বলে জেনে এসেছে মা, আপনার অজ্ঞাতসারে, আপন পুত-হৃদয়ের টানে তারা সব এক সঙ্গে হয়ে এক মহান শিখায় জ্বলে ওঠে। তার তীব্র জ্বালায় মায়ের চোখ ঝল্‌সে যায়...

'ওর মতো অনেক মানুষ আছে; আরো জন্মাচ্ছে দিনে দিনে। যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন তারা লড়াই করে যাবে সত্যের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য...'

কথার আগল খুলে যায় মায়ের। জনগণের মুক্তির জন্য যে গুপ্ত আন্দোলন চলেছে তার সম্বন্ধে যা কিছু জানা ছিল সাবধানতার কথা ভুলে গিয়ে সব বলে গেল কথার ঝোঁকে। অবশ্যি নাম ধাম বলল না কারো। একান্ত প্রিয়-জন যারা তাদের কথা বলতে গিয়ে মায়ের মুখর ভাষা ভালোবাসা আর আবেগে উচ্ছল হয়ে ওঠে। জীবনের কঠিন সংঘাতে মায়ের বুকের এই ভালোবাসা, এই শক্তি কত দেরীতেই না বিকাশের পথ পেয়েছে। নিজের মনের আবেগে উজ্জ্বল আর মহিমান্বিত হয়ে মনের পটে মানুষগুলোর ছবি ফুটে ওঠে।

'দুনিয়া জুড়ে প্রতিটি শহরবন্দরে এই সাধারণ কাজ করছে সাচ্চা মানুষেরা। তাদের শক্তির কোন সীমা-পরিসীমা, হিসেব-কিতেব নেই। যতই দিন যাচ্ছে ততই জোর বাড়ছে এই শক্তির। বেড়েই চলবে যতদিন না লড়াইয়ে আমরা জিতি...'

কণ্ঠে দ্বিধা নেই, জড়িমা নেই, সমান লয়ে বয়ে চলেছে। মায়ের

আজ আর কথা হাতড়াতে হয় না, কথার দল আপনি এসে ধরা দেয়। সারা দিনের যত ধুলো আর রক্ত তা মুছে ফেলে সহজ হতে চায় মা। সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষার সুতোয় রঙ্গীন কথা দুলিয়ে কথার মালা গাঁথে মা। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে শোনে মানুষগুলো। মায়ের চোখে তাদের গম্ভীর চোখ বাঁধা। পাশে বসে তাতিয়ানা হাঁপায় উত্তেজনায় — মা শোনে তার দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ। যে-বিশ্বাসের বলে এতক্ষণ এত কথা কয়েছে মা, এই সবে মিলে সেই বিশ্বাসের মূলে শক্তিসঞ্চার করে; যে-অঙ্গীকার এই মানুষগুলোর সামনে তুলে ধরেছে, অন্তরের বিশ্বাসই বলে দেয় মিথ্যে নয় সে-অঙ্গীকার...

'যারা এক দিনও সুখের মুখ দেখেনি; দুঃখে-কষ্টে-অভাবে-জুলুমে যারা শেষ হয়ে যাচ্ছে... ধনীর আর ধনীর নফরদের শোষণে যারা মাটির ধুলোয় মিশে আছে... এস, সবাই এস, মানুষের দুঃখ ঘোচাবার জন্য যারা জেলের আঁধারে তিলে তিলে মরছে, অমানুষিক অত্যাচার সইছে, এস, তাদের সঙ্গে হাত মেলাও। নিজেদের দিকে চায়নি তারা, নিজেদের লাভের কোনো কথা না ভেবে দুনিয়ার মানুষের সুখের পথ তারা দেখিয়ে দেবে। কাউকে ঠকায়নি, ঠকাতে চায়নি। খোলাখুলি বলব — এ বড় শক্ত পথ! কাউকে তারা জোর করে টেনে আনেনি। কিন্তু একবার যে এসেছে, আর সে পেছন ফেরেনি; কেননা সে দেখেছে এখানেই সত্য, এই খাঁটি পথ, এ ছাড়া আর পথ নেই।'

সত্যের কথা বলতে নেমেছে মা নিজেই। দিন গুনছিল এতদিন। সেই কাজটুকু করতে পেয়ে মা আনন্দে বিহ্বল আজ।

'ওদের সঙ্গে যেতে ভয় পেও না। ক্ষুদ-কুঁড়ো পেয়ে তুষ্ট হবার মানুষ নয় ওরা। যতদিন না সমস্ত পৃথিবী থেকে লোভ, শোষণ, ধোঁকাবাজী একেবারে শেষ হয়ে যাবে ততদিন ওরা থামবে না। কারু কাছে মাথা নোয়াবে না। শুধু যেদিন সমস্ত জনতা এক হয়ে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে, আমিই রাজা, আমিই প্রভু; আমাদের আইন আমরাই করব — সে-আইন সকলের জন্য সমান হবে — সেই দিন তারা সেই গণরাজের সামনে মাথা নোয়াবে...'

ক্লান্ত হয়ে থেমে যায় মা। চারদিকে চায়। শান্তভাবে বোঝে, এতক্ষণকার কথাগুলি ব্যর্থ হয়নি। চাষীরা তার দিকে তাকিয়েই থাকে। চোখে মুখে যেন কিসের প্রত্যাশা! পিওতর হাত দুটো আড়াআড়ি করে বুকের ওপর

রেখে চোখ কোঁচকায়। ওর বিচিত্র মুখের ওপর একটা মৃদু হাসি খেলে বেড়ায়। স্তেপানের একটা কনুই তখনও টেবিলের ওপর। তার সমস্ত দেহটা উদগ্র ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, মনে হয় এখনও শুনছে সে। ওর মুখের ওপর একটা কিসের ছায়া পড়েছে, ফলে মুখের সেই অসম্পূর্ণ ভাবটুকু আর নেই। হাঁটুর ওপরে কনুই ভর দিয়ে, মাথা নীচু করে মায়ের পাশে বসে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে ওর বৌ।

ধীরে ধীরে বেঞ্চিতে বসে পড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে পিওতর, 'বুঝলে তো সব?'

স্তেপান সোজা হয়ে বসে বউ'র দিকে তাকায়। দু'হাত বাড়িয়ে দেয় যেন কাউকে আলিঙ্গন করতে চাইছে...

কী যেন ভাবতে ভাবতে নিচু গলায় বলে, 'একবার যদি ও কাজ আরম্ভ কর, তবে সত্যি মন প্রাণ দিয়ে কর...'

পিওতর বিনীতভাবে বলে:

'নিশ্চয়ই! পেছন-ফেরা নেই...'

স্তেপান বলে যায়, 'মস্ত বড় ব্যাপার!'

পিওতর জুড়ে দেয়, 'তা তো ঠিকই! দুনিয়া জোড়া কাজ!'

১৮

মাথাটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে ওদের চুলচেরা কথাবার্তা শোনে মা। তাতিয়ানা একবার উঠে চারদিকে চায় তারপর আবার বসে পড়ে। দৃষ্টিতে গভীর অসন্তোষ আর তাচ্ছিল্যভরে ও চাষীদের দিকে চায়। ওর সবুজ চোখ দুটো একটা হিম দীপ্তিতে জ্বলছে। হঠাৎ মায়ের দিকে ফিরে শুধয়:

'জীবনে আপনি মেলাই কষ্ট পেয়েছেন, বুঝি?'

'তা পেয়েছি বৈকি!' মা বলে।

'আপনার কথা শুনতে বড় ভালো লাগে। কলজের শিরাগুলোকে ধরে যেন টান মারে। কী মনে হয় জানেন? এই আপনি যাদের কথা বলছেন — যদি এই চোখ দুটো দিয়ে তাদের একবার একটুখানি দেখতে পেতাম! জীবনটার চেহারাখানাও একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। কী রকম জীবন আমার? চারধারে তো যত ভেড়ার পাল! একটু আধটু লিখতে

পড়তে জানি। পড়িও বই। অনেক ভাবি। ভাবতে ভাবতে এক এক সময় রাত্তিরে ঘুম হয় না। কিন্তু কী লাভটা হচ্ছে তাতে? কিছুই না। ঐটুকু যদি না করি তাহলে আর কী, খতম! আর ভেবেও বা কী হচ্ছে! আবার খতম, মিছিমিছিই।'

তাতিয়ানার চোখে ব্যঙ্গ। এক এক সময় মনে হয় কথাগুলোকে সুতোর মতো করে যেন কামড়ে কামড়ে ছেঁড়ে। পুরুষেরা চুপ। জানালার শার্শিতে ঝাপটা মেরে, ছাদের খড়গুলোকে নাড়া দিয়ে, চিম্‌নির মধ্যে কোমল সুরে শিস দিয়ে হুহু করে বাতাস বয়ে চলেছে। কোথায় একটা কুকুর কাঁদছে। মাঝে মাঝে এক আধটা অনিচ্ছুক বৃষ্টির ফোঁটা জানালায় এসে লাগছে। ঘরের বাতিটা কাঁপতে কাঁপতে এক একবার প্রায় নিভে যায়, আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠে স্থির শিখায় জ্বলতে থাকে।

'আপনার কথা শুনে মনে হয় এই তাহলে জীবনের পথ। আর কী আশ্চর্য জানেন? শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, আমি তো এ সবই জানি! কিন্তু আগে কখনও কারো কাছে শুনিনি এমনি কথা; আর এমনি ধারণাও ছিল না...'

ভুরু কুঁচকে ধীরে ধীরে স্তেপান বলে, 'তাতিয়ানা, চল, কিছু খেয়ে নিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দেওয়া যাক্। লোকেরা দেখবে চুমাকভের বাড়ীতে আজ এত রাত্তির অবধি বাতি জ্বলছে। আমাদের কিছু হবে না। তবে আমাদের অতিথির যদি কিছু হয়...'

তাতিয়ানা উঠে স্টোভের কাছে যায়।

পিওতর একটু হেসে স্তেপানকে বলে, 'তা যা বলেছ! এখন কান খাড়া রাখো! খবরের কাগজটা লোকেদের মধ্যে একবার পড়লেই...'

'আমার কথা ভাবছি না, আমায় ধরলে বিশেষ কিছু আসবে যাবে না।'

তাতিয়ানা টেবিলের কাছে এসে বলে:

'সরো...'

ও উঠে একধারে দাঁড়িয়ে বৌয়ের টেবিল সাজান দেখে।

'তা তোমার আমার মতো মানুষের আর দাম কী দাদা! আমরা কড়িতেও বিকোই না...' ব্যঙ্গের হাসি হেসে স্তেপান বলে।

মায়ের হঠাৎ বড় কষ্ট হয় মানুষটার জন্য। বড় ভালো লেগেছে ওকে; যতই দেখে ততই ভালো লাগে। কথাগুলো বলার পর সারা দিনের

গ্লানিটা কেটে গেছে মায়ের মন থেকে, নিজেকেই ভালো লাগছে নিজের, সকলের জন্য দরদে মনটা ভরে উঠেছে। বলে:

'ভুল করছেন বাবা! রক্ত-চোষা ডাকাতেরা কানা-কড়িরও দাম দিল না বলে তাই মেনে নেবেন নাকি? নিজের দাম নিজেরা ভেতর থেকেই ঠিক করবেন — ঠিক করবেন আপনাদের দোস্তদের পক্ষ থেকে, দুষমনদের তরফ থেকে নয়...'

'দোস্ত?' চাপা সুরে বলে উঠে স্তেপান। 'হুঃ, দোস্তই বটে! রুটির টুকরোটি সামনে পড়লে তো সব দোস্তি চলে যায়...'

'কিন্তু, বলছি আমি, আমাদের এই সাধারণ মানুষেরও বন্ধু আছে...'

'তা হবে, কিন্তু এখানে নেই। আর সেই তো হল কথা।' চিন্তিতভাবে স্তেপান বলে।

'তা বন্ধু জোটান এখানে!'

কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দেয় স্তেপান:

'হুঁ! তাই করা দরকার...'

তাতিয়ানা ডাকে, 'বসুন সব। খাবার তৈরী।'

মায়ের কথাবার্তা শুনে পিওতর এতক্ষণ অভিভূতের মতো ছিল। এখন আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল:

'খুব সক্কালে উঠেই যেতে হবে গো, মা! নইলে কোথা দিয়ে কার বা নজর পড়বে। শহরে যাবেন না, ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে পরের ঘাঁটিতে যান...'

স্তেপান বলে, 'তা কেন? আমি নিয়ে যাব গাড়ী করে।'

'না, তা হবে না। তারপর যদি শুধয়, মেয়েমানুষটা রাত্তিরে ছিল? বলবে, হাঁ ছিল। তা গেল কোথায় এখন? আমি দিয়ে এসেছি তুলে। তারপর হাঁকবে, তবে শালার তুমিই ওর সাকরেদ? চল শালা জেলে! বুঝলে তো? সাত তাড়াতাড়ি জেলে গিয়ে কী লাভ! সময় মতো হবে সব। সময় হলে জারকেও তো মরতে হবে। কাজেই বলছি যেও-টেও না। খোঁজ তালাস হয়, ব্যস্ বলে দেবে, রাত্তিরে ছিল বৈকি। ভোরে উঠেছে, নিজেই গাড়ী ঠিক করেছে, চলে গেছে। সদর রাস্তার ওপর গাঁ, কত লোকই তো রোজ আসছে যাচ্ছে থাকছে। কে তার হিসেব রাখে...'

বিদ্রূপের স্বরে তাতিয়ানা বলে, 'এত ভীতুপনা শিখ্লে কোত্থেকে, পিওতর?'

'কাজ কত্তে হলে তার ফন্দিফিকিরও শিখ্‌তে হয়গো, বৌ!' হাঁটুতে চাপড় মেরে বলে পিওতর। 'ভয়ে গত্তেও সেঁধ্‌ুতে শিখতে হয়, আবার সময় হলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেও শিখতে হয়। মনে আছে তো, সেবার খবরের কাগজের জন্য ভাগানভ কী ঠ্যাঙ্গানিটাই খেয়েছিল! দাও দিকিন একখানা বই ওর হাতে আবার! হাজার টাকা দিলেও আর ওমুখো হবে না। কিন্তু আমায় সে পাত্তর পাবেন না, মা। আমি দুঁদে শয়তান। সবাই জানে। কত কাগজ দেবেন বলুন, সব একেবারে ঠিক ঠিক জায়গায় পাচার করে দিচ্ছি। হাঁ, এটা ঠিক, এখানকার মানুষেরা বেশির ভাগই লিখতে পড়তে জানে না, আর ভীতুর একশেষ। কিন্তু তাহলে কী হয়! চোখ বন্ধ করে কদ্দিন থাকবে আর! এই সব বইয়ে খুব সাফ, সোজা কথায় লেখা আছে সব। খালি দু'দণ্ড বসে ভাব নারে একটু! দেখ না দু'য়ে দু'য়ে কত হয়। এক এক সময় পণ্ডিতদের চেয়ে মুখ্যু লোকেরাই বোঝে বেশি। বিশেষ করে যদি লেখাপড়া জানা বাবুদের পেটটি ভরা থাকল! অনেক দেখা আছে আমার, এ তল্লাটে ঘুরি তো সবখানে। যাই হোক, বুদ্ধিশুদ্ধি করে একটু মাথা খাটিয়ে তবে তো জীবনটা কাটানো চাই, গোড়াতেই যেন ধরা না পড়ি। কত্তারাও আঁচ করেছেন — এই চাষী ব্যাটারা আর বাপের সুপুত্তুর নেই এখন; তেনাদের দেখলে দাঁত বের করে হাসে না; মোদ্দা কথা প্রভুদের অধীনতার অভ্যেস কাটতে চায়। সে-দিন ওই পাশের গাঁয়ে — ওই স্মলিয়াকভোতে কী হল! ট্যাক্স নিতে এসেছিল। ডাণ্ডা নিয়ে রুখে উঠল সব চাষীরা। আর পুলিশ-সাহেব! অমনি খেঁকিয়ে উঠলেন: "কী রে কুত্তীর বাচ্চারা! শালা সব জারের বিরুদ্ধে?!" ছিল সেই চাষী — স্পিভাকিন নাম — অমনি এগিয়ে এসে বলল — "মর ব্যাটা! গতর থেকে সুতোটি অবধি খসিয়ে নিলে এ কেমন ধারা জার গো! মুখে আগুন অমন জারের!" দেখলে তো মা! কদ্দুর গেছে সব! অবশ্যি স্পিভাকিনকে ওরা ছেড়ে দেয়নি; ধরে নিয়ে গারদে ঠুসেছে। তা স্পিভাকিন গেলে কী হবে — যে-কথাগুলো মুখ থেকে ওর খসেছে, তা যে রেখে গিয়েছে। ছোঁড়াগুলো অবধি মুখস্থ করে রেখেছে সেগুলো। এমনি জলজ্যান্ত রয়েছে স্পিভাকিনের কথা!'

কিছু খেল না ও। কালো কালো ঝকমকে চোখ দিয়ে চাইতে চাইতে বকর্‌ বকর্‌ করে চলল। চাষীদের জীবন সম্বন্ধে ওর নিজের টীকা-টিপ্পনী ঝুড়ি ঝুড়ি শোনাল মাকে।

বার দুই স্তেপান ওকে থামিয়ে বলল:

'আরে বাপু, দুটো খেয়ে নাও...'

তক্ষুনি রুটি-চামচ তুলে নিল; কিন্তু হাতের রুটি হাতেই থাকে। পিওতরের গল্প চলে অঝোর ধারায় — এমনি সহজে এমনি অবলীলায় যেন লার্ক পাখি গান গাইছে। খাওয়া শেষ হতেই লাফিয়ে উঠে বলল:

'রাত হয়েছে, চল্লাম...'

মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে ওর হাত-ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে:

'বিদায় মা! আর হয়তো কোন দিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু মা, এই দেখাটা হয়ে, আপনার কথা শুনে যে কী ভালোই লাগল, তা বোঝাতে পারছি না। আচ্ছা, কাগজ ছাড়া আপনার স্যুটকেসে আর কিছু আছে? একটা পশমী শাল? বুঝলে, স্তেপান? একটা পশমী শাল। ভুলো না যেন। স্যুটকেসটা আর ওটা এক্ষুনি এনে দিচ্ছে ও। এস, স্তেপান! বিদায় মা। ভগবান আপনার ভালো করুন...'

ওরা চলে যায়। আরশোলাদের ছুটোছুটির শব্দ শোনা যায়। ছাদের ওপর বাতাসের কৌতুক; চিমনির ফোকরে চলছে তার সরসরানি। জানালার কাঁচে ঝির্‌ঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে মিহি-ধারায়। স্টোভের ওপর থেকে কাঁথা-কম্বল পেড়ে একটা বেঞ্চির ওপর মায়ের বিছানা করে দিল তাতিয়ানা।

মা বলে, 'ভারি প্রাণবন্ত মানুষটা, না?'

ভুরু কুঁচকে গিন্নি তাতিয়ানা দেখে মাকে। 'তা গলাবাজী করে যথেষ্ট? কিন্তু ওই পর্যন্তই।'

'আর আপনার সোয়ামী? কেমন মানুষ?' মা শুধয়।

'আছে ভালোমানুষটি। নেশা-টেশা নেই। মিলেমিশেই আছি। কিন্তু বড় দুর্বল চরিত্তিরের মানুষ...'

সোজা হয়ে দাঁড়ায় তাতিয়ানা। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে:

'আমরা কী করব এখন বলুন তো? বিদ্রোহ করা উচিত এখন? নিশ্চয়ই উচিত। প্রত্যেকেই ওকথা ভাবছে। সবারই মনে মনে আছে কথাটা। কিন্তু শুধু আলাদা আলাদা ভাবে মনে মনে থাকলে কী হবে! সবাইকে গলা তুলে বলতে হবে... অথচ শুরু তো করতে হবে একজনকে...'

বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে হঠাৎ বলে উঠল:

'আপনি বলছিলেন না, আপনাদের ওদিকে ভদ্দর ঘরের মেয়েরা অবধি একাজে নেমেছে। তারা মজদুরদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের পড়েটড়ে শোনায়। ওদের আড় আড় ঠেকে না? ভয় লাগে না?'

মায়ের জবাব শুনে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে তাতিয়ানা। তারপর চোখের পাতা নামিয়ে মাথা নীচু করে, মাটির দিকে তাকিয়ে বলে চলে:

'কোন কোন বইয়ে "অর্থহীন জীবন" কথাটা পেয়েছি। খুব বুঝি ওটার মানে! অর্থহীন জীবন যে কেমন, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ভাবনা আছে, কিন্তু এমনি এলোমেলো, ছাড়া-ছাড়া। ঠিক যেন রাখাল ছাড়া ভেড়ার পাল। গুছিয়ে গেঁথেগুঁথে তোলবার কেউ, কিছুই নেই... একেই বলে অর্থহীন জীবন। কিছু কিছু বুঝতে পারলে অসহ্য লাগে। একদণ্ডও টিকতে ইচ্ছে করে না। সম্ভব হলে মুখ না ফিরিয়ে পালিয়ে যেতাম...'

মা বুঝতে পারে এ মেয়ের বুকের মধ্যে কী যেন বিষণ্ণ আগুন জ্বলছে। ওর সবুজ চোখের শুকনো জ্বালা, ওর রোগা মুখখানায় আর গলার স্বরে তার হল্কা। মায়ের ইচ্ছে করে ওকে একটুখানি আদর করে সান্ত্বনা দেয়।

'কী করতে হবে তা তো আপনি বুঝতেই পারছেন...'

'কিন্তু কেমন করে, তাও তো জানা উচিত!' কোমল স্বরে বাধা দেয় তাতিয়ানা। 'আপনার বিছানা পাতা হয়েছে।'

স্টোভের কাছে গিয়ে স্থির হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে ও গভীর বিষণ্ণ চিন্তায় মগ্ন হয়ে। কাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়ে মা। ক্লান্তিতে দেহ যেন ভেঙে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে। বাতিটা নিভিয়ে দিল তাতিয়ানা। ঘর আঁধার হয়ে গেল। তখন উত্তেজনাহীন চাপা স্বরে বলতে আরম্ভ করে ও। গলার স্বর শুনে মনে হয়, ওই নির্বিকার গুমোট অন্ধকারটা থেকে ও কি যেন মুছে নিচ্ছে।

'আপনি প্রার্থনা করেন না দেখছি। ভগবান-টগবান, আর তার যাদু আমিও মোটেই বিশ্বাস করি না।'

অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ করে মা। তামসী রাত্রি একটা অতল কালো গহ্বরের মতো মাকে গ্রাস করবে বলে যেন জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বেড়াচ্ছে চাপা খসখসানি। মা সভয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলে:

'ভগবানের কথা জানিনে, কিন্তু যীশু খৃষ্টকে মানি... তিনি যে বলেছেন — পাড়াপড়শীকে নিজের মতো করে ভালোবেসো — সে কথায়ও বিশ্বাস করি!..'

তাতিয়ানা নীরব। কালো স্টোভটার পটভূমিতে ওর ধূসর ঋজু মূর্তিখানির অস্পষ্ট অবয়ব-রেখা দেখতে পায় মা। স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাতিয়ানা। গভীর দুঃখে চোখ বোজে মা।

হঠাৎ শুনতে পায়:

'আমার সন্তানদের মৃত্যুর জন্য ভগবান বলুন, মানুষ বলুন, কাউকে কখনো আমি ক্ষমা করতে পারব না!..' তাতিয়ানার কণ্ঠ হিমশীতল।

উদ্বিগ্নভাবে উঠে পড়ে মা। কী ব্যথায় যে পাঁজর ভেদ করে অমন কথাগুলো বেরুল, তা বুঝতে বাকী থাকে না মায়ের। কোমল স্বরে বলে:

'আপনার এখনও কাঁচা বয়েস, আবার ছেলে হবে, ভাবছেন কেন?'

তক্ষুনি জবাব দেয় না তাতিয়ানা। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলে:

'না। কী যেন হয়েছে আমার। ডাক্তার বলেছে আর সন্তান হবে না আমার...'

মেজের ওপর দিয়ে একটা ইঁদুর ছুটে গেল। ধ্বনির অদৃশ্য বিদ্যুৎ চমকে নিস্তব্ধতার বুক চিরে কী যেন একটা ভেঙে গেল তীব্র খান খান শব্দ করে। আবার বৃষ্টি পড়ে। ছাদের ওপর খড়ের মধ্যে জল-ঝরার রিম্‌ঝিম্ — মনে হয় কার যেন ভয়-পাওয়া মিহি আঙুলের পরশ কাঁপছে শুক্‌নো খড়ের বুকে। মাটির বুকে টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি ঝরার থম্‌থমে সুরে যেন মন্থর হৈমন্তী রাত্রির প্রহর গোনা চলছে...

তন্দ্রার ঘোরে বাইরে কার যেন চাপা পায়ের শব্দ শুনতে পায় মা। দোরগোড়া পর্যন্ত আসে। অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুলে কে জানি জিজ্ঞাসা করে:

'শুয়ে পড়েছ, তাতিয়ানা?'

'না।'

'উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?'

'মনে তো হচ্ছে।'

আলোটা জ্বলে ওঠে, সেকেন্ড খানেক কেঁপে উঠে আঁধারে নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়। স্তেপান মায়ের বিছানার কাছে আসে; পায়ের ওপরকার কোটটা

ঠিক করে দেয়। সহজ সরল এই আদরটুকু বড় ভালো লাগে মায়ের। মৃদু হেসে আবার চোখ বোজে। স্তেপান নিঃশব্দে জামাকাপড় ছেড়ে ওপরের মাচানে উঠে শুয়ে পড়ে। চতুর্দিক চুপচাপ হয়ে যায় আবার।

মা নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে শুয়ে নিঝুম অন্ধকারের অলস শব্দ শোনে। চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে রীবিনের রক্তস্নাত মুখ...

মাচানের ওপরে শুষ্ক ফিসফিস স্বর।

'দেখছ তো। বুড়ো বুড়ো লোকেরা সারা জন্ম খেটে আর দুঃখধান্ধায় হাড় কালি করে, কোথায় এখন দু'দিন বসে গতর জুড়োবে, না এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর স্তেপান, তুমি একটা জোয়ান-মন্দ মানুষ...'

গভীর ভেজা কণ্ঠে উত্তর দেয় স্তেপান:

'না ভেবে চিন্তে এ রকম কাজে ঢোকা যায় না...'

'ও তো এ্যাদ্দিন শুনে আসছি...'

কয়েক মুহূর্ত পরে স্তেপানের কণ্ঠ গমগম করে ওঠে:

'দেখ, শুরু কী করে করব ঠিক করে ফেলেছি। পয়লা আলাদা আলাদা করে ক'জনাকে বলব। যেমন ধর আলেকসেই মাকভ — লেখাপড়া জানে, সাহসও আছে। কর্তাদের ওপর চটে আছে। তারপর আছে সের্গেই শোরিন — সেও খুব চালাক লোক। ক্লিয়াজেভ আছে — খাঁটি মানুষ, ভয়ডর একদম নেই। ব্যস্ আপাতত এ পর্যন্তই, শুরুর পক্ষে ঢের। তারপর যে-সব লোকের কথা উনি বললেন আমাদের, তাদেরও একটু হদিস্-নিরিখ কত্তে হবে। ভাবছি কী জান? একটা কুড়ুল কাঁধে ফেলে শহরে যাব, যেন কাঠ চেরাই করে উপরি-পয়সা কামাতে এসেছি। একটু সাবধানে থাকতে হবে তো এক্ষেত্রে! কি না বললেন উনি — নিজের দাম নিজেকেই ঠিক করতে হবে। সেই মানুষটা — ওই যাকে পুলিশে ধরেছে গো, — একেবারে খোদ দুনিয়ার মালিকের কাছে নিয়ে যাও, সেখানেও ব্যাটা ভাঙবে তবু মচ্‌কাবে না। য়্যাঁ! শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে... আর শালা নিকিৎকা! ওটাও লজ্জা পেল... অদ্ভুত ব্যাপার!'

'তোমাদের নাকের সামনে একটা মানুষকে মারলে আর যত মরদ সব হাঁ করে দেখলে!..'

'আরে সবুর করো! আমরাই যে ওকে ধরে ঠ্যাঙাইনি, এ কি কম ভাগ্যি নাকি গো?'

অনেকক্ষণ ধরে বৌ'এর সঙ্গে চুপি চুপি কী কথা কয় স্তেপান। এক

এক সময় এমনি আস্তে যে একটা কথাও বুঝতে পারে না মা। আবার এক এক সময় বেশ জোরে জোরে মোটা গলায় বলে। বৌ ধমকায়:

'চুপ! জাগিয়ে দেবে যে...'

ঘন মেঘের মতো জমজমাট ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায় মা।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি ভালো করে। ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতার মধ্যে গির্জার ঘণ্টায় সবে রাত্রিশেষের তামাটে বোল ধরেছে। তাতিয়ানা মাকে ডেকে তুলে দিল।

'সামোভারে আগুন দিয়েছি। একটু চা খেয়ে যাবেন। বিছানা থেকে উঠেই বাইরে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে...'

জট-পাকান দাড়িতে বিলি কাটতে কাটতে মা'র ঠিকানা শুধয় স্তেপান। মায়ের মনে হয় রাতারাতি ওর চেহারা অনেকটা যেন ভালো হয়ে গেছে। আগের আধ-খেঁচড়া মুখটা যেন এবার সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চা খেতে খেতে মুচকে হেসে বলে স্তেপান:

'আশ্চর্য তো!'

তাতিয়ানা জিজ্ঞাসা করে, 'কী?'

'না, এই কী রকম করে আমাদের পরিচয়টা হল! কোন ঘটা না, কিছু না...'

মা কী যেন ভাবতে ভাবতে প্রত্যয়ের সুরে বলে:

'এ সমস্ত কাজ অমনিই। ঘটা পটার বালাই নেই।'

বিদায়ের মুহূর্ত আসে। স্তেপান তাতিয়ানা ধীর সংযত। কথা কেউই বেশি বলে না, অথচ মায়ের কোথায় কিসে আরাম হবে তাই নিয়ে সবাই অতি ব্যস্ত। হাজারো রকমের কত তাদের চেষ্টা।

গাড়ীতে বসে মায়ের মন বলে স্তেপান কাজ আরম্ভ করবে ছুঁচোর মতো অতি সাবধানে, চুপচাপ আর অনলস ভাবে। সর্বদা বৌয়ের কথার ধার, তার সবুজ চোখের তীব্র আগুন ওকে চাঙ্গা রাখবে। যদ্দিন বেঁচে থাকবে, ওই সন্তান-হারা অভাগী তার মরা ছেলের হিংস্র শোক আর প্রতিশোধের জ্বালা ভুলতে পারবে না।

মনে পড়ে রীবিনের কথা — সেই রক্ত, সেই মুখ, সেই জ্বলন্ত চোখ, তার কথা — অমানুষিক বর্বরতার সামনে একটা তিক্ত অসহায়তায় মায়ের বুকখানা কুঁকড়ে ওঠে। সারা রাস্তায়, ধূসর দিনের নিষ্প্রভ পটভূমিতে কালোদাড়ি মিখাইলোর মূর্তি রইল সম্মুখের দৃষ্টি জুড়ে।

ছিন্নভিন্ন অঙ্গের বসন, পিছমোড়া করে হাত বাঁধা, চুল এলোমেলো, যে-সত্যের ধ্বজা ও বহন করে চলেছে, সেই সত্যের প্রতি গভীর বিশ্বাসে দীপ্ত আর ক্রোধে দৃপ্ত সেই বলিষ্ঠ মূর্তি! হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ এমনি গ্রাম বিনীতভাবে ধুলোর বুকে মিশিয়ে আছে এই পৃথিবীতে — মনে হয় মায়ের — যেখানে মানুষ ন্যায়ের পথ চেয়ে গোপন প্রতীক্ষায় দিন গুনছে আর হাজার হাজার মানুষ সেখানে কোন মতে অনর্থক খাটুনি খেটে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে — কিছুর আশা রাখে না, কোন নালিশ নেই।

মা'র মনে হয় জীবনটা যেন অচষা, পাহাড়ী জমি — আকুল আশায় বোবা হয়ে কর্মীদের জন্য চেয়ে আছে আর নিঃশব্দে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে মুক্ত সাচ্চা মানুষকে:

"এস সত্যের বীজ, জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দাও আমার এই প্রসারিত বুকে। তোমার শ্রমের ধন শতগুণে ফিরিয়ে দেব আমি!"

কালকের সাফল্যের কথা মনে পড়ে। বুকের মধ্যে শান্ত আনন্দ উছলে ওঠে। সলজ্জভাবে মা সামলে নেয় নিজেকে।

১৯

নিকলাই এসে দরজা খুলে দিল — আলুথালু চেহারা, হাতে একখানা বই। আনন্দে প্রায় চীৎকার করে ওঠে:

'আরে! এরি মধ্যে!'

চশমার পেছনে ওর কোমল চোখ দুটি মিট্‌মিট্ করে। স্নেহের হাসি হেসে মাকে কোট খুলতে সাহায্য করে। বলে:

'কাল খানাতল্লাশি করেছে বাড়ী। আপনার জন্য খুব ভাবনা হচ্ছিল। কিন্তু আমায় ধরেনি। আপনি ধরা পড়লে আমায় ছেড়ে দিত না অবশ্য!..'

উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলতে বলতে খাবারঘরে নিয়ে যায় মাকে।

'আমার চাকরিটি এবার কিন্তু থাকবে না। যাক্‌গে। কোন্ চাষীর ঘোড়া নেই, সেই হিসেব করাটা আর ভালো লাগে না।'

ঘরখানার দিকে তাকালে মনে হয় কোন একটা দানব এসে হঠাৎ-খেয়ালে ঘরের পাঁচিল ধরে রাম-ঝাঁকানি দিয়েছে। তাই অমন লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দেয়ালের ছবিগুলো সব মেজেতে লুটোচ্ছে; দেয়াল-ঢাকা কাগজ

ফালি ফালি হয়ে দেয়াল থেকে ঝুলছে; এক জায়গায় মেজের কাঠ ওঠান, জানলার তাক উপড়ে ফেলা। স্টোভের কাছে ছাই ছড়ান মেজেতে। মায়ের কাছে এ দৃশ্য নতুন নয়। কিন্তু নিকলাইয়ের মুখে যেন আছে নতুন কিছু — তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মা।

টেবিলের ওপর পড়ে আছে না-ধোয়া বাসনপত্র, ঠাণ্ডা সামোভার; চীজ্, সসেজ অমনি ঠোঙ্গায় পড়ে, প্লেটে নয়। টেবিলখানা বইয়ে, রুটির টুকরোয় আর সামোভারের কয়লায় ঢাকা। মা মুচকে হাসে। নিকলাইও হাসে বিব্রতভাবে।

'ওরাই সবটা করেনি কিন্তু। আমারও হাত আছে। ভাবলাম আবার তো আসবেই, তাই আর পরিষ্কার টরিষ্কার করিনি। যাক্‌গে — এবারে বলুন আপনার কথা। কেমন হল সব শুনি।'

প্রশ্নটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল মায়ের বুকে। রীবিনের চেহারাটা আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে। ছিঃ, এতক্ষণ বলেনি ওর কথা। এসেই বলা উচিত ছিল। চেয়ারটা নিকলাইয়ের দিকে একটু এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলে যেতে লাগল ইতিবৃত্তটা — একটি কথা বাদ না দিয়ে, শান্ত সংযত থাকার চেষ্টা করে।

'ধরা পড়েছে সে...'

চমক খেলে গেল নিকলাইয়ের মুখে।

'সত্যি?'

হাতের ইসারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে যায় মা এমনি ভাবে যেন মানুষের ওপর স্বৈরতন্ত্রী নিঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে আজ এসে দাঁড়িয়েছে ধর্মাধিকরণে। পাণ্ডুর মুখে, ঠোঁট চেপে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে শোনে নিকলাই। ধীরে ধীরে চশমাটা খুলে রেখে হাত বুলায় মুখে, যেন অদৃশ্য একটা মাকড়সার জাল এসে পড়েছে, সেটা মুছে ফেলতে চায়। ওর মুখের প্রতিটি রেখা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে; গালের হাড় ওঠে খাড়া হয়ে; নাসারন্ধ্র কাঁপতে থাকে থর্‌থর্ করে। ভয় পেয়ে যায় মা, এ মূর্তি আর কখনও দেখেনি ওর।

মায়ের বর্ণনা শেষ হয়। উঠে পড়ে নিকলাই; মুঠো-করা হাত দুটো পকেটে পুরে ঘরময় পায়চারি করে। চাপা দাঁতের ভেতর দিয়ে বিড়বিড় করে বলে:

'এ তো দেখছি খুব বড় মানুষ। জেলে কিন্তু খুব কষ্ট হবে ওর। এদের মতো লোকেদের বড় খারাপ লাগে জেলে।'

মনের উত্তেজনা চাপবার জন্য হাত দুটো পকেটের আরো গভীরে ঢুকিয়ে দেয়। তবুও ওর অবস্থাটা মা বুঝতে পারে। ওর মনের আগুনের আঁচ এসে লাগে মায়ের মনেও। নিকলাইয়ের কোঁচকান চোখের সরু ফাঁকটা ছুরির ফলার মতো দেখায়। আবার পায়চারি করতে করতে সে বলতে আরম্ভ করে। ওর স্বর চাপা ক্রোধের আগুনে ভরা।

'কী সাংঘাতিক! ক্ষমতা কায়েম রাখার অন্ধ নেশায় মত্ত হয়ে মুষ্টিমেয় কটা নির্বোধ লোক দুনিয়া-শুদ্ধ মানুষের টুঁটি টিপে এমন অকথ্য জুলুম করে যাবে! দিন দিন বেড়ে চলছে বর্বরতা! নিষ্ঠুরতাই আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবুন দেখি একবার অবস্থাটা! বুনো জানোয়ারের মতো হয়ে উঠে মানুষ মারছে। কেন? না তারা যে আইনের বাইরে! জুলুম করার এই যে লোভ এ হল ওদের ব্যাধি। দাসত্বের জঘন্য ব্যাধি। দাস-মনোভাবের বিষ ছড়াবার সুবিধা পেলেই ওদের পশুবৃত্তি বে-আব্রু হয়ে ওঠে। অনেকেরই মনে প্রতিহিংসার আগুন। কেউ কেউ জুলুমের চাবুক খেয়ে খেয়ে বোবা, পাথর হয়ে আছে। সমস্ত মানুষের চরিত্র দিচ্ছে নষ্ট করে।'

নিকলাই থামে, দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হয়ে থাকে। নীচু স্বরে বলে:

'এই পশুসুলভ সমাজব্যবস্থায় বাধ্য হয়ে আপনা থেকেই মানুষকে জানোয়ার হতে হয়।'

নীরবে কাঁদে মা। নিকলাই উত্তেজনা দমন করে প্রায় শান্তভাবেই চোখে অচঞ্চল দীপ্তি নিয়ে মা'র দিকে চায়।

'কিন্তু, নিলভনা! সময় নষ্ট করলে তো চলবে না। সামলে নিতে হবে নিজেদের...'

বিষণ্ণ হাসি হেসে মায়ের কাছে আসে। আবেগ ঢেলে মায়ের হাতখানা চেপে ধরে বলে:

'স্যুটকেসটা কোথায় আপনার?'

'রান্নাঘরে।'

'আমাদের বাড়ীর গেটের কাছে স্পাই। অত কাগজ লুকিয়ে নিয়ে যাবার সাধ্যি নেই। লুকিয়ে রাখব এমন জায়গাও নেই। এ দিকে

মনে হচ্ছে আজ রাতে আবার আসবে তল্লাসী করতে। কাজেই যত খারাপই লাগুক সব পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া উপায় নেই।'

'মানে?' শুধয় মা।

'স্যুটকেসে যা ছিল সব!'

এতক্ষণে বুঝতে পারে মা। এত দুঃখের মধ্যেও নিজের কৃতিত্বের জন্য মুখে গর্বের হাসি ফোটে।

'এক টুকরো কাগজও নেই।' চুমাকভের সঙ্গে সাক্ষাতের কাহিনীটা বলে মা। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শুনতে শুনতে প্রথমটায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে নিকলাই। কপাল কুঁচকে যায়। কিন্তু ক্রমশ উদ্বেগ কেটে গিয়ে গভীর বিস্ময় ফুটে ওঠে। অবশেষে উত্তেজনায় মাকে গল্পের মাঝখানেই থামিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে:

'সাবাস্! চমৎকার! বরাত আপনার অস্বাভাবিক রকম ভালো বলতে হবে...'

মায়ের হাত চেপে ধরে চাপা স্বরে বলে ওঠে:

'মানুষের ওপর একি অগাধ বিশ্বাস আপনার... তর ছোঁয়াচ সবাইকে লাগে। সত্যি মায়ের মতোই ভালোবাসি আপনাকে!..'

মৃদু হাসে মা। ভারি অবাক লাগে মায়ের। ভেবে পায় না, এ মানুষের এত আনন্দ, এত উত্তেজনা কিসের আজ!

'সত্যি, চমৎকার! বড় চমৎকার কেটেছে গত কটা দিন।' হাত দুটো ঘষতে ঘষতে মৃদু সাদর হাসি হাসে ও। 'শ্রমিকদের মধ্যে কেটেছে সারা দিন — পড়ে শুনিয়েছি, ওদের সঙ্গে কথা কয়েছি, আর এই নিরীক্ষণ করেছি আশ্চর্যরকম পবিত্র খাঁটি একটা কিসে আমার মনটা কানায় কানায় ভরে গেছে। কী অদ্ভুত চমৎকার মানুষ যে ওরা, নিলভনা, কী বলব! মানে তরুণ শ্রমিকরা... কী শক্তি! কী অনুভূতিশীল মন! আর জ্ঞানের কী অদম্য পিপাসা। ওদের দিকে তাকালেই রাশিয়াকে মনে পড়বে। একদিন দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হবে এই রাশিয়া!'

নিজের কথার সমর্থনে শপথ নেবার ভঙ্গিতে হাত ওঠায় নিকলাই। তারপর একটু থেমে আবার বলে:

'ঝর্‌ঝরে পুরোনো বই আর আঁক নিয়ে প্রায় একটা বছর কাটিয়ে দিলাম। কী ব্যাপার! য়্যাঁ? অসহ্য! বরাবর মজদুরদের মধ্যেই থেকে এসেছি। ওদের কাছ থেকে সরে গেলেই আমার সব কেমন যেন বিগড়ে

যায়। সমস্ত শক্তি জোগাড় করতে হয় এমন জীবনের জন্য। এবার আবার আমি খোলা আকাশে ডানা মেলব। ওদের মধ্যেই থাকব, কাজ করব। সারাক্ষণ ওদের দেখতে পাব, পড়ে শোনাব। বুঝলেন! সদ্যজাত চিন্তার সন্নিকটে থাকব, তরুণ সৃজনশীল উদ্যোগের সামনে। আশ্চর্য সহজ সরল! ভারি সুন্দর! আর মস্ত প্রেরণা দেয়, বুঝলেন! মানুষকে নতুন বানিয়ে দেয়। ভারি বল পাওয়া যায় বুকে। জীবন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।'

একটু বিব্রত আনন্দের হাসি হাসে নিকলাই। মা বোঝে এ সুখ। ওর আনন্দে নিজেও খুসি হয়ে ওঠে।

'আর তা ছাড়া,' বলে নিকলাই উচ্ছ্বসিত হয়ে, 'আপনিও এক আশ্চর্য মানুষ! খুব ভালো বোঝেন মানুষকে! অদ্ভুত উজ্জ্বলভাবে তার ছবি আঁকতে পারেন!..'

মায়ের পাশে এসে বসে নিকলাই। বিব্রত ভাবটা লুকোবার জন্য উচ্ছল মুখখানা ওপাশ করে চুল ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা বেশিক্ষণ নয়। আবার মুখ ফেরায় সে। মা'র সুসঙ্গত সরল উজ্জ্বল কাহিনী সাগ্রহে শুনতে থাকে তার মুখে চোখ নিবদ্ধ করে।

'অদ্ভুত কপালজোর আপনার!' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ও, 'জেলে যাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল আপনার — আবার হঠাৎ! বেশ বোঝা যাচ্ছে, কৃষকরাও জেগে উঠছে। তাতো হবেই। সেই মেয়েটি... মনে হচ্ছে একেবারে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি!.. গাঁয়ে কাজ চালাবার জন্য বাছা বাছা লোকের ওপর ভার দিতে হবে। লোক বলছি! ক'জনই বা আছে তেমন লোক!.. আমাদের যে শ'য়ে শ'য়ে দরকার...'

মা আস্তে আস্তে বলে, 'যদি পাভেল ছাড়া পেত! আর আন্দ্রেইও!'

নিকলাই মায়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নেয়।

'হয়তো কথাটা শুনে আপনার কষ্ট হবে; কিন্তু তবু বলি। আমি পাভেলকে বেশ ভালো করেই জানি, জেল থেকে পালাতে সে রাজী হবে না। ও চায় ওর বিচার হোক; মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ চায় ও। সুতরাং এ সুযোগ কি ছাড়বে ও, ভেবেছেন? আর কেনই বা ছাড়বে! সাইবেরিয়া থেকে পালাবে।'

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলে:

'যা করার বুঝে শুনেই করবে ও...'

চশমার ফাঁক দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত পরে বলে

নিকলাই, 'হ্ঁ! আপনার সেই চাষী বন্ধুটি আমাদের এখানে তাড়াতাড়ি এলেই ভালো হয় এখন। রীবিনের সম্বন্ধে লিখতে হবে গ্রামাঞ্চলের জন্য। ওর বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না, কারণ ও নিজে এত সাহস দেখিয়ে দিয়েছে। আজই লিখে ফেলব আমি। লুদ্‌মিলা চট্‌চট্‌ ছেপেও ফেলবে... কিন্তু তারপর ওগুলো পেঁছুবে কী করে ওদের কাছে?'

'আমি নিয়ে যাব...'

'না, সেটি হচ্ছে না!' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে নিকলাই। 'ভাব্‌ছি ভেসভশ্চিকভ নিয়ে যেতে পারে কিনা?'

'কথা বলে দেখব?'

'দেখতে পারেন! আর একটু শিখিয়ে পড়িয়েও দিতে হবে ওকে।'

'আর আমি কী করব তাহলে?'

'সে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

লিখতে বসে যায় নিকলাই। মা টেবিল পরিষ্কার করতে করতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। আঙুলের ফাঁকে কলমটা কাঁপছে, আর কাগজের শুভ্র বুকে কালির আখর সাজছে সারবন্দী হয়ে। এক এক সময় ঘাড়টা শিউরে ওঠে। মাথা পেছনে হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে এগিয়ে থাকে কখনও বা; তখন থুতনিটা কেমন কাঁপে, মা লক্ষ্য করে। ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে মা।

তারপর এক সময় উঠে পড়ে বলে নিকলাই, 'হয়ে গেছে। জামার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিন। কিন্তু পুলিশ এলে আপনাকেও ছাড়বে না, শরীর-তল্লাসী করবেই।'

'মরুক ব্যাটারা!' শান্তভাবে বলে মা।

সন্ধে বেলা এল ডাক্তার ইভান দানিলভিচ। এসেই ঘরের মধ্যে প্রায় ঘোড়দৌড় শুরু করে দিল। বলে:

'কী ব্যাপার হে, বল তো! হঠাৎ কর্তারা অমন ভেবড়ে গেল কেন? কাল রাত্তিরে সাত সাতটা বাড়ী তল্লাসী করেছে। আমার রোগী কোথায় হে?'

'কাল চলে গেছে।' নিকলাই বলে। 'আজ হলো শনিবার, পাঠচক্রের বৈঠক আছে। সে বাদ দেবে? কস্মিনকালেও না...'

'সে কী হে? ভাঙা মাথা নিয়ে পাঠচক্রে বসবে?'

'কম বোঝান বুঝিয়েছি? কোনো ফল হয়নি...'

'তা বন্ধুদের কাছে একটু বাহবা নেবে না!' মা বলে, 'এই দেখ, আমারও রক্ত পড়েছে!..'

ডাক্তার মায়ের দিকে তাকায়, কপট রাগে মুখটা বিকট করে বাঁকিয়ে দাঁত চেপে বলে:

'ইস্! রক্তখাকী বটে...'

'এই ইভান! এখানে ঘুটুর ঘুটুর করছ নি! পালাও শীগগির। অতিথি আসবে জানো! নিলভনা, কাগজটা দিয়ে দিন ওকে...'

'আবার কাগজ!' চীৎকার করে ওঠে ডাক্তার।

'হ্যাঁ, এই যে। এটাকে ছাপাখানায় দিয়ে দিও।'

'জো হুকুম। আর কিছু?'

'না, ব্যস্। সদরে স্পাই আছে একজন, জানো?'

'হুঁ, দেখেছি। আমার দরজায়ও আছে। আচ্ছা আসি তাহলে। শুনছেন রাক্কুসী, চল্লাম। হ্যাঁ বুঝলে? কবরখানার ব্যাপারটা হয়ে শাপে বর হয়েছে। সবাই বলাবলি করছে। শহরময় ঢিঢি। আর খাসা লিখেছিলে হে ব্যাপারটা সম্বন্ধে। কাগজখানা বেরুলও একেবারে সময়মত। আরে এই জন্যই তো আমি বলি সর্বদা — ওঁচা শান্তির চেয়ে জবরদস্ত লড়াই ঢের ভালো।'

'ভালো তো ভালো। ভাগো এখন...'

'অতিথিকে তাড়াচ্ছ! আচ্ছা নিলভনা, হাতখানা দেখি! ছোঁড়া ভারি অন্যায় করেছে। ওর যাওয়া ঠিক হয়নি! কোথায় থাকে জানো?'

ঠিকানা দিয়ে দেয় নিকলাই।

'কাল গিয়ে দেখে আসব। খাসা ছেলে, না?'

'সত্যি চমৎকার ছেলে...'

'সামলে রাখতে হবে ছেলেটাকে ভালো করে। খাসা মগজখানা ওর।' যেতে যেতে বলে ডাক্তার, 'এদের মতো ছেলেরাই খাঁটি সর্বহারা বুদ্ধিজীবীর জাত গড়বে। আর আমরা যখন একূল ছাড়িয়া ওকূলের পানে ভাসাইব তরী — হ্যাঁ, ওকূলে খুব সম্ভব শ্রেণী-সংঘাত-টংঘাত নেই — তখন আমাদের জায়গা নেবে এরা...'

'ভারি বক্‌বকে স্বভাব হয়েছে কিছুদিন থেকে তোমার, ইভান...'

'খোশ মেজাজে আছি যে হে! জেলের জন্য পা বাড়িয়ে আছ, না? তা যাও, দু'দিন বিশ্রাম হবে।'

'ধন্যবাদ। বিশ্রামের দরকার নেই। দিব্যি তাগড়া আছি।'

ওদের দু'জনের কথাবার্তা শোনে মা, মজদুর-ঘরের ছেলেটার জন্য এতটা দরদ দেখে ভারি খুশি হয় ও।

ডাক্তার চলে গেছে, নিকলাই আর মা খেতে বসেছে। নৈশ অতিথিদের অপেক্ষায় দুজন। গল্প করে নিকলাই কমরেড্‌দের বিষয়ে, অনেকে নির্বাসনে আছে, অনেকে আবার পালিয়ে এসে ছদ্মনামে কাজ করছে। নিরাবরণ, নিরাভরণ দেয়ালগুলিতে লেগে ঠিকরে ফিরে আসে ওর নীচু স্বরের কথা; যেন নতুন দুনিয়া গড়বার জন্য বিনীত দধীচিদের এই নিঃস্বার্থ আত্মদানের কাহিনী বিশ্বাস করতে পারেনি তারা। কোমল একটা ছায়া যেন গভীর স্নেহের আলিঙ্গনে জড়িয়ে আছে মাকে। অজানা সেই সর্বত্যাগী লোকেদের জন্য মা'র বুকখানা উষ্ণতায় ভরে ওঠে। মায়ের মানসলোকে ওরা সব এক হয়ে মিশে যায় এক নির্ভীক বিরাট পুরুষের রূপে, — দুই হাতে শতাব্দীসঞ্চিত শ্যাওলা, আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে সরিয়ে মানুষকে জীবনের সহজ-সরল সত্য সন্দর্শন করিয়ে দিচ্ছে মানুষটা, ধীর অকান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে পৃথিবীতে। মিথ্যা, লোভ, দ্বেষ এই তিন দানবই পৃথিবীকে ভয় দেখিয়ে, দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। ওই মহান পুনরুজ্জীবিত সত্য ঘরে ঘরে সাম্যের আহ্বান পাঠায় প্রত্যেকটি মানুষকে; ডাক দিয়ে বলে — ওই দানবের হাত থেকে আমি তোদের সবাইকে সমান ভাবে মুক্তি দেব... মানসলোকের এই মূর্তির কাছে মায়ের হৃদয় প্রণত হয়। আগে একেকটা দিন যখন তেমন ভারি ঠেকত না তখন বুকে এমন একটা অনুভূতি জাগত। এমনি অনুভূতি নিয়েই মা সন্ধে বেলায় আইকনের সামনে কৃতজ্ঞভাবে নতজানু হত। সে সব দিনের কথা আজ আর মনে নেই মায়ের — কিন্তু সে-দিনটার সেই অনুভূতি ডালপালা মেলে, ফুলে-ফলে আলোয়-আনন্দে ভরে উঠে আত্মার গভীরে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। সুদীপ্ত শিখায় জ্বলছে।

হঠাৎ নিকলাই গল্পটা থামিয়ে বলে ওঠে, 'পুলিশ আজ আর আসবে না বোধ হয়।'

নিকলাইয়ের দিকে ত্বরিত দৃষ্টি ফেলে একমিনিট চুপ করে বিরক্তির সঙ্গে বলে মা:

'গোল্লায় যাক! গোল্লায় যাক পাজীরা!'

'সে তো, বলা বাহুল্য। কিন্তু এখন একটু শুয়ে নিন গে। ভীষণ কান্ত হয়ে আছেন নিশ্চয়। অবশ্যি বলতে নেই, দেহখানা আপনার লোহার।

এত ঝক্কি গেল আজ — অথচ আপনার গায়ে যেন কিচ্ছুটি লাগেনি। এদিকে মাথাটি কিন্তু দেখতে দেখতে সাদা হয়ে উঠছে। আচ্ছা আজ বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

২০

রান্নাঘরের দরজায় বিষম ধাক্কাধাক্কি; ঘুম ভেঙে গেল মা'র। ধাক্কার আর বিরাম নেই। চলছে তো চলছেই। তখনও অন্ধকার; ভোরের কোলাহল তখনও শুরু হয়নি। আবছা অন্ধকারটা আঁৎকে উঠছে সেই শব্দে। ধড়ফড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল মা। গায়ের ওপর তাড়াতাড়ি পোষাক ফেলে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল এসে।

'কে?'

'আমি গো।' অপরিচিত কণ্ঠের জবাব আসে।

'কে?'

'খুলুন না দরজাটা!' মিনতি শোনা যায়। গলার স্বরটা নেমে এসেছে।

হুড়কো তুলে পা দিয়ে ঠেলে খুলে দিল দরজাটা। ইগনাত এসে ঢোকে।

'ভুল করিনি তাহলে!' উল্লসিত হয়ে বলে ইগনাত।

কোমর পর্যন্ত সারা গায়ে ওর কাদা। মুখখানায় যেন ছাইয়ের ছোপ মারা। চোখ বসা। সেই কোঁকড়া চুলের ঝাঁক চারদিকে এলোমেলো হয়ে টুপির তলা দিয়ে বেরিয়ে আছে। দরজা বন্ধ করতে করতে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে:

'ভারি বিপদ!'

'জানি...'

শুনে অবাক হয়ে যায় ছোকরা। চোখ মিট্‌মিট্‌ করে শুধয়:

'সে কি? কী করে জানলেন?'

সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দেয় মা।

'সেই যে আরো দুটি সাথী ছিল তাদেরও ধরেছে নাকি?'

'না, ওরা তো ছিল না ওখানে তখন। ওদের তো সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে, হাজিরা দেবার দিন ছিল। মিখাইলো-কাকাকে নিয়ে পাঁচজনকে ধরেছে...'

একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে মুচকি হেসে আবার বলে:

'আমিই বাদ পড়ে গেছি। এতক্ষণে নিশ্চয় আমার জন্য গরু-খোঁজা করছে।'

'পালালে কী করে?' মা শুধয়। পাশের ঘরের দরজাটা ঈষৎ খুলে যায়।

একটা বেঞ্চির ওপর বসে বসে চারদিকে তাকিয়ে বলে ইগনাত, 'আমি? আমার কথা শুধোচ্ছ? পুলিশ আসার মিনিট দুই আগেই জঙ্গলের পাহারাওলা ধেয়ে এসে বলল — সাবধান থাক ব্যাটারা, ওরা আসছে...'

আস্তে আস্তে হেসে কোটটার কিনারা দিয়ে মুখ মুছে ইগনাত বলে:

'মিখাইলো-কাকাকে মাথায় ডান্ডা মেরেও ওঠায় কার বাপের সাধ্যি। আমায় হেঁকে বললে — "ইগনাত, বাপ্, ধেয়ে যা শহরে, পা চালিয়ে যাবি কিন্তু! মনে আছে সেই যে আধবয়সী মেয়েমানুষটি এসেছিল্" — বলে খস্‌খসিয়ে কী লিখলে একটা চিরকুটে। "ধর্, এটা নিয়ে দিবি গে তার হাতে।" গুড়ি মেরে আমি তো বেরিয়ে এসে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে পথ ধরনু; আওয়াজে বুঝনু তেনারা আসছে। সেকি আর দুটো চাট্টে গো! হেই এক দঙ্গল! শালারা চারদিক থে' ঘিরে ফেললে আমাদের সেই আলকাতরার থান। আমি ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকনু। পাশ দিয়ে চলে গেল শালারা। যেই না ওরা গেল, আমি খপ্ করে উঠেই চোঁচা দৌড়। দু'রাত এক দিন ধরে চলে চলে এই আসছি; এক লহমার জিরন-থামন দিইনি গো!'

ওর বাদামী চোখের হাসির দুলুনি আর লাল-টুকটুকে ঠোঁট দুটোর ভঙ্গিতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল নিজের ওপর ভারি খুশি হয়েছে ইগনাত।

সামোভার ধরে মা তাড়াতাড়ি বলে, 'বসো, চা আনছি। এই এলাম বলে।'

'এই যে, আপনার চিঠি নিন।'

বেঞ্চির ওপর বহু কষ্টে পা একটা তুলতে গিয়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে ইগনাত। মুখ কুঁচকে যায়।

দরজার কাছে নিকলাইকে দেখা যায়।

'আরে, আসুন আসুন কম্‌রেড্!' চোখ কুঁচকিয়ে বলে সে। 'দাঁড়ান, আমি সাহায্য করছি।'

ওর পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিকলাই। ময়লা কাপড়ের ফালিটা চটপট খুলে ফেলতে যায় ও।

'না!' নীচু স্বরে চেঁচিয়ে উঠে সে পা টেনে নেয় আর অবাক হয়ে মা'র দিকে মিটমিটিয়ে চায়।

সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই মা বলে:

'ওর পা-টাকে ভদকা দিয়ে ভালো করে মালিশ করে দিতে হবে...'

নিকলাই বলে, 'তাই দিচ্ছি।'

ইগনাত বিব্রত হয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

নিকলাই দুমড়োন মোচড়ান ময়লা চিরকুট্‌টা তুলে চোখের খুব কাছে নিয়ে এসে পড়তে আরম্ভ করে:

"আমাদের কাজকর্ম কখনও ছেড়ে দিও না, মা। আর সেই লম্বা মতন ভদ্রমহিলাকে বলো, আমাদের কাজকর্মের কথা যেন আরো বেশি করে লেখেন। ভোলেন না যেন। বিদায়। রীবিন।"

চিঠিশুদ্ধ হাতখানা এলিয়ে পড়ে নিকলাইয়ের।

'চমৎকার!' অস্পষ্ট স্বরে বলে।

ইগনাত তার খালি পায়ের ফোলা ফোলা ময়লা আঙুলগুলো একটু নাড়তে নাড়তে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। মা চোখের জলে-ভেজা মুখ লুকিয়ে এক গামলা জল নিয়ে আসে। তারপর ওর সামনে উবু হয়ে বসে ওর পায়ের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। ভয় পেয়ে যায় ইগনাত:

'না, না, ও কী,' বলে বেঞ্চির তলায় পা লুকোয়।

'শীগ্‌গির পা বের কর...'

'আমি অ্যালকহল নিয়ে আসছি,' নিকলাই বলে।

'আমি কি হাসপাতালে এসেছি?' বিড়বিড় করে বলে ইগনাত। পাটা বেঞ্চির আরো তলায় ঢুকিয়ে দেয়।

মা ওর আরেকটা পা থেকে জড়ান ফালিগুলো খুলে নেয়।

মায়ের দিকে ওপর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড় মোচড়ায় ইগনাত; বড় অস্বস্তি লাগে ওর। জোরে জোরে ফোঁৎ ফোঁৎ করে নিশ্বাস ফেলে। ঠোঁট দুটো এলিয়ে পড়েছে হাস্যকরভাবে।

মা কম্পিত স্বরে বলে, 'জানো, মিখাইল ইভানভিচকে বেদম মেরেছে ওরা...'

'সত্যি?' চাপা ভয়ের চীৎকার বেরিয়ে আসে ইগনাতের মুখ থেকে।

'সত্যি। নিকলস্কয়েতে যখন নিয়ে এল তখনই অনেক মার খেয়েছে। তার ওপরে ওখানে পুলিশের বড় সাহেব আর ছোট সাহেবের এলোপাতাড়ি কিল চড় ঘুষি লাথি — সারা দেহ রক্তারক্তি!'

'আর কিছু জানুক না জানুক, ঠ্যাঙানিতে হাত পাকা ওদের!' ভ্রূকুটি করে ইগনাত। কাঁধদুটো শিউরে ওঠে। আবার বলে, 'বাপ্‌স্‌। মানুষ তো নয় যম, ভয়ে গা কাঁপে। মুজিকরাও মেরেছে নাকি মিখাইলো-কাকাকে?'

'একজন মেরেছে পুলিশ-সাহেবের হুকুমে। অন্যরা কিছু করেনি; বরঞ্চ মিখাইলোর হয়েই কথা বলেছে। বলেছে, মারা চলবে না...'

'চাষীভাইদেরও চোখ খুলতে লেগেছে। কে যে কোন দিকে তা ওরা বুঝতে লেগেছে।'

'জ্ঞান-বুদ্ধিওলা আছে ওদের মধ্যেও।'

'তা তেমন লোক কোথায় নেই? খুঁজে নিতে কষ্ট হয়, এই আর কি।'

নিকলাই এক বোতল অ্যালকহল নিয়ে এল। তারপর সামোভারে কিছু কয়লা দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেল। ইগনাত নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে উৎসুকভাবে।

'এই বাবুটি কে? -- ডাক্তার?' নিকলাই বেরিয়ে যেতেই চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে।

'আমাদের এ কাজে বাবু টাবু নেই কেউ। আমরা সব কমরেড...'

'ভারি অদ্ভুত তো!' অপ্রতিভ সন্দিগ্ধভাবে হেসে বলে ইগনাত।

'কী অদ্ভুত রে?'

'এমনিই বলছিলাম। মানে, এই এক দিকে ঘুষিয়ে নাক চেপ্টে দেয়, আবার আর এক দিকে পা ধুইয়ে দেয়। মধ্যিখানটায় কে থাকল?'

দরজা খুলে যায়। নিকলাই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে:

'মাঝখানে আছে তারা, যারা সেই নাক চেপ্টে-দেনেওলাদের পা চাটে আর চেপ্টে-যাওয়া নাকওলাদের রক্ত শোষে! এরাই আছে মাঝখানে!'

সসম্ভ্রমে ইগনাত তাকায় নিকলাইয়ের দিকে। তার পর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে:

'খাঁটি কথাই বলেছেন গো আপনি।'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শক্ত করে পায়ের ওপর কয়েকবার ভর দিয়ে বলে:

'বাঃ! এ যে একদম নতুন পা গো! ধন্যবাদ...'

এরপর খাবারঘরে গিয়ে চা খাবার পালা। চা খেতে খেতে ইগনাত বলে শক্ত ভারি গলায়:

'খবরের কাগজ আমি বিলি করতাম, জানেন? ওঃ, জবর হাঁটতে পারি আমি!'

'মেলা লোক পড়ে কাগজ?' নিকলাই শুধয়।

'যারা পড়তে পারে তারা সব্বাই পড়ে; বড়লোকেরাও পড়ে। তবে অবশ্যি বাবুরা তো আমাদের কাছ থেকে নেন না বই!.. তেনারা বুঝতে পেরেছেন বেশ যে, চাষীরা তাদের রক্ত স্রোতে জমিদারদের পায়ের তলার জমি দেবে সরিয়ে। আর ঐটুকু যদি কত্তে পারে, তবে পরে জমি এ রকমভাবে বিলি করবে যাতে না থাকে জমিদার না থাকে ক্ষেতমজুর! তা নইলে, লড়াই-টড়াই কেন হে বাপু?'

এমন কি একটু যেন রেগেছে ইগনাত। জিজ্ঞাসুভাবে সংশয়ের দৃষ্টিতে নিকলাইয়ের দিকে চায়। নিকলাই শুধু হাসে, কিছু বলে না।

'ধরো না হয় আজ সকলের সঙ্গে মিলে লড়লাম। সব্বাইকে দাবিয়ে দিলাম। কাল আবার যে কে সেই—সেই বড় লোক, আর গরীব। কী লাভটা হল শুনি? না বাবা! অত মুখ্যু পাওনি গো আমাদের! ওসব চলবে না। ধনরতন হল শুক্‌নো বালি — এক ঠেঁয়ে থাকে না।'

'আরে রাগ কোরো না!' মা হাসে।

'আর আমি ভাবছি রীবিনের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে সেই লেখাটা যত শীগ্‌গির ওখানে পাঠাই কী করে!' নিকলাই বলে চিন্তিতভাবে।

ইগনাত কান খাড়া করে।

'আছে নাকি লেখাটা?' জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ।'

হাত কচলাতে কচলাতে ইগনাত বলে, 'দিন, নিয়ে যাব।'

ওর দিকে না তাকিয়েই শান্তভাবে হাসে মা। তারপর বলে:

'কিন্তু বলছিলে যে বড্ড ক্লান্ত হয়েছ আর ভয় করছে?'

চওড়া থাবাটা দিয়ে কোঁকড়া চুলগুলো ঠিক করতে করতে ইগনাত বলে শান্তভাবে করিৎকর্মার ধরনে:

'ভয় এক জিনিস আর কাজ হল আরেক। হাসছেন কেন গা? আচ্ছা মানুষ তো!'

ছেলেটিকে দেখে কী জানি এক সুখে মায়ের বুক ভরে ওঠে। অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে:

'এক্কেবারে ছেলেমানুষ!'

'হ্যুঁ, তাই বইকি,' বিব্রত হয়ে মুচকে হাসে ইগনাত।

ওর দিকে কোমল চোখে তাকিয়ে নিকলাই বলে:

'ফিরে যেতে পারছেন না আর...'

'কেন? কেন যেতে পারব না? তাহলে কোথায় যাব?' ইগনাত অস্থির হয়ে ওঠে।

'আর একজন যাবে। আপনি ভালো করে পথ বাতলে দেবেন। কেমন?'

একটু চুপ করে থেকে ক্ষুণ্ণস্বরে ইগনাত বলে, 'বেশ!'

'আপনাকে নতুন পাসপোর্ট জোগাড় করে দেব, আর বনরক্ষীর কাজ জুটিয়ে দেব একটা।'

চট করে মাথাটা তুলে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করে ইগনাত:

'তারপর চাষীরা যখন কাঠের জন্য আসবে? ধরে কষে হাত-পা বেঁধে রাখব? না বাবা, ওসব আমার দ্বারা হবে-টবে না...'

মা হাসে, নিকলাইও হাসে। ইগনাত আবার যেন আঘাত পেল মনে হয়। নিকলাই সান্ত্বনা দেয়:

'আরে আরে, বাঁধতে-টাঁধতে হবে না। আমি বলছি, বিশ্বাস করুন...'

ইগনাত খুশি হয়ে ওঠে। এক গাল হেসে বলে, 'তাহলে করব। কিন্তু কারখানায় কাজ-টাজ হয় না? কারখানায় যারা কাজ করে তারা নাকি বড় চালাক-চৌকস হয়...'

মা উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে:

'জীবনটা কী অদ্ভুত! এই হাসি, এই কান্না! হাঁ রে, ইগনাত! খাওয়া শেষ হল? আর না, এবার একটু ঘুমিয়ে নাওগে...'

'ঘুম পায়নি...'

'বলছি চট্‌পট যাও বিছানায়...'

'বাপরে, ভারী কড়া নিয়ম যে এখানে! যাচ্ছি, বাপু যাচ্ছি... বড্ড ভালো লোক তোমরা — ধন্যবাদ! চা খাইয়েছ, তার জন্যও ধন্যবাদ।'

মায়ের বিছানায় গিয়ে শুতে শুতে মাথা চুলকিয়ে বিড়বিড় করে:

'সব এখন আলকাতরার গন্ধ হয়ে যাবে! কেনরে বাপু এত সব কিছু... ঘুমটুম কিচ্ছু পায়নি... সেই মধ্যিখানে যারা আছে তাদের কথা কেমন করে বললে... যত সব শয়তান! পাজী!..'

হঠাৎ ওর নাক ডাকতে আরম্ভ করল। মুখটা আধখানা হাঁ হয়ে গেল। ভুরু দুটো উঁচিয়ে উঠল। ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই দিনই সন্ধে বেলার কথা। ছোট্ট একটা মাটির তলার ঘরে ভেসভশিচকভের সামনে বসে ভুরু কুঁচকে নীচু গলায় কথা বলছে ইগনাত:

'মাঝের জানালাটায় চারবার...'

'চারবার?' উদ্বিগ্নভাবে নিকলাই বলে।

'প্রথম তিনটে... এই এমনি করে... এক, দুই, তিন...' টেবিলে বাঁকা আঙুল দিয়ে টোকা মেরে দেখায়, 'তারপর একটু অপেক্ষা করেই আর একবার।'

'বুঝতে পারলাম।'

'একজন লালমাথা চাষী এসে দরজা খুলে দিয়ে শুধবে: ধাত্রী ডাকতে এসেছ? আপনি বলবেন, হ্যাঁ, কারখানার মালিক পাঠিয়ে দিয়েছেন, তারি জন্য... আর কিছু বলতে হবে না, সব বুঝে নেবে।'

দুজনে বসেছিল পরস্পরের দিকে মাথা হেলিয়ে। দুজনেই বলিষ্ঠ জোয়ান তাগড়া মানুষ। কথা বলছে চাপা স্বরে। হাত দুখানা বুকের ওপর রেখে মা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ওদের। রহস্যজনক এই সব সংকেতগুলি ওর ভারি মজার লাগে। আপন মনেই বলে মা:

"নেহাৎ ছেলেমানুষ..."

দেয়ালে একটা বাতি—তার আলোয় দেখা যায় কতকগুলো সেঁতসেঁতে দাগ আর মাসিক পত্রিকার ছবি, মেজেতে ছড়ান রয়েছে ভাঙা বালতি আর টিন-মিস্ত্রী যে কাজ করে গেছে তার সব টুকরো টাকরা! ঘর্‌টা মরচে, রং আর ছ্যাৎলার গন্ধে ভরা।

মোটা খসখসে কাপড়ে তৈরী ভারি একটা কোট পরে আছে ইগনাত। কোটটা তার পছন্দ। তার ওপর আস্তে আস্তে কোমলভাবে হাত বোলায় আর ঘাড়টা ভারিভাবে বেঁকিয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে দেখে। মা স্নেহভরে মনে মনে ভাবে:

"আহা রে বাছারা..."

ইগনাত উঠতে উঠতে বলে:

'ভুলবেন-টুলবেন না! বুঝলেন তো? পয়লা যাবেন মুরাতভের কাছে। গিয়ে দা-ঠাকুরের তালাশ করবেন...'

ভেসভশিচকভ উত্তর দেয়: 'না হে না, ভুলব না!'

ইগনাত কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। আবার সংকেতগুলো মুখস্থ করিয়ে দিয়ে তবে হাত বাড়িয়ে দেয়।

'আমার নমস্কার দেবেন ওদের। কেমন খাসা মানুষ সব দেখবেন...'

চট করে খুশি চোখে নিজেকে একবার দেখে নিয়ে মাকে বলে জামায় হাত বুলোতে বুলোতে:

'যেতে হবে এখন?'

'পথ খুঁজে পাবে তো?'

'আলবৎ পাব... আচ্ছা আসি, কমরেড!'

কাঁধ খাড়া করে, বুক চিতিয়ে, নতুন টুপীটাকে এক পাশে কানের ওপর আড় করে পরে বেরিয়ে গেল ও। হাত দু'খানা রাশভারি চালে পকেটে পোরা। কোঁকড়া চুলের গোছা কানের কাছে হাওয়ায় ফুর্তি করে উড়ছে।

আস্তে আস্তে মায়ের কাছে এসে বলে ভেসভশিচকভ: 'তাহলে কাজ জুটল একটা। বসে বসে পাগল হবার জো প্রায়। ভাবছিলাম, তাহলে পালিয়ে এসে লাভটা কী হল! দিন রাত্তির গর্তে সেঁধিয়ে থাকো। তার চাইতে সেখানেই তো পড়াশুনা করতাম — পাভেল মগজে চাপ দিত, সে ভারি ভাল লাগত। হাঁ গো, নিলভনা? ওদের পালাবার কী হল গা?'

অজান্তে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মা'র। বলে, 'জানিনে।'

নিকলাই মায়ের কাঁধে চাপ দিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলে:

'তুমিই ওদের বলো। তোমার কথা ওরা শুনবে। ওতো জলের মতো সোজা। এই দেখ না — এই হল জেলের পাঁচিল। তারপরই রাস্তার আলোটা। ঠিক সামনেই একটা পোড়ো জায়গা। বাঁ দিকে কবরখানা; ডান দিকে শহরের রাস্তা আর পাকা বাড়ী। আলোগুলো পরিষ্কার করবার জন্য ফরাশ আসে রোজ দিনের বেলায়। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা থাকে তার মইটা। মই বেয়ে উঠে একটা দড়ির মই পাঁচিলের ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেবে সে ভেতর দিকে। ভেতরে ওরা সব জানে, কখন কী করতে হবে। হয় সাধারণ কয়েদীদের বলবে একটা গোলমাল বাধাতে, নইলে নিজেরাই সব করবে। আর সেই ফাঁকে যারা কাজ সারবার তারা দড়ির মই বেয়ে... এক... দুই... তিন... বাস্... চিচিংফাঁক... দেখলে তো কী সোজা!'

মায়ের মুখের সামনে হাত নাড়তে নাড়তে নিজের প্ল্যানটা বোঝায় নিকলাই। শুনতে যেমন সোজা তেমনি কাজের বলে মনে হয়। আগে নিকলাইকে মায়ের তেমন কর্মপটু বলে মনে হত না। ওর চোখে মাখান ছিল দুনিয়ার ওপর গভীর ঘৃণা আর অবিশ্বাস। এখন যেন ওই চোখ দুটির পুনর্জন্ম হয়েছে। চোখ দুটি থেকে যেন একটা উষ্ণ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মা'র কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায় সেই আলোয়। মা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে...

'ভাবো দিকিনি একবার! দিনের আলোয়, একেবারে খটখটে দিনের আলোয়। দিনের বেলা — চারদিকে সব খাড়া পাহারা, তার মধ্যে কয়েদী পালাবে, কোনও শর্মা সন্দেহ করবে না!..'

মা'র সর্ব-শরীর শিউরে ওঠে। বলে, 'গুলি টুলি করবে না তো?'

'কে? কে করবে? সৈন্য তো থাকে না ওখানে। আর পাহারাওয়ালাদের কাছে যে রিভলবার আছে, তা দিয়ে তারা পেরেক ঠোকে...'

'তোমার সব কিছু দেখি খুব সোজা...'

'নিজেই দেখবে ঠিক কথা বলছি কিনা। আমি সব জোগাড়যন্ত্র করে রেখেছি — দড়ির মই, হুক... সব, আর আমার বাড়ীওয়ালা ফরাশ হবেন...'

দরজার ওধার থেকে কে যেন ব্যস্ত হয়ে কেশে উঠল, তারপর টিন টানার শব্দ। নিকলাই বলে:

'ওই যে আসছে!'

খোলা দরজায় দেখা দিল একটা টিনের তৈরী স্নানের গামলা। একটা মোটা কর্কশ গলা অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে বলে:

'এই শয়তান বুড়ো, বেরিয়ে আয়...'

টবটার পেছন থেকে একখানা ভালোমানুষ মুখ দেখা যায় — চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে; চুলে পাক ধরেছে।

নিকলাই টবটা টেনে আনতে সাহায্য করে। বিরাট লম্বা মানুষটি, দেহটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। ঘরে ঢুকেই কামানো গাল দুটো ফুলিয়ে এক চোট কেশে নেয়। তার পর থুথু ফেলে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে কর্কশ গলায়:

'ভালো আছেন তো সব!'

নিকলাই বলে, 'এই একে জিজ্ঞাসা করে দেখো না!'

'আমাকে? কী জিজ্ঞাসা করবে?'

'এই পালানোর বিষয়ে...'

টিন-মিস্ত্রী কালো হাত দিয়ে গোঁফ-জোড়া মুছে বলে, 'ওঃ!'

'কিছুতেই বিশ্বাস করবে না এ মেয়ে, ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ্।'

'য়্যাঁ, বিশ্বাস করবে না? করবে না নয়, কত্তে চায় না। কিন্তু আমি, তুমি চাই তো! তাই বিশ্বাস করি।' শান্তভাবে বলে মিস্ত্রী। তারপর হঠাৎ কাশতে কাশতে একেবারে বেঁকে যায়। কাশি থামলে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুক ঘষতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে; মাকে নিরীক্ষণ করে হাঁপাতে হাঁপাতে। মা বলে:

'ও বিষয় যা করার পাভেল আর তার বন্ধুরাই ঠিক করবে।'

নিকলাই চিন্তিতভাবে মাথা নীচু করে।

'পাভেল নাকি বললে? কে হে?' বসতে বসতে বলে টিন-মিস্ত্রী।

'আমার ছেলে।'

'পদবী?'

'ভ্লাসভ।'

মাথা নাড়ে টিন-মিস্ত্রী, তামাকের থলিটা বের করে পাইপ নিয়ে ভরতে শুরু করে:

'শুনেছি বটে নাম।' থেমে থেমে বলে ও। 'আমার ভাইপো চেনে। সেও এখন জেলে। ইয়েভ্চেঙ্কো, শুনেছ ওর কথা? আমার নাম গবুন। যত জোয়ান ছেলে আছে—সব ধরবে এবার। আমাদের মতো বুড়োহাবড়াদের জায়গা করে দিচ্ছে আর কি! পুলিশ বলছিল—ভাইপোটাকে নাকি সাইবেরিয়ায় ঠেলে দেবে। তা পারে ওরা — কুত্তাগুলো!'

নিকলাইয়ের দিকে তাকিয়ে পাইপ টানতে থাকে আর ঘন ঘন থুথু ফেলে মেজের ওপর। বলে:

'তা হলে সে চায় না? ওর ব্যাপার, ওই বুঝবে ভালো। কিন্তু বলি ওহে! মানুষ স্বাধীন — যা খুশি তাই করতে পারে। বসে বসে ঝিম ধরে যায় তো চলতে শুরু করে। আর চলতে চলতে ঠ্যাং ব্যথা হয় তো বসতে পারে! ওরা তোমাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয় — মুখ বুজে থাক। ধরে মারে, খবরদার কেঁদ না। খুন করে ফেলে — ছিঃ বলতে নেই ও

কথা। সবাই জানে এ কথা। কিন্তু আমি ছেলেটাকে বের করে আনছি দেখ না।'

মা অবাক হয়ে যায় ওর কাটা কাটা কথা শুনে। কিন্তু শেষের কথাগুলিতে হিংসে হয় মা'র।

বৃষ্টি মাথায় করেই পথে বেরুল মা। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে মুখে লাগছে। যেতে যেতে মা ভাবে নিকলাইয়ের কথা।

"আশ্চর্য! কী অদ্ভুত বদলে গেছে!"

গবুনের কথা মনে হয়। প্রায় প্রার্থনার মত করে ভাবে:

"নতুন জীবন একা আমিই পাইনি!.."

মুহূর্তে পাভেলময় হয়ে ওঠে মায়ের অন্তর:

"যদি মত দেয়!"

২২

পরের রবিবার সাক্ষাতের শেষে করমর্দনের সময় মা দেখল, পাভেল একটা কাগজের ছোট্ট বল গুঁজে দিল হাতে। হাতটা যেন জ্বলে গেল। চমকে উঠে মা মিনতিভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের মুখে চাইল; তার মুখের ভাবে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, — সেই চিরকালের প্রশান্ত, প্রতিজ্ঞা-কঠিন হাসি ওর নীল চোখে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলে, 'আসি আজ!'

আর একবার হাত বাড়িয়ে দেয় ছেলে — মুখখানি যেন একটু কোমল হয়ে ওঠে।

'এসো, মা।'

মা দাঁড়িয়ে থাকে হাতখানা ধরে।

'ভেবো না মা। রাগ-টাগ করো না!' পাভেল বলে।

এই কথাগুলিতে আর ছেলের কপালের সংকল্পকঠোর রেখায় মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর লেখা হয়ে গেল।

মাথা নীচু করে, বিড়বিড় করে বলে মা:

'ছিঃ কী বলছিস!..'

আর না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে মা — ছেলে যেন না দেখতে পায় ওর চোখ-ছাপানো জল, আর কাঁপা ঠোঁট। হাতের মুঠোয়

শক্তভাবে ধরা সেই কাগজ। সারা রাস্তা মা'র মনে হল মুঠোটা যেন ব্যথায় টাটাচ্ছে। ঝোলা হাতখানায় যেন পাথুরে ভার, যেন কাঁধের ওপর ওকে কেউ মেরেছে। বাড়ী পৌঁছেই কাগজখানা নিকলাইয়ের হাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মা — আশা আকাঙ্ক্ষায় আবার বুক দোলে। শক্ত করে মোড়া কাগজখানা হাত দিয়ে সমান করে পড়তে পড়তে বলে নিকলাই:

'তা আর কি! এই যে লিখছে পাভেল, — "আমরা কেউ পালাবার চেষ্টা করব না। করতে পারি না। তাহলে আত্ম-সম্মান হারাব। সম্প্রতি যে চাষীটি ধরা পড়েছে, তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা প্রয়োজন। সে আপনাদের যত্নের যোগ্য। এখানে তার খুব কষ্ট। প্রতিদিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার লাগছে। এরই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা তাকে সেলে কাটাতে হয়েছে। অত্যাচার করে সাবাড় করে দেবে। সুতরাং এই লোকটির হয়ে আমরা সকলে আবেদন জানাচ্ছি আপনাদের কাছে। আমার মাকে একটু দেখবেন, তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন সব। তিনি বুঝবেন"।'

মাথা তুলে কম্পিত নীচু স্বরে বলে মা:

'বলার আর কী আছে? আমি সব বুঝি।'

নিকলাই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফিরে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ে সশব্দে। যেন নিজের মনেই বলে:

'সর্দি লেগেছে মনে হচ্ছে...'

তার পর চশমাটা সোজা করে নেবার জন্য হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলে:

'সময়ও অবশ্যি আমাদের হত না...'

'বেশ তো, হোক না মোকদ্দমা!' ভুরু কুঁচকে মা বলে। বিষাদের কুয়াশায় বুকটা ছেয়ে যায়।

'এই মাত্র পিটার্সবুর্গের এক কমরেডের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম...'

'এখন যাই হোকগে, সাইবেরিয়া থেকে তো পালাতে পারবে... তাই না?'

'নিশ্চয়! কমরেড লিখছেন, শীগ্গিরই ওদের মামলা উঠবে। সাজা ঠিক হয়েই আছে — সব্বাই নির্বাসিত হয়ে যাবে। পাষণ্ডদের আর আইন-আদালত কি! সে তো একটা তামাশা! মামলা আরম্ভই হয়নি —

ওদিকে পিটার্সবুর্গে বসে তার রায় তৈরী হয়ে গেল। দেখুন দিকি কাণ্ডটা!'

মা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'ওসব কথা থাক, নিকলাই ইভানভিচ্! আমাকে বোঝাবারও দরকার নেই, সান্ত্বনা দেবারও দরকার নেই। পাভেল ঠিক কাজই করবে। মিছিমিছি ও কাউকে কষ্ট পেতে দেবে না; নিজেকেও না। আর আমায় সে ভালোবাসে। সে তো দেখতে পাচ্ছেন। লিখেছে না, মাকে বোঝাবেন, সান্ত্বনা দেবেন!..'

বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল। আবেগে মাথা ঘুরতে থাকে।

'আশ্চর্য মানুষ আপনার ছেলে,' অস্বাভাবিক জোরে বলে ওঠে নিকলাই, 'বলতে গেলে রীতিমত সম্মান করি আমি ওকে।'

মা বলে, 'রীবিনের জন্য কী ভাবে কী করা যায় ভাবতে হচ্ছে তো!'

ইচ্ছে হয় মা'র তখনই কিছু একটা করে ফেলে। কোথাও যায়... চলে, কেবলি চলে যতক্ষণ না দেহটা শ্রান্তিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

নিকলাই ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলে, 'বেশ! কিন্তু সাশাকে যে দরকার...'

'সে তো আসবেই। পাভেলের সঙ্গে যেদিন আমার দেখা হয় সেদিন সে আসবেই...'

নিকলাই মায়ের পাশে এসে বসে পড়ে। মাথা নীচু করে কী যেন ভাবে, ঠোঁট কামড়ায় আর দাড়ি পাকায়।

'এ সময় সোফিয়াও নেই... কী যে মুশকিল!'

'পাভেল ওখানে থাকতে যদি কিছু করা যেত তো খুব ভালো হত। খুব খুশি হত ছেলেটা।' মা বলে।

চুপ করে বসে থাকে দুজনে। খানিক পরে মা আস্তে আস্তে বলে:

'কেন যে ও রাজী হল না, বুঝতে পারি না...'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নিকলাই। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠে। দুজনে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে।

'সাশা এসেছে...' চাপা গলায় বলে নিকলাই।

মা তেমনি চাপা স্বরে বলে, 'ওকে এখন বলি কী করে?'

'হুঁ! তাই তো...'

'ভারি দুঃখ হয় বেচারার জন্য...'

আবার ঘণ্টা বাজে। এবার যেন ঘণ্টার শব্দে কিছু ইতস্তত ভাব।

আগন্তুক যেন এখনও মনঃস্থির করে উঠতে পারেনি। নিকলাই আর মা দুজনেই রান্নাঘরে আসে। কিন্তু দরজার কাছে নিকলাই সরে দাঁড়ায়। বলে:

'আপনি একাই যান। সেই ভালো...'

মা দরজা খুলতেই সাশা বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলে, 'স্বীকার করেনি তো?'

'না।'

'জানতাম।' খুব সাধারণ ভাবে জবাব দেয় সাশা। কিন্তু মুখখানা তার একেবারে সাদা হয়ে গেল। কোটের বোতাম একবার খুলে, তারপর দুটো আবার লাগিয়ে খুলবার জন্য টানাটানি করতে থাকে। পারে না খুলতে। তখন বলে:

'কী বিশ্রী দিন! যেমনি হাওয়া তেমনি বৃষ্টি? ভাল আছে তো ও?'

'আছে।'

নিজের হাতখানা দেখতে দেখতে অনুচ্চ স্বরে বলে সাশা, 'ভাল আছে... শরীরও ভালো আছে... মনও ভালো...'

ওর দিকে না তাকিয়েই বলে মা, 'লিখেছে, রীবিনকে যেন আমরা মুক্ত করি।'

'তাই নাকি? তাহলে তো যে প্ল্যান করেছিলাম সেটা কাজে লাগাতে হয়।' সাশা বলে ধীরে ধীরে।

'আমারও তাই মনে হয়,' দরজার কাছে এসে বলে নিকলাই, 'আরে! সাশা যে!'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাশা শুধয়:

'ব্যাপারটা কী? সবাই তো বলছে চমৎকার প্ল্যান?'

'কিন্তু করবে-কর্মাবে কে শুনি? আমরা তো সবাই ভয়ংকর ব্যস্ত...'

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে সাশা, 'বেশ তো, আমায় দিন! আমার তো সময় আছে।'

'বেশ! কিন্তু অন্যদেরও একটু জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে...'

'আমিই নেব'খন জিজ্ঞাসা করে। এখুনি যাচ্ছি।'

তার পাতলা আঙুলগুলো দৃঢ় ভঙ্গিতে কোটের বোতাম লাগায়।

মা বলে, 'আরে এই তো এলেন, একটু জিরিয়ে নিন!'

ধীর শান্ত একটু নরম গলায় বলে ও:

'কিছু ভাববেন না, একটুও ক্লান্ত হইনি...'

নীরবে করমর্দন করে বেরিয়ে যায় সাশা! আবার সেই হিম-কঠিন প্রতিমা।

মা আর নিকলাই জানালার কাছে গিয়ে তাকিয়ে থাকে ওর অপসৃয়মাণ মূর্তির দিকে। নিকলাই আস্তে আস্তে শিস দেয়। তারপর টেবিলে এসে লিখতে বসে।

চিন্তিত ভাবে মা বলে, 'হাতে কাজ এসেছে বলেই এখন ক'দিন একটু ভালো থাকবে মেয়েটা!'

'যা বলেছেন!' নিকলাই জবাব দেয়। মা'র দিকে ফিরে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে, 'প্রিয়-কামনা যে কী বস্তু তা জানবার সুযোগই হয়নি আপনার। তাই না, নিলভনা?'

'ফুঃ,' হাত নেড়ে বলে মা, 'বিয়ে দেবে বলেই ভয়ে ভয়ে মরতাম! প্রিয়-কামনা আবার!'

'কাউকে পছন্দ হয়নি কখনও?'

একটু ভেবে মা বলে, 'মনে টনে নেই বাপু ওসব। হয়নি তা কি হতে পারে? কাউকে পছন্দ করতুম নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা আর মনে নেই!'

বিষাদ-নিবিড় প্রশান্তিতে ছেয়ে যায় মায়ের মুখ। বলে চলে:

'এত মার মেরেছে আমার স্বামী! বিয়ের আগের যা কিছু ছিল, ঠ্যাঙানির চোটে মগজ থেকে সব বেরিয়ে গেছে।'

নিকলাই মুখ ফিরিয়ে নেয় টেবিলের দিকে। মা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, একটু পরেই আবার ফিরে আসে। গভীর অন্তরঙ্গতায় নিকলাইয়ের চোখ দুটি কোমল... মনের আকাশে ওর স্মৃতির আলপনা... বলে:

'আমারও দশা সাশার মতোই ছিল। একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম! আশ্চর্য মেয়ে! ওর সঙ্গে দেখা যখন কুড়ি বছর বয়স আমার। তখন থেকে তাকে ভালোবাসি... আজও ভালোবাসি... তেমনি করে সমস্ত প্রাণ দিয়ে, প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা দিয়ে... বাসি, বাসবো... চিরকাল।'

তার পাশে দাঁড়িয়ে মা দেখে চোখে ওর অপূর্ব এক উষ্ণ কোমল আলো দুলছে। চেয়ারের পিঠে হাত দুখানি রেখে, তার ওপর মাথা রেখে বসে আছে ও... সুদূর চাহনি ডানা মেলেছে কোন দূর দূরান্তরের পানে। ওর সমস্ত শীর্ণ বলিষ্ঠ দেহখানা যেন এগিয়ে যেতে চায় একান্তভাবে, সূর্যলোকে ফুলের মতন।

'বিয়ে করলেন না কেন?' মা শুধয়।

'আঃ, চার বছর হলো বিয়ে হয়ে গেছে ওর...'

'তার আগে? তার আগে করলেই তো পারতেন!'

'কি জানি হয়ে উঠল না।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ও, 'যখন আমি বাইরে, তখন ও হয় জেলে, নয় সাইবেরিয়ায়। আর যখন ও বাইরে, আমি ভেতরে। ঠিক সাশার মতো। শেষ বার ওকে দিলে ঠুকে দশটি বছর। সাইবেরিয়ার সব থেকে দূর একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিলে। ভাবলাম, আমিও যাই। কিন্তু ভারি লজ্জা করল। ও-ও লজ্জা পেল, আমারও লজ্জা হল। সেখানে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ হল ওর, — চমৎকার ছেলে। আমাদেরই একজন কমরেড। তারপর সেখান থেকে এক সঙ্গে ওরা পালাল। এখন বিদেশে আছে ওরা...'

চশমাটা খুলে মোছে নিকলাই। আলোর সামনে তুলে ধরে আর একবার ভালো করে মুছে নেয়।

'বেচারা!' মাথা নাড়তে নাড়তে গভীর স্নেহের সঙ্গে বলে মা। মায়ের বড় দুঃখ হয় ওর জন্য। কি যেন আছে নিকলাইয়ের মধ্যে, গভীর মাতৃসুলভ বাৎসল্যে মা'র বুক ভরে ওঠে। নড়ে চড়ে বসে নিকলাই। কলমটাকে তালে তালে নাড়তে নাড়তে আবার বলতে আরম্ভ করে:

'পারিবারিক জীবন বিপ্লবীদের উদ্যোগ ক্ষুণ্ণ করে। অভাব, অনটন, ছেলেপুলে নিয়ে তারা কী খাবে সেই চিন্তাই তাদের খেয়ে ফেলে। সমস্ত কর্ম শক্তি এতেই বরবাদ হয়ে যায়... অথচ বিপ্লবীর শক্তি বাড়ানোই দরকার, আরো গভীর আরো বিস্তৃতভাবে। এ যে যুগেরই দাবী। সবার চেয়ে আগে আগে আমাদের চলতে হবে, কারণ আমরা শ্রমিক — পুরানো পৃথিবীটাকে ভেঙে নতুন পৃথিবীর পত্তন করার কাজে ইতিহাসের ডাক এসেছে আমাদের কাছে। আমরা অলস হয়ে, বা সামান্য একটু পেয়ে অনেক পেলাম বলে আত্ম-তৃপ্ত হয়ে যদি পেছনে পড়ে থাকি তবে মস্ত ভুল করব — এবং সে-ভুল আদর্শের প্রতি প্রায় বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল হবে। আদর্শের হানি না-ঘটিয়ে একসঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারি, এমন সঙ্গিনী তো নেই। ক্ষুদ্র লাভ আমাদের নয় — আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ বিজয়, একথা ভুললে চলবে না আমাদের।'

ওর স্বর দৃঢ় হয়ে ওঠে, মুখ পাণ্ডুর, চোখে ওর স্বাভাবিক সহজ প্রশান্ত সংযত-সংহত শক্তির প্রদীপন। আবার ঘণ্টা বাজে। লুদমিলা। গাল দুটো ওর হিমে লাল। গায়ের কোটটি ঋতুর পক্ষে অত্যধিক হাল্কা।

ছে'ড়া গালশ জোড়া খ্লতে খ্লতে রাগত-স্বরে বলে ল্দমিলা:
'এক সপ্তাহ পরে মোকদ্দমা আরম্ভ হবে।'

পাশের ঘর থেকে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে নিকলাই:

'ঠিক জানেন?'

মা ছ্টে ও ঘরে যায়। ব্কের মধ্যে তুফান — ভয়ের না আনন্দের, মা বোঝে না। ল্দমিলা সঙ্গে সঙ্গে যায়।

'জানি বৈকি!' ওর গভীর স্বরে বিদ্রূপের আভাস। 'আদালতে সবাই একেবারে খোলাখ্লি বলছে যে রায় ইতিমধ্যেই তৈরী! এর মানে কী? সরকারের কি ভয় হচ্ছে যে তাদের আমলারা দ্ষমনদের ওপর যথেষ্ট কড়া হতে পারবে না? গোলামদের জল্লাদী শেখাবার এত ফন্দিফিকির করেও সরকার নিশ্চিত হতে পারে না! সন্দেহ হয় কী জানি মন্ষ্যত্বের ছিটেফোঁটা যদি এখনও বাকী থেকে থাকে ওদের মধ্যে!..'

ল্দমিলা সোফার ওপর বসে পড়ে শীর্ণ গালে হাত ঘসে। ওর ম্লান চোখে ঘৃণার আভাস। স্বর ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে ওঠে রাগে। নিকলাই ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করে:

'মিছে শক্তিক্ষয় করছেন, ল্দমিলা! ওরা তো আর শ্নতে পাচ্ছে না...'

মা নিবিষ্ট মনে ল্দমিলার কথা শোনে, কিন্তু কিছ্ই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না — সমস্ত চিন্তা জ্ড়ে একই কথা বাজে — বিচার... এক সপ্তাহ পরে...

সহসা ব্ঝতে পারে মা... এক অমোঘ, অমান্ষিক শক্তি এগিয়ে আসছে...

২৩

একটা বিহ্বলতার আবেশে আর উদ্গ্রীব প্রতীক্ষার মধ্যে কেটে গেল দ্টো নিঃশব্দ দিন। তৃতীয় দিনে সাশা এসে বলল নিকলাইকে:

'সব তৈরী। আজ একটায়...'

'এত শীগ্গির?' অবাক হয়ে যায় নিকলাই।

'কেন? অবাক হবার কী আছে? খালি তো একটু কাপড়-চোপড়, আর রীবিন এসে কোথায় থাকবে তা ঠিক করে রাখা, এই তো! বাকী তো সব গব্ন করবে নিজে। ভেসভশ্চিকভ অবশ্য ছদ্মবেশে তৈরী হয়ে

রাস্তায় অপেক্ষা করবে। ব্যস্, রীবিন ছুটে এলেই ও তার গায়ে একটা কোট ফেলে দেবে আর মাথায় একটা টুপি। তারপর রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে। পুরো পোষাক নিয়ে আমি তৈরীই থাকব। আর সেখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাব।'

'তা মন্দ নয়। কিন্তু এই গবুনটি কে?' নিকলাই জিজ্ঞাসা করে।

'আপনার চেনাই তো। এরই ঘরে তো কল-মিস্ত্রীদের নিয়ে পাঠ-চক্র বসাতেন!'

'ওঃ হো! মনে পড়েছে। এক আজব বুড়ো...'

'সৈন্য ছিল। অবসর নিয়েছে। এখন টিন-মিস্ত্রীর কাজ করে। খুব যে একটা উঁচু-পেঠের লোক তা নয়, তবে যে-কোনো অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাড়ে হাড়ে ওর ঘৃণা... আর একটু দার্শনিক ধরনের,' চিন্তিত ভাবে বলে সাশা জানালার দিকে তাকিয়ে। নিঃশব্দে শুনছিল মা; একটা অস্পষ্ট কিছু যেন মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। বলে:

'মনে আছে সেই ইয়েভচেঙেকাকে? গবুনের ভাইপো — বেশ ফিটফাট, পরিষ্কারের দিকে খুব নজর। তাকে আপনার ভালো লেগেছিল। তাকেই বের করে আনতে চায় গবুন।'

নিকলাই মাথা নাড়ে।

সাশা বলে যায়, 'সব ব্যবস্থা করেছে ও। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে সব ভেস্তে যেতে পারে। কয়েদীরা ঐ সময় সবাই একসঙ্গে হাওয়া খেতে বাইরে আসে। মইটা চোখে পড়লে অনেকেই পালাতে চাইবে...'

চোখ বোজে সাশা। কথা বলে না। মা চেয়ারটা টেনে ওর কাছে ঘেঁষে আসে।

'সব... সব নষ্ট হয়ে যাবে...'

তিন জনেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। মা, নিকলাই আর সাশার পেছনে। ওদের দ্রুত কথাবার্তায় মায়ের মনে কতরকম যে অনুভূতির লহর ওঠে তার ঠিকানা নেই...

'আমিও যাচ্ছি ওখানে!' হঠাৎ বলে ওঠে মা।

'কেন?' শুধয় সাশা।

'যাবেন না, শেষে যদি আপনাকে ধরে ফেলে! যাবেন না, বুঝলেন!' উপদেশ দেয় নিকলাই।

মা ওর দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলে:

'না, আমি যাবই...'

তিনজনে চোখাচোখি হয়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাশা বলে:

'বুঝেছি...'

তারপর মায়ের হাতখানা ধরে, একটু ঝুঁকে পড়ে আন্তরিক ভাবে বলে:

'কিন্তু মা, বুঝে দেখেছেন তো! মনের মধ্যে কিন্তু কোন আশা রাখবেন না...'

কম্পিত হাতে সাশাকে জড়িয়ে ধরে মা বলে, 'লক্ষ্মীটি! আমায় নিয়ে আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। শুধু আমায় সঙ্গে যেতে দিন। খুব দরকার আমার। কি জানি আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে জেল থেকে সত্যি সত্যিই পালানো যায়!'

'উনি যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।' সাশা বলে নিকলাইকে।

'সে তোমরাই জান।' মাথা নীচু করে জবাব দেয় নিকলাই।

'আমাদের কিন্তু একসঙ্গে থাকা চলবে না। আপনি যাবেন ওধারের ফাঁকা মাঠটায়, বাগানটার কাছে। জেলের পাঁচিল দেখা যায় ওখান থেকে। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ওখানে কী করছেন, তাহলে?'

'সে তখন দেখা যাবে,' মা খুসি হয়ে বলে।

'মনে রাখবেন কিন্তু, সান্ত্রীরা আপনাকে চেনে।' সাশা সাবধান করে। 'তারা যদি আপনাকে দেখে ফেলে...'

মা বলে উঠে, 'না, না, দেখতে পাবে না...'

যে আশা ধিকিধিকি বুকের মধ্যে জ্বলছিল, হঠাৎ তা শিখায় শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি কাপড় পরতে পরতে ভাবে:

"যদি, পাশাও যদি..."

ঘণ্টা খানেক পরে দেখা গেল মা জেলের পেছন দিককার মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। কনকনে হাওয়া। মায়ের কাপড় চোপড় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। জমাট-বাঁধা মাটির বুকে ঝাপটা মেরে বাগানের নড়বড়ে বেড়াটাকে ঝাঁকানি দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে হাওয়া খাটো পাঁচিলের গায়ে আছড়ে পড়ছে। ভেতরকার আঙ্গিনায় লুটিয়ে পড়ে মানুষের চীৎকার কুড়িয়ে নিয়ে ঘূর্ণির আবর্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ঊর্ধ্ব আকাশে যেখানে ক্ষণে ক্ষণে নীলের গভীরে ছোট ছোট বাতায়ন খুলে দিয়ে ছুটোছুটি করে মেঘের দল।

মায়ের পেছনে বাগান, সামনে কবরখানা। ডান দিকে প্রায় ফুট সত্তরেক

দূরে জেলখানা। কবরখানার কাছে একজন সৈন্য একটা ঘোড়াকে দৌড় করাচ্ছে। আরেকজন পাশে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকে চীৎকার করছে, হাসছে, শিস দিচ্ছে। এ ছাড়া জেলখানার আশেপাশে আর কেউ নেই।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে মা ওদের পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে কবরখানার বেড়ার ধারে। হঠাৎ যেন হাঁটু দুটো ভেঙে পড়তে চায়; পা যেন মাটির মধ্যে জমে বসে গেছে এমনি ভারি। মইটাকে কাঁধে ফেলে অভ্যস্ত দ্রুতগতিতে কুঁজো ফরাশ আসে ওদিক থেকে। ভয়ে ভয়ে মিটমিট করে মা তাকায় সৈন্যদের দিকে — এক জায়গায়ই তারা জটলা করছে, ঘোড়াটা চরকির মত তাদের চারধারে ঘুরছে। মইওয়ালা লোকটার দিকে চায় মা — ওই যে মইটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ধীরে সুস্থে উঠে যাচ্ছে সে। আঙ্গিনার মধ্যে তাকিয়ে হাত নেড়ে সে তাড়াতাড়ি নেমে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়। মায়ের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। সময় যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলছে। কালো, ছ্যাৎলা-ধরা দেয়ালটার সঙ্গে মইটা প্রায় মিশে গেছে। আস্তর খসে পড়ে জায়গায় জায়গায় ইঁট বেরিয়ে পড়েছে দেয়ালের। হঠাৎ একটা কালো মাথা দেখা যায় দেয়ালের ওপর দিয়ে — তারপর দেহটা; পাঁচিল ডিঙিয়ে গুড়ি মেরে মই বেয়ে নেমে যায়। ভালুকে টুপী-পরা আরেকটা মাথা দেখা যায় এবার — একটা কালো রংএর বল যেন গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে মোড়ের ওদিকে হাওয়া হয়ে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়ায় মিখাইলো, চারদিকে চায়, মাথা ঝাঁকায়...

'পালাও, পালাও!' মাটিতে পা ঠুকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে মা।

মায়ের কান ভোঁ ভোঁ করে। ভয়ংকর চ্যাঁচামেচি উঠল। পাঁচিলের ওপর তৃতীয় একটা মাথা। মা দু'হাতে বুক চাপে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অজাতশ্মশ্রু একখানা মুখশুদ্ধ সোনালী মাথাটা ভেসে উঠে যেন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়, তার পর আবার টুপ করে নেমে যায়। কোলাহল বেড়ে ওঠে। বাতাসে ভেসে আসে পাগলা ঘণ্টীর তীক্ষ্ম শব্দ। মিখাইলো পাঁচিলের পাশ কাটিয়ে চলছে। এই যে জেলখানার সীমাটা শেষ হয়ে এল; খানিক পরেই শহরের বসতি সুরু। মাঝখানের ফাঁকা মাঠটায় এসে পড়েছে মিখাইলো। মায়ের মনে হয় মানুষটা যেন বড্ড সোজা হয়ে, বড্ড ধীরে ধীরে হাঁটছে — ওকে একবার যে দেখেছে, সে যে কখনও ভোলে না।

'জলদি, জলদি হাঁটো না!' মা চাপা স্বরে বলে। ধড়াম্ করে কি যেন একটা পড়ল জেলখানার ওধারে। ঝন্ঝন্ করে কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ পায় মা। সেপাইদের মধ্যে একজন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার রশি ধরে টানে। আর একজন হাতটা চোঙের মতো করে মুখের সামনে ধরে জেলখানার দিকে ফিরে কি যেন চীৎকার করে। একবার চীৎকার করেই মুখ ফিরিয়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, ওধার থেকে কোন সাড়া আসে কিনা শোনার জন্য।

মায়ের সমস্ত চেতনা উদগ্র হয়ে আছে কোথায় কী হয় দেখবার জন্য। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চায় চারদিকে — চোখে দেখে সবই, তবু বিশ্বাস করতে পারে না কিছুই। এত সহজে পলক না ফেলতে এক কাণ্ড হয়ে গেল! কোথা দিয়ে কখন যে কী হল যেন ঠাহর করতে পারল না মা — হকচকিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল মা। রাস্তায় রীবিন আর নেই। রাস্তা দিয়ে চলেছে লম্বা ওভারকোট-পরা এক ঢ্যাঙা লোক; তার আগে আগে হন্হনিয়ে চলেছে এক মেয়ে। তিনজন সান্ত্রী জেলখানার ওধার থেকে ধেয়ে বেরিয়ে এল। ডান হাত বাড়িয়ে গায়ে গায়ে সেঁটে দৌড়চ্ছে ওরা। একজন সেপাই ছুটে ওদের কাছে আসে। আর একজনের চলে ঘোড়ায় চড়ার ব্যর্থ কসরৎ। এক লহমা স্থির হয়ে দাঁড়ায় না জানোয়ারটা; অনবরত ঘোরে আর সামনের দুই ঠ্যাং তুলে মারে শূন্যে লাফ। ওর লাফের সঙ্গে মনে হয় চারধারের সবকিছু লাফিয়ে ওঠে। উন্মত্তের মতো অবিরাম হুইসল্ বেজেই চলেছে। বায়ুমণ্ডলের বুক ফালি ফালি হয়ে ভেসে আসছে তার শব্দে। সেই মরীয়া চীৎকারে মায়ের সম্বিৎ ফিরে আসে। এতক্ষণে খেয়াল হয় চারধারে বিপদ। শিউরে ওঠে মা। সান্ত্রীদের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে আরম্ভ করে কবরখানার ধার দিয়ে। কিন্তু সান্ত্রীরা আর সৈন্যরা জেলখানার আর এক মোড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক তার পরেই আর একটি মানুষ ছুটে এল খোলা ইউনিফর্মে। মা চিনতে পারে — ছোট-জেলার। সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠল পুলিশ আর দর্শকের ভিড়।

পাগল হাওয়ার ঘূর্ণি-নৃত্য; যেন উল্লাসে মেতেছে। হুইস্লের শব্দ আর টুকরো টুকরো কোলাহল বাতাসে ভেসে আসে... খুশি হয়ে ওঠে মা এই ডামাডোলে। পা চালিয়ে দেয়। চলতে চলতে মনে হয়:

“ও-ও তো পারতো...”

সহসা দু’জন পুলিশের আবির্ভাব হয় সামনের মোড় থেকে।

‘থামো!’ একজন হাঁকে। হাঁপাতে থাকে মানুষটা। ‘দেখেছ?.. একটা — লোক... দাড়িওয়ালা?’

বাগানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মা। যেন কিছুই হয়নি এমনি শান্ত ভাবে বলে:

‘ওই হোথা দিয়ে গেল। কেন গা?’

‘ইয়েগরভ! হুইস্‌ল্ বাজাও!’

মা বাড়ীর পথ ধরে। কিসের যেন একটা ব্যথা খচ্‌খচ্ করে বুকের মধ্যে। কিসের যেন তিক্ততা, বিরক্তি। রাস্তায় এসে পড়ে মাঠ পেরিয়ে। একটা গাড়ী চলে যায় সামনে দিয়ে। ভেতরে বসে এক যুবক — পাণ্ডুর ক্লান্ত মুখ, সোনালি গোঁফ। একপেশে হয়ে বসে থাকাতে ডান কাঁধটা উঁচু হয়ে আছে। চোখা-চোখি হয়ে যায় ছেলেটার সাথে।

উল্লসিত হয়ে মাকে স্বাগত জানায় নিকলাই:

‘তারপর, কী হল?’

‘সবই তো ভালো মনে হচ্ছে...’

মা খুঁটিনাটি সব মনে করে পুরোটা বলতে চেষ্টা করে। যেন কোন শোনা কাহিনী শোনাচ্ছে যা নিজেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

হাত কচলাতে কচলাতে নিকলাই বলে, ‘ভাগ্যি ভালো আমাদের, বাপরে বাপ্! কী ভাবনাই যে হচ্ছিল আপনার জন্য! কি জানি যদি কিছু হয়। শুনুন, শুভানুধ্যায়ীর কথা শুনুন, মামলার কথা নিয়ে আর ভয়-ভাবনা করবেন না। ও যত শীগ্গির হয় তত শীগ্গির পাভেল বেরিয়ে আসতে পারবে। হয়তো বা চালান যাবার পথেই সরে পড়বে। আর হ্যাঁ মোকদ্দমা — তা মোটামুটি এইভাবে হবে...’

বিচারপদ্ধতি বোঝাতে বসে মাকে। কিন্তু ওর কথা শুনে মা’র বুঝতে বাকী থাকে না, সান্ত্বনা ও দিচ্ছে বটে, কিন্তু ওর নিজের মনেই কী একটা ভয় রয়েছে।

হঠাৎ বলে ওঠে মা, ‘আপনার বোধ হয় ভয় হয়েছে যে আদালতে আমি কোন বেফাঁস কথা বলে বসব, বা হাত জোড় করে ভিক্ষে করে ফেলব বিচারকদের কাছে?’

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে নিকলাই, হাত নেড়ে আহত স্বরে বলে:

'কী যে বলেন আপনি!'

'ভয় সত্যি করছে, কিন্তু কিসের ভয় বুঝতে পারছি না নিজেই...' বলে থেমে যায় মা। ওর চোখ ঘরের মধ্যে চারধারে ঘোরে।

'এক এক সময় মনে হয় কি, হয়তো পাশাকে অপমান অত্যাচার করবে ওরা। পাশাকে বলবে, তুই যে চাষা, চাষার ছেলে, কী হাঙ্গামা করেছিলি?! আমার পাশা, ভারি মানী ছেলে। সইবে না, মুখের ওপর জবাব দিয়ে বসবে। এ-ও হতে পারে যে, আন্দ্রেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করবে ওদের। মাথা তো সবারই গরম। যদি... যদি ওরা বরদাস্ত না করে... তবে হয়তো এমন শাস্তি দেবে যে দেখতে পাব না আর কখনো!'

নিকলাই নীরব। কপাল কুঁচকে দাড়িতে চিমটি কাটে শুধু।

'কিছুতেই মনটা ঠাণ্ডা করতে পারি না। মামলাটা — কত যে ভয়ানক!' আস্তে আস্তে মা বলে, 'সব কিছু দেখে শুনে যাচাই করেই বিচার চালাবে। ভয় তো আর সাজাকে নয়, ভয় ওই বিচারকে। ঠিক বোঝাতে পারছি না...'

মা দেখল, নিকলাই বুঝতে পারছে না ওর কথা। তাই মনের আশংকা বোঝাতে গিয়ে আরো কষ্ট হয় মায়ের।

২৪

গলায় যেন ছ্যাৎলার মতো হয়ে জমে আছে ভয়টা। দম বন্ধ হয়ে আসে। মামলার দিন বুকের ওপরকার জগদ্দল পাথরটাকে নিয়েই ধুঁকতে ধুঁকতে মা আদালতে আসে।

বস্তির অনেক চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় রাস্তায়। সম্ভাষণ জানায় সবাই। মা শুধু নিঃশব্দে প্রতি-নমস্কার করে ক্ষুব্ধ জনতার মধ্য দিয়ে চলে যায়। আদালতে আসামীদের অনেকের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেই দেখা হয়। চাপা স্বরে নানা রকম মন্তব্য করছে। কথাগুলো অনর্থক বলে মনে হয় মায়ের, বুঝতেও পারে না সেগুলো। সবার বুকে যে আজ একই ব্যথা জ্বলছে তা অনুভব করে মা। তাই তো আরো বেশি যন্ত্রণা।

'বসো এখানটায়, আমার পাশে।' সরে জায়গা করে দিয়ে সিজভ্ বলে।

বাধ্য মেয়ের মতো বসে পড়ে মা। পোষাক ঠিক করে, চারদিকে তাকিয়ে

তাকিয়ে দেখে। সবুজ, লাল, হলদে ফুটকি, ডোরাকাটা নানান রকম রঙের বাহার নাচছে চোখের সামনে।

ওপাশে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক। নীচু স্বরে বলে, 'তোমার ছেলেই আমাদের গ্রিশার সর্বনাশ করেছে!'

বিষণ্ণ মনে বলে সিজভ, 'চুপ কর, নাতালিয়া।'

মা স্ত্রীলোকটির দিকে চায় — সাময়লভা। তার স্বামী বসে আছে ওই ওধারে। বেশ চেহারা লোকটির — মুখখানা যদিও হাড্ডিসার। মাথায় টাক, বিশাল লাল দাড়ি। চোখ কুঁচকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনে। দাড়ি কাঁপছে থিরথির করে।

জানালাগুলো উঁচু। কাঁচের ওপর পিছলে পড়ছে তুষার। তাদের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত ফিকে আলোয় আদালত-কামরা আলো হয়ে আছে। দুই জানালার মাঝখানে ঝলমলে গিল্টিকরা ফ্রেমে আঁটা জারের বিরাট ছবি, লালরঙের ভারি জানালার পর্দার আড়ালে তার ধারগুলো পড়েছে ঢাকা। ছবির সামনেই সবুজ বনাতে ঢাকা লম্বা একটা টেবিল ঘরের প্রায় সমস্তটা জুড়ে। ডানদিকের দেয়ালের কাছে কাঠগড়া। দুটো কাঠের বেঞ্চি পাতা তার ভেতরে। আর বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে লাল মখমলের গদি আঁটা দুই সারি আরাম-চেয়ার। সবুজ কলার আর সামনের দিকে সার-বাঁধা সোনালী বোতাম আঁটা পোষাক পরা আমলাদের দল ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরের মধ্যেকার আবহাওয়াটা গুমট্। তার মধ্যে শুধু ভীরু ফিস্‌ফিসানির শব্দ আর ওষুধের গন্ধ। এই রং, আলোর ঝলক, শব্দ, গন্ধ চোখে কানে যেন বিঁধতে থাকে। নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে গিয়ে একটা নির্বস্তুক বিষণ্ণ ভয় মর্ম ছেয়ে ফেলে।

হঠাৎ কে যেন জোরে কথা কয়ে উঠল। মা চম্‌কে ওঠে। দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। সিজভের হাত ধরে সবার সঙ্গে মাও উঠে দাঁড়ায়।

বাঁ দিকের উঁচু দরজাটা খুলে যায়। চশমাপরা এক বৃদ্ধ টলতে টলতে এসে ঘরে ঢোকে। তার ধূসর গালের ওপরকার সাদা জুলপি কাঁপছে। গোঁফহীন ওপরের ওষ্ঠ দন্তহীন মুখের মধ্যে অনেকটা ঢুকে গেছে। উঁচু কলারের পেছনে গর্দানটা দেখাই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন ওটা নেই। শুধু থুতনি আর বেরিয়ে-আসা গালের হাড় জেগে আছে কলারের ওপর দিয়ে। একটি দীর্ঘকায় যুবকের ওপর ভর দিয়ে বৃদ্ধ হাঁটছে। যুবকের

গোলাপী গোল মুখখানাকে মনে হয় চীনেমাটির মুখ। এদের পেছনে ধীরে ধীরে এল আরো ছজন। তিনজন বেসামরিক পোষাকে আর তিনজনের জরির কাজ করা উর্দি পরা।

মিছিল করে আসা, টেবিলে এসে গদিয়ান হয়ে বসা — অনেক লম্বা পালা। শেষ হতে প্রচুর সময় লাগল। চাঁছা-ছোলা অলস মুখ, পোষাকের বোতামগুলো খোলা একজন ফোলা ঠোঁটদুটোকে বিশ্রী ভাবে নেড়ে নেড়ে বৃদ্ধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কী জানি বলে। বৃদ্ধ কাঠের মতো নিশ্চল আর খাড়া হয়ে বসে শোনে। চশমার কাঁচের পেছনে মা শুধু দুটো বিবর্ণ ফুটকি দেখতে পায়।

টেবিলের ওধারটায় লেখার টেবিলটা। তার সামনে একটু টাক-পড়া লম্বা একজন লোক দাঁড়িয়ে। হাতে এক তাড়া কাগজ। গলা খাঁকারি দিতে দিতে সে কাগজগুলো উল্টে চলেছে।

বৃদ্ধ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলতে আরম্ভ করে। প্রথম কথাগুলো বেশ স্পষ্ট, কিন্তু পরেরগুলো যেন জটলা করে পাতলা ঠোঁটদুটোর ওপর এলিয়ে পড়তে লাগল:

'আমি ঘোষণা করিতেছি... উপস্থিত করা হউক...'

মাকে একটা ঠ্যালা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সিজভ, 'দেখ... দেখ...'

কাঠগড়ার পেছন দিককার দরজা খুলে যায়। খোলা তলোয়ার কাঁধে প্রথমে আসে একজন সৈন্য। তার পেছনে পাভেল, আন্দ্রেই, ফিওদর মাজিন, গুসেভরা দুই ভাই, সাময়লভ, বুকিন, সমভ, আরও পাঁচটি ছেলে — নাম মা জানে না। পাভেল মৃদু হাসে, আন্দ্রেই-ও এক গাল হেসে মাথা নাড়িয়ে নমস্কার জানায়। ওদের হাসি হাসি প্রাণবন্ত মুখগুলোয় এজলাস ঘরের গুমটটা যেন কেটে গিয়ে হাওয়া হালকা হয়ে যায়। নিবে যায় জাঁকালো উর্দির সোনার কাজের জলুস। যে-প্রশান্ত বিশ্বাস, যে-প্রাণ-নিস্যন্দী শক্তি সঙ্গে করে নিয়ে এল বন্দীরা তার তেজে মা'র সাহস ফিরে এল, বুকে বল এল। মায়ের পেছনে বেঞ্চিতে এতক্ষণ বিমর্ষভাবে যারা বসেছিল তারাও সজীব হয়ে উঠল।

সিজভ বলে, 'দেখছ? ওদের মোটে ভয় নেই!' ডান দিকে সাময়লভের মা ফুঁপিয়ে ওঠে।

'চুপ!' কঠোর হুকুম আসে।

বৃদ্ধ হাঁকে, 'সাবধান করে দিচ্ছি...'

প্রথম বেঞ্চিতে বসেছিল পাভেল, আন্দ্রেই, মাজিন, সাময়লভ আর গ্নুসেভ ভাইয়েরা। আন্দ্রেই দাড়ি কামিয়েছে, কিন্তু গোঁফ রেখেছে। গোঁফ-জোড়া বেড়ে বেড়ে এমনি ঝুলে পড়েছে যে ওর গোল মাথাটা বেড়ালের মাথার মতো দেখাচ্ছে। ওর মুখের মধ্যে যেন নতুন একটা কী, ওষ্ঠে তীক্ষ্নতা আর শ্লেষ; চোখের দৃষ্টিতে কাঠিন্য। মাজিনের ওপরের ওষ্ঠে দুটো কালো রেখা পড়েছে; মুখখানায় যেন মাংস লেগেছে। সাময়লভের তেমনি কোঁকড়া চুল; ইভান গ্নুসেভের তেমনি একগাল হাসি।

মাথা নীচু করে সিজভ বলে, 'আঃ ফিওদর! ফিওদর!'

জেরা করতে আরম্ভ করে বৃদ্ধ। মা শুনতে পায়। বৃদ্ধ বন্দীদের দিকে তাকায় না; ভালো করে কথা বোঝা যায় না। মাথাটা নিশ্চল হয়ে আছে কলারের উপর। মা শোনে তার ছেলের জবাব — শান্ত, ধীর, সংক্ষিপ্ত। মা'র মনে হল প্রধান বিচারক আর তার সহকারীরা কেউই ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর হতে পারবে না। টেবিলে বসা মানুষগুলোর মুখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে মা, রায় কী হবে তার যদি একটু আভাস পাওয়া যায়। কি জানি কেন বুকের তলে আশা বাড়ে।

চীনেমাটির মতো মুখওয়ালা লোকটি একঘেয়ে স্বরে কী একটা কাগজ পড়ে গেল। শ্রোতারা সেই একঘেয়েমিতে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইল সব শুনে। চারজন উকিল চাপা স্বরে, উত্তেজিত ভাবে কী আলোচনা করছে আসামীদের সঙ্গে। ওদের চলন-বলন দ্রুত, দৃঢ়; চেহারা মস্ত মস্ত কালো পাখীর মতো।

বৃদ্ধের একদিকের আরাম-কেদারায় বসে এক হোঁৎকা বিচারক। তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ চর্বিতে বুঁজে গেছে। বাঁ দিকে আরও একজন। ওর লাল গোঁফ, পাঁশুটে মুখ আর ঝুঁকে পড়া কাঁধ। চোখ বুজে ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে মাথা এলিয়ে বসে আছে। মুখে চিন্তার ছাপ। সরকারী উকিলেরও মুখে চোখে অসীম ক্লান্তি আর অবসাদ। বিচারকদের পেছনে উপবিষ্ট বিশিষ্ট তিনজন ব্যক্তি। একজন নগরপাল — স্থূল দেহ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ; বসে বসে চিন্তান্বিতভাবে গালে টোকা মারছে। আরেকজন এক মার্শাল অব দি নোবিলিটি, সাদা চুল, লাল টুকটুকে গাল, বড় বড় দাড়ি, ডাগর অমায়িক দুই চোখ। আর আছে জেলাশাসক সাহেব — বেচারা তার জালার মতো পেটটি নিয়ে বড়ই বিব্রত। কোটের ঝুল টেনে টেনে বারবার সেটি ঢাকছে, বারবার ঢাকা সরে যাচ্ছে।

পাভেলের দৃঢ় কণ্ঠ গম্‌গম্‌ করে ওঠে, 'এখানে অপরাধী বা বিচারক নেই — আছে শুধু বিজয়ী আর তাদের বন্দী...'

এজলাস ঘর নিস্তব্ধ। শুধু কলম চলে তাড়াতাড়ি, খস্‌ খস্‌ করে। কিছুক্ষণ কলমের শব্দ আর নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না মা।

প্রধান বিচারকও যেন মন দিয়ে কি একটা শোনে, কিসের প্রতীক্ষায় যেন আছে। সহকারীরা উস্‌খুস্‌ করে। তখন সে বলে:

'আন্দ্রেই নাখদ্‌কা, আপনি কি স্বীকার করেন যে...'

ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে আন্দ্রেই। গোঁফ চুমরিয়ে ভুরু কুঁচকে বিচারকের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ওর স্বভাব-সুরেলা, ত্বরাহীন কণ্ঠে:

'কি অপরাধ করেছি যে স্বীকার করব? খুন করিনি, চুরি ডাকাতি করিনি; যে-অবস্থায় পড়ে মানুষ চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হয়, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি করে, সেই জীবনাবস্থাটাকে শুধু মেনে নিতে অস্বীকার করেছি...'

বৃদ্ধ অতিকষ্টে তবু স্পষ্ট ভাবে বলে, 'সংক্ষেপে উত্তর দিন।'

মা টের পায়, তার পেছনের বেঞ্চির মানুষগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা নড়াচড়া করে, কানাকানি করে — চীনেমাটির মানুষটা যে কথার জাল বুনছে তার থেকে যেন নিজেদের মুক্ত করে নেয়।

সিজভ বলে, 'আরে শোনই না, কী বলছে!'

'ফিওদর মাজিন! জবাব দিন...'

'দেব না জবাব।' লাফিয়ে উঠে স্পষ্ট ভাবে বলে ফিওদর। ওর মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে; চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কেন জানি হাত দুটো ও পেছনে করে রেখেছে।

সিজভের মুখ দিয়ে একটা কাতরোক্তি বেরিয়ে আসে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মা।

'আমার পক্ষ-সমর্থনের জন্য কোন উকিল মোক্তারকে নিতে রাজী হইনি। আমি কিছুই বলব না। এ মামলা বেআইনি। কারা আপনারা? আমাদের বিচার করার অধিকার কে দিল আপনাদের? জনসাধারণ সে সনদ তো দেয়নি। আমি আপনাদের জানি না।'

বসে পড়ে ফিওদর। উত্তপ্ত মুখ আন্দ্রেইয়ের কাঁধের পিছনে লুকায়।

স্থূলকায় বিচারক প্রধান বিচারকের কানে কানে কী যেন বলে। ফ্যাকাসে মুখ তৃতীয় বিচারক একবার চোখ খুলে বন্দীদের তির্যক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সামনে-রাখা কাগজখানায় কী যেন টুকে নেয়। জেলাশাসক মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে পা বদলে বসে। এবারে পেটটা হাঁটুর ওপর চাপিয়ে হাত দিয়ে আড়াল করে। ঘাড় না ফিরিয়েই শরীরটাকে একটু পাক দিয়ে বৃদ্ধ লাল গোঁফওয়ালাকে কি যেন বলে কানে কানে। সে নতমস্তকে অবহিতচিত্তে শোনে। মার্শাল অব দি নোবিলিটি সরকারী উকিলকে কী যেন বলে। নগরপাল গাল ঘসতে ঘসতে শোনে সে-কথা। প্রধানের নিষ্প্রাণ বক্তৃতা আবার শোনা যায়।

সিজভ অবাক হয়ে মায়ের কানে কানে বলে, 'দেখলে তো কেমন দিলে ওদের? এ লোকটাই ভালো দেখছি দলের মধ্যে!'

মা না বুঝেই হাসে একটু। প্রথমে তার মনে হয়, যা কিছু ঘটছে সবই এক অত্যাসন্ন, অতি ভয়ানক ভবিতব্যেরই ক্লান্তিকর নিষ্প্রয়োজন ভূমিকা। সে পরিণাম হঠাৎ ঘটলেই ঠাণ্ডা ভীষণতায় সকলকে দলে পিষে চুরমার করে দিয়ে যাবে। কিন্তু পাভেল আন্দ্রেইয়ের শান্ত কথাগুলি যেন অভয়মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে গেল। এ যেন আদালত নয়, কুলি-বস্তির সেই ছোট্ট ঘরখানায় বসেই ওরা কথা বলছে — এমনি দৃঢ়ভাবে, এমনি নির্ভয়ে। ফিওদরের তেজোদ্দীপ্ত কথাগুলোও মা'র প্রাণে ঘা দিয়েছিল। পেছনে যারা বসে আছে, তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে তারাও অনুভব করছে যে ভয়ের আগল ভেঙে গিয়েছে।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার মত কী?'

টাক-মাথা সরকারী উকিল উঠে দাঁড়াল। ডেস্কের ওপর একটা হাত রেখে, নানা রকম সংখ্যার অবতারণা করে গড়গড় করে একটা বক্তৃতা দিয়ে গেল। সাদামাটা স্বর। ভয় পাবার মতো কিছু নেই।

তবু ভয় করে মা'র। কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে ভয়টা বেঁধে বুকের মধ্যে। অদৃশ্য হয়ে ভোঁতা ভাবে বেড়ে যায় শত্রুভাব। হাওয়ার মধ্যেই কী যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত, যা দুর্ভেদ্য মেঘের আড়াল রচনা করে বিচারকদের বাইরের সব কিছু থেকে বাঁচিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। বিচারকদের দিকে তাকায় মা। দুর্বোধ্য সব! মা'র মনে হয়েছিল পাভেল আর ফিওদরের ওপর ওদের রাগ হবে। কিন্তু কই ওদের কথায় রাগ তো কিছুই হল না। কিন্তু যে-প্রশ্ন ওরা করল সে সবই মনে হয় অনাবশ্যক। ইচ্ছে

নেই তবু করতে হয় বলেই করল; জবানবন্দীটা নেহাৎ শুনতে হবে তাই বসে শোনা। শেষের অঙ্ক তো আগে থেকেই জানা। তাই সবাই নির্বিকার।

একজন পুলিশ এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে মোটা গলায় বলল:

'সবাই বলে পাভেল ভ্লাসভ দলের পাণ্ডা...'

'আর নাখদকা?' মোটা বিচারক জিজ্ঞাসা করে অলসভাবে অনুচ্চ স্বরে।

'সেও...'

একজন উকিল উঠে দাঁড়ায়:

'একটা কথা বলতে পারি?'

'কোন আপত্তি তুলবার আছে?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে একজনকে।

মায়ের মনে হয় সব কজন জজই অসুস্থ। প্রত্যেকের চেহারা, গলার স্বর, মুখের ভাব, সব কিছুর মধ্যেই একটা ভারি অস্বাস্থ্যকর ক্লান্তি, আর বিষণ্ণ ধূসর একঘেয়েমির ছাপ। এই আদালত, পোষাক-আসাক, পুলিশ, উকিল-ব্যারিষ্টার, আরাম-চেয়ারে বসে থাকা, সওয়াল-জবাব শোনা --- সবই তাদের কাছে কষ্টের ব্যাপার। কিছুই ভালো লাগে না।

মা'র আগের চেনা সেই হলদে-মুখো পুলিশ অফিসারটা জজদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সসম্মানে, টেনে টেনে উচ্চ স্বরে সাক্ষ্য দিচ্ছে পাভেল আন্দ্রেইয়ের সম্বন্ধে। মা শুনে মনে মনে বলে:

"তুমি আর কী জান?"

কাঠগড়ায় বসা মানুষগুলোর দিকে তাকায় মা — ওদের জন্য আর কোন ভয় করে না, করুণাও হয় না। ওদের বেলায় আসে না করুণা — আসে শুধু শান্ত বিস্ময় আর বুকজোড়া ভালোবাসা — আনন্দোচ্ছল স্বচ্ছতায় সুন্দর ভালোবাসা। ওই যে বসে আছে শক্তিমান তরুণ ছেলেদের দল — সাক্ষী-জজের সওয়াল-জবাব, সরকারী উকিলের সঙ্গে প্রতিবাদী উকিলদের বাগ্‌যুদ্ধ, কোন দিকেই ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে ওদের কেউ হয়ত বাঁকা হাসি হেসে ওঠে; কেউ বন্ধুদের কী একটা বলে -- তাদের মুখেও তখন বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। আন্দ্রেই আর পাভেল ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলেই চলেছে একজন উকিলের সঙ্গে। একেই মা কাল রাতে নিকলাইয়ের ঘরে দেখেছিল। মাজিন সবচেয়ে

উদ্দীপ্ত, চঞ্চল, সেও পাভেলের আলোচনা শুনছে। এক এক বার সাময়লভ ইভান গুসেভকে কী একটা বলে; মা দেখে — ইভান তাকে কনুইয়ের খোঁচা দেয়, হাসি চাপতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে, গাল ফুলে ফুলে ওঠে ওর। মাথা নীচু করে ফেলে ও। চেষ্টা করেও বার দুয়েক হাসি চাপতে পারেনি কিছুতেই। তার পর মিনিট কয়েক সংযত মুখে বসে আছে, চেষ্টা করছে গাম্ভীর্য দেখাবার। ছেলেদের চঞ্চল তারুণ্য চেপে রাখার সব চেষ্টা সহজেই ছাপিয়ে ওঠে।

মায়ের কনুইতে হাল্কা স্পর্শ করে সিজভ। মা ফিরে তাকিয়ে দেখে, সে খুশি কিন্তু একটু উদ্বিগ্ন। কানে কানে বলে:

'ছোঁড়াগুলোকে দেখলে? কী বুকের পাটা হয়েছে! যেন শাহান-শা-বাদশা এক এক জন!'

সাক্ষীরা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কী সব বলাবলি করছে, স্বরে তাদের কোনো বর্ণ নেই। জজেদেরও নেহাৎ কইতে হবে তাই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কথা কওয়া। মাংস-থলথল হাতখানা মুখের সামনে ধরে হাই তোলে হোঁৎকা জজ। লাল-গোঁফওয়ালার মুখখানা আরো পাণ্ডুর হয়ে গেছে; বারে বারে আঙুল দিয়ে কপালের রগ চেপে ধরে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কড়িকাঠের দিকে। চোখ দুটোতে করুণ অন্ধ দৃষ্টি। সরকারী উকিল থেকে থেকে পেন্সিল দিয়ে কী জানি টুকছে আর মার্শাল অব দি নোবিলিটির সঙ্গে কথা বলছে নিঃশব্দে। শুনতে শুনতে মার্শাল কখনও দাড়িতে হাত বুলোয়, কখনও বড় বড় সুন্দর চোখগুলো বিস্ফারিত করে আর সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে মৃদু হাসে। নগরপাল পায়ের ওপর পা তুলে বসে হাঁটুর ওপর আঙুল দিয়ে তাল দিতে দিতে তাকিয়ে থাকে আঙুলগুলোর দিকে। জেলাশাসক হাঁটুর খুঁটিতে ঠেকা-দেওয়া ভুঁড়িখানিকে দুই হাতের সযত্ন আলিঙ্গনে বেঁধে বসেছিল। সে আর ওই যে-বৃদ্ধ নির্বাত দিনের হাওয়াযন্ত্রের মতো একেবারে নিশ্চল খাড়া হয়ে বসে আছে আরাম-চেয়ারে, তারাই মাত্র সেই একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি শুনছে। একই দৃশ্য একটানা চলছে তো চলছেই। একঘেয়েমিতে অবসাদে লোকে আবার আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'আমি ঘোষণা করিতেছি...' বাকি কথাগুলো ওর পাতলা ঠোঁটের তলায় মিলিয়ে যায়।

দীর্ঘশ্বাস, চাপা মন্তব্য, কাশি, পা-ঘষার শব্দে এজলাস ঘর ভরে

যায়। আসামীদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাবার সময় আত্মীয়-বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে তারা হেসে মাথা নাড়ে। ইভান গুসেভ ফাঁক খুঁজে কাকে ডেকে বলে অনুচ্চ স্বরে:

'ঘাবড়াসনি রে, ইয়েগর!'

মা আর সিজভ উঠে বারান্দায় যায়।

সযত্নে চিন্তিত স্বরে বলে, 'কাফিখানায় যাবে নাকি, চা-টা খাবে? ঘণ্টা-দেড়েক সময় আছে আমাদের।'

'ইচ্ছে করছে না তেমন।'

'তাহলে আমিও যাব না। ছেলেগুলো কী বলতো! এমনিভাবে বসে আছে যেন দুনিয়ায় ওরা ছাড়া আসল লোক আর কেউ নেই। আর ঐ ফিওদরটা?'

টুপি হাতে সাময়লভের বাবা এল এগিয়ে। বিমর্ষ হাসি হেসে বলে:

'কাণ্ডটা দেখলে আমাদের গ্রিগরির? উকিল নিল না। কথা অবধি কইতে চায় না তাদের সঙ্গে। ও ব্যাটার মাথায়ই প্রথমে ঢুকেছে এ কথাটা। তোমার ছেলে তো উকিল লাগানোর পক্ষেই ছিল। আমার ছেলেই তো বলল — না, চাই না। তারপর আর চারজন নারাজ হল...'

ওর স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল পাশেই। চোখ পিটপিট করছে বারবার। রুমালের কোণা দিয়ে নাক মুছছিল। মুঠো করে দাড়ি ধরে মাটির দিকে তাকিয়ে বলে চলে সাময়লভ:

'হয়েছে এক জ্বালা! ব্যাটাদের মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় বৃথাই ওরা গেল এসব গণ্ডগোলের মধ্যে! আবার এক এক সময় হঠাৎ মনে হয়, কি জানি হয়তো সত্যি কথাই বলছে ব্যাটারা! বিশেষ করে কারখানায় নিত্যি ওদের দল বাড়ছে। পুলিশ তো গন্ধ পেলেই টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু হলে হবে কি! নদীর জলে মাছের পোনার মতো শেষ নেই ওদের। তখন আবার মনে হয় — হয়ত শক্তি ওদের পক্ষেই।'

সিজভ বলে, 'আমাদের মগজে এসব ঢোকাতে অনেক কষ্ট হবে হে, স্তেপান পেত্রভিচ!'

'যা বলেছ!' সায় দেয় সাময়লভ।

'জোয়ান মরদ ডাকাতে ছেলে সব...' জোরে নাকে শ্বাস টেনে বলে সাময়লভ-গিন্নী।

ধ্যাবড়া মুখখানায় হাসি ফুটিয়ে মাকে বলে:

'রাগ করো না গো, নিলভনা! ওবেলায় তোমার ছেলেটাকে অত গাল দিলুম। কে জানে, কার ছেলে কাকে ক্ষ্যাপালে! শুনলে তো পুলিশ আর গোয়েন্দারা আমাদের গ্রিগরির কথা কি বললে। ও ব্যাটাও কম চেষ্টা করেনি! লালগোঁফ কুত্তা!'

বেশ বোঝা যায়, ছেলের জন্য সাতহাত হয়ে আছে গ্রিগরির মায়ের বুক। হয়ত নিজেও সে জানে না তার সেই অনুভূতিটাকে। কিন্তু মা তা বোঝে। অমায়িক হাসি হেসে নীচু স্বরে বলে মা:

'কাঁচ পরাণেই সত্যকে তাড়াতাড়ি চেনা যায়!..'

বারান্দা দিয়ে লোকজন যায় আসে, জটলা করে মনোযোগ সহকারে উত্তেজিত চাপা স্বরে কথা বলে। কেউই প্রায় একা নেই। প্রত্যেক মুখেই কথা কইবার, প্রশ্ন শুধবার, শুনবার স্পষ্ট ব্যগ্রতা। ওরা যেন ঝড়ের বায়ে উড়ে এসে পড়েছে এইখানের এই দু'দেয়ালের মাঝখানকার এই সরু সাদা বারান্দাটায়। নাও বাঁধবার জন্য শক্ত পোক্ত একটা কিছু চাই।

বুকিনের বড় ভাই — দেখতে লম্বা আর বুকিনের মতই ফ্যাকাশে — চার দিকে হাত নাচিয়ে বুঝিয়ে দেয়:

'ওই যে ক্লেপানভ — জেলাশাসক — এটা মোটে ওর জায়গা নয়...'

ওর বাপ, ছোটখাট চেহারার এক বৃদ্ধ সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে বলে, 'চুপ্ চুপ, কন্স্তানতিন!'

'কেন, কার ভয়ে চুপ করব? জান? কী বলছে ওর নামে লোকে? ও নাকি ওর কেরাণীর বৌকে নিয়ে থাকে। আর তাইজন্যই নাকি বৌটার সোয়ামীটাকে মেরে ফেলেছে। তা ছাড়া ও ব্যাটা যে চোর সে তো সব্বাই জানে...'

'দোহাই, কন্স্তানতিন!'

'ঠিক বলেছ,' সাময়লভ বলে, 'এর নাম কি বিচার...'

ওর গলার স্বর শুনে এগিয়ে আসে বুকিন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাইও আসে। উত্তেজনায় লাল টক্‌টক্ করছে বুকিনের মুখ — হাত নাচিয়ে নাচিয়ে ও চীৎকার করে:

'খুন, জখম, চুরি-ডাকাতির ব্যাপার হলে — তখন এদের জুরি বসবে। জুরির মধ্যে থাকবে সব সাধারণ লোক — চাষী, শহরের মানুষ।

কিন্তু কত্তাদের বিরুদ্ধে যখন মানুষ খ্যাপে, তখন তার বিচার কত্তারা নিজের হাতে করবেন! কী বলে একে? তুমি আমায় অপমান করলে — তোমার চোয়াল তাক করে মারলুম এক ঘুষি! তারপর তুমিই যদি বিচারে বস, তাহলে আমার দোষ ষোল কাহন তো হবেই। কিন্তু বাপুহে প্রথম দোষখানা কার? তোমার!'

চুল-পাকা, বড়শীর মতো নাক-ওয়ালা এক পাহারাদার ভিড় হটায়। ওর বুকে অনেক কটা মেডেল ঝোলান। বুকিনের দিকে আঙুল তুলে বলে:

'এই ব্যাটা, থাম বলছি। ব্যাটা যেন আড্ডা পেয়েছে!'

'কত্তা, সে তো না হয় বুঝলাম। কিন্তু ধর দু'চার ঘা আমি দিলুম তোমাকে, তারপর আমিই জজ হয়ে বসলাম। কেমন লাগবে হে মজাটা...'

কঠিনভাবে বলে পাহারাদার, 'নাঃ তোকে বের করে দিতেই বলব!'

'য়্যাঁ! কোথায়? কেন শুনি?'

'এখানে গোল পাকিয়ে তুলছিস বলে। ধরে রাস্তায় বার করে দিতে বলব।'

আশেপাশে যারা ছিল তাদের মুখের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলে বুকিন:

'আমাদের মুখ বেঁধে রাখাটাই ওদের আসল ব্যাপার...'

বৃদ্ধ কড়া গলায় চীৎকার করে ওঠে, 'আর তোর মত কী ছিল, শুনি?'

বুকিন কাঁধ ঝাঁকায়, স্বরটা আরো নামিয়ে বলে:

'শুধু আত্মীয়-স্বজনকেই আসতে দেবে? কেন বাপু! অত ভয়টা কিসের তোদের! বিচার যদি তোদের ঠিকই হবে — দে দেখি সবাইকে আসতে। শুনুক সবাই...'

সাময়লভ জোরে জোরেই বলে:

'ন্যায়! ন্যায়-বিচার বলে কিচ্ছু নেই।'

মা নিকলাইয়ের কাছ থেকে শুনেছিল এই মামলাই বেআইনী। ইচ্ছে হল, সেই কথাগুলো ওকে শুনিয়ে দেয়। কিন্তু সবটা ভালো করে বুঝতে পারেনি সেদিন। তা ছাড়া কিছু কিছু কথা ভুলেও গিয়েছিল। একটু একান্তে সরে যায়, মনে করার চেষ্টা করে কথাগুলো। হঠাৎ

চোখ পড়ে, একজন য়ুবক ওকে লক্ষ্য করছে। হাল্কা রঙের গোঁফ, ডান হাতখানা পাৎলুনের পকেটে, ফলে ডান কাঁধের চেয়ে বাঁ কাঁধটা নীচু দেখাচ্ছে। ভঙ্গিটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগে মায়ের। কিন্তু তক্ষুনি ঘুরে দাঁড়ায় লোকটা। এদিকে নিজের চিন্তায় ডুবে যায় মা। পরক্ষণেই য়ুবকটির কথা আর কিছুই মনে থাকে না।

কিন্তু মিনিটখানেক পরেই একটা চাপা স্বরের প্রশ্নে চমক ভাঙ্গে মা'র।

'এ?'

'হ্যাঁ।' ব্যগ্র উত্তর।

মুখ ফিরিয়ে দেখে মা। উঁচু-নীচু কাঁধওলা সেই লোকটা কথা বলছে পাশের লোকের সঙ্গে। পাশটাই শুধু দেখা যাচ্ছে লোকটার। যার সঙ্গে কথা বলছে তার কালো দাড়ি, ছোট একটা কোট গায়ে, হাঁটু পর্যন্ত বুট।

আবার মায়ের স্মৃতি সভয়ে চমকে ওঠে, কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে — ডেকে ডেকে শোনাতে চায় প্রতিটি মানুষকে যে-মহান ব্রত পালনে তার ছেলে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, সেই ব্রতের কথা। শুনবে মা এরা কী বলে তার কথার বিরুদ্ধে। তাহলেই আন্দাজ করা যাবে আজ আদালতের রায় কী হবে।

অতি সাবধানে চাপা গলায় বলে সিজভকে, 'এর নাম বিচার? কে কী করল তাই নিয়ে ওদের যত মাথাব্যথা। কিন্তু কে, কেন করল সে-দিক পানে তো তাকিয়ে দেখিস্ না তোরা! তা ছাড়া কচি ছেলেদের বিচার করবে এই বুড়োরা! কেন রে বাপু! ওদের বিচার করাতে হয়, ওদের বয়সী মানুষদের নিয়ে আয়!'

'যা বলেছ!' সিজভ বলে, 'এসব কান্ড-কারখানা বাপু বোঝার সাধ্যি নেই আমাদের!' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে ও।

পাহারাদার এজলাসের দরজা খুলে দিয়ে হাঁকে:

'টিকিট দেখাও, আসামীদের আত্মীয়-স্বজন যারা আছ!'

'টিকিট!' বেজার কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে কেউ, 'টিকিট! যেন সার্কাসে এসেছি!'

লোকগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা বিরক্তির ছায়া। শাসন-বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেছে কোনখান দিয়ে। মানুষগুলো তাই সোরগোল করে, পাহারাদারদের সঙ্গে তর্ক জোড়ে। সব গেছে ঢিলে-ঢালা হয়ে।

বেণ্ডির ওপর নিজের জায়গায় বসতে বসতে কী যেন বিড়বিড় করে সিজভ।

'কী বলছ?' মা বলে।

'না কিছু না। মানুষগুলো সব গাধা...'

ঘণ্টা বাজে। নির্বিকার কণ্ঠে কে যেন বলে:

'জজরা আসছে।'

সকলেই উঠে দাঁড়ায়। আগের মতোই লাইন বেঁধে জজেরা আসে — বসে। আসামীদের কাঠগড়ায় ফিরিয়ে আনা হয়।

সিজভ কানে কানে বলে: 'এই সেরেছে! সরকারী উকিলের বক্তিমে হবে এবার।'

মা নতুন করে আশংকায় স্তব্ধ হয়ে যায়। সমস্ত দেহটা দিয়ে সামনে ঝুঁকে শুনতে চেষ্টা করে।

জজদের এক পাশে, তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে সরকারী উকিল। একটা কনুই ডেস্কের ওপর। অনেকখানি লম্বা একটা নিশ্বাস নিয়ে, ডান হাতটাকে প্রবলভাবে নেড়ে নেড়ে সে বলতে আরম্ভ করল। প্রথম কথাগুলো কিছুই বুঝতে পারল না মা। মোটা মসৃণ গলা। কিন্তু কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর। একঘেয়ে টানা সুরে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ যেন চিনির ডেলার সামনে মাছির ঝাঁকের মতো ভন্‌ভনিয়ে ওঠে। কিন্তু তার কথায় ভয়ংকর কিছু পেল না মা। বরফের মতো হিম, ছাইয়ের মতো ধূসর কথার স্রোত ভেসে বেড়ায় ঘরের মধ্যে। আবহাওয়াটা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, মনে হয় সূক্ষ্ম ধুলোর জালে যেন ভরে গেছে ঘরখানা। অনুভূতিবিহীন রাশি রাশি কথা শুধু, — তার একটিও পাভেল আর তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছয় না। ওরা সেগুলো গ্রাহ্যও করে না! আগের মতোই নিরুদ্বেগে নিজেদের মধ্যে নিঃশব্দে আলাপ চলে ওদের! কখনো হাসে, কখনো হাসি চাপতে গিয়ে ভুরু কুঁচকে ওঠে।

সিজভ বলে:

'যত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে।'

মা কিন্তু পুরোপুরি সায় দিতে পারে না। মা বুঝতে পারে, সবাইকে

নির্বিচারে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় লোকটা। পাভেলের কথা বলতে বলতে শুরু করে ফিওদরের কথা, তার কথা শেষ হতেই এল বুকিন। যেন সব্বাইকে ভালো করে গুছিয়ে-গাছিয়ে এক বস্তায় গাদা করছে উকিল সাহেব। কিন্তু কথার মানে যাই হোক না কেন, তার জন্য মায়ের কিছুই এসে যায় না। এখনও মনের মধ্যে ভয় — সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে। সেই সাংঘাতিকেরই তালাশ করে মা সরকারী উকিলের বক্তৃতার অন্তরালে, লোকটার মুখে, চোখে, গলার স্বরে, তার গৌর-বরণ হাতখানার ছন্দোবদ্ধ আস্ফালনে কী যেন একটা আছে। গা-বুক ছম্ ছম্ করে। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কিসের ভয়।

বিচারকদের দিকে চেয়ে দেখে। বক্তৃতাটা যে একঘেয়ে লাগছে ওদের তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই নির্জীব ফ্যাকাশে, পাঁশুটে মুখগুলোতে কোনও ভাবের বিকার নেই। সরকারী উকিলের কথা ঘরের হাওয়ায় এক অদৃশ্য কুয়াশার জাল বোনে, ঔদাস্য আর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার মেঘে ঘিরে ফেলে বিচারকদের। খাড়া, কাঠের মতো হয়ে বসে আছে প্রধান বিচারক — যেন জমে গেছে। চশমার পেছনকার ধূসর রঙের ফুট্‌কিগুলো থেকে থেকে সারা মুখখানার বর্ণহীনতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়।

এই নিষ্প্রাণ ঔদাস্য, হৃদয়হীন বৈরাগ্য দেখে মা অবাক হয়ে নিজেকে শুধয়:

"রায় দিচ্ছে নাকি ওরা?"

নিজের প্রশ্নেই মনটা ওর কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যায়। যে-ভয়ংকরের পথ চেয়ে বসেছিল মা, সেই পথ-চাওয়াটুকুর সমস্ত আশঙ্কা ম্লান হয়ে যায় — বুকের মধ্যে তীব্র অপমানের ঘা দগ্‌দগ্‌ করতে থাকে।

সরকারী উকিলের বক্তৃতা হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। শেষ কথাকটার জাল তাড়াতাড়ি বুনে ফেলে, মাথা নীচু করে বিচারকদের অভিবাদন করে হাত ঘষতে ঘষতে বসে পড়ে ভদ্রলোক। মার্শাল চোখ বিস্ফারিত করে নমস্কার করে, নগরপাল যেন করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়; আর জেলাশাসক শুধু নিজের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

কিন্তু বিচারকেরা নিশ্চল হয়ে একভাবেই বসে রইল। চেহারা দেখে মনে হয় বক্তৃতায় তারা খুশি হয়নি।

মুখের সামনে একটা কাগজ নিয়ে বৃদ্ধ বলে, 'এখন আসামী

ফেদসেয়েভ, মারকভ, জাগারভের পক্ষের কৌঁসুলীর সওয়াল-জবাব শুরু হবে।'

উকিল উঠে দাঁড়ায়। সেই নিকলাইয়ের ওখানে যাকে দেখেছিল মা। চওড়া গড়নের অমায়িক মুখ। ছোট ছোট চোখে হাসি লেগে আছে। লালচে ভ্রূ-জোড়ার নিচ থেকে ঝক্ঝকে ধারাল দু'খানা কাঁচির ফলা যেন হাওয়া কেটে চলেছে। স্বর একটু উঁচু, কথা স্পষ্ট ধীর, তবু মা ভাল করে শুনতে পায় না, কারণ সিজভ কানে কানে বলে চলে: 'বুঝতে পারছ, কী বলছে? শোন শোন, বলছে, আসামীরা এত বিচলিত হয়েছিল যে ওদের মাথার ঠিক ছিল না। য়্যাঁ, আমার ফিওদরের কথা বলছে নাকি?'

মা কথা বলতে পারে না। নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে। অপমান, অন্যায় করা হচ্ছে মনে হয়। এই অনুভূতিটা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠে বুকের উপর একটা বোঝার মতো চেপে বসে। এতক্ষণে বুঝতে পারে, ন্যায় বিচারের জন্য কেন তার মন ব্যাকুল হয়েছিল। ভেবেছিল, নিক্তির ওজনে খোলাখুলি যাচাই হয়ে যাবে কোন্ দিক বেশি ভারি; তার ছেলের দিক, না তার ছেলেকে যারা অভিযুক্ত করেছে তাদের দিক! আশা করেছিল অনেকক্ষণ ধরে চুলচেরা জেরা করবে জজেরা, ওর কথা মন দিয়ে শুনবে। তাদের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে পাভেলের উদ্দেশ্য, আদর্শ, মনের কথা সব উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। সত্যকে দেখতে ওরা ভুল করবে না। এবং ন্যায়ের মর্যাদা রেখে খোলা আদালতে ঘোষণা করে যাবে — এই মানুষ সত্য কথা বলেছে।

কিন্তু কই! সেসব তো কিছুই হল না! বিচারের কাঠগড়ায় এসে যারা দাঁড়িয়েছে তারা যেন বড্ড দূরে। অত দূরে জজেদের দৃষ্টি পেঁছিয় না। আর জজেদের কাছেও ছেলেগুলোর কোন দরকার নেই। মায়ের ভেতরটা ক্লান্তিতে অবশ হয়ে যায়। মামলা শোনবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই আর। নিজের মনে হাহাকার করে:

"এর নাম বিচার!"

'ঠিক বলেছ!' সায় দেয় সিজভ।

আর একজন উকিল উঠে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ণ, পাণ্ডুর মুখে শাণিত ব্যঙ্গ। বারে বারে বিচারকেরা ওর কথার মাঝখানে বাধা দেয়।

সরকারী উকিল লাফিয়ে উঠে সক্রোধে তাড়াতাড়ি কি যেন বলে

বিবরণীর বিষয়ে। বৃদ্ধ বিচারপতি আসামীপক্ষের উকিলকে বুঝিয়ে বলে। মাথা নীচু করে সসম্মানে শুনে আবার আরম্ভ করে উকিলটি।

সিজভ বলে, 'খোঁড়ো বাবা। সব ঠিকঠাক করে দেখিয়ে দাও...'

একটা উত্তেজনার হাওয়া যেন সরসরিয়ে বয়ে যায়, বিরোধী শক্তি ঝকমক করে। উকিলের ধারাল কথার ঘায়ে জজেদের তিনকেলে পুরু গণ্ডারের চামড়া জর্জরিত হয়ে ওঠে। ওর বাক্য-বাণের আঘাত এড়াবার জন্য তারা যেন গোমড়া মুখে ফুলে উঠে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে।

এরপর পাভেল উঠে দাঁড়ায়। নিমেষে সব স্তব্ধ হয়ে যায়। মায়ের সমস্ত দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতি ধীর শান্ত-স্বরে আরম্ভ করে পাভেল :

'পার্টির সভ্য হিসেবে আমি শুধু আমাদের পার্টির রায়ই মানি। সুতরাং আমি আত্মসমর্থন করব না। আমারই মতো আমার কমরেডরাও আত্মসমর্থন করতে অস্বীকার করেছেন। কয়েকটি জিনিস আপনারা বোঝেননি, তাঁদেরই অনুরোধে আমি তা বুঝিয়ে দেবার জন্য এখানে এসে দাঁড়িয়েছি আজ। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসীর পতাকার তলায় আমরা যে মিছিল বের করেছিলাম, সরকারী উকিলমশায় তাকে আখ্যা দিয়েছেন রাজ-বিদ্রোহ বলে। এবং বরাবর তিনি এই ধারণাই পোষণ করে এসেছেন যে আমাদের এই আন্দোলন জারের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সকলকে এই কথাই জানিয়ে দিতে চাই যে — শুধুমাত্র জারতন্ত্রের শেকলেই আমাদের দেশ বাঁধা আছে বলে আমরা মনে করি না। তবু সেটাই হল প্রথম এবং প্রত্যক্ষ শেকল এবং এ বন্ধন থেকে জনগণকে মুক্ত করা আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি...'

দৃপ্ত, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। স্তব্ধতা গাঢ় হয়ে ওঠে। আদালত ঘরের দেয়ালগুলি যেন সরে যায়। বহু দূরে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভাস্বর দীপ্যমান মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে পাভেল।

জজেরা চেয়ারে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নড়ে চড়ে বসে। মার্শাল কুঁড়ে-দেখতে জজের কানে কানে কী যেন বলে; সেটা শুনে সে সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে বুড়ো জজের দিকে মুখ ফেরায়। তখন অন্য দিক থেকে রোগা জজ বুড়োর কানে কী একটা ফিসফিস করে বলে। চেয়ারে বসে বুড়ো জজ এদিক ওদিক দোল খেতে খেতে আবার কি যেন বলে পাভেলকে। কিন্তু পাভেলের নিরুত্তেজিত স্থির গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের ধারায় তা ডুবে যায়।

'আমরা সমাজতন্ত্রী। তার মানে আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী। এই ব্যক্তিগত মালিকানা আছে বলেই সমাজ ভেঙে পড়ছে, মানুষে মানুষে চলছে হানাহানি আর অবিরাম স্বার্থ-সংঘাত। এই শত্রুতা চাপা দেবার জন্য কিম্বা এরই সমর্থনে ব্যক্তিগত মালিকানা মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর মানুষকে টেনে নামায় প্রতারণা ভন্ডামি আর বিদ্বেষের পাঁকে। আমরা বলি, যে-সমাজ শুধু স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় হিসেবে মানুষকে ব্যবহার করে, সে-সমাজ বর্বরের সমাজ এবং জনতার স্বার্থ-বিরোধী। তার মিথ্যা আর দু'মুখো নৈতিকতাকে আমরা কখনই স্বীকার করে নিতে পারি না। মানুষকে এ-সমাজ বেহায়া চোখে দেখে, এবং মানুষের প্রতি তার আচরণও নির্মম। আমাদের পক্ষে এটা ন্যক্কারজনক। এ রকম সমাজ-ব্যবস্থার দৌলতেই দৈহিক, নৈতিক যত রকম দাসত্ব সব চেপে বসে আছে মানুষের ওপর। স্বার্থপর লোভী মানুষের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যত রকম শোষণ-ব্যবস্থা আছে, তারি বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে চাই আর করব। আমরা শ্রমিক — শিশুর খেলনা থেকে আরম্ভ করে, বড় বড় কলকারখানা, সব আমাদেরি মেহনতে তৈরী। অথচ মানুষ হিসেবে আমাদের কোন মূল্য নেই। মানুষের অধিকারটুকু রক্ষা করার ক্ষমতা থেকেও আমরা বঞ্চিত। যার খুশি নিজের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করতে পারে। সমস্ত ক্ষমতাই একদিন যাতে আমাদের নিজেদের হাতে আসে সেজন্য যতখানি স্বাধীনতা প্রয়োজন, বর্তমানে সেইটুকু স্বাধীনতাই আমরা চাই। আমাদের স্লোগান খুবই সহজ: "ব্যক্তিগত মালিকানা দূর হোক, উৎপাদনের সমস্ত উপায় আসা চাই শ্রমিকের হাতে, জনতার হাতে ক্ষমতা চাই, সবাইকে খেটে খেতে হবে"। দেখতে পাচ্ছেন আমরা বিদ্রোহী নই।'

অল্প একটু হাসে পাভেল। ধীরে ধীরে মাথার চুলে হাত বুলোয়। ওর নীল চোখের জ্যোতি দীপ্ততর হয়ে জ্বলে।

সভাপতির উচ্চ স্পষ্ট কণ্ঠ শোনা যায়, 'বিষয়ের বাইরে কথা বলবেন না!' ফিরে পাভেলের দিকে তাকায় বৃদ্ধ — মা'র মনে হয় ওর নিষ্প্রভ বাঁ চোখটায় একটা লুব্ধ হিংস্র আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। প্রত্যেক বিচারক তাকিয়ে আছে ওর ছেলের দিকে — ওতো তাকিয়ে থাকা নয়, দৃষ্টি যেন বিঁধে আছে ওর মুখে গায়ে, ওর সমস্ত রক্ত যেন শোষণ করে নিতে চায়। ওর রক্ত পান করে নিজেদের ক্ষয়ে-যাওয়া দেহগুলোকে

ঝালিয়ে নিতে চায়। কিন্তু উন্নত সোজা হয়ে দৃঢ় শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাভেল। ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে শান্ত স্পষ্ট স্বরে বলে চলেছে:

'আমরা বিপ্লবী। একদল শুধু কর্তৃত্ব করে যাবে, আর একদল খেটে যাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে — যতদিন এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে ততদিন এ-ই আমাদের ভূমিকা। যে-সমাজ-ব্যবস্থাকে আগ্‌লাবার চাপরাশ পেয়েছেন আপনারা, সেই সমাজের আর আপনাদের চিরশত্রু আমরা। আমাদের আপোশহীন লড়াই চলবে যতদিন না আমরা চূড়ান্ত জয়লাভ করি। মাঝামাঝি কোনো রফা সম্ভব নয়। এবং জেনে রাখুন — মেহনতী জনতারই জয় হবে। আপনারা যতটা মনে করেন ততটা জোর নেই, আপনাদের কর্তাদের। হাতের মুঠোয় তাদের লাখো লাখো মানুষ আছে — নিজেদের ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করার ও তাকে বজায় রাখার চেষ্টায় লাখো জান বিকিয়ে দেয় তারা। কিন্তু যে-ক্ষমতায় তারা আমাদের দাবিয়ে রাখে সেই ক্ষমতাই আবার তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়। ওতেই তারা মরে। দেহেও মরে, নৈতিক মৃত্যুও হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার খরচ বড় বেশি! সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনারা মালিকরা আমাদের চেয়ে আরো বেশি বাঁধা। আপনাদের দাসত্ব আরও বেশি। আমাদের দাসত্ব শুধু দৈহিক। আপনাদের দাসত্ব মনের, চিন্তারও। নানা রকম কুসংস্কার আর অভ্যাসের ফাঁস লেগে আপনাদের আত্মার মৃত্যু ঘটেছে। ওই ফাঁস থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা আপনাদের নেই। কিন্তু আমাদের আত্মা মুক্ত। তাকে বাঁধতে পারে এমন সাধ্য কার? প্রতিদিন বিষ খাওয়াচ্ছেন আমাদের। কিন্তু আপনাদেরই অজান্তে প্রতিদিন বিষের সঙ্গে তার প্রতিষেধকও দিচ্ছেন। বিষের চেয়ে অনেক বেশি তেজ তার। অপ্রতিহতভাবে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমাদের সচেতনতা বেড়ে চলছে। আপনাদের সমাজেরও সেরা সেরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান চরিত্রবান সবাই এদিকে আসছেন। এই দেখুন না কেন, আপনাদের মধ্যে স্রেফ নৈতিক সমর্থনটুকু করবার মতো মানুষও আপনারা খুঁজে পাবেন না। যে ঐতিহাসিক ন্যায়ের দাবী উঠেছে আজ আকাশে বাতাসে, তার নিদারুণ চাপ থেকে আত্মরক্ষা করার মতো কোন যুক্তি নেই আপনাদের ভাণ্ডারে। সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। মতাদর্শগত ক্ষেত্রে নতুন কিছু সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতাও আপনাদের নেই। আপনাদের ভেতর ফাঁকা। কিন্তু আমাদের দেখুন! নতুন নতুন চিন্তাধারা, নতুন নতুন আদর্শ জনতার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে

প্রতিদিন বেড়ে চলছে, বাড়ছে তার তেজ, বাড়ছে দীপ্তি। তাইতো দিকে দিকে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে উঠছে। শ্রমিকরা জানে তাদের ভূমিকা কত মহান। তা জেনেই তো সারা দুনিয়ার শ্রমিক এক হয়ে হাত মেলাচ্ছে। কি বিরাট সে প্রক্রিয়া! পৃথিবীর বুকে পুনরুজ্জীবন ঘটাচ্ছে ওরাই। কোন শক্তি দিয়ে ঠেকাবেন এই যৌবন-জল-তরঙ্গকে? আপনাদের আছে শুধু নিষ্ঠুরতা আর নির্লজ্জতা। কিন্তু ও আর কদিন! নির্লজ্জতা অতি সহজেই প্রকট হয়ে পড়ে, নিষ্ঠুরতাও মানুষকে শুধু খেপিয়ে তোলে। আজ যে-হাত আমাদের টুঁটি চেপে ধরছে, শীগ্‌গিরই সে-হাতই এসে আমাদের হাত ধরবে বন্ধু বলে। আপনাদের শক্তি তো যান্ত্রিক শক্তি, শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি সোনার তাল জমাবার শক্তি। ফলে আপনারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি করবেন। কিন্তু আমাদের তা নয়। আমরা জানি দুনিয়ার মজদুর সব এক। এই বর্ধমান সচেতনতার সজীব শক্তিই দেয় আমাদের তেজ। আপনারা যা করেন, মানুষকে শুধু দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধবার জন্যই — কাজেই তা হচ্ছে অপরাধ, পাপ। আপনাদের লোভ, মিথ্যা আর ক্রোধ দিয়ে আপনারা এক দানবের দুনিয়া তৈরী করে রেখেছেন মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য। তা থেকে মানুষকে মুক্ত করা আমাদের কাজ। জীবনের মূল ছিন্ন করে দিয়ে আপনারা মানুষকে খতম করেছেন। আপনাদের ধ্বংস-করা পৃথিবীটাকে সমাজতন্ত্র নতুন করে গড়ে তুলবে এক অখণ্ড মহান রূপে। এ হবেই হবে।'

এক সেকেণ্ড একটু থেমে পাভেল আরো নীচু বলিষ্ঠ কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে:

'এ হবেই হবে!'

পাভেলের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বিচারকেরা নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করে ফিস্‌ফিস্ করে। অদ্ভুত মুখভঙ্গি! মায়ের মনে হয় পাভেলের বলিষ্ঠ, সুস্থ দেহটা, ওর অমিত শক্তি আর রসপ্রাচুর্য দেখে যেন হিংসেয় জ্বলছে বিচারকেরা। তাদের আবিল দৃষ্টির স্পর্শে তার ছেলের দেহটা যেন কলুষিত হয়ে উঠছে। নিবিষ্ট চিত্তে পাভেলের বক্তৃতা শুনছে বন্দীরা — তাদের ছায়া-পাণ্ডুর মুখে চোখগুলি সুখে ঝলমল করছে। গণ্ডূষ ভরে ভরে মা ছেলের কথা যেন পান করে। কথাগুলো সার-বেঁধে মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যায়। বৃদ্ধ প্রধান

বিচারপতি কথার মাঝে কয়েকবার বাধা দিয়ে পরিষ্কার করে বুঝে নিতে চেয়েছে এটা সেটা। একবার মুখে একটু বিষাদের হাসিও ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকবার থেমেছে পাভেল, কিন্তু ছন্দ-পতন হয়নি। ওর বলার প্রশান্ত দৃঢ় কঠোর ভঙ্গি জনতাকে ওর দিকে টেনে এনেছে, না শুনে তারা থাকতে পারেনি; বিচারকদের ইচ্ছাশক্তিকে ওর ইচ্ছাশক্তির তলায় নত করেছে। কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধ চীৎকার করে সোজা হয়ে উঠে বসল হাত বাড়িয়ে। পাভেলের কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপ ফুটে উঠল:

'এই শেষ হয়ে এল বলে। ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের অপমান করার আমার কোন ইচ্ছে নেই। বরঞ্চ এখানে বসে বসে বিচারের নামে আপনাদের এই প্রহসন ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে দেখতে হচ্ছে বলেই সত্যি আপনাদের জন্য আমার মায়া হচ্ছে বলতে পারি। শত হলেও মানুষ আপনারা। যেই হোক না কেন, শত্রু হলেও অত্যাচারের দাসত্বে এমনি লজ্জাকরভাবে নিজেকে ধুলোয় নামিয়ে আনা, মানুষের মর্যাদা-বোধটুকুকেও খুইয়ে এমনিভাবে দেউলে হয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমাদের মনে লাগে...'

বসে পড়ে পাভেল, বিচারকদের দিকে একবারও তাকায় না। মা রুদ্ধ নিশ্বাসে একমনে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

আন্দ্রেই পাভেলের হাত সজোরে চেপে ধরে; ওর চোখ থেকে যেন আলো উছলে পড়ে। সাময়লভ, মাজিন, সবাই ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে। বন্ধুদের এই সপ্রশংস উৎসাহে বিব্রতভাবে হাসে পাভেল। মায়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। ওর মূক দৃষ্টি যেন শুধয়:

"ঠিক আছে তো?"

মায়ের উদ্বেলিত-স্নেহোদ্দীপ্ত মুখে, বুকভরা সুখের নিশ্বাসে প্রশ্নের উত্তর লেখা পড়ে।

সিজভ বলে, 'এবারে আসল মামলা শুরু হল। কী রকম দেখিয়ে দিয়েছে ওদেরকে, অ্যাঁ?'

কথা বলে না, শুধু মাথা নাড়ে মা। এমন নির্ভীকভাবে কথা বলেছে ছেলে, সুখে মা গদ্‌গদ — কথা যে শেষ হয়েছে তাতে হয়তো আরো সুখী। একটা প্রশ্নই শুধু মনের মধ্যে বাজতে থাকে:

"কী করবে ওরা এখন?"

কিছুই নতুন কথা বলেনি ছেলে। যা বলেছে তা ওর কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু আজ এই এজলাসে দাঁড়িয়ে ছেলের আদর্শের প্রতি একটা অদ্ভুত সাগ্রহ আকর্ষণ অনুভব করে মা। এ অনুভূতি আজই প্রথম। পাভেল স্থির সংযত। ছেলের লক্ষ্য আর তার চূড়ান্ত বিজয়ে মায়ের প্রাণের একান্ত বিশ্বাস যেন জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র হয়ে জ্বলতে থাকে তার কথাগুলোর মধ্যে। মা আশা করেছিল পাভেলের সঙ্গে ভারি তর্কযুদ্ধ হবে এবারে বিচারকদের। তারা নানা ওজর আপত্তি তুলে নিজেদের বিশ্বাস জাহির করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কোথায় কী? হঠাৎ আন্দ্রেই উঠে দাঁড়ায়। ওর দেহটা একটু দুলে ওঠে। ভুরু নামিয়ে বিচারকদের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে:

'প্রতিবাদী পক্ষের ভদ্রমহোদয়গণ...'

'আমরা বিচারক, প্রতিবাদী পক্ষ নই!' পাণ্ডুর মুখ বিচারক রেগে চীৎকার করে বলে। মা লক্ষ্য করে আন্দ্রেইয়ের মুখে দুষ্টুমির হাসি খেলছে; ওর গোঁফগুলি কাঁপছে, আর বেড়ালের চোখের মতো সকৌতুকে জ্বল জ্বল করছে ওর চোখ। এ চেহারা তার খুব চেনা। লম্বা হাতটা দিয়ে মাথাটাকে খুব ঘষে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আন্দ্রেই বলে:

'তাই নাকি? তা আপনারাই যে বিচারক তাতো বুঝতে পারিনি। আমি তো ভেবেছি আপনারা প্রতিবাদী পক্ষ...'

'কাজের কথা বলুন!' শুকনো গলায় হেঁকে উঠল প্রধান।

'কাজের কথা? বেশ বেশ! ইতিমধ্যেই নিজেকে ভাবতে বাধ্য করেছি যে, আপনারা বিচারক! মহা সম্মানীয় স্বাধীনচেতা...'

'আদালত আপনার সুপারিশ চায় না!'

'তাই নাকি? বেশ বেশ! তাহলে বক্তব্যই বলি... আচ্ছা আপনারা তাহলে "আপন" "পর" এসব তফাৎ ফারাক করেন না, আপনারা হলেন স্বাধীন লোক, কেমন? আচ্ছা তাহলে এই ধরুন — আপনাদের সামনে দু'জন লোককে নিয়ে এল। একপক্ষের নালিশ, দ্বিতীয় জন তার সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে ঠেঙ্গিয়ে তুলো ধুনে দিয়েছে। আর অপরপক্ষ তাল ঠুকে বলছে — আলবৎ করব। আলবৎ কেড়ে খাব। হাতে বন্দুক আছে, কেন করব না...'

বৃদ্ধ গলা উঁচিয়ে বলে, 'আসল বিষয়ের ওপর কথা বলবেন নাকি?' হাত কাঁপছে বৃদ্ধের। বোঝা যায় রেগে গেছে। মা খুব খুশি। কিন্তু আন্দ্রেইয়ের ধরন ওর ভালো লাগে না। ছেলের জবানবন্দীর পর এসব হালকা কথা খাপ খায় না। চায় একটা গম্ভীর কঠোর বিতর্ক হক।

খখল থেমে বৃদ্ধের দিকে তাকায়। কপালটা ঘসে নিয়ে বলে গম্ভীর ভাবে:

'কাজের কথা বলতে বলছেন! সে আপনার সঙ্গে আর কী নিয়ে বলব? জানবার যা-কিছু আমার বন্ধুই তো তা বলেছে। যা বাকী আছে তা অন্যরা বলবে সময় মতো...'

বৃদ্ধ চেয়ারের থেকে একটু উঠে হাঁকল:

'ব্যস্ চুপ্! আচ্ছা, এবার গ্রিগরি সাময়লভ!'

ঠোঁট চেপে অলসভাবে বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে খখল। সাময়লভ পাশে দাঁড়িয়ে কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে বলে:

'সরকারী উকিল আমার কমরেডদের বর্বর বলেছেন, বলেছেন তাঁরা নাকি সভ্যতার শত্রু...'

'আবার! শুধু আপনার নিজের মামলা সম্পর্কে যা বলার বলুন।'

'সেই সম্পর্কেই তো বলছি। খাঁটি লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোন কথা আছে নাকি? আর দেখুন, দয়া করে কথার মধ্যে অমন বাধা দেবেন না। আচ্ছা, বলুন তো দেখি — আপনাদের সভ্যতা জিনিসটা কী?'

'আপনাদের সঙ্গে তর্ক করতে বসিনি আমরা। কাজের কথায় আসুন এখন।' দাঁত খিঁচিয়ে বৃদ্ধ বলে।

আন্দ্রেইয়ের কথার ধরনটা বিচারকদের মধ্যে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাদের ওপর থেকে একটা খোলস যেন খসে পড়েছে। ধূসর মুখগুলো লাল দাগড়া দাগড়া হয়ে উঠেছে। চোখে জ্বলছে শীতল সবুজ আগুনের ফুলকি। পাভেলের কথায় ওদের বিরক্তি লাগলেও কথার মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে পাভেলকে শ্রদ্ধা না করে পারেনি এবং মনে যত বিরক্তিই থাক, বাইরে তা প্রকাশ করেনি। খখল ওদের এই সংযমের খোলস ছিঁড়ে ফেলে চাপা-দেওয়া সত্য স্বরূপটা টেনে বের করে এনেছে। বিচারকের দল চঞ্চল হয়ে অদ্ভুত ভাবে মুখ বিকৃত করে কী যেন কানাকানি করে।

'আপনারা শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষগুলোকে স্পাই বানিয়ে তুলছেন,

সববয়সের মেয়েদের কুপথে টেনে আনছেন; চোর ডাকাত খুনীর অবস্থায় ফেলে দিচ্ছেন মানুষকে, ভদ্‌কা খাইয়ে তাদের বিষিয়ে দিচ্ছেন—জগৎজোড়া জবাই, মিথ্যা, দুর্নীতি আর বর্বরতা, এই হল আপনাদের সভ্যতা! হ্যাঁ, এরকম সভ্যতার আমরা শত্রুই বটে!'

বৃদ্ধ বিচারপতি থুতনি নাচিয়ে চীৎকার করে ওঠে, 'আমি আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি...' কিন্তু বৃদ্ধের কণ্ঠ ডুবিয়ে লালমুখ, উজ্জ্বল-চোখ সাময়লভের জবাব আসে:

'আমরা কিন্তু সেই সভ্যতাকে মানি, শুধু মানি না, পুজো করি, যে-সভ্যতার স্রষ্টারা আপনাদের কৃপায় জেলে তিল তিল করে পচে গলে মরেছেন, পাগল হয়ে গিয়েছেন...'

'ব্যস চুপ্‌! ফিওদর মাজিন!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছোট্ট ফিওদর যেন হঠাৎ একটা ছুঁচ বেরিয়ে এল।

'আমি... শপথ করে বলছি! রায় তো আপনাদের জানিই...'

হাঁপায় ফিওদর। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। শুধু চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে:

'তবে দিব্যি গেলে বলছি, যেখানেই ঠেলে দিন না কেন, যেমন করেই হোক সেখান থেকে পালাবই। পালিয়ে এসে যতদিন বেঁচে থাকব কাজ করে যাব!'

সিজভ জোরে জোরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে থাকে, চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিপুল উত্তেজনার তরঙ্গ জনতার মধ্যে অদ্ভুত একটা চাপা গুঞ্জন তোলে। একজন স্ত্রীলোক ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, আর একজন বেদম কাশতে আরম্ভ করে। সশস্ত্র পুলিশেরা নির্বোধ বিস্ময়ে তাকায় বন্দীদের দিকে, আর আগুন চোখে তাকায় জনতার দিকে। বিচারকরা চেয়ারে বসে দোলে। বৃদ্ধ তীক্ষ্ণভাবে চেঁচিয়ে ওঠে:

'ইভান গুসেভ!'

'কিছুই বলব না।'

'ভাসিলি গুসেভ!'

'বলব না।'

'ফিওদর বুকিন!'

অত্যন্ত কষ্টে উঠে দাঁড়ায় সে — সাদাটে চেহারা, যেন সবখানি রং নিংড়ে নিয়ে গেছে কে। মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বলে:

'লজ্জা করে না আপনাদের! আমি মুখ্যু, মন ভারি আমার, কিন্তু আমিও সত্য বুঝি!' মাথার ওপর হাত তুলে যেন বহু দূরের কিছু দেখছে এমনি ভাবে আধবোজা চোখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বুকিন।

চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বিচারপতি। বিরক্তি-মেশা বিস্ময়ে বলে ওঠে:

'ও আবার কী?'

'কী আবার? যাও...'

বেজার মুখে বসে পড়ে বুকিন। ওর ওই কাটাকাটা কথাগুলো অভাবনীয় গুরুত্বে যেন গমগম করে। কি এক অকপট সারল্য, আর মর্মস্পর্শী তিরস্কার তার মধ্যে। প্রত্যেকটি মানুষের অনুভূতিকে গিয়ে স্পর্শ করে। এমন কি বিচারকরাও কান খাড়া করে — যদি কোন দিক থেকে একটু প্রতিধ্বনি এসে বুকিনের কথাগুলো খোলসা করে দেয়। দর্শকদের কারো মুখে কথা নেই, ওরা যেন জমাট বেঁধে গেছে, এমনি নিস্তব্ধতা। শুধু কার চাপা কান্নার শব্দ দুলছে হাওয়ায়। অবশেষে সরকারী উকিল ঘাড় ঝাঁকিয়ে ফিক করে একটু হাসে; মার্শাল কাশে, তার পর সারা এজলাস ঘরে উত্তেজিত ফিসফিসানির ঢেউ ওঠে।

মা সিজভের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে:

'জজেরা বলবেন নাকি কিছু?'

'মামলা তো শেষ... রায়টাই...'

'ব্যস্? আর কিচ্ছু নেই?'

'হ্যাঁ...'

বিশ্বাস হতে চায় না মায়ের।

সাময়লভের মা চঞ্চল হয়ে ওঠা-বসা করে, আর কনুই দিয়ে বারে বারে মাকে ধাক্কা দেয়। স্বামীকে আস্তে আস্তে বলে:

'হাঁগা? এ কি করে সম্ভব?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ — সম্ভব।'

'তাহলে আমাদের গ্রিশার কী হবে?'

'আঃ, মুখ বন্ধ করে বস তো!'

সকলের চেতনায় গিয়ে ধাক্কা লাগে। একটা অনাচার অবিচারের অনুভূতি — কোথায় যেন কী বিচ্যুতি ঘটেছে, কী ভেঙে চুরে ছত্রখান হয়ে গেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কী একটা উজ্জ্বল বস্তু চোখের সামনে

ছিল। তার দীপ্তিটাই দেখতে পাচ্ছে, তবু জিনিসটার আকার বা অর্থ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। না বুঝে চোখ মিট্‌মিট্‌ করছে সবাই, কিন্তু জিনিসটার দুর্বার আকর্ষণ-শক্তি অনুভব করে পুরোপুরি। কত বড় সত্য যে চোখের পলকে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল সবার সামনে তা উপলব্ধি করতে পারেনি বলেই খুঁটিনাটি ব্যাপার যেটুকু ওরা বুঝেছে, তাতেই নতুন অনুভূতিটা ব্যয় করছে।

'দেখুন!' অসংকোচে বলে বুড়ো বুকিন, 'ওদের বলতে দিলে না কেন শুনি? সরকারী উকিলের বেলায় পোয়াবারো। যত ইচ্ছে বলতে পারে। সে বেলায় কিছু না...'

একজন আমলা দাঁড়িয়েছিল বেঞ্চিগুলোর কাছে। হাত নেড়ে নিচু গলায় বলে:

'চুপ্‌! চুপ...'

সাময়লভ স্ত্রীর পেছনে মাথাটা বাড়িয়ে গজগজ করে:

'আচ্ছা ধরেই নেওয়া যাক ওরা অপরাধী, কিন্তু নিজেদের কথা বুঝিয়ে বলবার একটা সুযোগ দেবে তো! কিসের বিরুদ্ধে ওরা চলেছে বুঝিয়ে বলো তো হে বাপু! আমি বুঝতে চাই! এ ব্যাপারে আমারও তো খানিকটা স্বার্থ আছে...'

সাময়লভের দিকে তর্জনী শাসিয়ে চীৎকার করে বলে আমলা, 'চুপ্‌!'

সিজভ গোমড়া মুখে মাথা নাড়ে।

বিচারকেরা চাপা স্বরে কথা বলে নিজেদের মধ্যে। মা ওদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ক্রমশ ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওদের ঠাণ্ডা, পিচ্ছিল স্বরের ঝাপটা যেন এসে লাগে মায়ের মুখে। গাল দুটো কাঁপতে থাকে, মুখে কেমন এক বিশ্রী পচা স্বাদ। কেন জানি না মায়ের মনে হয় — ওর ছেলে আর তার সঙ্গীসাথীদের টগ্‌বগে রক্তে ভরা বলিষ্ঠ জীবন্ত দেহগুলোর ওপরই যেন হাকিমদের চোখ — সেই কথারই আলাপ চলছে যেন ওদের মধ্যে। হিংসেয় মরছে ওরা—অসুস্থের হিংসা, ফুরিয়ে-যাওয়া মানুষের ক্লেদাক্ত লোভ, ভিখারীর ক্ষুদ্র ঈর্ষা নিয়ে ক্ষুব্ধ মনে বসে বসে ঠোঁট চাটছে ওরা। বুঝিবা দুঃখ হচ্ছে — অকেজো হয়ে যাবে এই শক্তিধর সৃষ্টিধর সুন্দর দেহগুলি। ওরা মেহনত করতে পারে, আনতে পারে কুবেরের ধন লুটে, ভোগ করতে পারে, কিন্তু আজ ওদের কাজ ফুরিয়েছে, ওদের শাসন, শোষণ করার জো রইল না। সেই জন্যই

এই জোয়ান ছেলেগুলোকে দেখে হাকিমদের অত রাগ, অত জ্বালা। ভেতরটা যেন দাঁত বসিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে। সামনে তাজা রক্ত দেখলে বুড়ো জানোয়ারের যেমন হয়: ভোগের বস্তু হাতে এসে খোয়া গেল — ধরবার মতো তাকত নেই, পরের শক্তি উপভোগ করার মতো ক্ষমতা আর নেই। তাই খেদের সঙ্গে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, একঘেয়ে ভাবে গোঙাচ্ছে এই দেখে যে, তৃপ্তির উৎস চলে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে।

অদ্ভুত রূঢ় চিন্তা। কিন্তু বিচারকদের মুখের দিকে যতই চায় মা, ততই আরো স্পষ্ট উজ্জ্বল আকার নেয় এই কথাগুলো। একদা বহু রক্ত পান করেছে এই হিংস্র জানোয়ারের দল। আজ ওরা অক্ষম, উপোসী; মনে হল উপোসী হিংস্রতার নগ্ন লোলুপতা আর নিষ্ফল ক্রোধ লুকোবার চেষ্টাও করে না ওরা। নারীর হৃদয়, মায়ের হৃদয়, নিজের আত্মার চাইতেও প্রিয়তর পুত্রের ওই বরবপু, আজ ওই প্রিয়-বস্তুর ওপর দিয়ে গুড়ি মেরে বেড়াচ্ছে এই নিষ্প্রভ চোখগুলোর লালা-সিক্ত ক্লেদাক্ত দৃষ্টি! তার ক্লিন্ন স্পর্শ লাগছে ছেলের বুকে মুখে কাঁধে বাহুতে। ওদের প্রাণ-সমৃদ্ধ তরুণ সজীব দেহের সঙ্গে যেন নিজেদের দেহগুলিকে ঘষে ঘষে ওরা ওদের স্থবির ধমনীর হিম রক্ত-প্রবাহ আর নিষ্ক্রিয় পেশীগুলোকে উষ্ণতায় সঞ্জীবিত করে তুলতে চায়। ভয়ে শিউরে ওঠে মা, — বিদ্বেষের কাঁটার খোঁচায় মরা মানুষগুলো যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে! হাতের মুঠোয় এসেছে কাঁচা প্রাণগুলো, — এখন পরোয়ানা জারী করে ওদের দেহগুলোকে ছিনিয়ে নিতে হবে ওদের কাছ থেকে। মা'র মনে হয়, পাভেল যেন ওদের এই লালা-ক্লিন্ন স্পর্শটা টের পাচ্ছে আর চমকিয়ে চমকিয়ে মা'র দিকে চাইছে।

মায়ের দিকে চায় পাভেল। শান্ত কোমল দৃষ্টি, বুঝি বা একটু ক্লান্ত। মাঝে মাঝে একটু মাথা নাড়ে, একটু হাসে।

এতো শুধু হাসি নয় — এ যে আদর! "দেরী নেই, দেরী নেই আর — মুক্তি আসছে।" বলছে পাভেল ওই হাসির ভাষায়। মায়ের হৃদয়ে যেন কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

হঠাৎ বিচারকেরা সবাই একসঙ্গে উঠে পড়ে। মাও উঠে পড়ে নিজের অজান্তে।

'চলল এবার।' সিজভ বলে।

'রায় দেবার জন্য?' শুধয় মা।

'হুঁ...'

এতক্ষণের মানসিক উত্তেজনা মিলিয়ে গেল মায়ের। ভয়ের একটা গুমট অবসন্নতা আচ্ছন্ন করেছে ওকে। ভুরু কাঁপতে লাগল; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। অপমান আর নৈরাশ্যের প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগল বুকে। আর নিমেষে হাকিম আদালত সকলের বিরুদ্ধে চাপা ঘৃণা হয়ে জ্বলে উঠল সেই আঘাত। মাথাটা তীব্র ব্যথায় দপ্ দপ্ করতে লাগল। কপালটাকে সজোরে ঘষে চোখ তুলে তাকায় মা। বন্দীদের আত্মীয়স্বজন উঠে কাঠগড়ার কাছে গেছে। কথাবার্তার গুন্গুনানিতে ঘর ভরে গেছে। মাও পাভেলের কাছে যায়; ছেলের হাতখানা চেপে ধরে, জলে চোখ ভেসে যায় — আনন্দ ব্যথা ফেটে পড়ছে... বিপরীত এলোমেলো নানা সুরের ভিড় লেগেছে অনুভূতির তারে তারে। পাভেল আদরের কথা বলে মাকে, খখল সেই চিরকেলে হাসিঠাট্টা নিয়ে ঠিক তেমনিই আছে।

মেয়েরা সবাই কাঁদছে — অনেকটা অভ্যেসেই, দুঃখে ততটা নয়। কারণ বিহ্বল হবার মতো অলক্ষ্যে আকস্মিক ভাবে তেমন কোন ভারি আঘাত আসেনি। শুধু অনিবার্য বিচ্ছেদের ব্যথা, কিন্তু আজকের এই মামলার সমস্ত ব্যাপারটা মনের মধ্যে যে রং লাগিয়ে দিয়েছে, তাতে সে দুঃখও খানিকটা মোলায়েম হয়ে গেছে। মা-বাপের মনে পাঁচমিশেলি ভাব। দস্যি ছেলেগুলোকে বিশ্বাস হতে চায় না — শত হলেও মা-বাপ গুরুজন... নিজেদের বিচার-বুদ্ধিকেই বড় মনে হয় — অথচ তার সঙ্গে মিশে আছে যে-ভাবটা তা প্রায় শ্রদ্ধার কাছাকাছি। এদিকে কোথায় কী করে থাকতে হবে ওদের, ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যেতে চায়। অথচ ওই ছেলেরাই কেমন সোজা চেয়ে বুক ফুলিয়ে নির্ভয়ে বলে গেল তারা নতুন দুনিয়া গড়বে, জীবনকে সুখের পথ দেখাবে। তাক্ লেগে যায়। দুঃখ ছাপিয়ে ওঠে বিস্ময়। কিন্তু মনের ভাব মনেই থাকে — ভাষা নেই। ভাষা নেই বলে কথার কাঙ্গাল নয় ওরা। অজস্র কথা কয়। অতি সাধারণ কথা সব — কাপড়-জামা, ধোবা-নাপিত, শরীরের দিকে নজর রাখা, ব্যস্ ওই পর্যন্ত।

বড় বুকিন ছোট ভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে হাত নেড়ে:

'বুঝলে কিনা, ন্যায় চাই, ন্যায়! আর কিচ্ছুটি নয়!'

ছোট বুকিন বলে:

'পাখীকে দেখো...'

'তা আর বলতে!'

সিজভ ভাইপোর হাত ধরে ধীরে ধীরে বলে:

'তাহলে, ফিওদর! যাচ্ছিস্, আমাদের ছেড়ে...'

ঝুঁকে পড়ে কাকার কানে কী যেন বলে ও। চোখে মুখে দুষ্টু হাসি। রক্ষীও হাসে। পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হয়ে এতখানি মুখ করে গলা খাঁকারি দিয়ে দাঁড়ায়।

মাও অন্য মায়েদের মতো ছেলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তার সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু মনের মধ্যে তোলপাড় করে হাজার প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে, সাশার সম্বন্ধে, ছেলের সম্বন্ধে। সব ছাপিয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠে পুত্র-স্নেহ। একটা প্রবল ইচ্ছে হয়, মাকে পাভেলের পছন্দ হক, মা তার আরো কাছাকাছি হক। ভয়ঙ্কর বিচ্ছুর আশঙ্কাটা মরে গেছে। মনের তলায় এখন তার ছায়াটা আছে শুধু, হাকিমদের কথা মনে করলে বুকটা অস্বস্তিকর ভাবে কেঁপে ওঠে। হোক তা। এক বিপুল জ্যোতির্ময় আনন্দ যে জন্ম নিচ্ছে মায়ের ভেতরে সে খবর তার চেতনায় পেঁছে গেছে। এ সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিল না মা — বড় বিব্রত বোধ করে এখন। সকলের সঙ্গেই কথা কয় খখল। মা বোঝে, পাভেলের চাইতেও ওই ছেলেরই স্নেহের বেশি দরকার। তাই ওর দিকে ফিরে বলে মা:

'তোদের এই বিচার ভালো লাগেনি আমার।'

'কেন গো নেন্কো?' কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বলে উঠে খখল, 'বয়স কত? না নেইক গোনা, কিন্তু যেন গো খাঁটি সোনা...'

ইতস্তত করে বলে মা, 'কী এমন হাতী ঘোড়া হল? কার যে ন্যায় আর কার যে অন্যায়, সেটা তো লোকে বুঝতেই পারল না।'

'ওহো, তাই আশা করে বসেছিলেন বুঝি!' আন্দ্রেই গলা তুলে বলে ওঠে, 'সত্যি মিথ্যের জন্য ভারি তো মাথা-ব্যথা ওদের?..'

একটু হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মা:

'ভেবেছিলাম কত সাংঘাতিক ব্যাপারই না জানি হবে...'

'এজলাস চুপ্!'

সবাই তাড়াতাড়ি জায়গায় ফিরে যায়।

প্রধান বিচারক টেবিলের ওপর এক হাতে ভর দিয়ে আর এক হাতে একটা কাগজ মুখের কাছে ধরে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে নিস্তেজ স্বরে:

'রায় পড়ছে,' সিজভ বলে।

শান্ত ঘর। সবাই দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ বিচারকের দিকে তাকিয়ে আছে। তার শুকনো সিধে খাটো মূর্তিটাকে মনে হচ্ছে যেন কোন অদৃশ্য হাতের লাঠি। অন্য বিচারকরাও উঠে দাঁড়িয়েছে। জেলাশাসক ঘাড় কাৎ করে ছাদের দিকে তাকিয়ে, নগরপালের হাত দুটো আড়াআড়ি ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখা; মার্শাল দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে। রোগা বিচারক, হোঁৎকা বিচারক, সরকারী উকিল সকলেই তাকিয়ে আছে আসামীদের দিকে। তাদের পেছনে জারের ছবি। রক্ত-বর্ণের রাজবেশে ঝলমল করছে সে মূর্তি, আনত-দৃষ্টি; ঔদাস্য-ভরা গৌরবর্ণ মুখখানার ওপর দিয়ে একটা পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে।

'যাক বাবাঃ দেশান্তর!' একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে সিজভ। 'যাক বাবা, শেষ তো হল! বলেছিলে তো সশ্রম দণ্ড। তা হোক্‌গে। ভেবো না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'এতো জানাই ছিল।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলে মা।

'যাই হোক, একটা কিছু হেস্তনেস্ত তো হয়ে গেল। এতদিন তো সব কিছুই হতে পারত।' বন্দীদের দিকে ফিরে তাকায় সিজভ। এরই মধ্যে তাদের বের করে নিয়ে চলেছে। উচ্চ স্বরে বলে:

'আসি হে, ফিওদর, আর যারা যারা আছে। বিদায়! ভগবান মঙ্গল করুন।'

মা তার ছেলে আর অন্যদের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নেড়ে বিদায় জানায়। বুক ফেটে কান্না আসতে চায়, কিন্তু লজ্জা করে যে।

২৭

আদালত থেকে বেরিয়ে দেখে রাত হয়ে গেছে। অবাক হয়ে গেল মা। রাস্তায় রাস্তায় বাতি জ্বলেছে। আকাশে জ্বলছে তারা। আদালতের কাছে জটলা করছে দলে দলে মানুষ। হিমেল হাওয়ায় বরফ ভাঙ্গার শব্দ। কতগুলি তরুণ কণ্ঠের স্বর ভেসে আসছে। ধূসর রঙের বাশ্‌লিক্‌* পরা একটা লোক সিজভের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করে:

---

* ঘোমটার মতো মাথার শীতাবরণ, টুপীর ওপরে পরে। — সম্পাঃ

'কী সাজা হল?'

'নির্বাসন!'

'সব্বাইকে?'

'হ্যাঁ!'

'ধন্যবাদ!'

হনহন করে চলে গেল লোকটা।

সিজভ বলে, 'দেখলে তো? জিজ্ঞাসা করছে যে...'

তক্ষুনি জন বারো ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে ধরে। দাঁড়িয়ে পড়ে সিজভ আর মা। প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে ওদের। লোক জমে যায় চারদিকে। কী সাজা হল, আসামীরা কী করল, কে কে বক্তৃতা দিল, কী বলল — খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করে। ওদের স্বরে, ভঙ্গিতে এমনি ব্যগ্র কৌতূহল, এমনি আন্তরিকতা যে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে থাকতে পারা যায় না।

কে একজন অনুচ্চস্বরে বলে ওঠে, 'বন্ধুগণ! এই যে পাভেল ভ্লাসভের মা।' নিমেষে কোলাহল থেমে যায়। কারো মুখে কথা নেই।

'আপনার হাতখানা...'

কার একখানা বলিষ্ঠ হাত এসে মায়ের হাত চেপে ধরে। কার যেন ব্যগ্র কণ্ঠ বলে ওঠে:

'আমাদের সামনে সাহসের আদর্শ হয়ে থাকবে আপনার ছেলে...'

'রুশ শ্রমিক জিন্দাবাদ!' বাতাসের বুক চিরে ধ্বনি ওঠে।

ক্রমশ আরো আরো মানুষের কণ্ঠ এসে মেলে ওই ধ্বনির সঙ্গে; দিকে দিকে ছড়িয়ে যায় সেই নির্ঘোষ। দলে দলে মানুষ চারদিক থেকে ছুটে এসে সিজভ আর মাকে ঘিরে ফেলে। পুলিশের বাঁশি বাজে অস্থির ভাবে, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে জনতার আওয়াজ। সিজভ হাসে। মায়ের কাছে এ যেন সুখস্বপ্ন! হাসি-ভরা মুখে মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ জানায় মা, এগিয়ে আসা হাতগুলি চেপে ধরে। আনন্দাশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। শ্রান্তিতে পা কাঁপে, কিন্তু স্বচ্ছ হ্রদের বুকের মতো কানায় কানায় ভরা চিত্ত সমস্ত ছবি প্রতিফলিত করে তোলে। মায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল কে একজন। অত্যন্ত স্পষ্ট, আবেগময় স্বরে ভীরু কণ্ঠে বলল:

'বন্ধুগণ, যে দানব আমাদের দেশের মানুষকে গিলে গিলে খাচ্ছে, সে আজ আবার তার লোলুপ গ্রাসে চেপে ধরেছে...'

সিজভ বলে, 'চল গো, মা, এখান থেকে!'

কোত্থেকে যেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠল সাশা। মাকে হাতে ধরে রাস্তার ওধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে:

'চলুন চলুন। যদি মারামারি ধরপাকড় শুরু হয়। তারপর কী হল? সাইবেরিয়া?'

'হ্যাঁ!'

'কী রকম বলল? আমি অবশ্য জানি, — খুব জোরাল আর বেশ সহজসরল, অবশ্য কঠোর সংযমও তার সঙ্গে, তাই না? বড় স্পর্শাতুর মানুষ, আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, লজ্জা পায়।'

সাশার প্রাণঢালা কথায় মা যেন শান্তি পায়। নতুন করে বল পায়।

সাশার হাতে সস্নেহে চাপ দিয়ে মা জিজ্ঞাসা করে, 'কবে যাবেন আপনি ওর কাছে?'

'আমার জায়গায় কাজ করবার মতো একজন কাউকে পেলেই চলে যাব।' সামনের দিকে তাকায় সাশা। ওর চোখে দৃঢ় প্রত্যয়। 'আমিও একটা কিছু সাজা পাবার অপেক্ষায় আছি। সম্ভবত আমায়ও সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেবে। তখন ও যেখানে আছে সেখানেই পাঠিয়ে দিতে বলব।'

পেছন থেকে সিজভের গলা শোনা যায়:

'যান যদি, তাকে আমার নমস্কার দেবেন। কিছু বলতে টলতে হবে না, খালি বলবেন সিজভ নমস্কার পাঠিয়েছে, ফিওদর মাজিনের কাকা। ও চেনে আমায়...'

ফিরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় সাশা।

'আমি চিনি ফিওদরকে। আমার নাম আলেক্সান্দ্রা।'

'পিতৃনাম?'

'আমার বাবা নেই।'

'মারা গেছেন?'

'না।' তীব্র উত্তেজিত স্বর। মুখে কী একটা কঠিন একরোখা ভাব। বলে, 'জমিদার মানুষ তিনি, এখন জেলার কর্তা, চাষীদের লুট করেন...'

'হুঁ।' অভিভূত হয়ে সিজভ বলে। তারপর সব চুপচাপ। সাশার পাশে পাশে চলে সিজভ — মাঝে মাঝে ওর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়।

'আচ্ছা, আসি মা,' বলে ও, 'আমি এই বাঁদিকে যাব। আচ্ছা দেবী,

চলি তাহলে, কী কঠোর আপনি বাপের ওপর! অবশ্যি আপনার ব্যাপার আপনিই বুঝবেন...'

সাশা সাগ্রহে বলে ওঠে: 'আচ্ছা! আপনার ছেলে যদি অপদার্থ হয়, লোকের ক্ষতি করে বেড়ায়! ধরুন, তাকে দেখতে পারেন না আপনি। বলবেন না তাহলে?'

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বলে, 'তা হয়ত বলব।'

'তাহলেই তো ছেলেটেলে যেমন তেমন, ন্যায়ই বড় আপনার কাছে। আমার কাছেও তাই। আমার বাবার চাইতে আমার কাছে ন্যায় বড়...'

সিজভ হাসে, মাথা নাড়ে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে:

'ভারি চালাক মেয়ে তো আপনি! তা ওটুকু যদি রাখতে পারেন বুড়োগুলোকে হারিয়ে দিতে পারবেন। দম আছে দেখছি। আচ্ছা, চলি। আপনার মঙ্গল হোক। তবে লোকের সঙ্গে একটু নরম-সরম হলে ক্ষতি নেই — কী বলেন? চলি নিলভনা। পাভেলের সঙ্গে দেখা হলে বলো — আমি তার জবানবন্দী শুনেছি। যদিও সব বুঝতে পারিনি, মধ্যে মধ্যে কিসব বলছিল বাপু, ভয়ে মরি, তবু যা বলেছে মোটামুটি ঠিকই বলেছে।'

টুপী তুলে সসম্ভ্রমে রাস্তার বাঁক ফিরল সে।

ডাগর ডাগর চোখের হাসিভরা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল সাশা ওর দিকে। বলল, 'বেশ মানুষটি।'

মা'র মনে হয়, সাশার মুখখানা যেন আজ অন্যদিনের চাইতে একটু বেশি মিঠে, কোমল।

বাড়ী এসে দুজন ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে সোফার ওপর বসে। স্তব্ধ ঘরে জিরিয়ে নিতে নিতে পাভেলের কাছে সাশার যাওয়া নিয়ে কথাবার্তা বলে মা। ঘন ভুরু দুটো তুলে সাশা তার স্বপ্নালু চোখের পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দূরের পানে তাকিয়ে আছে। কী যেন ভাবছে গভীর ভাবে। স্থির প্রশান্ত সেই চিন্তার ছায়া পড়েছে ওর বিবর্ণ মুখে।

'তারপর, তোমাদের যখন ছেলে হবে, আমি যাব ধাই-মা হয়ে। ওখানেই থাকব সবাই মিলে। এখানের থেকে কী আর এমন খারাপ হবে! কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারবেই পাভেল কিছু না কিছু। সব রকম কাজই তো ও জানে...'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায় সাশা। শুধয়:

'আপনি এখন যেতে চান না ওর পেছন পেছন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মা, 'আমায় নিয়ে করবে কী ও? যদি ওখান থেকে পালাতে চায়, আমায় নিয়ে শুধু মুশকিলই হবে তখন। ও নিজেও রাজী হবে না...'

সাশা মাথা নাড়ে:

'ঠিক বলেছেন, সত্যি ও রাজী হবে না।'

'তা ছাড়া,' মা বলে — স্বরে একটু আত্মপ্রসাদের সুর বাজে: 'আমার কাজও তো পড়ে আছে এখানে।'

'ঠিক বলেছেন।' চিন্তিত স্বরে বলে সাশা। 'তা ভালো...'

হঠাৎ চমকে ওঠে সাশা। কী যেন একটা ঝেড়ে ফেলল ও। আবার বলতে আরম্ভ করে অতি সহজ শান্ত ভাবে:

'সেখানে তো চিরটা কাল বসে থাকবে না। পালাবে তো নিশ্চয়ই...'

'আর আপনি? তারপর, বাচ্চা যদি হয়...?'

'তা সে তখন দেখা যাবে। আমার কথা ভাবলে ওর চলবে না। আমি ওর পথের বাধা হব না। অবশ্যি খুব কষ্ট হবে আমার ওর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে—তা সে ব্যবস্থা করে নেব'খন যা হয়। বাধা আমি ওর হব না!'

মা বোঝে, যা বলবে, তাই করবে সাশা। সে ক্ষমতা ওর আছে। বড় দুঃখ হয় মেয়েটার জন্য। ওকে জড়িয়ে ধরে বলে:

'বড় কষ্ট হবে আপনার, মা!'

সাশা মৃদু হেসে মায়ের কাছে সরে আসে।

শ্রান্ত ক্লান্ত নিকলাই এসে ঘরে ঢোকে এমনি সময়। কোট ছাড়তে ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে বলে:

'এখনও সময় আছে সাশা। পালিয়ে যান। সকাল থেকে দুজন টিকটিকি লেগেছে আমার পেছনে। এমনি খোলাখুলি ঘুরছে, মনে হচ্ছে এবারে ধরবেই আমায়। আমার মন বলছে। কিছু একটা হয়েছে কোথাও। ভালো কথা, এই যে পাভেলের জবানবন্দী। ছাপ্‌বো ঠিক করেছি আমরা। এটা এক্ষুনি নিয়ে যান লুদমিলার কাছে। বলবেন, যত শীগগির পারে এটা ছেপে ফেলে যেন। আঃ নিলভনা! কী চমৎকার বলেছে পাভেল!.. হ্যাঁ, স্পাই, খেয়াল রাখবেন, সাশা।'

কথা বলতে বলতে জমে-যাওয়া হাত দুটোকে ঘষে নিকলাই। তারপর

নিজের ডেস্কে এসে দেরাজ থেকে কি সব কাগজপত্র টেনে বার করে। কতগুলি ছিঁড়ে ফেলে, কতগুলি একধারে সরিয়ে রাখে। উদ্বেগের ছায়া পড়েছে মুখে, এলোমেলো চেহারা।

'এই তো সেদিন সাফ করেছি। আবার কোত্থেকে এল এসব নতুন কাগজপত্র কে জানে! আপনি যেন এখানে রাত্তিরে থাকবেন না, নিলভনা! কী বললেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের তামাশা দেখা ভারি বিশ্রী লাগে। তাছাড়া আপনাকেও ধরতে পারে। এদিকে পাভেলের বক্তৃতাটা নিয়ে চারধারে ছুটোছুটি করতে হবে তো আপনাকেই...'

মা বলে, 'আমায় ধরে কী করবে?'

নিকলাই নিজের চোখের সামনে হাতটা নেড়ে দৃঢ় গলায় বলে:

'কি জানি, এসব ব্যাপারের গন্ধ যেন টের পাই আমি। তাছাড়া লুদমিলার অনেক সাহায্য করতে পারবেন আপনি। মিছিমিছি ওদের খপ্পরে পড়বেন কেন...'

ছেলের বক্তৃতা ছাপার কাজে লাগবে শুনে খুশি হয়ে ওঠে মা। বলে:

'বেশ তো, যাচ্ছি আমি।'

তারপর অতর্কিতে দৃঢ় কিন্তু অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, 'যীশুর কৃপায় আমার সব ভয়ডর গেছে।'

'চমৎকার!' মায়ের দিকে না তাকিয়েই জবাব দেয় নিকলাই। 'কিন্তু আমার স্যুটকেস আর ভেতরে পরবার জামাগুলো কোথায় আছে একটু বলে দিন দিকি। সব নিজের লুব্ধ হাতে নিয়ে এমনি করে গুছিয়েছেন, আমার নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও খুঁজে পাই না।'

সাশা নিঃশব্দে বসে স্টোভের আগুনে কাগজ পুড়িয়ে কয়লার ছাইয়ের সঙ্গে তার ছাইগুলো নেড়ে নেড়ে মেশায়। নিকলাই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে:

'এবারে যেতে হয় যে, সাশা! আসুন তাহলে। ভালো বইটই যা বেরুবে পাঠিয়ে দেবেন আমায়, ভুলে যাবেন না যেন? আচ্ছা, আসুন কমরেড! সাবধানে থাকবেন...'

'আপনার কি অনেক দিনের জেল হবে মনে হয়?' সাশা জিজ্ঞাসা করে।

'শয়তানই জানে। আমার বিরুদ্ধে ওদের কিছু একটা আছে নিশ্চয়!

নিলভনা, আপনি না হয় সাশার সঙ্গেই চলে যান। দুজনকে নজরে রাখা বেশি শক্ত...'

'বেশ,' জবাব দেয় মা, 'এক্ষুনি তৈরী হয়ে নিচ্ছি...'

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে নিকলাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মা। সেই চিরকালের শান্ত কোমল মুখ। আজ তার ওপর শুধু একটু উদ্বেগের ছায়া। কোন চঞ্চলতা, ব্যস্ততার চিহ্ন নেই। এই মানুষটির ওপরেই মায়ের স্নেহ হয় সবচেয়ে বেশি। সবার সঙ্গে ওর সমান পক্ষপাতিত্বহীন অমায়িক ব্যবহার। শান্ত একা মানুষটি নিজের মধ্যে নিজে সমাহিত। কিন্তু কোথায় যেন এগিয়ে গেছে সবাইকে ছাড়িয়ে। চিরকাল যেমন ও সবার জন্য ছিল আজও তাই রইল। কিন্তু তারই কাছে এই মানুষটি সব চেয়ে এগিয়ে এসেছে — জানে মা। তাই বড় সাবধানভাবে ভালোবেসে এসেছে ওকে; যেন নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারে না। আজ অসহ্য মায়া হয় মা'র ওর জন্য। কিন্তু দেখাতে ভয় হয়। জানে, বিব্রত হবে নিকলাই; ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে। হাস্যকর চেহারা হবে তখন ওর। নিকলাইকে অমন চেহারায় দেখতে মোটেই ইচ্ছে করে না মা'র।

আর একবার ঘরে আসে মা। নিকলাই সাশার হাত ধরে বলছে:

'খাসা! ঠিক আপনাদের দুজনের যোগ্য ব্যবস্থা! ছিটেফোঁটা ব্যক্তিগত সুখ — কারুরই লোকসান নেই তাতে। তৈরী, নিলভনা?'

চশমাটা ঠিক করতে করতে হাসিমুখে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায় নিকলাই।

'এবার বিদায়, কেমন? এই মাস তিন চার আর কি! বড় জোর ছ'মাস। আশা করি তার বেশি না। ছটা মাস—জীবনের পক্ষে বড্ড লম্বা... সাবধানে থাকবেন, কেমন? আসুন! একটু জড়িয়ে ধরি...'

রোগা, কৃশকায় মানুষটি; কিন্তু বলিষ্ঠ দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাকে। তার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলে:

'যে-ভাবে আদর করছি, মনে হচ্ছে আপনার প্রেমে পড়ে গেছি...'

মা কথা বলতে পারে না; নীরবে ওর কপালে গালে চুমু খায়। হাত কাঁপে থরথর করে। সরিয়ে নেয় মা হাত পাছে টের পায় নিকলাই।

'সাবধানে থাকবেন কিন্তু। ভোর বেলা একটা ছোট্ট ছেলেকে পাঠাবেন — সে এসে আগে দেখে যাবে চারদিকে। লুদমিলার কাছে তার একটি পালিত ছেলে আছে। এইবার তাহলে আসুন, কমরেড। সব কিছু ঠিক!..'

রাস্তায় বেরিয়ে সাশা আস্তে আস্তে বলে:

'যমের বাড়ী যেতে হলেও মানুষটা এমনি করে বিনা হৈচৈ-এ সহজ ভাবে চলে যাবে। বরঞ্চ একটু তাড়াতাড়িই করবে। আর খোদ যমরাজ যখন সামনে এসে দাঁড়াবেন — তখনও ও এমনি করে চশমা ঠিক করে "খাসা!" বলে চোখ বুজবে!'

মা চাপা স্বরে বলে, 'বড় ভালোবাসি আমি ওকে।'

'ওকে দেখে দেখে শুধু অবাক হই আমি, ভালোবাসিনে। খুব শ্রদ্ধা করি। ভারি নরম; এক এক সময় স্নেহশীল হয়ে পড়ে ওর মনটা। কিন্তু তবু যেন বড্ড শুকনো, রস-কসহীন — ও যেন ঠিক রক্তমাংসের মানুষ নয়... বোধ হয় কেউ লেগেছে পেছনে? চলুন, আলাদা হয়ে কেটে পড়ি। যদি বোঝেন যে পেছনে টিকটিকি লেগেছে, তাহলে লুদমিলার ওখানে যাবেন না।'

'তা জানি।' মা বলে। তবু সাশা অধ্যবসায়ের সঙ্গে বলতে থাকে:

'সেখানে যাবেন না, তার চেয়ে আমার ওখানে আসবেন। আচ্ছা, এখনকার মতো আসি তাহলে।'

ফিরে, যে পথে এসেছিল সে পথেই হন্‌হন্‌ করে চলতে থাকে সাশা।

২৮

কয়েক মিনিট পর লুদমিলার ছোট ঘরখানিতে বসে স্টোভের আগুন তাপাচ্ছে মা। ধীরে ধীরে পায়চারি করছে লুদমিলা। পরনে তার কালো পোষাক — চামড়ার বেল্ট দিয়ে আঁটা। পোষাকের খস্‌খসানি আর ওর প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে ঘরখানা ভরে আছে।

স্টোভে গন্‌গন্‌ করছে আগুন; শোঁ শোঁ শব্দে ঘরের বাতাসকে শুষে নিচ্ছে। কাঠ পোড়ার ফট্‌ ফট্‌ শব্দ আছে তার সঙ্গে মিশে। সমান লয়ে বয়ে চলেছে লুদমিলার কণ্ঠস্বর:

'মানুষরা ভালো তো নয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বোকা। ঠিক চোখের সামনে যেটুকু আছে, হাতের মুঠোয় যেটুকু আছে, তার বাইরে আর কিছু ওদের চোখে পড়ে না। সস্তা মালই হাতের কাছে পড়ে থাকে। মূল্যবান দামী জিনিস দূরেই থাকে। জীবনটা যদি একটু অন্যরকম, হাল্কা হত, মানুষগুলোর একটু বুঝসুঝ থাকত, তাহলে আসলে প্রত্যেকেরই লাভ হত। কিন্তু ওটুকু পেতে হলে কিছু কষ্ট করতে হবে তো...'

হঠাৎ মায়ের সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ায়।

'লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আমার বড় একটা হয় না। তাই কেউ এলেই আমার মুখ ছোটে এমনি ভাবে। ভারি হাস্যকর ঠেকছে, না?' যেন ক্ষমা-চাওয়ার সুরে বলে লুদমিলা।

'কেন?' মা বলে। মায়ের চোখ ঘুরে বেড়ায়, কোথায় মানুষটার ছাপার সরঞ্জাম। কিন্তু কোথাও অদ্ভুত কিছু নেই। রাস্তার দিকে তিনটে জানালা। আসবাবের মধ্যে একটা সোফা, বইয়ের আলমারি একটা, টেবিল, খানকয় চেয়ার আর দেয়ালের কাছেই বিছানা। তার পাশে এক কোণে হাত মুখ ধোবার আসবাব, তার এক কোণে স্টোভ। দেয়ালে ঝোলান গুটি কয়েক ফটো। সব একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, নতুন, মজবুত। গৃহকর্ত্রীর সন্ন্যাসিনী মূর্তিখানি থেকে উঠে এসে একখানি হিম-ছায়া যেন ছড়িয়ে আছে সব কিছুর ওপর। মায়ের মনে হয় কী একটা যেন লুকোন আছে। কিন্তু কোথায়, তা বোঝা যায় না। দরজাগুলোর দিকে তাকায়। একটা দরজা দিয়ে ভেতরে এল ছোট্ট হলটা থেকে। আর একটা আছে স্টোভের পাশে — অনেক উঁচু আর সরু।

মা'র খেয়াল হয় লুদমিলা নিরীক্ষণ করে দেখছে ওকে। সসঙ্কোচে বলে, 'একটা কাজে এসেছি।'

'জানি। এমনি বেড়াতে কেউ আসে না আমার বাড়ী...'

লুদমিলার বলার ভঙ্গিতে অদ্ভুত একটা সুর। ওর মুখের দিকে চায় মা — পাতলা ঠোঁট দু'খানির প্রান্তে হাসির ক্ষীণ রেখা। চশমা চোখে। তার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় ওর অস্বচ্ছ চোখের দীপ্তি। মা একদিকে তাকিয়ে পাভেলের বক্তৃতাটা হাত বাড়িয়ে ওকে দেয়।

'এই যে। যদ্দুর সম্ভব তাড়াতাড়ি ছেপে দিতে বলে দিয়েছে...'

নিকলাই যে ধরাপড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাও বলে।

লুদমিলা নিঃশব্দে কাগজগুলো বেল্টের মধ্যে গুঁজে বসে পড়ে। আগুনের প্রতিচ্ছবি লাল হয়ে ওর চশমার কাঁচের মধ্যে জ্বলছে। ওর নিশ্চল মুখের ওপর চলছে তার উষ্ণ হাসির নাচ।

মায়ের কথা শেষ হলে লুদমিলা বলে: 'আসুক না আমায় ধরতে, গুলি করব।' অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা উচ্চারিত। 'জুলুমের হাত থেকে আত্মরক্ষার অধিকার আমার আছে। তাছাড়া, সবাইকে যখন বলি লড়াই-এ নামতে তখন আমাকেও তো লড়াই করতে হয়!'

আগুনের আভা ওর মুখের ওপর থেকে সরে যায়। মুখখানায় আবার কাঠিন্য আর একটু ঔদ্ধত্য ফুটে ওঠে।

মা সস্নেহে ভাবে: "এমনি করে কি থাকা যায়!"

প্রথমে নেহাৎ অনিচ্ছায় লুদমিলা পড়তে আরম্ভ করে বক্তৃতাটা। পড়তে পড়তে ক্রমশই কাগজগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে। পড়া কাগজগুলো একখানা একখানা করে চট করে সরিয়ে রাখে। অবশেষে উঠে দাঁড়ায়, সোজা হয়ে মায়ের কাছে এসে বলে:

'চমৎকার হয়েছে!'

কয়েক মুহূর্ত কী জানি ভাবে মাথা নীচু করে।

'আপনার ছেলের সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আমি চাইনি। কারণ তাঁকে কখনও দেখিনি আমি। তারপর, যাতে কারো মনে কষ্ট হয় এমন কথা আমার ভালো লাগে না। প্রিয়জনের নির্বাসনে যাওয়ার দুঃখটা আমার জানা। কিন্তু একটি কথা শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই — এমন ছেলে পেটে ধরে মায়ের কি সুখ?'

'সুখ! তা আছে বৈকি!'

'আর... ভয় — ভয় করে না?'

'না আর ভয় নেই...' শান্ত হাসি হেসে মা বলে।

সোজা সোজা চুলগুলোর ওপর নাতিগৌর হাতখানাকে বুলিয়ে জানালার দিকে চায় লুদমিলা। চাপা হাসির মতো কি একটা হাল্কা ছায়া ঝিলমিল করে ওর মুখে।

'শীগগিরই টাইপগুলো বসিয়ে ফেলছি। একটু শুয়ে নিন ততক্ষণ আপনি। ভারি ধকল গেছে সারা দিন। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়েছেন। এই যে বিছানা। আমি শোব না এখন। বরঞ্চ রাতে হয়তো তুলে দেব, একটু সাহায্য করতে হবে আমায়... শুতে যাবার সময় বাতিটা নিবিয়ে দেবেন...'

স্টোভে দুখানা কাঠ ফেলে দিল। তারপর সরু দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওধার থেকে দরজাটা সেঁটে বন্ধ করে দিল। মা তাকিয়ে রইল ওর যাওয়ার দিকে। তারপর কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করল। মনটা পড়ে রইল লুদমিলার ওপর।

"কি যেন একটা কষ্ট আছে ওর মনে..." ভাবে মা।

শ্রান্তিতে মায়ের মাথা ঘুরতে থাকে। কিন্তু মনের মধ্যে অগাধ শান্তি। চারদিক যেন একটা কোমল স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত। সেই আলোয় অভিস্নাত

মায়ের আত্মা। এমনি শান্তির সঙ্গে মায়ের পরিচয় আগেও ঘটেছে। যখনি মনের ওপর দিয়ে বেশি রকম ঝড়ঝাপটা গেছে—তার পরেই এসেছে এমনি অনাবিল শান্তি। আগে আগে ভয় করত। কিন্তু এখন আর ভয় করে না। বরঞ্চ বৃহৎ, বলিষ্ঠ ভাবনায় দৃঢ় করে মনকে দেয় প্রশস্ত করে। বাতি নিবিয়ে শুতে যায় মা। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বিছানা। কম্বল মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়তে না পড়তেই অগাধ ঘুমে ঢলে পড়ে...

ঘুম যখন ভাঙল, শীতের হিমেল শুভ্র আলোয় ঘরখানা ভরে গেছে। সোফার ওপর একখানা বই হাতে শুয়ে আছে গৃহকর্ত্রী লুদমিলা। মুখে একটু হাসি টেনে এনে মা'র দিকে তাকায়। এমন হাসি তার মুখে দেখা যায় না।

'হা ভগবান!' বিব্রত হয়ে বলে মা, 'কি দেরীই হয়ে গেল!'

'সুপ্রভাত! দশটা বাজে প্রায়। উঠুন — চা খাব যে!'

'জাগিয়ে দেননি কেন আমায়?'

'এসেছিলাম জাগিয়ে দিতে। কিন্তু এমন সুন্দর হাসছিলেন ঘুমের মধ্যে যে আর পারলাম না...'

লঘু ভাবে দেহটাকে তুলে সোফা থেকে উঠে মায়ের কাছে আসে লুদমিলা। ঝুঁকে দাঁড়ায়। ওর দীপ্তিহীন চোখে যে ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে — তা যেন মায়ের পরিচিত, আত্মীয়সুলভ, বুঝতে কষ্ট হয় না।

'বড় খারাপ লাগল ঘুমটা ভাঙাতে। হয়তো ভালো একটা স্বপ্ন দেখছিলেন...'

'না, গো না, স্বপ্ন-টপ্ন দেখিনি।'

'যাকগে, হাসিটুকু কিন্তু ভারি ভালো লাগছিল। বড় শান্ত, স্নিগ্ধ মিষ্টি হাসি!'

লুদমিলা হাসে — মখমলের মতো কোমল তুলতুলে হাসি।

'আপনার কথাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, জীবনে খুব কষ্ট পেয়েছেন, না?'

ভুরু নড়তে থাকে মায়ের। বুকের মধ্যে ভাবনার ঢেউ ওঠে। উত্তেজিত স্বরে লুদমিলা বলে ওঠে:

'বুঝতে পারছি, খুব কষ্ট পেয়েছেন।'

'বুঝতে পারছিনে ঠিক,' সাবধানে মা বলে, 'এক এক সময় মনে হয় ভারি কষ্টের জীবন। কিন্তু গোটা জীবনটাই হাজার জিনিসে এমনি ভরে

আছে — আর প্রত্যেকটি জিনিসই এত গুরুগম্ভীর যে হকচকিয়ে যেতে হয়। একটার পর একটা আসছেই...'

সেই অতি পরিচিত তীব্র উত্তেজনার তরঙ্গ ওঠে বুকে, কত ভাবনা কত ছবিতে ভরে ওঠে তার আকাশ। বিছানার ওপর উঠে বসে মা কথার পর কথা গাঁথতে থাকে:

'চলছেই আর চলছেই... সব একই লক্ষ্যে... এক এক সময় ভারি কষ্ট হয়, জানেন। কী কষ্ট পায় মানুষ। মার খায় — দয়া মায়া না করে এমনি নিষ্ঠুর মার মারে, কত সুখ আর আনন্দ থেকে যে ওরা বঞ্চিত! তখন সত্যি যেন অসহ্য লাগে।'

লুদমিলা মাথাটা পেছনে হেলিয়ে মায়ের দিকে তাকায়। ও শুধু তাকান নয়, দৃষ্টির আলিঙ্গন। বলে:

'কিন্তু কই নিজের কথা তো বলছেন না কিছু!'

মা তার মুখে তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে জামাকাপড় পরতে আরম্ভ করে।

'আমার-তোমার আলাদা কী করে করি যখন এ-ও-সে — সবাইকে ভালোবাসি! সবার জন্যই মমতা হয়, সবার জন্যই ভয়ে বুক কাঁপে। সবাই ভিড় করে থাকে কলজের মধ্যে... বলুন তো, আলাদা করি কী করে?'

জামাকাপড় পরা শেষ হয়নি, অমনি অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকে চিন্তায় ডুবে। এককালে ছেলের জন্য কী ভয়ই না ছিল। যত চিন্তা ছিল ওর দেহটার জন্য। ওটাকে আগলে রাখার জন্যই ছিল যত আকুলিবিকুলি। এখন মনে হয় ও যেন সে-দিনের সে-মানুষ আর নেই। এ যেন আর এক মানুষ। পুরোনো দিন, পুরোনো সংসারটাকে পেছনে ফেলে বহু দূর চলে এসেছে। নিজেরই আবেগের আগুনে জ্বলে সেই ভস্ম থেকে পুনর্ভূমিষ্ঠ হয়েছে ওর আত্মা, নতুন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়ে, শক্তিমান হয়ে। বুকের মধ্যে কান পেতে শোনে। ভয় পায় পুরোনো উদ্বেগ পাছে মনে জেগে ওঠে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে লুদমিলা কোমল স্বরে:

'কী ভাবছেন বলুন তো?'

'জানি না।'

নীরব দৃষ্টি বিনিময়; স্নিগ্ধ মৃদু হাসি।

'দেখিগে যাই, আমার সামোভারের কী দশা হল।' বলতে বলতে বেরিয়ে যায় লুদমিলা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় মা। ঠাণ্ডা, খট্‌খটে দিন। মায়ের বুকের মধ্যেও আলো-ঝলমল, কিন্তু উষ্ণতার আমেজ। ভারি কথা বলতে ইচ্ছে করছে আজ। অনেকক্ষণ ধরে, অনেক কিছু — সব কিছু নিয়ে। আত্মার গভীরে এই যে এত রূপ, এত রস, এই যে অস্ত-রাগের আলোয় রাঙা হয়ে আছে তার দিগ্‌দিগন্ত — এর জন্য কোন এক অজানার উদ্দেশ্যে যেন কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়ে সারা অন্তর। বহুদিন পরে কেন জানি আজ আবার প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করছে। কচি একখানা মুখ ঝিলমিলিয়ে ওঠে মনের মধ্যে, কানে স্পষ্ট কার স্বর বাজে: "ওই পাভেলের মা, পাভেল ভ্লাসভের..." মনে পড়ে সাশার মুখ — আনন্দ-স্নিগ্ধ চোখ দুটি, রীবিনের কালো মূর্তি, ছেলের ব্রোঞ্জ রঙের কঠিন মুখখানা, বিব্রত নিকলাইয়ের সেই চোখ মিটমিট করা। তার পর সব যেন একসঙ্গে একাকার হয়ে যায় বক্ষমথিত হাল্কা একখানি দীর্ঘশ্বাস হয়ে — মিলিয়ে যায় রামধনু রঙের মেঘের স্বচ্ছতায়, যা মায়ের সমস্ত চিন্তার জগৎ ছেয়ে ফেলে অসীম শান্তিতে মন ভরে তোলে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে লুদমিলা বলে, 'ঠিক কথাই বলেছিল নিকলাই। ওকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেটাকে পাঠিয়েছিলাম আপনার কথামতো। ওর বাড়ীর উঠোনে অনেক পুলিশ নাকি দেখে এসেছে। গেটের পেছনেও নাকি একজন লুকিয়ে ছিল। আর চারধারে স্পাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটা চেনে ওদের।'

মাথা নেড়ে মা বলে, 'আহা! বেচারা...'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা। কিন্তু, এ তো দুঃখের নিশ্বাস নয়! নিজেই অবাক হয়ে যায়।

'ইদানীং এই শহরেই মজদুরদের নিয়ে অনেক পড়াশোনা চালিয়েছিল ও, ধরা পড়বার দিন ওর ঘনিয়েই এসেছিল।' থমথমে হাঁড়ি মুখে কিন্তু শান্ত স্বরে বলে লুদমিলা। 'এখান থেকে চলে যেতে বন্ধুরা ওকে অনেক বলেছে। কিছুতেই শুনল না। এসব ব্যাপারে তো আর বলা-কওয়া চলে না, একেবারে জোর করে পাঠিয়ে দিতে হয়...'

দরজার কাছে একটি ছেলের মুখ দেখা যায় — কালো চুল, লাল গাল, ভারি সুন্দর নীল এক জোড়া চোখ আর টিয়াপাখীর মতো নাক।

'সামোভার নিয়ে আসব?' জিজ্ঞাসা করে ছেলেটি।

'হ্যাঁ সেরিওজা। নিয়ে আয় বাবা, লক্ষ্মী আমার।' তার পর মা'র দিকে তাকিয়ে বলে, 'একে আমি মানুষ করছি।'

মায়ের মনে হয় লুদমিলা যেন আরেক মানুষ আজ। অনেক সহজ সরল, আরো ঘনিষ্ঠ। ওর ছিমছাম সুন্দর দেহখানির নড়াচড়ার লীলায়িত ছন্দে মাধুরী আর বলিষ্ঠতা মিশে আছে, তাতেই ওর ফ্যাকাশে মুখখানার কাঠিন্যে ঢেলে দিয়েছে কোমলতা। রাতের মধ্যে ওর চোখের নীল রেখাগুলি আরো গভীর হয়েছে। বোঝা যায়, অন্তরের তারগুলো উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে।

সামোভার নিয়ে এল ছেলেটি।

'এস সেরিওজা, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন পেলাগেয়া নিলভনা — সেই যে শ্রমিক যার বিচার হল কাল — তার মা।'

সেরিওজা নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে নমস্কার আর করমর্দন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর রুটি এনে টেবিলে গিয়ে বসল। চা ঢালতে ঢালতে লুদমিলা বোঝাতে চেষ্টা করে মাকে যে এখন তার বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত নয় — বোঝা তো যাচ্ছে না পুলিশ কার জন্য অপেক্ষা করছে।

'হতেও তো পারে আপনারই জন্য এসেছে। সম্ভবত জিজ্ঞাসাবাদ করবে...'

'হক তা!' মা জবাব দেয়। 'নিক না ধরে। কোন লোকসান নেই। খালি যদি পাভেলের বক্তৃতাটা বিলি করে ফেলতে পারি আগে!'

'টাইপ সাজিয়ে ফেলেছি। কাল শহরে মজুর-বস্তিতে নিয়ে যেতে পারবেন... নাতাশাকে জানেন আপনি?'

'জানি না আবার!'

'তার কাছেই নিয়ে যাবেন ওগুলো...'

ছেলেটি কাগজটা পড়ছিল। মনে হচ্ছিল কিছুই শুনছে না। কিন্তু বারে বারে তাকাচ্ছিল মায়ের মুখের দিকে। ওর সজীব চোখ দুটি দেখে হাসিতে মা'র মুখ ভরে ওঠে। আবার নিকলাইয়ের কথা তোলে লুদমিলা — সে বারের মতো কোন দুঃখ হা-হুতাশ নেই। আশ্চর্য হয় না মা — ভাবে এ তো স্বাভাবিকই। দিনটা আজ যেন দৌড়ে দৌড়ে চলেছে। চা খেতে খেতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেল।

'ইস্! দুপুর হয়ে গেল!' বলে ওঠে লুদমিলা।

কে যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ধাক্কা দিল দরজায়। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে লুদমিলার দিকে চায়।

'কে এল জানি না! খুলে দে তো দরজা, সেরিওজা!'

এতটুকু উত্তেজনা নেই। শান্তভাবে হাতখানা স্কার্টের পকেটে রেখে মাকে বলে:

'যদি পুলিশ হয়, আপনি গিয়ে ওই কোণায় দাঁড়াবেন, পেলাগেয়া নিলভনা। আর তুমি সোরিওজা...'

'আমি জানি।' বাইরে যেতে যেতে নীচু স্বরে বলে ও।

মা মৃদু হাসে। আজ আর এসবে উত্তেজনা হয় না মা'র। মনে বিপদের আশংকা নেই কোন।

সেই ক্ষুদে ডাক্তার ঘরে ঢোকে। এসেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে:

'প্রথম খবর — নিকলাই গ্রেপ্তার। আরে! নিলভনা যে! আপনি এখানে! ওকে নিয়ে যাবার সময় ছিলেন না আপনি?'

'সেই তো আমায় পাঠিয়ে দিল।'

'হুঁ, অবিশ্যি এতে আপনার বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না... দ্বিতীয় নম্বর হল — কাল রাত্তিরে ছোকরারা পাভেলের জবানবন্দীর প্রায় শ' পাঁচেক কপি হেকটোগ্রাফে ছেপে ফেলেছে। আমি দেখেছি, মন্দ হয়নি — বেশ পরিষ্কার, স্পষ্ট ছাপা হয়েছে। আজ রাত্তিরের মধ্যেই ওরা শহরে ওগুলো বিলি করে ফেলতে চায়, কিন্তু আমার মত নেই। বরঞ্চ ছাপা কপিগুলো এখানে বিলি করে, ওগুলো অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া ভাল।'

সাগ্রহে বলে ওঠে মা, 'আমি ওগুলো নিয়ে যাব নাতাশার কাছে! দিন, আমাকে দিন!'

আকুল হয়ে ওঠে মা, মরীয়া হয়ে ওঠে — তার পাভেলের কথা কতক্ষণে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে। আকূতি ভরা চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

'কে জানে বাবা, এখনই নিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে ভালো হবে কি না।' ঘড়ি দেখতে দেখতে ডাক্তার একটু ইতস্তত করে বলে, 'এগারোটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট হয়েছে। দুটো পাঁচ-এ একটা ট্রেন আছে। সওয়া পাঁচটায় গিয়ে পেঁছোয়। সন্ধে হয়ে যায় বটে, কিন্তু বেশি রাত হয় না। কথা তাও নয়...'

ভুরু কুঁচকে লুদমিলাও বলে, 'কথা তাও নয়।'

'তাহলে কথাটা কী?' এগিয়ে এসে মা শুধয়, 'কাজটা যাতে ভালো করে হাসিল হয়...'

কপাল মুছতে মুছতে লুদমিলা সন্ধানী দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকিয়ে বলে, 'বিপদ হতে পারে আপনার...'

'কেন?' আন্তরিক তাগিদের সুর মা'র কথায়।

'কেন?' ছাড়া ছাড়া ভাবে তাড়াতাড়ি বলে ডাক্তার, 'শুনুন তাহলে। নিকলাই গ্রেপ্তার হবার মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে আপনি বাড়ী ছেড়েছেন। ধরুন আপনি কারখানায় গেলেন। সেখানে আপনাকে সব্বাই তাদের শিক্ষয়িত্রীর মাসী বলে জানে। আপনার যাওয়ার পরেই নিষিদ্ধ কাগজপত্র পাওয়া গেল সেখানে। এখন বুঝে দেখুন — সব মিলিয়ে আপনার গলায় ফাঁশ...'

মা তবু সাগ্রহে বুঝিয়ে বলে, 'কেউ আমায় দেখতে পার্বে না। তারপর ফিরে এলে যদি ধরে, আর যদি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গিয়েছিলাম...'

একটু থেমে সজোরে বলে ওঠে:

'কী বলতে হবে আমি জানি। ঠিক বলব গুছিয়ে। ওখান থেকে সোজা যাব আমাদের আগের বস্তিতে। সেখানে একজন চেনা লোক আছে — নাম সিজভ। বলব, আদালত থেকে সোজা সেখানেই গিয়েছিলাম মনটা একটু ঠান্ডা করবার জন্য। তা ছাড়া তারও বিপদ হয়েছে, সে-বেচারার ভাইপোটাও তো সাজা পেল! তা সিজভ কখনও ফিরিয়ে দেবে না!'

পীড়াপীড়িতে ওরা নিমরাজী হয়েছে দেখে আরো জোর দিয়ে কথা বলে মা। শেষ পর্যন্ত রাজী হল ওরা। অনিচ্ছার সঙ্গে বলে ডাক্তার:

'বেশ যান তাহলে!'

লুদমিলা কথা বলে না। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে শুধু পায়চারি করে ঘরের মধ্যে। ওর মুখটা এখন নিষ্প্রভ। মাথাটা ভারি হয়ে বুকের ওপর এলিয়ে পড়তে চায় — লক্ষ্য করে মা। সেটা খাড়া রাখার আয়াসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কাঁধের কড়া মাংসপেশীর টানে।

মৃদু হেসে মা বলে, 'আপনারা সবাই আমার জন্যই ভেবে মরছেন। কই নিজেদের কথাটা তো একটুও ভাবছেন না...'

ডাক্তার বলে, 'না, তা ঠিক নয়। নিজেদের কথাও ভাবছি বইকি আমরা। না ভেবে যাব কোথায়! অনর্থক যারা শক্তিক্ষয় করে মরছে তাদের আমরা গাল দিই। তাহলে কথা রইল — স্টেশনেই পাবেন আপনি ছাপান বক্তৃতা...'

কোথায় কে নিয়ে যাবে ওগুলো, সব মাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়, তারপর মা'র মুখের দিকে চেয়ে বলে:

'বেশ ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুন!'

তবু মুখে কিসের একটা বিরক্তির ছায়া নিয়ে চলে যায় ডাক্তার। ওর পেছনে দরজাটা বন্ধ হতেই লুদমিলা মায়ের কাছে আসে। নিঃশব্দ হাসি হেসে বলে:

'আপনার মনটা বুঝতে পারছি আমি...'

মায়ের কনুইটা ধরে আবার ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করে আস্তে আস্তে।

'আমারও একটি ছেলে আছে — বছর তের বয়েস হয়েছে। থাকে তার বাপের কাছে। আমার স্বামী সহকারী সরকারী উকিল — আর ছেলে থাকে তার কাছে। কি দশা হবে তার, প্রায়ই ভাবি সে কথা...'

ওর ভেজা গলা ভেঙে আসে। তারপর আবার আসে শান্ত, চিন্তিত একটা সুর।

'কে তাকে বড় করছে? যে মানুষকে ভালোবাসি আমি — দুনিয়ার মধ্যে যাদের জুড়ি নেই আর, সেই মানুষেরই শত্রু, জেনে শুনে শত্রু। আমার সন্তান হয়ত বড় হয়ে আমার শত্রু হবে। আমার কাছে তার থাকার উপায় নেই। ছদ্ম নামে আছি আমি। আট বচ্ছর তাকে দেখিনি! আট বচ্ছর! ওঃ কতদিন!..'

জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় লুদমিলা — শূন্য বিবর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ও আমার কাছে থাকলে বুকে আরো বল পেতাম। অন্তত কলজের মধ্যে এই যে কাঁচা ঘাটা দগ্‌দগ্‌ করছে — তার জ্বলুনিটা তো থাকত না... ও মরে গেলেও আমার পক্ষে বেশি সহজ হত...'

'আহা! বাছারে আমার!' মায়ের বুক সমবেদনায় তোলপাড় হয়।

'আপনার কপাল ভাল,' তিক্ত হাসি হেসে লুদমিলা বলে, 'আশ্চর্য! হাতে হাত ধরে কাজ করতে নেমেছে মা আর ছেলে। কদাচিৎ দেখা যায় এমনি।'

ভ্লাসভা অজান্তেই বলে ওঠে:

'সত্যি আশ্চর্য!' তারপর স্বর নামিয়ে যেন কানে কানে গোপন কথা বলছে এমনভাবে বলে, 'আপনারা সবাই, আপনি, নিকলাই ইভানভিচ আর আরো যাঁরা যাঁরা আছেন সত্যকে আঁকড়ে, আপনারা সবাই-ই আছেন আমার কাছে। হঠাৎ যেন একেবারে পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছেন সবাই। আমি সবাইকেই

বুঝতে পারছি। কথা বুঝতে পারি না, কিন্তু বাকী সমস্তটা বুঝি।'

গুনগুনিয়ে বলে লুদমিলা:

'সত্যি, ঠিক তাই...'

লুদমিলার বুকে হাত রেখে ওকে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে বলে যায় মা, যেন নিজের কথাগুলো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

'দুনিয়ায় এগিয়ে চলেছে আমাদের সন্তানেরা। এই বুঝেছি যে, আমাদের সন্তানেরাই সারা দুনিয়া জুড়ে এপ্রান্ত ওপ্রান্ত থেকে চলেছে একই লক্ষ্যের দিকে। মনে বলুন, গুণে বলুন, সেরা সেরা ছেলেরা নেমে এসেছে পথে — মিথ্যাকে শক্ত পায়ে থেৎলে পিষে গুঁড়িয়ে চলছে, — অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। শক্তিধর সব ছেলেরা — তাদের উজ্জ্বল সুস্থ দেহের সমস্ত দুর্নিবার শক্তির ওই এক দাবী — ন্যায় চাই! সমস্ত মানবজাতির দুঃখকে তারা জয় করবে। দুনিয়া থেকে মানুষের সব দুর্ভাগ্য, সব কদর্যতা তারা একেবারে মুছে ফেলবে, ব্রত নিয়েছে। তা তো করবেই! ওদের মধ্যে একজন আমায় বলেছে — তারা নতুন সূর্য জেবলে দেবে আকাশে। জেবলে দেবেই! যেখানে যত ভাঙা বুক আছে সবাইকে এক জোট করবে তারা, করবেই!'

ভুলে-যাওয়া উপাসনার মন্ত্র মনে পড়ে যায়। আগুনের ফুলকির মতো বুকের তলা থেকে উছলে ওঠে নতুন বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত সেই মন্ত্র।

'সত্য আর ন্যায়ের পথে চলেছে আমাদের সন্তানেরা — মাথার ওপর এক নতুন আকাশ রচনা করে। মাটির বুকে এক নতুন আগুন জবালিয়ে দিয়েছে তারা — প্রাণের অনির্বাণ বহ্নি। যে মানব-প্রেমে দীক্ষা নিয়েছে ওই ছেলেগুলি — নতুন জীবন জন্ম নিচ্ছে সেই প্রেমের আগুন থেকে। কে নেবাবে ওই আগুন? কার সাধ্যি আছে? মাটির বুক থেকে উঠেছে সেই আগুন। জয় হোক ওই শিখার, জীবন তো তাই চায়। হ্যাঁ, জীবনই চায়!'

উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়ে মা। লুদমিলার কাছ থেকে সরে গিয়ে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। লুদমিলাও সন্তর্পণে সরে যায় — কোথায় যেন কিসের শান্তিভঙ্গ হবে। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে — ওর স্তিমিত চোখের গভীর দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে স্থির হয়ে আছে। ও যেন আরো লম্বা, আরো ঋজু হয়ে গেছে। রোগা কঠিন মুখখানা চিন্তাক্লিষ্ট। চাপা ঠোঁট দুখানিতে অস্থিরতার আভাস। ঘরের নিস্তব্ধতায় একটুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে ওঠে মা। লুদমিলার মনের অবস্থা দেখে অপরাধীর মতো নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করে:

'কিছু অন্যায় কথা বলে ফেলেছি?'

সঙ্গে সঙ্গে লুদমিলা যেন ভীত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে ফিরে তাকায়। তারপর যেন কিছু থামাতে চায় এমনি-ভঙ্গিতে হাতখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে:

'না, না, না। ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু ও কথা আর তুলব না। ওই পর্যন্তই থাক।' শেষ করে আবার বলে, 'তাড়াতাড়ি যান আপনি, অনেকটা পথ যেতে হবে।' এবারে স্বর আরও শান্ত, প্রকৃতিস্থ।

'এই উঠছি। আপনি জানেন না কত আনন্দ আমার! আমার ছেলে — আমারই রক্তমাংসে তৈরী সে — তার মুখের কথা আমি ঘরে ঘরে বিলোতে চলেছি। মনে হচ্ছে এ যেন আমারি আত্মাকে ছড়িয়ে চলেছি।'

মায়ের মুখে স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু লুদমিলার মুখে তার প্রতিফলন কই? মা'র মনে হয় এ-মেয়ের আত্মনিপীড়নের ফলে তার নিজের মনের আনন্দ সব পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মা'র কেমন জেদ হয়, নিজের মনের আগুন দিয়ে ওই কঠিন মানুষটাকে জ্বালিয়ে তুলবে। আনন্দের স্পন্দন জাগুক ওরও বুকে। লুদমিলার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চেপে ধরে বলে:

'বলুন দেখি যখন জানতে পারা যায় যে বিশ্ব-সংসারের মানুষকে আলো করে দেবার মতো আলোও আছে, একদিন সবার চোখেই পড়বে সে আলো — তখন কী ভালো লাগে! সবাই এই আলোতে সম্মিলিত হবে!'

মায়ের অমায়িক মস্ত বড় মুখখানায় একটা শিহরণ বয়ে যায়। চোখ জ্বলে ওঠে; ভুরু-জোড়া কাঁপতে থাকে — যেন ডানা মেলে চোখ দুটির আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিরাট বিরাট চিন্তায় অভিভূত হয়ে ওঠে মা, সেই সব চিন্তায় ঢেলে দেয় তার হৃদয়ের সমস্ত আগুন, তার যা-কিছু অভিজ্ঞতা, তাদের রূপান্তরিত করে উজ্জ্বল হাল্কা কথার স্ফটিকে। হেমন্তের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হৃদয়ে বসন্ত-সূর্যের সৃষ্টিময়ী, শক্তিময়ী আলোয় উদ্দীপ্ত হয়ে জেগে উঠে সেই কথাগুলি তেজে দীপ্তিতে আরও ভাস্বর হয়ে জ্বলতে থাকে।

'জনতার দেউলে যেন নতুন দেবতা জন্ম নেয় — সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এই তো আমি বুঝি। আপনারা সবাই কমরেড্ — এক সাথ, এক প্রাণ! সত্য আপনাদের মা, আপনারা সেই মায়েরই সন্তান।'

আবেগে ভেসে যায় মা। একটু থেমে, নিশ্বাস নিয়ে, আলিঙ্গনের মতো করে হাত বাড়িয়ে বলে:

' "কমরেড" কথাটি যখন একা একা নিজের মনেও বলি, মনে হয় আমারই বুকের মধ্যে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাই।'

মায়ের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। লুদমিলার মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে; ঠোঁট কাঁপতে থাকে। গাল বেয়ে বড় বড় স্বচ্ছ ফোঁটায় চোখের জল ঝরে।

মা স্নিগ্ধ হেসে দু'হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। বিজয়ী হৃদয় কোমল গর্বে ভরে ওঠে।

বিদায় নেবার সময় লুদমিলা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চুপি চুপি বলে:

'আপনাকে কাছে পেলে যে কী ভালই লাগে তা আপনি জানেন?'

২৯

রাস্তায় বেরুতেই হাড়-জমান হাওয়া নাগপাশে জড়িয়ে ধরল মায়ের দেহটাকে; নাকে দিতে লাগল সুড়সুড়ি। কয়েক সেকেন্ড নিশ্বাস নিতে পারল না। একটু দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায় মা। কাছেই একটা কোণে ভালুকে টুপিটা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক গাড়োয়ান। আরও খানিকটা দূরে রাস্তা দিয়ে চলেছে একটি মানুষ — একেবারে কুঁজো হয়ে পড়েছে, দুই কাঁধের মধ্যে মাথাটা যেন গোঁজা। তারও খানিক আগে কান ঘষতে ঘষতে এক সৈন্য লাফাতে লাফাতে ছুটছে।

মা মনে মনে বলে: "হয়তো কোনও দোকানে পাঠিয়েছে সৈন্যটাকে।" নিজের পথে চলে — পায়ের নীচে বরফ মড়মড় করে ওঠে, প্রাণ যেন মেতে ওঠে সেই শব্দে। ট্রেন আসার আগেই স্টেশনে পেণছে গেল মা। বিশ্রী ময়লা, চট্‌চটে তৃতীয়-শ্রেণীর বিশ্রাম ঘরটায় মানুষ গিস্‌গিস্‌ করছে। ঠান্ডার জন্য লাইন-মজুরেরা, গাড়োয়ান-কোচম্যানের দল, ঘর-হারা জীর্ণপোষাক মানুষের দল, সব এসেছে ওই ঘরখানায় গরম উপভোগ করার জন্য। যাত্রীরাও আছে। কজন কৃষক, রেকুনের লোমের জামা-পরা একজন মোটা শেঠ, একজন পাদ্রি আর মুখে বসন্তের দাগওয়ালা তার মেয়েটা। এ ছাড়াও ছিল জন পাঁচ-ছয় সৈন্য আর কজন ছোটখাট ব্যবসায়ী। তামাক খাওয়া, কথাবার্তা, চা-ভদকা খাওয়া চলছে অবিশ্রাম। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে কে একজন যেন হো হো করে হাসছে। তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে মাথার ওপর দিয়ে। দরজাটা ক্যাঁচকোঁচ করে ককিয়ে উঠছে

খোলার সময়, শার্শি ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠছে কেঁপে। ধোঁয়া আর নোনা মাছের গন্ধে ঘরের হাওয়া ভস্‌ভস্‌ করছে।

দরজার কাছেই একটা জায়গায় বসল গিয়ে মা। এমনি জায়গা যে চোখে পড়তেই হবে। দরজা খুললেই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে লাগে। মন্দ লাগছিল না ঠাণ্ডাটা। বুক ভরে সেই ঠাণ্ডা হাওয়ার নিশ্বাস নেয়। মোটঘাট নিয়ে আর শীতের ভারি ভারি জামা পরে লোকে ঢুকতে গিয়ে আটকে যায় দরজায়। ঠেলেঠুলে কোনও মতে ঢুকে পোঁটলা-পুঁটলি মেজেতে, বেঞ্চিতে নামিয়ে রেখে — গা, মাথা, দাড়ি-গোঁফ, জামাকাপড় থেকে বরফ ঝাড়ে আর সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

হলদে একটা স্যুটকেস হাতে এক ছোকরা ভেতরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে চারদিকে চায়। তারপর সোজা মা'র কাছে এসে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে:

'মস্কো যাচ্ছেন?'

'হাঁ, তানিয়ার ওখানে।'

'এই যে এটা!'

মায়ের পাশেই বেঞ্চির ওপর স্যুটকেসটা রেখে একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর টুপীটা একটু ওপরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মা স্যুটকেসটার ঠাণ্ডা চামড়ার ওপর হাত বুলিয়ে ওটার ওপর কনুই ভর দিয়ে বসে বসে খুশিমুখে লোকজনের আসাযাওয়া দেখে। মিনিটখানেক পর উঠে দরজার কাছে আর একটু এগিয়ে বসে। মাথা সোজা করে আশপাশ দিয়ে যাওয়া মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে চলে মা স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে। বেশি বড় নয়, বইতে কষ্ট হয় না।

ছোট কোট গায়ে, কলার ওল্টানো এক ছোকরা হঠাৎ হুড়মুড় করে মা'র গায়ের ওপর এসে পড়ে। তারপর চমকে হাতটা মাথার পানে তুলে চুপচাপ এক ধারে সরে দাঁড়ায় সে। ছেলেটিকে চেনা চেনা লাগে মা'র। ফিরে তাকায়। ছোকরাটি কলারের আড়াল দিয়ে একচোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দৃষ্টিটা ছুরির ফলার মতো গিয়ে বিঁধতে লাগল মাকে। স্যুটকেস্‌-ধরা হাতটা শিউরে উঠল; হঠাৎ যেন সাংঘাতিক ভারি হয়ে উঠল বাক্সটা।

"নিশ্চয় কোথাও দেখেছি ছেলেটাকে," মনে মনে ভাবে মা, বুকের মধ্যের অস্বস্তিকর অনুভূতিটা চাপতে চেষ্টা করে, কিন্তু চেপে দেবে কি! সেটা

কলজেটাকে ধীরে ধীরে শক্ত করে ধরে পিষে ফেলে যেন। ক্রমশই বাড়তে লাগল; ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল গলার কাছে; সারাটা মুখ কেমন বিশ্রী একটা শুকনো বিস্বাদে ভরে গেল। আর একবার ছোকরাটাকে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছে করতে লাগল। একসময়ে ফিরে তাকিয়ে দেখে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই ছোকরা। কেবল বারে বারে পা বদল করছে — ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা করতে চাইছে, কিন্তু মন ঠিক করে উঠতে পারছে না। ওর ডান হাতটা জামার বুকের মধ্যে ঢোকানো, বাঁ হাতটা পকেটে। ফলে ডান কাঁধটা উঁচু দেখাচ্ছে বাঁ-টার চাইতে।

একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে মা, অতি ধীরে সন্তর্পণে, যেন ভেতরের একটা কিছু ছিঁড়ে যাবে। বিপদের আশংকায় আঁতিপাঁতি করে স্মৃতি ওলট পালট করে মা। দুবার লোকটার চেহারা তার মানসচোখে ভেসে উঠল। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুবার দেখেছে। একবার সেই রীবিন পালাবার সময় শহর পেরিয়ে সেই খোলা মাঠের ধারে; সেই যে পুলিশটাকে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল মা, তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল লোকটা। দ্বিতীয়বার দেখেছিল আদালতে। বুঝতে বাকী থাকে না নজরবন্দী হয়ে আছে মা।

"ধরা পড়ে গেলাম?" নিজেকেই শুধয় মা। শিউরে ওঠে সারা দেহ। নিজেই জবাব দেয় আবার:

"না, হয়তো এখনও নয়..."

কিন্তু তখনই আবার মন জোর করে দৃঢ় কণ্ঠে বলে:

"ধরা পড়েছি!"

চারদিকে তাকায় মা — কিন্তু শূন্য দৃষ্টি, দেখে না কিছুই। শুধু একটার পর একটা চিন্তা ফুল্‌কির মতো জ্বলে জ্বলে ওঠে মনের মধ্যে।

"স্যুটকেসটা ফেলে চলে যাই?"

সঙ্গে সঙ্গেই আরো উজ্জ্বল হয়ে আরেকটা চিন্তা জ্বলে ওঠে:

"কী? আমার ছেলে, তার বাণী — ওই হাতে দিয়ে যাব..."

শক্ত করে ধরে স্যুটকেসটা।

"এটাকে নিয়ে পালিয়ে যাই..."

কথাটা যেন নিজের নয়, পরের। যেন কারো জোর করে চাপিয়ে-দেওয়া। মনের ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, যেন সূক্ষ্ম আগুনের তন্তু দিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ শতছিদ্র করে দিচ্ছে। যন্ত্রণায় অপমানে ছুটে পালাতে চায় মা — নিজের কাছ থেকে, ছেলের কাছ থেকে, জীবনে যত

বস্তু তার প্রিয় হয়ে উঠেছে, সব কিছুর কাছ থেকে। কী যেন একটা প্রতিকূল শক্তি ওর কাঁধে বুকে চেপে বসেছে — ভয় দেখিয়ে ওর আত্মার অবমাননা করে তাকে টেনে নীচে নামাচ্ছে। ওর রগের শিরাগুলো ফুলে উঠে দপ্ দপ্ করছে। মাথার চুলের গোড়া থেকে ছুটছে আগুন।

প্রাণপণে বুকে বল বেঁধে মা সমস্ত ক্ষুদ্র দুষ্ট চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ধমক দিয়ে ওঠে নিজেকে — ছিঃ, লজ্জা করে না!

নিমেষে সমস্ত গ্লানি যেন দূর হয়ে যায়। সাহসে বুক ভরে ওঠে:

"দেখো, ছেলের অপমান করো না! ওরা কোনো কিছুতেই ভয় করে কি!"

কার দুঃখিত ভীরু দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলে যায় মায়ের। রীবিনের মুখ বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো খেলে যায় চিত্তের আকাশে। কয়েক মুহূর্তের দ্বিধায় মনটা শক্ত হয়ে ওঠে। বুক-ধড়ফড়ানিটা শান্ত হয়ে আসে।

চারদিকে তাকাতে তাকাতে ভাবে: "এখন কী হবে তাহলে?"

টিকটিকিটা স্টেশনের পাহারাদারকে ডেকে কানে কানে কী বলে, মাকে চোখের ইসারায় দেখিয়ে দিয়ে। পাহারাদারটা লোকটার দিকে তাকিয়ে পিছু হটে যায়। আর একজন পাহারাদার আসে। সে সব শুনে ভুরু কোঁচকায়। শক্ত সমর্থ বৃদ্ধ — এক মাথা সাদা চুল। ক্ষৌর-বিবর্জিত মুখ। লোকটা টিকটিকিটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে কী ইসারা করে মায়ের দিকে এগিয়ে যায়। টিকটিকিটা তক্ষুনি বেরিয়ে যায়।

বিরক্ত চোখে মাকে নিরীক্ষণ করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে পাহারাদার। মা বেঞ্চির ভেতরের দিকে সরে যায়। মনে হয়:

"আর যাই করুক, যেন না মারে..."

লোকটা এসে দাঁড়ায় মায়ের সামনে। মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে কঠোর স্বরে বলে:

'কী দেখছ বসে বসে?'

'কিচ্ছু না।'

'বটে? চোর মাগী! এই বয়সে এত শয়তানী!'

মনে হল ওর কথাটা যেন মুখে একটা চড়ের মতো এসে লাগল। একবার, দুবার; কথাগুলোর ওই স্থূল আক্রোশের ছোবলে মা'র দৈহিক কষ্ট হতে লাগল। যেন গাল দুটো চিরে দুফাঁক করে, চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে...

'আমায় বলছ? আমি চোর নই। মিথ্যে কথা!' বুকের সমস্ত জোর দিয়ে চীৎকার করে মা। রাগে, তিক্ত অপমানে চারদিক বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। স্যুটকেসটাকে ধরে টান মারে মা। খুলে গেল সেটা। একমুঠো কাগজ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শূন্যে হাতটা নাড়তে নাড়তে চীৎকার করতে থাকে মা:

'দেখ! দেখ! সব্বাই দেখ!' কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করে। তার মধ্যে দিয়েই শুনতে পায় মা, চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে চীৎকার করতে করতে।

'কী, কী, কী হয়েছে?'

'ওই যে টিকটিকিটা...'

'সে আবার কী?'

'ওরা বলছে এ নাকি চুরি করেছে...'

'এ যে ভদ্রঘরের মনে হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ...'

চারদিকে মানুষের ঠেলাঠেলি দেখে খানিক প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে মা। চীৎকার করে জবাব দেয়, 'আমি চোর নই গো, চোর নই! কাল সেই যে রাজনৈতিক বন্দীদের মামলা হল! আমার ছেলে — ভ্লাসভ — ছিল তাদের মধ্যে। সে একটা বক্তৃতা দিয়েছিল আদালতে — এই যে দেখ সব। আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছিলুম সবাইকে বিলোব বলে! যাতে সবাই পড়ে দেখে আর সত্যি কথাটা যে কী তা ভেবে দেখে...'

কে একজন সন্তর্পণে একটা কাগজ টেনে নেয়। মা সেগুলো শূন্যে দুলিয়ে ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। কার ভীত কণ্ঠ শোনা যায়:

'কী করছ! ঠাণ্ডা করে দেবে যে!'

মা দেখে, হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ভিড়ের মধ্যে। কাগজগুলো লুফে নিয়ে যে যার কোটের বুকে, পকেটে পুরে ফেলছে। মা'র দেহে বল ফিরে আসে — পা দুটো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে চাপা আনন্দ, গর্ব উথলে উঠেছে। তারই আমেজে জোরাল অথচ শান্ত ভাষায় বলে যায় মা। স্যুটকেস থেকে মুঠো মুঠো কাগজ নিয়ে ছড়িয়ে দেয় ডাইনে বাঁয়ে — এগিয়ে-আসা ব্যগ্র হাতগুলির মুঠোয়।

'তোমরা জানো, কেন আমার ছেলে আর তার সঙ্গীসাথীদের ওরা ধরে আদালতে নিয়ে এসেছিল? শোন তাহলে বলছি। আমি মা। মায়ের প্রাণ আর এই পাকা চুলগুলোকে তো বিশ্বাস করবে! ওরা সত্যি কথা বলেছিল—

বুঝলে? ঐ হলো ওদের অপরাধ। তাই কাঠগড়ায় তুললে। কাল তো দেখলুম — কেউ পারলে ওদের সত্যকে ঠেলে ফেলতে? কেউ না!'

ভিড় বেড়ে ওঠে। মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে জ্যান্ত মানুষের প্রাচীর।

'মানুষ মেহনত করে মরে; তার বদলে পায় কী? না, অভাব অনটন, ক্ষিদে, রোগ! চিরকেলে ধরা-বাঁধা মজুরি। সব কিছু আমাদের বিরুদ্ধে। দিনের পর দিন খাটি — আর পড়ে থাকি আঁস্তাকুড়ে। আমাদেরই মেহনতের ফল ভোগ করে অন্যে। আর আমরা গলায় শিকলি-বাঁধা কুকুরের মতো থাকি ওদের হাতের মুঠোয়। ওরা আমাদের বোকা মুখ্যু করে রেখে দেয়। আমরা কিচ্ছু জানি না, কেবল ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকি। ভয় করিনে হেন জিনিস নেই। আমাদের জীবনটা একটা আস্ত আঁধার রাত — আর কিছুই না।'

চাপা সাড়া আসে ভিড় থেকে, 'ঠিক বলেছ।'

'দে তো মাগীর মুখ ভোঁতা করে!'

মা'র চোখ পড়ে ভিড়ের পেছনে — সেই টিকটিকিটা আর দুজন পুলিশ। শেষ গোছাটা তুলবার জন্য তাড়াতাড়ি হাত দেয় মা স্যুটকেসে। কিন্তু হাতটা আর একজনের হাতে এসে ঠেকে। ঝুঁকে পড়ে বলে মা:

'নাও নাও, নিয়ে যাও!'

ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে করতে পুলিশ হাঁকে, 'এই সব হটে যাও, হটো!' নেহাৎ অনিচ্ছায় একটু ফাঁক হয় ভিড়, কিন্তু পুলিশকে চারদিকে ঘিরে রাখে, এগুতে দেয় না ওদের, যদিও হয়তো তা করে অজান্তেই। দুর্বার আকর্ষণে জনতাকে টানে ওই শুভ্রকেশা নারী আর তার স্নেহভরা মুখের বড় বড় উদার চোখ দুটি। দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষগুলো আজ এক হয়ে পড়ে। গভীর অভিনিবেশে মায়ের অগ্নিময়ী বাণী শোনে। জীবনের অন্যায় অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এদের অনেকেই হয়তো এমনি বাণীর প্রতীক্ষায় ছিল। মায়ের কাছাকাছি যারা ছিল, তারা নিঃশব্দ, অপলক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের উষ্ণ নিশ্বাস লাগে এসে মায়ের মুখে।

'সরে যাও বুড়ী, পালাও!'

'এক্ষুনি ধরবে যে!..'

'বাবাঃ, কী জবরদস্ত মেয়েমানুষ!'

'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও সব!' হাঁকতে হাঁকতে একটু একটু করে এগিয়ে

আসে পুলিশ। মায়ের সামনে যারা ছিল — তারা টলতে টলতে পরস্পরকে ধরে থাকে।

মায়ের মনে হয় ওরা যেন বুঝতে চাইছে, বিশ্বাস করতে চাইছে। মাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের বলে যেতে চায় যাকিছু তার জানা আছে — যে-সমস্ত চিন্তার জোর সে নিজে অনুভব করেছে। হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে সেসব কিছু গান হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু কণ্ঠে তো জোর নেই মা'র! ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলা আছে শুধু — মা'র কষ্ট হতে থাকে।

'যে-কথা বলে গেছে আমার ছেলে — সে এক সাচ্চা মেহনতী মানুষের প্রাণের কথা — যে-মানুষ তার আত্মাকে বিকিয়ে দেয়নি কারো পায়ে। নির্ভীক কথা শুনলেই বোঝা যায় তা সাচ্চা কথা।'

ভয়-আনন্দে অভিভূত এক জোড়া তরুণ চোখ মায়ের মুখে স্থির ভাবে নিবদ্ধ হয়ে থাকে।

হঠাৎ বুকে একটা চোট খেয়ে মা টলে উঠে বেঞ্চিতে বসে পড়ে। পুলিশের হাতগুলো জনতার মাথার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায় — কারো ঘাড়, কারো কলার ধরে এক পাশে সরিয়ে দেয়। টুপিগুলো মাথা থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আরেক ধারে। মায়ের চোখের সামনে সব অন্ধকার... বোঁ বোঁ করে ঘুরছে সব। তবু অবসাদ ঝেড়ে ফেলে যেটুকু শক্তি বাকী ছিল, তাই দিয়ে আর একবার চীৎকার করে বলে:

'এক হও, এক হও, সব মানুষ এক হয়ে এক বিরাট শক্তি গড়ে তোল!'

একজন পুলিশ মস্ত বড় লাল থাবাটা দিয়ে ওর কলার ধরে প্রচণ্ডভাবে মাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে চীৎকার করে:

'চোপরাও মাগী!'

মাথার পেছনটা দেয়ালে ঠুকে যায়। ক্ষণিকের জন্য একটা ভয়ের কালো মেঘ ছেয়ে আসে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেঘের বুককে শতদীর্ণ করে হৃদয় জ্বলে ওঠে সহস্র-শিখায়।

পুলিশ হুঙ্কার ছাড়ে:

'চল্ মাগী চল্!'

'কিছুতেই ভয় পেওনা। আর বেশি ভয়ংকর কী আছে বলতো যে অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছ তার চাইতে...'

'কানে যাচ্ছে না! মুখ বন্ধ করলি!' পুলিশ ওর হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মারে। আর একজন আর একটা হাত ধরে বড় বড় পা ফেলে নিয়ে চলে ওকে।

'...যে অত্যাচার প্রতিদিন কলজেকে, ছাতিটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার চাইতে!..'

টিকটিকিটা আগে আগে ছুটে গিয়ে মা'র মুখের সামনে মুঠি নাচাতে নাচাতে তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে:

'চোপরাও, কুত্তী কহীঁকা!'

মায়ের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ধক্‌ধক্ করে জ্বলে ওঠে। চোয়াল কাঁপতে থাকে। পিছল পাথুরে মেজের ওপর শক্ত করে পা দুটো আটকে মা চীৎকার করে:

'আমার পুনরুজ্জীবিত আত্মাকে মারতে পারবে না ওরা!'

'এই কুত্তী!'

টিকটিকিটা এক থাপ্পড় মারে মা'র মুখে। কার যেন বিদ্বেষের খুসীভরা কণ্ঠ শোনা যায়: 'খুব হয়েছে, ডাইনী বুড়ী! যেমন কুকুর তেমন মুগুর!'

চোখের সামনে লাল... কালো... দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য, রক্তের লবণাক্ত স্বাদে মুখ ভরে যায়।

আচ্ছন্ন চেতনার তটে এসে ঘা দেয় জনতার এলোমেলো উত্তেজিত চীৎকার:

'খবরদার, ওর গায়ে হাত দিয়েছ তো!'

'চল হে চল!'

'শালা শয়তানের হাঁড়ি!'

'দে, দে, দে ব্যাটাকে কষে!'

'আরে লোকের মন তো আর রক্তে ডুবিয়ে দিতে পারবে না!'

মায়ের পিঠে ঘাড়ে ধাক্কা মারে; মাথায় কাঁধে আঘাত পড়ে। চীৎকার, আর্তনাদ, হুইস্‌লের শব্দ, সব মিলে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণী ওঠে মা'র চারপাশে। চাপা অথচ তীক্ষ্ণ কী যেন একটা কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করে কানকে বধির করে দেয়; গলা আটকে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। পায়ের তলা থেকে জমি সরে যায়; হাঁটু অবশ হয়ে আসে। সারা দেহ তীব্র ব্যথায় কাঁপতে কাঁপতে ভারি হয়ে উঠে অসহায় ভাবে টলতে থাকে। কিন্তু চোখ

তেমনি জ্যোতিষ্মান। জনতার চোখের সঙ্গে চোখ মিলে যায় — মা দেখে ওই দুঃসাহসী চোখগুলিতে ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলছে। এ আগুন মা চেনে — ভালোবাসে — এ যে তার অন্তরের 'প্রিয়ো বৈ সঃ'।

ধাক্কা দিতে দিতে দরজা দিয়ে নিয়ে যায় মাকে।

একটা হাত ছাড়িয়ে চৌকাঠ ধরে মা।

'রক্তের সমুদ্দুর বইয়ে দিলেও সত্যকে ডুবিয়ে দিতে পারবে না...'

হাতে আঘাত পড়ে।

'নির্বোধের দল! শুধু মানুষের ঘৃণাই কুড়ুচ্ছ! এক দিন উল্টে তোমাদেরই মাথায় পড়বে!'

একজন পুলিশ মায়ের গলা টিপে ধরে।

খাবি খায় মা।

'হতভাগার দল...'

কে একজন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

১৯০৭

উপসংহারের বিকল্পে
(গোর্কির 'মা' উপন্যাসের পরিশিষ্ট)

গোর্কির মা উপন্যাসের নায়কদের আমরা ছেড়ে আসি তাদের ঘোর দুঃসময়ে। পাভেল ভ্লাসভ অপেক্ষা করছে তার হাজার ভার্স্ট যাত্রা, সাইবেরিয়ায় যাবজ্জীবন নির্বাসন। আদালতে পাভেল যে বক্তৃতা দিয়েছিল তার বয়ান-ছাপা বেআইনী প্রচারপত্রের স্যুটকেস সমেত নিলভনা ধরা পড়েছে সশস্ত্র পুলিসের হাতে, তারা তাকে লাঞ্ছিত করছে, মারছে, আর ভিড় করে আসা লোকেদের সে বলতে চাইছে জীবনের সত্য কী... জল্লাদদের মুখের ওপর সে চেঁচিয়ে উঠেছে: 'রক্তের সমুদ্দুর বইয়ে দিলেও সত্যকে ডুবিয়ে দিতে পারবে না!.. নির্বোধের দল! শুধু মানুষের ঘৃণাই কুড়ুচ্ছ!'

কিন্তু গোর্কির উপন্যাস যে বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে লেখা, সেই পিওত্র জালোমভ এবং তাঁর মা আন্না কিরিলোভনার জীবনে কী ঘটেছিল?

পিওত্র্ জালোমভ আরো অনেক দিন বাঁচেন, মারা যান যথেষ্ট বার্ধক্যে ১৯৫৫ সালে তাঁর আটাত্তর বছর বয়সে। তাঁর মা আন্না কিরিলোভনা জালোমভাও বাঁচেন অনেক দিন, যাঁর সম্পর্কে গোর্কি লিখেছিলেন, '...নিলভনা হল পিওত্র জালোমভের মায়ের প্রতিচিত্র, সরমভোয় ১৯০২ সালের ১লা মে'র মিছিলের জন্যে পিওত্র জালোমভের বিচার হয়। তাঁর মা সংগঠনে কাজ করতেন, ছদ্মবেশে সাহিত্য পৌঁছে দিতেন...'

আন্না কিরিলোভনার জন্ম হয় ১৮৪৯ সালে, মুচি পরিবারে। জীবন তাঁর সুখের ছিল না। অবস্থা খুবই কঠিন হয় বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যুর পর, সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মাটির নিচের কুঠরিতে 'বিধবার বাড়িতে' একটি মাত্র ঠাণ্ডা বিমর্ষ খুপরি। কেবল মায়ের দৃঢ়তা ও পরিশ্রমেই সংসারটি রক্ষা পায়। ক্রমে ক্রমে বড়ো হল ছেলেরা — বড়োটি গেল কাজে, ছোটটি লেখাপড়ায়। পিওত্র যোগ দেন বিপ্লবী চক্রে এবং 'আমাদের জীবনে আসে একটা তাজা, চাঙ্গা হাওয়া' — পুরনো কথা মনে করে বলে পিওতরের ছোটো বোন ভারভারা জালোমভা। শীগগিরই জালোমভদের গোটা পরিবারই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়।

অক্টোবর বিপ্লবের পর আন্না কিরিলোভনা দিন কাটান কখনো লেনিনগ্রাদে ছোটো মেয়ের সংসারে, কখনো সরমভোয় ছেলেদের কাছে।

ছোটোখাটো চেহারার এক বৃদ্ধা তখন তিনি, আশ্চর্য জীবন্ত চোখে

অমায়িক হাসি। শাদা চুল তাঁর সাধারণত ঢাকা থাকত সেকেলে ঢঙের কালো শালে। লেনিনগ্রাদের উরিৎস্কি নামে কারখানার মজুরানী, নিজনি নভ্গরদের ছাত্র, সরমভোর মজুর — যারা তাঁকে দেখেছে, কথা কয়েছে, যাদের কাছে তিনি তাঁর অতীতের কথা, বিপ্লবী কাজের কথা, ছেলের কথা বলেছেন সরল সাদামাটা ঢঙে, তাদের সকলের কাছেই তাঁর ওই চেহারাটাই মনে আছে।

আন্না কিরিলোভনা মারা যান ১৯৩৮ সালে।

কিন্তু ফেরা যাক পিওত্র জালোমভের জীবনীতে... জার আদালতের রায়ে ১৯০৩ সালে পিওত্র জালোমভ পায়ে হেঁটে রওনা দেন সাইবেরিয়ার নির্বাসনে। এক বছর পরে তিনি পেঁছিন ইয়েনিসেই নদী, সেখানে ক্রাসনোয়ার্স্ক থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে ছোট একটি বসত মাকলাকভকায় ডেরা পাতেন... 'নির্বাসনে কাটাই দু'বছর, স্থানীয় চাষীদের মধ্যে প্রচার চালাই, ভলোস্তের পেশকার এবং তার দুই সহকারীকে দলে টানি। আলেক্সেই মাক্সিমভিচ গোর্কি প্রতি মাসে আমায় আট রুবল করে পাঠাতেন, এলাকার দারোগা সেটি মেরে দিত। উপোস দিতে হত আমায়, স্কার্ভি রোগে পড়ি...' পুরনো কথা প্রসঙ্গে বলেন পিওত্র জালোমভ।

পিওতরের জীবনের একটি শুভদিন শুরু হয় ১৯০৪ সালের রোদভরা মার্চের প্রত্যুষে। নিজের ক্ষুদে কুঠরিটায় বসে কাঠের স্কি বানাচ্ছিলেন তিনি। 'স্থির সমতালে তাল পড়ছে হৃৎপিণ্ডে... হঠাৎ দরজা খুলে গেল। হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে আমার কাছে এসে হাজির হলেন জোসেফিনা এদুয়ার্দোভনা, গায়ে একটা পুরনো শাদাটে লোম-কোট, ঠাণ্ডায় গোলাপী হয়ে উঠেছে মুখ।'

দুই পেশাদার আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর প্রণয়কাহিনীটা রুক্ষকঠিন। মস্কোর তরুণী শিক্ষিকা জোসেফিনা গাশেরের (জাতিতে ফরাসিনী) সঙ্গে পিওতরের পরিচয় হয় ১৯০১ সালেই। দেখা হত শ্রমিক সভায়, বৈঠকে, সাক্ষাৎ হত নিজনি নভগরদের রাস্তায়, কিন্তু মন দেওয়া নেওয়ার কথাটা কেউই তুলতে পারেন নি। শুধু পিওত্র জালোমভ যখন গ্রেপ্তার হয়ে মস্কোর বুতিরস্কায়া জেলখানায় তাঁর ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছিলেন কেবল তখনই আন্না কিরিলোভনার সঙ্গে জোসেফিনা গাশের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁর ভাবী 'বধূ' হিসাবে...

গোর্কির সাহায্যে নির্বাসন থেকে জালোমভের পলায়নের ব্যবস্থা হয়।

পিটার্সবুর্গের বলশেভিক গুপ্ত সংগঠনে কাজ করেন জালোমভ, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর্বে মস্কোয় শ্রমিক যোদ্ধবাহিনী সংগঠনে অংশ নেন।

পিওত্র জালোমভের সঙ্গে আলেক্সেই মাক্সিমভিচ গোর্কির প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৫ সালের গ্রীষ্মে, পিটার্সবুর্গের উপকণ্ঠে কুয়োক্কালে গোর্কির পল্লীভবনে।

ভবিষ্যৎ উপন্যাসের লেখক এবং যাঁকে নিয়ে আঁকা হবে ভবিষ্যৎ পাভেল ভ্লাসভ তাঁদের মধ্যে জানা শোনা ছিল, কিন্তু দেখা হয় নি কখনো। সরমভোর ১লা মে মিছিলের আগে থেকেই আলেক্সেই মাক্সিমভিচ দেখা করতে চেয়েছিলেন জালোমভের সঙ্গে, কিন্তু পিওতরের ভয় ছিল এতে গোর্কির ক্ষতি হতে পারে, কেননা পুলিস দপ্তরে তখনই গোর্কির 'সুনাম ছিল না', জানা ছিল যে বিপ্লবী লেখককে হেনস্থা করার জন্যে পুলিস যে কোনো সুযোগ খুঁজছে। ১লা মে'র মিছিল এবং তার নেতাদের গ্রেপ্তারের পর গোর্কি জালোমভ ও তাঁর কমরেডদের পৃষ্ঠপোষকতা চালিয়ে যান। পিওতরের মা আন্না জালোমভা মারফত গোর্কি তাঁর নিজ শহরবাসী নিজ্নি-নভ্গরদীদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। সাইবেরিয়ায় 'প্রাণধারণের' টাকা পাঠাতে গোর্কির কোনো মাসেই ভুল হয় নি। জালোমভের সংসার পাতার খবর পেয়ে টাকাটা তিনি দ্বিগুণ করে দেন এবং শেষত তিনশ টাকা পাঠান 'পালাবার জন্যে'।

তারপর ফেরারী এবার পিটার্সবুর্গে, তাঁর প্রথম দিককার একটা সাক্ষাৎই গোর্কির সঙ্গে।

গন্তব্য স্টেশন আসবার আগেই (পাছে টিকটিকি লাগে পেছনে) পিওতর ট্রেন থেকে নেমে বনে ঢোকেন, পল্লীভবনের বেড়ার কাছে গিয়ে থামেন। দেখেন আঙিনায় লম্বা শুকনোটে চেহারার একটি লোক, ছবি থেকে এ চেহারা তাঁর আগেই চেনা।

'আলেক্সেই মাক্সিমভিচ!' ডাক দেন পিওতর, নিজের পরিচয় দেন।

গোর্কি এগিয়ে যান অতিথি বরণে, মুখে তাঁর সামন্ত্রণ হাসি। কোলাকুলি হল এক এলাকার বাসিন্দা দুই ভাইয়ে। গৃহকর্তা উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন জালোমভকে।

'তাহলে এই হলেন আপনি!'

তারপর আরামকেদারায় আয়েস করে বসে শুরু হল তাঁদের লম্বা আলাপ। গোর্কি তাঁর সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞেস করেন

পিওতরের, তাঁর মা-বাপ, তাঁর বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ, সরমভোর মিছিলের কথা। শ্রমিক প্রচারক কাজের লোকের মতো জানিয়ে যান শুধু ঘটনাগুলো, মন-মেজাজের কথা বলেন কম, স্বপ্ন-কল্পনার কথা আদৌ না। বন্ধুর মতো বিদায় নেন তাঁরা, ঠিক করে নেওয়া হল আবার কবে দেখা হবে। এই সময় গোর্কি তাঁর এক বন্ধুর কাছে পিওত্‌র সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'সরমভোর একটা লোক আসে আমার কাছে — কী আশ্চর্য মানুষ!'

একের পর এক দায়িত্বশীল পার্টি কর্তব্য পালন করে যান পিওত্‌র। 'মস্কোয় যোদ্ধৃবাহিনীর সংগঠক নিযুক্ত হই। মস্কোয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হবার অল্প আগে আমার বৌ জোসেফিনা এদুয়ার্দোভনা জালোমভার সঙ্গে বোমার খোল তৈরির কাজে নামি — ইনি সাইবেরিয়া থেকে আমার কাছে চলে এসেছিলেন দশ মাসের মেয়ে নিয়ে... অভ্যুত্থানের সময় ব্যারিকেড লড়াইয়ে অংশ নিই। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি গলা দিয়ে রক্ত ওঠায় এবং একেবারে অশক্ত হয়ে পড়ায় বৈধ জীবনে ফিরতে বাধ্য হই।'

তাই কুর্স্ক গুবের্নিয়ার ছোটো একটি শহর সুজা'র রাস্তায় একদিন সপরিবারে দেখা দিলেন নিজ্‌নি নভ্‌গরদের মিস্ত্রি পিওত্‌র জালোমভ। পিওত্‌র জালোমভের পক্ষে সুজা'র জীবন হয়ে দাঁড়ায় কার্যত দ্বিতীয় এক নির্বাসন, কোথাও যাওয়া বারণ, কোথাও কাজ করা বারণ। পায়ে পায়ে অনুসরণ করত পুলিস। অনশন, জেলখানা ও নির্বাসনে ভেঙে পড়া জালোমভের স্বাস্থ্য এই সময় আরো খারাপ হয়ে পড়ে। সংসার চালাতেন বৌ জোসেফিনা এদুয়ার্দোভনা, সুজা'র বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার একটা কাজ পান তিনি। সে সময়কার কথায় জালোমভ বলেন, '১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত বরাবর ছিলাম পুলিস গোয়েন্দার কঠোর নজরাধীনে, সম্ভব ছিল কেবল চাষীদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত ভাবে কাজ চালানো।'

এল সতের সালের ফেব্রুয়ারি, তারপর অক্টোবর। সরমভোর নিশানবরদার, অপরাহত বিপ্লবী ফের ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘটনাবর্তে। প্রথম জনসভাতেই পিটার্সবুর্গের ঘটনাবলীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন চাষী ও কারুজীবীদের কাছে।

নিজের ভাই আলেক্সান্দরের কাছে চিঠিতে পিওত্‌র জালোমভ বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর জীবনের যে বর্ণনা দেন তা খুবই জীবন্ত:

'...১৯১৭ সালে উয়েজ্‌দে সোভিয়েত রাজ সংগঠনে অংশ নিই... শীগগিরই নির্বাচিত হই শ্রম কমিশার।

'সুজা দখল করে রাখার সময় শ্বেতরা বার কয়েক আমায় ঝোলাবার আয়োজন করে, কিন্তু তিন বারই ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে যাই। শেষ বার গ্রেপ্তার হই দেনিকিনীদের হাতে, কোর্ট মার্শালে বিচার হয়। জেলের কর্তারা লাঞ্ছনা করত আমায়, প্রায় প্রতি দিনই ভয় দেখাত ফাঁসি দেবে, গুলি করে মারবে... লাল ফৌজ এসে না পড়লে এ সিদ্ধান্ত তারা কার্যকরীও করত।'

জালোমভের প্রাণ বাঁচায় লাল ফৌজ, কিন্তু শক্তি তখন আর তাঁর কিছু ছিল না। গুরুতর চিকিৎসা দরকার। জালোমভ যান মস্কোয়, দীর্ঘদিন কাটান হাসপাতালে, ক্রমে ক্রমে শক্তি ফেরে, যোগাযোগ হয় পুরনো বন্ধুদের (খ্যাতনামা বিপ্লবী লেনিনপন্থী গ্লেব ক্রজিজানভস্কির পরিবারের) সঙ্গে, নতুন মোড় নেয় গোর্কির নায়কের জীবন।

জাত আন্দোলক হওয়ায় পিওত্র জালোমভ চাষীদের মধ্যে প্রচুর কাজ চালান। পত্রিকা পড়ে শোনাতেন, সহজ করে বোঝাতেন গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত রাজের নীতি কী, সরকার কী কী নতুন ডিক্রি ও নির্দেশ জারি করছে।

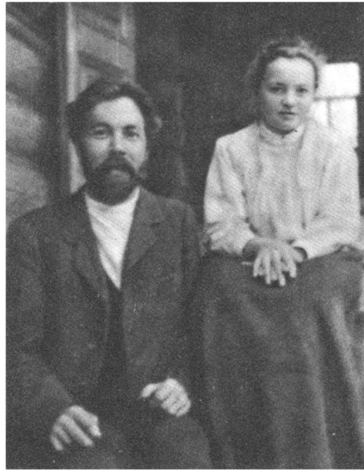
কলখোজ আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন পিওত্র সুজা'র চাষীদের নিয়ে গড়েন 'লাল অক্টোবর' কলখোজ। কয়েক বছর তিনি এর সভাপতিত্ব করেন, পরে কাজ করেন ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর সভ্য হিসাবে।

ডাক্তারদের নিষেধাজ্ঞা এবং কঠোর প্রাণান্তক ব্যাধি সত্ত্বেও পিওত্র জালোমভ কাজ ছাড়েন না। নিজের বৈপ্লবিক যৌবন এবং গোর্কির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের স্মৃতি কথা লেখেন তিনি, 'মা' উপন্যাসের পাঠকদের সঙ্গে ব্যাপক পত্রালাপ চালান। বন্ধু ক্রজিজানভস্কিদের কাছে একটি চিঠিতে পিওত্র জালোমভ লিখেছেন জীবন সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন: 'আমার ধারণা যে-গোলাম তার নিজের তুচ্ছ জীবনটা নিয়ে আর উদ্বিগ্ন নয়, নিজের স্বাধীনতার জন্যে যে সংগ্রামে কৃতসংকল্প, তার হাতে তখনো হাতকড়া ঝুললেও সে হয়ে উঠতে শুরু করছে স্বাধীন মানুষ। আমি চাই গোলাম যেন না থাকে, গোলামদের আমি ভালোবাসি না, ভালোবাসি যোদ্ধাদের, ভালোবাসি সেই লোকদের যাদের মধ্যে দেখি স্বাধীন মানুষের পৌরুষ।'

পিওত্র জালোমভ, বিপ্লবের মামুলী সৈনিক, যিনি একদা গোর্কিকে মুগ্ধ করেছিলেন, তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষার উদাত্তে, নৈতিক শুচিতায় আমাদেরও মুগ্ধ করেন। তাঁর মধ্যে, তাঁর জীবনে প্রকাশ পেয়েছে বিশ শতকের সচেতন রুশ শ্রমিক-বিপ্লবীর শ্রেষ্ঠ গুণাবলী।



আন্না কিরলোভনা জালোমভা — যাঁর আদর্শে গোর্কির 'মা' উপন্যাসের পেলাগেয়া নিলভনা ভ্লাসভার চরিত্রটি গড়া।



পিওত্‌র জালোমভ ও তাঁর স্ত্রী জোসেফিনা জালোমভা। পিওত্‌র জালোমভের আদর্শে পাভেল ভ্লাসভ চরিত্রটি কল্পিত।

'নিলভনা বলে কি কেউ ছিল? বিপ্লবের আয়োজনে, 'গোপন কার্যকলাপে' মায়েরাও অংশ নেন... নিলভনা হল পিওত্‌র জালোমভের মায়ের প্রতিচিত্র। সংগঠনে তিনি কাজ করতেন, ছদ্মবেশে সাহিত্য পৌঁছে দিতেন... তিনি কোনো ব্যতিক্রম নন।

'... পাভেল ভ্লাসভও বিরল চরিত্র নয়। ঠিক এই ধরনের লোকেরাই বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলেছিল।'

মাক্সিম গোর্কি

(৩০ খণ্ড রচনাবলীর ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫)